আদর্শ হিন্দুবিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম ভাগ।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

তত্ত্বাবধায়ক।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

প্রকাশক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

শিক্ষা-পরিচর কার্য্যালয়,
গঙ্গাধর নিকেতন,
৯০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

আদর্শহিন্দুবিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহাত্মা [illegible]সুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন

পঞ্চম ভাগ।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

তত্ত্বাবধায়ক।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

প্রকাশক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

শিক্ষা-পরিচর কার্য্যালয়,
গঙ্গাধর নিকেতন,
৯০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

সূচীপত্র।

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। | বৈশাখ, ১৩০২ সাল। | ১ম সংখ্যা।

অতীত বৎসর।

চলিলে বৎসর! যাও,
আসিতে পারে না আর,
বসিতে পাবে না আর
প্রতাপের সিংহাসনে,
ক্ষণিক প্রভুত্ব পেয়ে
ধরা খানি শরা খান
ভেবেছিলে,—যাইবে যে,
সে কথা ছিল না মনে!

দু'দিন প্রভুত্ব পেয়ে
কতই না করিয়াছ,
নির্দ্দোষ নয়নে কত
বহায়েছ অশ্রু-ধারা,
ভাঙ্গিয়াছ কত আশা,
কাঁপায়েছ কত প্রাণ,
নির্দ্দয় দলনে কত
হৃদয় করেছ সারা!

অত্যাচার অবিচার
ক্ষমতায় ছিল যত,

ঝাড়িয়াছ প্রাণপণে
দুর্ব্বল মানব-শিরে,
সাধের এ সিংহাসন
পৈতৃক রাজত্ব নহে,
অচিরে ছাড়িতে হবে,
ভাব নাই ক্ষণতরে!

অনন্তের কোন্ কোণে
কোথায় আছিলে প'ড়ে
কে লইত পরিচয়?
নামহীন, যশোহীন!—
বিধাতার বিড়ম্বনা!
তোমারো কপালে ছিল
জগতে রাজত্ব লেখা
তিন শত ষা'ট দিন!

ছিল না পাইলে নাম,
ছিল না পাইলে যশ,
মানবের ইতিহাসে
ছিল না পাইলে স্থান,
অধর্ম্মের গুরু হ'য়ে
হ'লে 'ধর্ম্ম-অবতার,'
পাইলে পিশাচ হয়ে
দেবতার যোগ্য মান!

যাও বর্ষ! রহ গিয়া
অতীতের অন্ধকারে,
যেমন সুপাত্র তুমি,
সেই তব যোগ্য বাস,

বিধাতার ভুল পেয়ে
লইলে রাজত্ব ক'রে,—
ভুলে কেহ হয় রাজা,
কাহারো বা সর্ব্বনাশ!

তুমি যেই গুণধর,
তোমারো স্তাবক আছে!
গাইছে কৃত্রিম সুরে
তোমারো গুণের গান!
প্রস্তরেতে প্রতিরূপ
উঠিত তোমারো নামে,
মানবের মত তুমি
হ'তে যদি মূর্ত্তিমান!

জগতের শান্তি।

(১)

জগৎ শান্তি চায়,—যুগ যুগান্ত ধরিয়া বিরোধ-বিক্রুত, হিংসা-দগ্ধ, শোণিত প্লাবিত পৃথিবী এখন শান্তি চায়। মানব-সন্তানকে প্রসব করিয়া অবধি সর্ব্বংসহা পৃথিবী অনেক সহিয়াছে,—সর্ব্বংসহা বলিয়াই সে এত অশান্তি, এত অপ্রেম, এত আত্ম-দ্রোহ, এত নৃশংসতা সহিতে পারিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বংসহাত্বেরও একটা সীমা আছে; প্রস্তরময় পৃষ্ঠাবরণ যাহা সহিতে পারে না, অভ্যন্তরে তেমন প্রখর তাপ উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই এ পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে—সর্ব্বংসহাও যে ধৈর্য্য চ্যুত হইতে পারে, তাহার পরিচয় দিবে।

পৃথিবী চিরদিনই শান্তি চাহিতেছে, কিন্তু পাইতেছে না। দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি, বীরের পর বীর পরাক্রান্ত হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছে, পৃথিবীর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া আপন আপন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছে, কিন্তু পৃথিবীর অশান্তি ঘুচিতেছে না, তাহার নর-শোণিত-কলঙ্কিত দেহ কেহই ধৌত করিয়া দিতেছে না! রাবণের পাপে রাক্ষস কুল বিধ্বস্ত, দুর্য্যোধনের পাপে ভারত নির্বীর্য্য, প্রায়ামের পাপে ট্রোযান বংশ নির্ম্মূল,—সে অনেক দিনের কথা। যাঁহারা আধুনিক সভ্যতা-মদে গর্ব্বিত, তাঁহারা বলিতে পারেন, সে অসভ্য যুগের

কথা; এই সভ্যতার পূর্ণালোকের সময়ে সেরূপ পাপেরও সম্ভাবনা নাই, সেরূপ শোণিত পাতেরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা সত্য কি? নেপোলিয়নের উচ্চাভিলাষের ফলে আজিও হয়ত কত জনের অশ্রুপাত হইতেছে, প্রুসিয়ার বৈরনির্য্যাতনের ফলে সিদানের সমর-ক্ষেত্র আজিও শোণিত সিক্ত রহিয়াছে, ইংলণ্ডের উন্মত্ত রাজ্য-পিপাসায় এখনও প্রতি বৎসর মানব-শোণিতে পৃথিবী কলঙ্কিত হইতেছে! এখনও এই মুহূর্ত্তেই ভারতের পশ্চিম সীমায় কি হইতে চলিল? পীত সমুদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র জাপানের সবে মাত্র সে দিন পাখা উঠিয়াছে, ইহারই মধ্যে সে কি করিতেছে,—কেমন নৃশংসভাবে নর-রক্তে পৃথিবীর তর্পণ করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ দেখি?

ফল কথা, যিনি যাহাই বলুন, মানব জাতি বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র, আপন স্বভাবের দস্যুতা, তস্করতা এবং শোণিত পিপাসাকে সাধুতার মনোজ্ঞ ভাষায় সাজাইতে শিখিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহার প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহার পশুত্বের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই, দেবত্বের দিকে সে একপদও অগ্রসর হইতে পারে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া—থাকিলেও মানুষ পাইলেই খায়, ব্যাঘ্রের সম্বন্ধেই এ কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, মানুষের সম্বন্ধে একথা বলিলেও অযুক্ত-প্রয়োগ দোষ ঘটে না। ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে একটি শীকার আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত কর, দেখিবে তাহার কি বিক্রম, কি একাগ্রতা, কি নৃশংসতা! মানুষও তাহাই। আজ সভায়, সমাজে, ধর্ম্ম-মন্দিরে বা সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া যিনি জ্ঞানের উপদেশ, প্রেমের উপদেশ দিতেছেন, যিনি কথায়, বক্তৃতায়, সংবাদ-পত্রে এবং পুস্তকে সাধুতা, ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা এবং ধর্ম্মের কাহিনীর ছড়াছড়ি করিতেছেন, কাল তাঁহার সম্মুখে একটি যুদ্ধের লোভ, একটি রাজ্যের লোভ, উপস্থিত হউক, অমনি দেখিবে আর সে মূর্ত্তি নাই, এখন আর এক মূর্ত্তি—এক রক্ত-পিপাসু ভীষণ শার্দ্দূল মূর্ত্তি! আর্য্যেরা বোধ হয় নর-প্রকৃতির এ তত্ত্ব বুঝিতেন, তাই তাঁহারা মানুষকে নরসিংহ, নরশার্দ্দূল প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন!

কিন্তু হাজার হউক, তথাপি মানুষ পশু নহে; তবে তাহার চরিত্রে এ দুর্ব্বলতা, এ কলঙ্ক কেন? ইহার একমাত্র কারণ অপ্রেম। একের অপ্রেমে অন্যের অপ্রেম জাগিয়া উঠে, একের হিংসায় অন্যের প্রতিহিংসা জলিয়া উঠে, কাযেই মারামারি কাটাকাটি লাগিয়া যায়!

বিদ্যায় মনুষ্যত্ব নহে, বুদ্ধিতে মনুষ্যত্ব নহে, শারীরিক বলেও মনুষ্যত্ব নহে,—মনুষ্যত্ব প্রেমে। মানুষের সৌন্দর্য্য প্রেমে, শক্তি প্রেমে, শান্তি প্রেমে। মানব-সমাজে প্রেমকে প্রধান আসন প্রদান করিতে যিনি কুণ্ঠিত, তিনি বলিতে পারেন প্রেম না থাকিলে সমাজ অচল হয় না, ন্যায়পরতাই মানবসমাজের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে না। মানুষ ভাল না বাসিয়া

থাকিতে পারে না। যে পরকে ভাল বাসিতে জানে না, সে আপনাকে অসঙ্গত রূপে ভাল বাসিতে থাকে। ক্রমে এই আত্ম-প্রেম স্বার্থপরতায় পরিণত হয়—প্রেমের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হইয়া উঠে। যে হৃদয়ে স্বার্থপরতা একবার শিকড় বসাইতে পারিয়াছে, সে জন্মের মত প্রেমের মাধুর্য্য এবং নীতির শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সে অন্ধ—স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই সে দেখিতে পায় না। সাহারার মরুভূমে প্রফুল্ল-কমল-শোভিত সরোবর বরং সম্ভব, তথাপি স্বার্থান্ধহৃদয়ে ন্যায়পরতা প্রভৃতি নীতির বিকাশ একেবারে অসম্ভব।

সত্য মিথ্যা, অতীতের সাক্ষী, মানবেতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর। বড় বড় দেশের, বড় বড় জাতির, বড় বড় অনেক নাম আছে, যাহা দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার এবং স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত। শিক্ষায়, সম্মানে এবং বীরত্বে যাহারা অদ্বিতীয়, তাহাদের যখন এই দশা,—যাহাদের আচরণের উপর জাতীয় সুনাম নির্ভর করে, তাহাদের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন অশিক্ষিত অজ্ঞান পশুভাবাপন্ন ক্ষুদ্র লোকের কথা বলিয়া আর কায কি?

বাস্তবিক ধর্ম্মের মূল যেমন প্রেম, নীতির মূলও সেইরূপ প্রেম। একমাত্র প্রেমকে হৃদয়ের নিয়ন্তা এবং সমাজের শাসন-কর্ত্তা করিয়া ছাড়িয়া দেও, কোন বিপদ হইবে না, কাহারও অমঙ্গল হইবে না, পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হইবে না; কিন্তু প্রেমকে পরিত্যাগ করিলে আর কোন নীতি, কোন ব্যবস্থা, কোন শাসনই সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না, পৃথিবীকে শান্তি দিতে পারিবে না। প্রেমের অভাবে সমাজের দশা কি হইয়াছে একবার চাহিয়া দেখ না কেন? জাতিতে জাতিতে অপ্রেম, পরিবারে পরিবারে অপ্রেম, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অপ্রেম! এই সর্ব্বব্যাপী অপ্রেম হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, কত বিধান-ব্যবস্থা, শান্তি-রক্ষার কত আয়োজন! তথাপি কিন্তু ন্যায়পরতা অব্যাহত থাকিতেছে না, অপ্রেমের বিষময় ফল দূর হইতেছে না। দেশে এত বিচারক, এত শান্তি-রক্ষক প্রেম-শিক্ষার জন্য নহে, কেবল শান্তিরক্ষার জন্য কেবল ন্যায়পরতাকে—বজায় রাখিবার জন্য। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে কি? শান্তি-রক্ষকের সংখ্যা যে দিন দিন বাড়িতেছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইবে না। বাল্যকালে পল্লীগ্রামে কালেভদ্রে একটা লালপাগড়ী দেখা যাইত, এখন প্রায় সর্ব্বদাই উহা দেখা যায়; বাল্যকালে লালপাগড়ী দেখিলে ভয়ে দূরে যাইতাম, আর অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম,— ভাবিতাম, একটা মানুষের এত ক্ষমতা, এত প্রভুতা সম্ভব? এখনকার শিশুগণ সে পাগড়ী আর তেমন ভয়ের চক্ষে দেখে না, শান্তিরক্ষক পদাতিকে তেমন অসাধারণ কিছু বলিয়াও ভাবে না। থানার সংখ্যা, দারোগার সংখ্যা, পদাতির সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন হইত। ইহাতেও আশানুরূপ শান্তি-

রক্ষা হইতেছে কি? অনেকে বলিবেন, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক অশান্তি বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু সাধারণে তাহা জানিতে পাইত না। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অশান্তি বাড়িয়াছে, তাই শান্তি-রক্ষকের সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বকার লোক অশিক্ষিত ছিল, সুতরাং অনেক ক্ষুদ্র দুষ্কর্ম্ম করিলেও বৃহৎ দুষ্কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি তাহাদের ছিল না। বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের বিস্তৃতি কমিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গভীরতা নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে প্রকৃতির অপরাধ হইত, তাহার অনেক গুলির বিচার এক দিনেই হইয়া যাইত; এখনকার এক একটি অপরাধ এত সূক্ষ্ম, এত গভীর, এত বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদিত যে, একটি অপরাধের বিচারেই এখন অনেক শান্তি-রক্ষক, অনেক উকীল মোক্তার, অনেক হাকিম, অনেক টাকা এবং অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। কেহ বলিতে পারেন, এখনকার বিচারে আমূল তথ্য নিরূপিত হয়, কাযেই এ সব লাগে। তথ্য যে কেমন নিরূপিত হয়, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। যে সবল, সে চিরদিন সবল; যে দুর্ব্বল, সে চিরদিনই দুর্ব্বল। সবলে দুর্ব্বলে যখন বিবাদ হয়, কখন কোন্ পক্ষে যে জয় হইবে, সাধারণ লোকে তাহা আগেই অবধারণ করিয়া রাখে।

"হত্যাকারীর এত টাকা আছে যে, ইচ্ছা করিলে সে আদালত শুদ্ধ কিনিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু হতব্যক্তির আত্মীয়েরা খাইতে পায় না, তাহারা মোকর্দ্দমা চালাইবে কি দিয়া?" "অমুকের এজলাসে যখন মোকদ্দমা, তখন অমুক উকীল বা ব্যারিষ্টারকে হাত করিতে পারিলেই জয় অবধারিত।" সাধারণ লোকের ইত্যাকার কথা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। দিনকে রাত্রি করা যায়, রাত্রিকে দিন করা যায়, পুষ্করিণী চুরি করা যায়, এ সকল কথা পূর্ব্বে অসম্ভব ছিল, কিন্তু বুদ্ধি-প্রাখর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে এ সমস্তই সম্ভব হইতেছে। পাপের আবার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে—পাপীকে পাপ-পথে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সমাজে পাপানুশীলনের জন্য একরূপ সাহিত্য অবতীর্ণ হইয়াছে। বালক ঘরে বসিয়া জ্যামিতির অনুশীলন কসে। ঘরে যাহা কসে, পরীক্ষায় যে তাহাই পড়ে, এমন নহে; কিন্তু অনুশীলন কসিতে কসিতে বুদ্ধিটা এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া যায় যে, পরীক্ষা-মন্দিরে অতি কঠিন প্রশ্নেরও উত্তর দিয়া সে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। চিত্র বিচিত্র গল্পে যাঁহারা পাপের চিত্র এবং পাপীর কিম্বা শান্তি-রক্ষকের বাহাদুরি প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা পাপীর বুদ্ধি-বৃত্তি-পরিকর্ষণের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

ফলতঃ যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে শান্তির ব্যবস্থা যতই দৃঢ় হউক, আর শান্তি-রক্ষকের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবী কিছুতেই শান্তি পাইবে না। ইহার পরে গ্রামে গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে থানা রাখিতে হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাহারা দিবার জন্য পুলিস মোতায়েন করিতে হইবে। কেবল

তাহাতেই হইবে না,—প্রত্যেক পুলিসের জন্য পুলিস, প্রত্যেক শাসনকর্ত্তার জন্য শাসনকর্ত্তা, প্রত্যেক বিচারকের জন্য বিচারক নিযুক্ত করিতে হইবে! তাহাতেই কি শান্তির আশা আছে? যেখানে এত আটা আটি, এত অবিশ্বাস, সেখানে শান্তি অসম্ভব।

পাঠক! মনে করিবেন না, কেবল ভারতের দুরদৃষ্টেই এই অশান্তি ঘটিয়াছে, জগতের আর সর্ব্বত্র—সমস্ত স্বাধীন রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সমস্ত স্বাধীন রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখুন, কোথাও নর-শোণিত-পাত হইতেছে, কোথাও অস্ত্র-ধারণ-ক্ষম ব্যক্তি-মাত্রেই আপাদমস্তক বর্ম্মাবৃত হইয়া কম্পান্বিত হৃদয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। এইত বাহিরের অবস্থা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, অবস্থা আরও ভয়ানক। তখন দেখিবেন, সে রকম অপরাধীও এ দেশে সচরাচর জন্মে না, আর সে রকম পুলিসও এ দেশে প্রস্তুত হয় না।

জগতে যদি এত অশান্তি, তাহা দুর করিবার যত্ন হয় না কেন? বাস্তবিক যত্ন হয় নাই বা হইতেছে না, এমন নহে। বুদ্ধদেব এবং যিশুখৃষ্ট শান্তির দুই অবতার। বুদ্ধদেব রাজ-ভোগ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন, জীবের দুঃখ দুর করিবার জন্য—জগৎ যুড়িয়া মৈত্রী বা প্রেম প্রচার করিবার জন্য। তাঁহার মৈত্রী কেবল স্বজাতিতেই নিবদ্ধ ছিল না, কেবল মনুষ্য মাত্রেই—সীমাবদ্ধ ছিল না, কিন্তু তাঁহার সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী মৈত্রী—কীট পতঙ্গকেও কোলে স্থান দিয়াছিল। যিশু দরিদ্র সূত্রধর-কন্যার কানীন পুত্র, সুতরাং তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে হয় নাই। কিন্তু তিনিও মৈত্রী শিক্ষা দিয়াছেন,—তাঁহার মৈত্রী বুদ্ধের মৈত্রীর ন্যায় এত উন্নত না হইলেও তিনি প্রতিবাসীকে ভাল বাসিতে, শত্রুকে পর্য্যন্ত প্রেম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আবার তিনি নিজেও যে শত্রুকে ভাল বাসিতে জানিতেন, তিনি যে প্রাণহন্তার জন্যও ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেন, নির্দ্দয় শত্রুকর্ত্তৃক ক্রশ বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহার পরিচয়ও দিয়াছেন। খৃষ্টের পরে মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারক মহম্মদ প্রাদুর্ভূত হন; কিন্তু তিনি শান্তির প্রচারক ছিলেন কি অশান্তির প্রচারক ছিলেন, তাহা জানি না। খৃষ্ট-শিষ্যেরা তাঁহার যেরূপ বর্ণনা করেন, তাহাতে তাঁহার হাতে কোরাণও দেখি, তরবারিও দেখি; কিন্তু কোরাণ এবং তরবারি এক হাতে কেমন করিয়া শোভা পায়,——প্রেম এবং দ্বেষ এক হৃদয়ে কেমন করিয়া স্থান পায়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কোন উপযুক্ত মহম্মদ-শিষ্য যদি এ বিষয়টা বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে জাতির একটা উপকার হইবে। সর্ব্বশেষে প্রেম-ভক্তির অবতার বঙ্গের গৌরব গৌরাঙ্গ দেব; কিন্তু ইহাঁর প্রচার-ফল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ।

আর এক শ্রেণীর শান্তি-প্রচারক রাজগণ এবং বীর-সম্প্রদায়। সামিরামিস্, আলেক্জান্দার, সীজর, নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাঁরা প্রেমের ধার

ধারেন নাই। রাজ-হৃদয়ে প্রেম বোধ হয় ততটা স্থানও পায় না, পাইলে তাঁহাকে শাক্যসিংহের পদানুসরণ করিতে হইত। ইহাঁদের শান্তি-বিস্তারের উপায় তরবারি। উদ্দেশ্য, যশ এবং প্রভুত্ব-জনিত সুখ। আমি হেন বীর বর্ত্তমান থাকিতে অমুক রাজত্ব করিবে কেন? আমি তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইব, আমার অধীন হইয়া আমার শাসনে, আমার প্রভুত্বে বাঘ ভেড়া একত্র বাস করিবে, এই ইহাঁদিগের ইচ্ছা। প্রজার প্রতি ইহাঁদিগের প্রেম, আর মেষের প্রতি মেষ-পালকের প্রেম এক প্রকৃতির। মেষ-পালক পয়সা লইয়া কসাইর নিকট মেষ বিক্রয় করে, যখন ইচ্ছা নিজের উদরের জন্য তাহার গলায় ছুরি বসাইয়া দেয়, তাহাতে দোষ নাই; কিন্তু কদাচিৎ কখন তস্করে বা শৃগালে যদি একটি মেষ অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে! ইহাঁরা শোণিত-প্লাতে পৃথিবীকে কর্দ্দমময় করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে শান্তি দিতে পারেন নাই। ইহাঁরা প্রেম ছাড়িয়া বলের আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু বল অশান্তি-রোগের ঔষধ নহে, বলে অশান্তির বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না। বল-প্রকাশে, তরবারি ধারণে, নর-শোণিত পাতে সর্ব্বত্রই পাপ—মহাপাপ, কেবল একমাত্র অবস্থায় ইহাতে পরম পুণ্য। যখন অত্যাচারীর অত্যাচারে প্রকৃতি-পুঞ্জ নিষ্পেষিত হইতে থাকে, যখন ন্যায়, ধর্ম্ম, প্রেম এবং শান্তি অত্যাচারীর-পদ-তলে দলিত হইতে থাকে, অথবা যখন দস্যু-বৃত্তানুকারী নর-ঘাতুক কেবলমাত্র লোভপরবশ হইয়া অন্যের স্বাধীনতা গ্রাস করিতে যায়, তখন তরবারি গ্রহণ করিয়া আততায়ীর শোণিতে ধরণীকে পরিতৃপ্ত করা মহাপুণ্যের কায। এইরূপ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া অনেকে স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহাদের নামে ইতিহাস পবিত্র হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বিধাতার বিধানে ইউরোপ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। ইউরোপের রাজন্য-বর্গ এবং জন-সাধারণ শিক্ষা এবং শান্তিতে জগতে শক্তি-বিস্তারের উপযুক্ত। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া যদি যত্ন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীর অশান্তি দূর করিতে পারেন, মানবজাতি হইতে কলঙ্কিত রক্তারক্তি চিরদিনের জন্য একেবারে তুলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতি এ বিষয়ে বিরোধী। তাঁহারা "মুখে মধু বুকে ছুরি" লইয়া পরস্পরের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং পৃথিবীর যে দেশে যে জাতিকে দুর্ব্বল দেখিতেছেন, তাহাকেই আক্রমণ করিতেছেন। বাণিজ্য এবং বাইবেল তাঁহাদিগের ধুয়া, কিন্তু ব্রাণ্ডি, বারুদ, বন্দুক এবং বেয়নেট্ তাঁহাদিগের অস্ত্র। তাঁহাদিগের বক্তৃতায় ন্যায় এবং নীতি, তাঁহাদিগের গ্রন্থে সাম্য এবং স্বাধীনতা; "কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যবহারে কি? সে গভীর তত্ত্ব বুঝিবার অধিকার আমাদের নাই"। যিনি যত সভ্য এবং শক্তিশালী,—যুদ্ধের আয়োজন এবং ব্যয়-ভার তাঁহার ততই অধিক। পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, যেখানে ইহাঁদের কামানের গর্জ্জন শ্রুত না হইতেছে; এমন জাতি নাই, যাঁহারা ইহাঁদের ভাব-ভঙ্গীতে ভীত না হইতেছে। পৃথিবীতে এখনও যে কয়টা অন্য জাতীয় রাজ্য রহিয়াছে, তাহা-

দের সঙ্গে ইউরোপীয় জাতি-সমূহের তুলনা করিয়া দেখুন, প্রভেদ কত। তাহাদের হৈ চৈ সুর সার নাই, গায়ে পড়িয়া দুর্ব্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি নাই, কে কাহার রাজ্য সুশাসন করিল কি কুশাসন করিল, আত্ম-দোষে অন্ধ হইয়া তাহার বিচার করিবার নির্লজ্জতাও তাহাদের নাই। তাহারা পূর্ব্বপুরুষাগত শাসনদণ্ড হাতে লইয়া আপন আপন প্রজা পুঞ্জের শাসন, পালন ও পরিরক্ষণ করিতেছে।

পারস্য, চীন প্রভৃতি রাজ্যের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। ইউরোপ যেখানে, আসুরী শক্তি সেখানে। এই শক্তি আমেরিকার প্রাচীন জাতিকে নির্ম্মূল করিয়া নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে; আবার এই শক্তি নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ আফ্রিকার বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান,ভগবান্ জানেন কি হইবে! এই সংক্রামিণী শক্তি এসিয়াতেও প্রবেশ করিয়াছে। আমরা ভারতবাসী ইউরোপের জাতি-বিশেষের সংস্রবে আসিয়া নানাবিষয়ে তাঁহাদের ভাবাপন্ন হইতেছি। যেখানে উচ্চ বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ করিবার সাধ্য নাই, সেখানে নীচ বিষয়ে তাঁহাদের অনুকারী হইয়া অধঃপাতে যাইতেছি। জাপান ইউরোপের স্বতোব্রতী মন্ত্র-শিষ্য, সুতরাং সেও ইউরোপের অনুকরণ করিতেছে; তবে আমাদের মত পাতাল-গামী হইবার সুবিধা তাহার নাই, তাই সে অন্য পথ ধরিয়াছে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

(৪)

খাদ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে; পানীয় সম্বন্ধে সম্প্রতি বলা যাইবে। স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে জল অত্যাবশ্যক। জলাভাবে জীবজন্তু বাঁচিতে পারিত না; জলাভাবে এই 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা' ধরা-মরুভূমি হইত। পৃথিবীর তিনভাগের দুইভাগ জলময়; জীব-দেহেরও তিনভাগের দুইভাগ জলময়। কি জড়-জগৎ কি প্রাণি-জগৎ সর্ব্বত্রই জলের ভাগ অধিক। জলের আবশ্যকতা অনুসারে পরম পিতা পরমেশ্বর সৃষ্টি-রক্ষার্থে প্রচুর পরিমাণে জলের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। দেহ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে, জীব-দেহ হইতে প্রতিদিন ঘর্ম্ম ও মলমূত্ররূপে তিন সের পরিমাণ জল বহির্গত হয়। জীব-দেহ-রক্ষার জন্য ঐ পরিমাণ জল বা জলীয় পদার্থ পান করা আবশ্যক। জলের পরিমাণ হ্রাস হইলে, জীব-দেহ রক্ষা হইতে

পারে না। জল বা জলীয় পদার্থ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়, ও দেহস্থ সমুদায় যন্ত্রে জলের অভাব পূরণ করে। আহার্য্য দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া জলের সাহায্যে তরলতাবস্থা প্রাপ্ত হয়; এবং মল-মূত্র, রক্ত ও হাড়-মাংসে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টি-বর্দ্ধন করে। জলের দোষ গুণানুসারে শরীর সুস্থ বা অসুস্থ হয়। এমন অনেক রোগের বীজ আছে, যাহা জলের সহিত উদরস্থ হইয়া জীব-দেহে উৎকট পীড়া জন্মায়। পক্ষান্তরে শরীরস্থ দূষিত পদার্থ সমূহ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীর হইতে বহির্গত হয়, এবং শরীরকে নীরোগ করে। হাইড্রোপেথী বা জল-চিকিৎসা নামক এক প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্র আছে, যাহাতে রোগীকে সম্পূর্ণরূপে জলের উপর নির্ভর করিতে হয়; এবং বিনা ঔষধে একমাত্র জলের সাহায্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে। বস্তুতঃ জলের গুণে শরীর সুস্থ থাকে, এবং জলের দোষেই শরীর অসুস্থ হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

জলে দুই অংশ হাইড্রোজেন বা উদজান ও এক অংশ অকসিজেন বা অম্লজান থাকে। হাইড্রোজেন বা উদজান ও অকসিজেন বা অম্লজান নামক বাষ্পদ্বয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি। বিশুদ্ধ জলে উদজান ও অম্লজান ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ থাকে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় তাদৃশ বিশুদ্ধ জল সচরাচর দেখা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়, তাহাতে উদজান ও অম্লজান ব্যতীত অন্য পদার্থও অল্প পরিমাণে থাকে। বিশুদ্ধ জল অতি স্বাস্থ্যকর। উহা স্বচ্ছ, নির্ম্মল, গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন ও হালকা। উহাতে দূষিত পদার্থ কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকিলেও, তাহাতে অপকারের সম্ভাবনা অতি কম। অবিশুদ্ধ জল অস্বচ্ছ, অপরিষ্কৃত, দূষিত-পদার্থ-মিশ্রিত, গন্ধযুক্ত, ও ভার। উহা অপকারজনক, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর। কৃত্রিম উপায় দ্বারা অবিশুদ্ধ জলকে উত্তমরূপে সংশোধন না করিয়া পান করা অবিধেয়।

কৃত্রিম উপায় দ্বারা অবিশুদ্ধ জলকে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে। ফিল্টার বা জল-পরিষ্করণ যন্ত্রে অবিশুদ্ধ জল বিশোধিত হয়। জল-সংশোধনের জন্য নানাপ্রকার বিদেশীয় পেটেন্ট বা এক-চেটিয়া ফিল্টার অল্প মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সহজ উপায়ে অবিশুদ্ধ জলকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

একটি কাষ্ঠ বা বংশ-নির্ম্মিত ত্রিপদ বা চৌপদ ফ্রেমের উপর চারিটি মাটিয়া কলস উপর্য্যুপরি সাজাইতে হয়। সর্ব্বোপরিস্থ প্রথম কলসের তলদেশে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র করিয়া, তাহাতে শীতল অথবা গরম জল রাখিতে হয়। পরিষ্কৃত মোটা বালুকা এবং কয়লার ক্ষুদ্র টুকরা দ্বারা দ্বিতীয় কলস এবং মোটা কাঁকর ও কয়লার বড় বড় টুকরায় তৃতীয় কলস অর্দ্ধ-পূর্ণ করিয়া উভয়ের তলদেশে ছিদ্র করিতে হয়।

সর্ব্বোপরিস্থ প্রথম কলসের জল ক্রমে চুয়াইয়া দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, এবং তৃতীয় হইতে সর্ব্বনিম্নস্থ চতুর্থ কলসে উত্তমরূপে বিশোধিত হইয়া পড়িবে। চতুর্থ কলস শূন্য রাখিতে হইবে; এবং তাহাতে ছিদ্র থাকিবে না।

অগ্নির উত্তাপে অবিশুদ্ধ জলকে উত্তমরূপ গরম করিলে, অবিশুদ্ধ জল বিশুদ্ধ এবং দোষ-শূন্য হয়। অগ্নির উত্তাপে জল উত্তমরূপ ফুটিলে, উহার দূষিত পরমাণু সমূহ বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত উত্থিত হয়; এবং উহাতে উদ্ভিজ্জাণু বা কীটাণু থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ফটকিরি বা নির্ম্মাল্য নামক পদার্থ জল-পাত্রে নিক্ষেপ করিলে, অবিশুদ্ধ জলের ভাসমান দূষিত পদার্থ সমূহ জল-পাত্রের তল-দেশে পতিত হয়; এবং সেই অবিশুদ্ধ জল পরিশোধিত হইয়া স্বচ্ছ এবং বিশুদ্ধ হয়।

অধুনা কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বঙ্গদেশের কয়েকটি সহরে জলের কল নির্ম্মিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কলের জল ব্যবহার করায়, ঐ সমস্ত সহরের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। কলের জল অতি নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ। উহা বঙ্গদেশে যতই প্রচলিত হইবে, ততই বঙ্গদেশের মঙ্গল। অবিশুদ্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া এক্ষণে বঙ্গবাসী যে উদরাময়, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি শরীর-ক্ষয়কারী রোগে আক্রান্ত হইতেছে, কলের জল প্রচলিত হইলে সমস্ত দুশ্চিকিৎস্য ব্যারাম-পীড়ার অনেকটা লাঘব হইবে। যে সমস্ত সহৃদয় মহোদয় জলের কল-নির্ম্মাণার্থে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা বঙ্গবাসীর পরম হিতৈষী। দেশের উন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। বিশুদ্ধ জল স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। জীবন-ধারণের উপযোগী বলিয়া, জলের অন্যতর নাম "জীবন" হইয়াছে। বৃষ্টির জল অতি বিশুদ্ধ। কলের জলের অভাবে সুপরিষ্কৃত বৃষ্টির জল পানার্থে ব্যবহার করা যায়। ইষ্টকালয়ের ছাদের উপর উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া কলস কি অন্য প্রকার জল-পাত্র রাখিলে বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল বৃষ্টির জল সহজেই ধরা যায়। অন্যথা নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করিলে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইষ্টকালয়ের অভাবে, বৃক্ষ-লতাদি-পরিশূন্য, পরিষ্কার স্থানে চারিটি খুঁটার সহিত একখানি মোটা, সুপরিষ্কৃত বস্ত্রের চারিটি কোণ বাঁধিয়া, তাহার মধ্যস্থলে একটি ভারী বস্তু দিলে, তদুপরি বৃষ্টির যে জল পতিত হয়, তাহা নীচে যে স্থানে পড়ে, সেই স্থানে মৃণ্ময় বা ধাতু-পাত্র রাখিলে, তাহাতে পরিষ্কার ভাবে বৃষ্টির জল সংগৃহীত হয়। এই প্রকার জল সর্ব্বপ্রকার দোষ-শূন্য।

ছাত্র ও শিক্ষক।

"শিক্ষক শিক্ষাদান করেন," ছাত্র শিক্ষা করে। একজন দাতা, আর একজন গ্রহীতা। দান ও গ্রহণ শিক্ষক ও ছাত্রের বিশেষ লক্ষণ। এই অর্থে শিক্ষকও অসংখ্য, ছাত্রও অসংখ্য। জড় অজড় সকলই শিক্ষা প্রদান করে। উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডিত সৌরজগৎ, নিম্নে পাহাড়, পর্ব্বত, নদনদী, সমুদ্র, বৃক্ষলতা সকলই আমাদের গুরু। কোমল কবি-প্রকৃতি যখন আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে, তখন সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়, মন সহজে প্রসারিত হইয়া অনন্তকে আলিঙ্গন করিতে চায়। পর্ব্বত-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নতন উপত্যকাদি দর্শন করিয়া প্রাণ মহৎ ও উন্নত হয়। প্রবল 'নদীস্রোতো দর্শনে' জীবনের মৃদুমন্দ ভাব চলিয়া যায়, বসন্তের কোমল মনোহর পবিত্র শোভা ও সৌন্দর্য্যের গৌরব প্রাণে পুণ্যের তেজ সঞ্চারিত করে। সুশীতল বায়ু-প্রবাহ নিত্য আমাদের দ্বারে ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিতেছে দেখিয়া হৃদয়ে সেবানুরাগ ও মাধুর্য্য সঞ্চারিত হয়। এইরূপে প্রাণিরাজ্যের কত দৃশ্য, কত শোভা, কত ঘটনা, কত ব্যবহার আমাদের আশ্চর্য্য শিক্ষা-বিধান করে। শিশুর সরল সুমিষ্ট ব্যবহার প্রাণের কঠোরতা, কুটিলতা দূর করে, পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবের অকৃত্রিম স্নেহ মমতা কত দুর্ব্যবহারের হস্ত হইতে রক্ষা করে। দুর্ঘটনা, বিপদ, পরীক্ষা, প্রলোভন প্রভৃতি নিত্য শিক্ষা বিধান করিতেছে! এইরূপে দেখিতে গেলে আমাদের অসংখ্য গুরু; অসংখ্য ঘটনাকে প্রণাম করিয়া আমাদিকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং আমরাও বহু লোকের শিক্ষার কারণরূপে বর্ত্তমান। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাও কত আশ্চর্য্যরূপে পৃথিবীর বহু লোকের জীবনে অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে ও শিক্ষাদান করিতেছে! এই সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা এখন দেখিব বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ সীমায় ছাত্রশিক্ষক কিরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই ব্রতধারী এবং উভয়ের জীবনের ব্রতই অতি মহৎ। ছাত্রের জীবন সাধকের জীবন, সংসারে অসংখ্য গুরু থাকা সত্বেও বিশেষ গুরুর আশ্রয়ে শিক্ষা লাভ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প এবং সংসারে অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যককে শিক্ষাদান করিতে শিক্ষকও বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত। ছাত্রের যেমন কঠোর ব্রত শিক্ষালাভ, শিক্ষকেরও গুরুতর ব্রত যথোচিত শিক্ষাদান। আমাদের পূর্ব্বতন কালে গুরু দেবতুল্য ছিলেন, ছাত্রও রীতিপূর্ব্বক পাঠসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। ছাত্রের অন্য নাম ব্রহ্মচারী। যথারীতি শুচি হইয়া একাগ্রমনে অধ্যয়ন ও গুরুসেবা তাঁহার ব্রতের বিষয়। এবং উপযুক্ত বয়সে গুরুর আজ্ঞাতে পাঠ সমাপনান্তর গৃহাশ্রমে

প্রবেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। বর্ত্তমানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবম্বিধ কঠোর নিয়মের অধীন নহে বটে, কিন্তু ছাত্রের পক্ষে দীনতা ও গুরুভক্তি পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও তুল্যরূপে আবশ্যক। বিনয় সুশিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। উদ্ধত, দুর্বিনীত ও অহঙ্কারী হইলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" অপেক্ষা "বিনয়ো দদাতি বিদ্যাং" অধিকতর সত্য। বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে দীন উপাসকের ন্যায় আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ধূলির ন্যায় অপদার্থ, শিশুর ন্যায় মূর্খ হইয়া প্রবেশ করিতে হয়; নতুবা প্রবেশাধিকার লাভ হয় না, দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের নিকটও কিছু শিক্ষা করা যায় না। বিনীত, নিরহঙ্কারী সামান্য মূর্খের নিকটও জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বতন গ্রীসদেশের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিশ বিনয়িশ্রেষ্ঠও ছিলেন। সমগ্র পৃথিবী যাঁহাকে জ্ঞান-গুরু বলিয়া সম্মান করিতেছে, সেই সক্রেটিশ বলিতেন, তিনি কিছুই জানিতেন না। বাস্তবিক এরূপ দীন ও বিনীত হওয়াতেই তিনি এত জ্ঞানী হইতে পারিয়াছিলেন। 'আমি জানি' এই বলিয়া যে অহঙ্কার করে সে কিছুই শিক্ষা করিতে পারে না। মহাজ্ঞানী নিউটন স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন, তিনি শিশুর ন্যায় বেলা ভূমিতে কেবল উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছেন, বিশাল জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখেই প্রসারিত। নিউটন ও সক্রেটিশ শিক্ষার্থীর প্রকৃত আদর্শ। ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই এই আদর্শ অনুসরণীয়। অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন এই উভয় ব্যাপারেরই মূল মন্ত্র বিনয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি শেক্‌পীর দয়া প্রবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, এই দয়া দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে। তদ্রূপ বিনয়ের সহিত শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণ উভয়েই কল্যাণ বর্ষণ করে। এই ভাবে শিক্ষাদান করিলে দাতা অশেষ লাভবান্ হন। গভীর ও নিগূঢ় সত্য সকল সহজেই তাঁহার মানস উদ্যানে বিকশিত হয়।

কুম্ভকার যেরূপ কাঁচা মাটিকে সুন্দর, দৃঢ়, ধারণক্ষম মৃণ্ময় পাত্রে পরিণত করে, শিক্ষকও কোমল, দ্রব শিশুপ্রকৃতিকে ক্রমে বিবিধ শিক্ষা প্রভাবে সুদৃঢ় মানব-চরিত্রে পরিণত করেন! উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে ভীরু, দুর্ব্বল ও চঞ্চল বালক সাহসী কর্ম্মক্ষম ও ধীর মানব-প্রকৃতি লাভ করে, দুর্নীতিপরায়ণ, দুর্বৃত্ত ও দুরাচার সাধুতার দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়। শিক্ষকের হস্তে অতি গুরুভার সংন্যস্ত। মানবচরিত্র ও মানবমন সুগঠিত ও সুদৃঢ় করা তাঁহার কার্য্য; মন ও চরিত্রের নির্ম্মাতা (ইঞ্জিনিয়ার) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব সমাজের সুখ দুঃখ গৌরব অগৌরব, উন্নতি অবনতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের প্রধানতম কারণ শিক্ষক। গুরুর গুরুত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা যেমন ছাত্রের কর্ত্তব্য, তদ্রূপ এই গুরুতর দায়িত্বের উপযুক্ত হওয়া ও তাহার সদ্ব্যবহার করাও সুশিক্ষকের

কর্ত্তব্য। শিক্ষকের নিকট সর্ব্বদা বিনীত, শান্ত ও কৃতজ্ঞতাবনত থাকা সৎ ছাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ছাত্রের প্রতি প্রীতিপূর্ণ থাকা সুশিক্ষকের ধর্ম্ম। উদ্যানরক্ষক উদ্যানের সকল বৃক্ষের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে না,সবল ও সতেজ চারাটিকে যেমন উপযুক্ত আশ্রয় সংযুক্ত করিয়া আরও সতেজ করিতে সাহায্য করে, তদ্রূপ দুর্ব্বল, ক্ষীণ, মৃতপ্রায় চারাটিকেও সতেজ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও আয়োজন করে। তদ্রূপ সুশিক্ষক ভাল মন্দ সকল প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া সকল ছাত্রের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে ব্যবহৃত হইতে পারেন। আকাশ হইতে বারিবর্ষণে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া একগুণ শস্য যেমন শতগুণে পরিণত হয়, তদ্রূপ বিনয় দ্বারা কোমল ও ভক্তিরসে অভিষিক্ত মানসক্ষেত্রও উর্ব্বর হইলে এক গুণ শিক্ষা শতগুণে পরিণত হয়। সামান্য ক্ষুদ্র একটি জ্ঞানের অঙ্কুর শাখাপ্রশাখা সমন্বিত মহাবৃক্ষরূপে মানস উদ্যানকে পরিশোভিত করে। পক্ষান্তরে নীরস শুষ্ক ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, শুষ্ক কঠোর ও কৃতজ্ঞতাহীন হৃদয়েও জ্ঞানবীজ নিষ্ফল হয়। উপদেশের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিলে শিক্ষা ফলবতী হয় না। শিক্ষার্থী জ্ঞানতৃষায় তৃষ্ণাতুর হইয়া যখন বিশাল জ্ঞান-সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়, অবিনয় কিম্বা শিক্ষকের প্রতি প্রেমের কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে ছাত্রজীবন সত্য সত্যই বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রবাহের ন্যায় প্রমুক্তভাবে সবেগে জ্ঞান-সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিবে এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে পবিত্র মধুর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া ও প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রও সুখী হইবে এবং শিক্ষককেও সুখী করিবে এবং সেই সুশিক্ষার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সকলকে সুখী করিবে।

তৃপ্তি হয় না কেন?

প্রাণ-মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম কত দ্রব্য বিশাল জগদ্‌ভাণ্ডারে সজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু আমার কেন তাহাতে তৃপ্তি হয় না? ফুল ফুটিয়া বাস বিলাইতেছে, চন্দ্রমা হাসিতেছে, পাপিয়া মধুর গাহিতেছে, কোকিলের উচ্ছ্বাসময়ী গীতিতে জগৎ মাতিতেছে,—আমি কেন তাহাতে তৃপ্তি বোধ করি না? চাতক "ফটিক জল" "ফটিক জল" শব্দে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; যেমন এক বিন্দু জল পাইল অমনি সে তৃপ্ত হইল; মধুপ

নবীন জলদ-জাল দেখিয়া পেকম ধরিয়া নাচিতে নাচিতে তৃপ্তি অনুভব করিতেছে, ভ্রমর প্রস্ফুটিত পুষ্প-মধু-পানে তৃপ্তি লাভ করিতেছে, বুভুক্ষু উদর পুরিয়া আহার করিয়াই তৃপ্ত হইতেছে, ভিক্ষুক এক মুষ্টি ভিক্ষার পাইয়াই "তৃপ্তোস্মি" মনে করিতেছে; সকলেরই তৃপ্তি আছে, আমার কেন তৃপ্তি নাই ?

জানি যাহার যাহা অভাব, তাহার নিবৃত্তি হইলেই সে তৃপ্ত হয়; আকাঙ্ক্ষার সম্যক্ চরিতার্থতাই তৃপ্তি, এ কথা বুঝিতে পারি। আমার আকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি নাই ? আমার আকাঙ্ক্ষাই বা কি ?

জগৎময় খুঁজিয়া বেড়াইলাম. কত গ্রাম নগর, কত পাহাড় পর্ব্বত, কত নদ নদী, কত বন উপবন, আরও কত কি দেখিলাম; সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যের বিজয়-নিশান উড়িতেছে, প্রকৃতির কোলে সৌন্দর্য্য খেলিতেছে, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষাকেত দেখিতে পাইলাম না! যাহাকে সম্মুখে পাইলাম তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা কি জান আমার আকাঙ্ক্ষা কি ?" সকলেই আমার কথা হাসিয়া উড়াইল, আমাকে পাগল মনে করিয়া করতালি দিতে দিতে পিছু পিছু ছুটিল; মনের ক্ষোভে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। উত্তুঙ্গ তুষার-ধবল শৃঙ্গধারী গিরিবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি না ঈশ্বরের পবিত্র আবাস স্থল, তোমার গুহায় ধ্যান-মগ্ন থাকিয়া কত যোগী ঋষি স্ব স্ব আরাধ্য দেবতাকে পাইয়াছে; আমি কি তোমার নিকট আমার আকাঙ্ক্ষাকে পাইব না ? কোন উত্তর পাইলাম না, বুঝিলাম এখানে আমার আকাঙ্ক্ষা মিলিবে না।

বন-বিহারি বিহঙ্গমদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা কি বলিতে পার আমার আকাঙ্ক্ষা কি ?" তাহারাও কোন উত্তর দিল না, বরং কি যেন অব্যক্ত শব্দে আমাকে উপহাস করিতে করিতে উড়িয়া গেল। পূর্ণিমার শশীকে বলিলাম "তুমি কি জান আমার আকাঙ্ক্ষা কি ?" কোন উত্তর মিলিল না; নির্লজ্জ শশী হাসিয়াই আকুল হইল, সে হাসিতে জগৎ হাসিল, কুসুম হাসিল, পৃথিবীস্থ প্রাণীগণও সে হাসির উচ্ছ্বাস দেখিতে আসিল। আমি আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না, বড়ই লজ্জা পাইলাম, হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল। ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিব না, মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিব। জগৎ স্বার্থপর, সকলেই স্ব স্ব বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অন্যের দিকে ফিরিয়া চায় না, অন্যের দুঃখ বুঝে না। সকলেই স্ব স্ব সুখ-বিলাসের জন্য লালায়িত, নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তুমি দিন রাত মাথা কুটিয়া মর, হৃদয় ফাটিয়া শোণিত ধারা বহুক, তথাপি তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে না—তুমি কি জন্য এমন করিতেছ, তোমার কি হইয়াছে ? জিজ্ঞাসা দূরের কথা, হয়ত তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। ভাবিলাম আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিব না, মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিব। কিন্তু অবোধ মন মানে কই ? শুনিয়াছিলাম পুণ্যশীল মহাপুরুষগণ

মরিলে না কি তাঁহাদের আত্মা আকাশে তারা হইয়া ফুটে, এখানে হয়ত স্বার্থ-পরতার বাতাস বহে না, তাহাদের কাছে আমার মনের কথার উত্তর মিলিলেও মিলিতে পারে; অতএব আর একটি বার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু হায়! এমন্দি পোড়া অদৃষ্ট যে সেখানেও বিফল-মনোরথ হইলাম, কোন উত্তর মিলিল না, সকলেই মুচকি মুচকি হাসিল! এইবার শেষ জিজ্ঞাসা। মনে হইল, এই যে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিলাম, ভাল, একবার তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না কেন? তাহাই হইল, স্বীয় জ্ঞানকেই জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি বলিতে পার, আমার আকাঙ্ক্ষা কি, তৃপ্তি হয় না কেন?" উত্তর হইল—"চিরজীবন সুখে কাটিয়া যাউক, দুঃখের ছায়া যেন পলকের তরেও দাঁড়াইতে না হয়, এইটি তোমার আকাঙ্ক্ষা।" এ আকাঙ্ক্ষা নয়ত, ঘোর দুরাকাঙ্ক্ষা! "দুরাকাঙ্ক্ষাণাং ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে।" এইবার মনের মত উত্তর পাইলাম; বুঝিলাম, এইটিই ঠিক।

ক্ষুদ্র গল্প।

শৃগালের সর্দ্দি।

সিংহ। (মেষের প্রতি) বল দেখি আমার মুখে কেমন গন্ধ?

মেষ। আঃ, বড় দুর্গন্ধ, নিকটে তিষ্ঠিতে পারা যায় না!

সিংহ। কি! আমার মুখে দুর্গন্ধ? (এই বলিয়া ক্রোধে মেষকে আক্রমণ ও হত্যাকরণ।

সিংহ। (তরক্ষুর প্রতি) তুমি বলিতে পার আমার মুখে কেমন গন্ধ?

তরক্ষু। আজ্ঞে আপনার মুখেত অতি মনোহর গন্ধ, এই গন্ধের জন্যই আপনার নিকট হইতে দূরে যাইতে ইচ্ছা হয় না।

সিংহ। কি! আমি কি নির্ব্বোধ যে আমার তোষামোদ করিতেছিস্? (এই বলিয়া তরক্ষুর প্রতি আক্রমণ ও তাহার হত্যা।)

সিংহ। (শৃগালের প্রতি) তুমি বল দেখি আমার মুখের গন্ধ কেমন?

শৃগাল। মহারাজ! কয়েক দিন হইল সর্দ্দিতে আমি বড় ভুগিতেছি, ভাল মন্দ কোন গন্ধই পাইতেছি না।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

পরীক্ষা-সম্বন্ধে যে সকল আদেশ প্রচারিত হয়, সে সমস্তের মধ্যেই এই ভাব পরিব্যক্ত। পরীক্ষার্থীকে কোন বিশেষ বিষয়ে প্রস্তুত হইবার জন্য উৎসাহ না দিয়া, যাহাতে ছাত্র প্রচুর পরিমাণে মানসিক শক্তি, শ্রমশীলতা এবং স্থির-চিত্ততা লাভ করিয়া বিদ্যালয় ছাড়িতে পারে, এবং যেরূপ কষ্টকর যত্ন অপগত হইবামাত্র আলস্য এবং শৈথিল্য উপস্থিত হইয়া থাকে, পরীক্ষার যত্ন যাহাতে সেরূপ কষ্টকর না হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। বালকের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ-সাধনই প্রধান উদ্দেশ্য, এবং এই জন্যই প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিবার ব্যবস্থা। ব্যস্ততার সহিত স্তূপীকৃত বহুল বিষয়ের যুগপৎ অধ্যয়নে ক্লান্ত এবং একাগ্রতা পরিভ্রষ্ট না হইয়া ছাত্র যাহাতে ব্যস্ততা-পরিশূন্য হইয়া নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন দ্বারা সম্পূর্ণ শক্তি এবং চরিত্র লাভ করিতে পারে, যাহাতে নিরাপদে এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে, যাহাতে এই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা কেবল পরীক্ষার উপযোগী উপদেশেই পর্য্যবসিত না হয়, ইহাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যাহাতে গর্ব্ব এবং প্রতিযোগিতা উত্তেজিত হয়, এমন কিছুই প্রশ্রয় পায় না, এবং শিক্ষা-প্রণালীর ন্যায় পরীক্ষা-প্রণালীও প্রকৃত এবং স্থায়ী গুণের দিকেই লক্ষ্য রাখে। (১) এই জন্যই জর্ম্মান্ পরীক্ষা প্রণালীতে রচনা এবং অনুবাদের এত প্রাধান্য, এই জন্যই যাহাতে পরীক্ষকের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং ছাত্রের মুখস্থ বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে সেরূপ প্রশ্নের আদর নাই।

প্রত্যেক বালক যাহাতে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিতে পারে, ইহাই প্রুসীয় রাজ-শক্তির উদ্দেশ্য। এবং ইহার পরীক্ষা-প্রণালীও এই উদ্দেশ্যের সহায়তায় ব্যবহৃত! ইংলণ্ডের শিক্ষা-প্রণালীতে বালক যেমন তেমন করিয়া শিক্ষা করুক সে দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু তথায় অসম্পূর্ণ পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা শিক্ষার ত্রুটি পূরণ করিবার বৃথা চেষ্টা হইয়া থাকে। (১)

রিয়েল্ স্কুল এবং উচ্চ বার্গার বিদ্যালয়েও এই প্রথাই অনুসৃত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজকীয় কোন বিভাগে কায করিতে হইলে উচ্চবিদ্যালয়ের ছাড়তি পরীক্ষার নিদর্শন-পত্র দেখাইতে হইত। ঐ বৎসর নিয়ম হয় যে, কোন কোন বিভাগে কায লইতে হইলে জিম্‌নাসিয়মের নিদর্শন-পত্রের পরিবর্ত্তে রিয়েল্ স্কুল বা উচ্চবার্গার বিদ্যালয়ের নিদর্শন-পত্র দেখাইতে পারিলেই চলিবে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন সর্ত্তে নিয়ম অবধারণ করিলেন; যথা, স্থাপত্য-সচিব নিয়ম করিলেন, স্থপতি-বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীর রিয়েল্ স্কুল কিম্বা বার্গার বিদ্যালয়ের নিদর্শন পত্র দিলেই চলিবে; কিন্তু উক্ত বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ ছয়

---

(১) জর্ম্মান্ শিক্ষা-সচিব উলফ প্রায় সর্ব্বদাই বলিতেন, যে পড়া কেবল পরীক্ষার জন্য তাহা পড়াই নহে।

(১) এ সম্বন্ধে ভারতের শিক্ষা এবং পরীক্ষা প্রণালীতে যে ত্রুটি আছে, গ্রন্থকারের তাহা জানা থাকিলে তিনি কি বলিতেন জানি না।

অনুবাদক।

শ্রেণীবিশিষ্ট হওয়া চাই, এবং উহার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যেক শ্রেণীতে দুই বৎসর করিয়া থাকা চাই। প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট বালকের পরীক্ষা অপেক্ষা বিদ্যালয় এবং শিক্ষা-প্রণালীকে কত অধিক প্রয়োজনীয় মনে করেন, ইংরাজ পাঠককে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থকার এ বিষয়ের এত বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে রাজকীয় বৈজ্ঞানিক বিভাগ-সমূহে উচ্চপদপ্রার্থীর পক্ষে রিয়েল্ স্কুলের নিদর্শন-পত্রের আদর আবার কমিয়া গিয়াছে, এখন ঐ সকল পদপ্রার্থীদিগকে জিম্‌নাসিয়মের ছাড়তি পরীক্ষার নিদর্শন-পত্র দেখাইতে হয়। কিন্তু রাজকীয় অধিকাংশ কার্য্যে রিয়েল্ স্কুলের নিদর্শন-পত্রই যথেষ্ট; আবার বাণিজ্য এবং শ্রম-শিল্প-সম্বন্ধীয় বহুতর কার্য্যেও এখন নিয়োক্তারা এই নিদর্শন-পত্র পাইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত নিদর্শন-পত্র পাইবার জন্য যে পরীক্ষার প্রয়োজন, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-বিভাগ কর্ত্তৃক তাহা প্রবর্ত্তিত হয়। জিম্‌নাসিয়মের ছাড়তি পরীক্ষা যেরূপ, প্রয়োজনানুরূপ প্রভেদ ছাড়া ইহাও সেইরূপ। পরীক্ষক নিয়োগ তদ্রূপ, পরীক্ষা তদ্রূপ, নিদর্শন-পত্রও তদ্রূপ। পরীক্ষা বিষয়,—ধর্ম্ম-শাস্ত্র, মাতৃভাষা এবং মাতৃভাষার সাহিত্য, সহজ লাটিন্ হইতে অনুবাদ কিন্তু সম্পূর্ণতঃ লাটিন্ লেখা নহে; ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষার অনুবাদ, লিখন এবং কথন; প্রাচীন ইতিহাস; জর্ম্মনী, ইংলণ্ড এবং ফরাসী দেশের অব্যবহিত অতীত তিন শত বৎসরের ইতিহাস; পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন বিদ্যা; অমিশ্র এবং প্রযুক্ত গণিত; ভূগোল এবং রেখাঙ্কন। এক বিষয়ের উৎকর্ষ দ্বারা বিষয়ান্তরের অপকর্ষের প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু যে বালক কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়, সে কিছুতেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বাহিরের পরীক্ষার্থী যে সর্ত্তে এবং যে পরিমাণ উপদান দিয়া জিম্‌নাসিয়মে পরীক্ষা দিতে পারে, সেই সর্ত্তে এবং সেই পরিমাণ উপদান দিয়া তাহারা এখানেও পরীক্ষা দিতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রিয়েল্ স্কুলের পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহার নিদর্শন-পত্রের মূল্যও কম। উচ্চ বার্গার্ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরও সহজ, এবং তাহার মূল্য আরও অল্প। এই পরীক্ষার নিদর্শন-পত্র লইয়া বালক উচ্চ রিয়েল্ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারে, ইহাতেই এই পরীক্ষার উপকারিতা; কারণ পাড়াগাঁয়ের বালক চালাক হইলে এক বৎসর কাল কোন দূরস্থ বিদ্যালয়ে যাইয়াও পড়িতে পারে, কিন্তু বরাবর তাহা পারে না।

জিম্‌নাসিয়ম্ এবং উচ্চ শ্রেণীর রিয়েল্ স্কুলের তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে উঠিবার সময়েও পরীক্ষা হয়, এবং এই পরীক্ষা দিয়া কোন বালক বিদ্যালয় ছাড়িলে তাহাকে তত্তৎ শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপক নিদর্শন-পত্র প্রদত্ত হয়। রাজকীয় নাগরিক বিভাগের অনেক নিম্নপদের প্রার্থনায় এই নিদর্শন-পত্র কাযে লাগে। দৃষ্টান্ত যথা, কোন সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাঙ্কণের শিক্ষক হইতে হইলে উচ্চ বার্গার স্কুল, রিয়েল স্কুল, বা জিম্‌নাসিয়মের দ্বিতীয়

শ্রেণীর নিদর্শন-পত্র দেখাইতে হয়। এ নিয়ম বাহিরের ছাত্রের জন্য; কিন্তু পদ-প্রার্থী যদি কোন সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে, তবে কোন দ্বিতীয় শ্রেণী রিয়েল্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর নিদর্শন-পত্র দেখাইতে পারিলেই চলে। (১)

অল্পদিনের জন্য সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতে হইলে বিদ্যালয়ের এই নিদর্শন পত্র চাই। কোন যুবক অস্ত্র এবং পরিচ্ছদের ব্যয় নিজে দিয়া এক বৎসরের জন্য স্বেচ্ছা সৈনিক হইতে চাহিলে তাহাকে জিম্‌নাসিয়ম্ বা রিয়েল্ স্কুলের কোন নিদর্শন-পত্র দেখাইতে হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জিমনাসিয়মের প্রথম শ্রেণী হইতে ছাড়তি পরীক্ষায় ১৭৬৫ বালক এবং রিয়েল্ স্কুল হইতে মোটে ২১৪ বালক উত্তীর্ণ হয়; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, রিয়েল্ স্কুল অপেক্ষা জিম্‌নাসিয়মের অধ্যয়ন কত অধিক বালকে সমাপন করে। ঐই ছাড়তি পরীক্ষায় বাহিরের ৪০ জন বালক উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং ঐ বৎসরে সর্ব্ব সমেত ১৮০৫ জন বালক জিম্‌নাসিয়মের উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষায় নিদর্শন-পত্র পাইয়াছিল। উক্ত সংখ্যার মধ্যে ১৫৬৩ জন ঐ বৎসরে প্রুসীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। রিয়েল্ স্কুলের ছাড়তি পরীক্ষায় ২১৪ জন, আর বাহিরের ৩ জন, এই মোট ২১৭ জন উত্তীর্ণ হয়; তন্মধ্যে ১১৪ জন রাজকীয় কার্য্য গ্রহণ করে, ৯২ জন বাণিজ্য বা শ্রমশিল্পের অনুসরণ করে, আর এক জন শিক্ষা-সাপেক্ষ ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে জিম্‌নাসিয়মের ছাড়তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে যায়। ফলতঃ যাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশ করে, তাহারা প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই রিয়েল্ স্কুল ছাড়িয়া দেয়; আর যাহারা প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত থাকে, তাহাদের অধিকাংশই রাজকীয় বিভাগে পদ-লাভের আশা করে। যাহারা বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নিদর্শন-পত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকাতে তাহারা যতদিন বিদ্যালয়ে থাকে, ঐ নিদর্শন-পত্রের প্রলোভন না থাকিলে তাহারা ততদিন বিদ্যালয়ে যাইত না। ইহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা এবং ফল দেখাইবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হয়; আর বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষ বশতঃ দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ী এবং কৃষকদিগের জীবনে শিক্ষার পরিমার্জ্জন স্থায়িত্ব লাভ করে। এইজন্য দেখা যায়, অন্য দেশে কোন উৎকৃষ্ট বা কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ প্রচারিত হইলে জর্ম্মণীর ব্যবসায়িগণ তাহা (অবশ্য অনুবাদে) পড়িয়া থাকে; যথা, মেকলে কৃত ইংলণ্ডের ইতিহাস। ইংরাজ-ব্যবসায়ীর শিক্ষা-জনিত পরিমার্জ্জন ইহা অপেক্ষা কত অপকৃষ্ট, ইংরাজ পাঠক তাহা বিশেষ অবগত আছেন। (১)

(১) এই নিম্নশ্রেণীর নিদর্শন-পত্রের জন্য বাহিরের ছাত্রের পরীক্ষার ফি বা উপদান ছয় টাকা।

(১) কিন্তু ইংরাজ ব্যবসায়ীর বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীর বিদ্যা-বুদ্ধির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ব্যবসায়ে বিদ্যাবুদ্ধি লাগে. আমরা তাহা জানি না।

পঞ্চম অধ্যায়।

যে শিক্ষা-কার্য্যের উন্নতির জন্য এত যত্ন, তাহা যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হয়, তদর্থে প্রুসিয়াতে কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা করিলেই যথেষ্ট হয় না, কিন্তু যে জন্য শিক্ষক-পদপ্রার্থীকেও পরীক্ষা দিতে হয়। শিক্ষা-বিষয়ক তিনটি প্রধান সংস্কারের মধ্যে এই বিখ্যাত শিক্ষক-পরীক্ষা-প্রণালী তৃতীয় এবং ইহা ভন্ হম্বলট্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শিক্ষকের উপযোগিতা-জ্ঞাপক নিদর্শন-পত্র দেখাইবার প্রয়োজন হইত না। বিশেষতঃ নাগরিক সমিতি এবং অপসাধারণ পরিপোষকেরা শিক্ষক-নিয়োগের সময়ে উপযোগিতার দিকে প্রায় দৃষ্টিই করিতেন না। ইহাদিগের পরিচালিত অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের উন্নয়নে কাল জ্যেষ্ঠতার নিয়ম অনুবর্ত্তিত হইত, তাহাতে বিলক্ষণ কুফল ফলিত। কি সাধারণ কি অপসাধারণ, সকল বিদ্যালয়েই উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষক-নিয়োগ রাজকীয় অধিকারভুক্ত করিবার জন্য এক সময়ে কল্পনা হয়। কিন্তু হম্বলট্ বলিলেন, 'অপসাধারণ বিদ্যালয়ের পরিপোষকদিগের এই অধিকারের অপব্যবহারের কেবল একটি মাত্র প্রতিবিধান আছে; সেটি এই যে, শিক্ষক পদ-প্রার্থীদিগের উপযোগিতা পরীক্ষা করা।'

১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। প্রথমতঃ 'শিক্ষা প্রণালী' লিখিয়া শিক্ষক-পদপ্রার্থীদিগকে পরীক্ষা দিতে হইত। এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কাহাকেও শিক্ষক নিযুক্ত করা এখন হইতে অবৈধ হইল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালী ক্রমেই কঠোর হইতে লাগিল। শিক্ষা-প্রণালীর প্রথায় কোন উপকার পাওয়া গেল না, কারণ নিম্নশ্রেণীর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী একবার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার অসারতা বুঝিয়াছেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নিয়ম হইল, শিক্ষক-পদ-প্রার্থীকে পরীক্ষার জন্য শিক্ষানবিশ হইয়া কোন বিদ্যালয়ে এক বৎসর থাকিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-যাজনার্থীদিগের নিম্নতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে এ পরীক্ষা না দিলেও চলিত, কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর হইতে সে নিয়ম উঠিয়া গেল; সুতরাং অন্যান্য শিক্ষক-পদ-প্রার্থীর ন্যায় ইহাদিগকে এ পরীক্ষায় বাধ্য হইতে হইল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের সংস্কারের উদ্দেশ্য এই নিয়ম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। উলফ্ বরাবর এইরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, প্রুসিয়ার উচ্চশিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে হইলে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে

আমাদের ধারণা, কেবল জমা খরচ লিখিতে আর নাম স্বাক্ষর করিতে পারিলেই ব্যবসায়ীর পক্ষে বিদ্যার চূড়ান্ত হইল। ভারতে ব্যবসায়ের উন্নতিতে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, মার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত লোকের ব্যবসায়ে অনাদর। অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া চাকুরি লইয়া শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করিতে না পারিলে তাহার জীবনই বৃথা।

অনুবাদক।

হইবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষকের কার্য্য স্বতন্ত্র ব্যবসায়রূপে পরিণত হইল, এবং ধর্ম্মযাজকের ব্যবসায় হইতে তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইল।

এই পরীক্ষা-সম্বন্ধে নিয়মাদি প্রধানতঃ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রবর্ত্তিত। উচ্চ পরীক্ষক-সমিতি দ্বারা এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। এই সমিতির সভ্য সাতজন; ইহার গঠন-প্রণালী ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পদপ্রার্থীকে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাড়তি পরীক্ষার নিদর্শন-পত্র, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে তিন বৎসর অধ্যয়ন হইয়াছে তাহার নিদর্শন-পত্র দাখিল করিতে হয়। নিদর্শন-পত্রের সঙ্গে আবেদনকারীকে নিজের একটি অধ্যয়ন-বিবরণ পাঠাইতে হয়। পূর্ব্বে অক্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোন কোন সদস্য-পদপ্রার্থীকেও এইরূপ লিখিতে হইত। জিম্‌নাসিয়মের শিক্ষক-পদপ্রার্থীকে ইহা লাটিনে লিখিতে হয়; রিয়েল্‌ স্কুলের শিক্ষক-পদপ্রার্থীকে ইহা ফরাসী ভাষায় লিখিলেও চলে। পরীক্ষান্তে শিক্ষানুমতি প্রদত্ত হয়; এই অনুমতি কখন সর্ত্ত-যুক্ত হয়, কখন সর্ত্ত-বিহীনও থাকে। পরীক্ষার বিষয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; ১ম, গ্রীক্‌, লাটিন্‌ এবং মাতৃভাষা; ২য়, গণিত এবং প্রাকৃত-বিজ্ঞান; ৩য়, ভূগোল এবং ইতিহাস; ৪র্থ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং হীব্রুভাষা। বিদ্যালয়ে যাহারা ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, কেবল তাহাদিগকেই এই শেষোক্ত পরীক্ষা দিতে হয়; কিন্তু তাহারা যাজক-তার জন্য ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলে পরীক্ষকেরা এ বিষয়ে কেবল মৌখিক প্রশ্ন করিয়াই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। কেবল পার্থিব বিষয়ে যাহারা শিক্ষা দিবে, ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে তাহাদেরও মৌখিক পরীক্ষা হয়, তাহাদিগকে হীব্রুতে পরীক্ষা দিতে হয় না; কিন্তু তাহারা যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়িয়াছে, এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মের নৈতিক ও বৈধিক সূত্রগুলি অবগত আছে, পরীক্ষকদিগের নিকটে সে বিষয়ের সন্তোষ-জনক পরিচয় দিতে হয়। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কাহারও অপরিপক্কতা পরিলক্ষিত হইলে তাহার নিদর্শন-পত্রে উহা লিখিত থাকে, এবং উক্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি শিক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত না হইতে পারে, এজন্য বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতিকে অনুরোধ করা হয়। আর প্রথমেই প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে যে পাঠ্য-বর্ণনা দাখিল করিতে হয়, তাহাতে সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারও নির্দ্দেশ করিতে হয়। গ্রন্থ-লিখন-সময়ের বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই শেষোক্ত নিয়ম অবধারিত হয়।

প্রাগুক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত পরীক্ষা-বিষয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে যে পরীক্ষার্থী প্রথম দুই শ্রেণী পড়াইবার উপযুক্ত যোগ্যতা দেখাইতে পারে, আর অপর বিষয়ে চলনসই গোছের হয়, তাহাকে সর্ত্ত-বিহীন অনুমতি-পত্র দেওয়া হয়। যে পরীক্ষার্থী কেবল এক বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াইবার যোগ্যতা দেখাইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সেরূপ যোগ্যতা

দেখাইতে পারে না, সে যোগ্যতার ন্যূনাধিক্য অনুসারে মধ্যবিভাগ কিম্বা নিম্নবিভাগ পড়াইবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

শিক্ষক-পদ-প্রার্থী মাত্রেরই ফরাসী ভাষা হইতে অনায়াসে অনুবাদ করিবার যোগ্যতা এবং উক্ত ভাষার ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য্য। মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের (১) সঙ্গে সকলেরই পরিচয় থাকা চাই, এবং সর্ত্ত-বিহীন অনুমতি প্রাপ্ত শিক্ষকদিগের পক্ষে এই দুই বিষয়ে অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্ব্যতীত সকলেরই প্রাকৃত-বিজ্ঞানে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই।

রিয়েল্ স্কুল অথবা উচ্চ বার্গার স্কুলের শিক্ষক-পদপ্রার্থীর গ্রীক্ শিখিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহাকে লাটিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহাদের পরীক্ষিতব্য বিষয় গণিত, প্রাকৃত-বিজ্ঞান ভূগোল ও ইতিহাস, মাতৃভাষা এবং অন্যান্য প্রচলিত ভাষা। প্রাচীন ভাষার ন্যূনতা বশতঃ এই সকল শিক্ষক পদপ্রার্থীর পরীক্ষা জিম্নাসিয়মের শিক্ষক-পদপ্রার্থীর পরীক্ষা অপেক্ষা কঠিন করা হয়।

(১) জর্ম্মনেরা শিক্ষা-বিজ্ঞানকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে। এই বিজ্ঞান এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই, সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে অনেক অসার কথাও লিখিত হইয়া থাকে; তথাপি লেখকের বিশ্বাস, এই বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা, এবং ইহার অনধ্যয়ন ইংলণ্ডের শিক্ষক এবং বিদ্যালয় উভয়ের পক্ষেই বিশেষ অনিষ্টকর।

কোন শিক্ষক-পদে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি তাহার যোগ্যতার পরিচয় না দিয়া থাকিলে তাহাকে আবার পরীক্ষা দিতে হয়। দৃষ্টান্ত যথা, যদি সর্ত্তযুক্ত অনুমতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উচ্চতর শ্রেণীতে পড়াইতে চায়। অথবা সর্ত্ত-বিহীন অনুমতি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যে বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা দেখাইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য কোন বিষয় যদি উচ্চ শ্রেণীতে পড়াইতে চায়, তবে সে বিষয়ে আবার তাহাকে পরীক্ষা দিয়া বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়।

প্রচলিত ভাষার বিদেশীয় শিক্ষককে বিশেষ অনুমতি প্রদত্ত হয়; কিন্তু সে যে ভাষা শিখাইবে, তাহা ছাড়া জিম্নাসিয়মের মধ্যবিভাগে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত লাটিন্, ইতিহাস, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় জানিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় না জানিয়া কেবল কোন প্রচলিত ভাষা শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষকের পক্ষে তত্তৎ শ্রেণীর শাসনও তত্ত্বাবধান অসম্ভব হয়, এই জন্যই এ ব্যবস্থা।

পরীক্ষক-সমিতি প্রত্যেক বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতির নিকট উক্ত বিভাগের পরীক্ষার ফল মন্তব্য সহ প্রেরণ করেন। শিক্ষক-পদপ্রার্থী ব্যক্তি যে বিভাগে কার্য্য করিতে চায়, সেই বিভাগের শিক্ষা-সমিতির নিকট নিজের অনুমতি-পত্র লইয়া সে উপস্থিত হয়। কোন কোন স্থলে অনুমতি-পত্র না পাইয়াও কেহ দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহাকে পদ-চ্যুত হইতে হয়।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া ডাক্তার উপাধি লাভ করেন, এবং উক্ত পরীক্ষায় লিখিত লাটিন্ রচনা মুদ্রিত করেন, তাঁহাদিগকে আর শিক্ষকতার জন্য পরীক্ষা দিতে হয় না। যখন এই পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন শ্লীয়ারমাচার্ এবং উল্ফ্ শিক্ষা-বিভাগের সদস্য ছিলেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন উপাধিধারীকে শিক্ষকতার পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি দিতে তাঁহারা ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের আপত্তি সঙ্গত, কারণ সমস্ত জর্ম্মণ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধির গাম্ভীর্য্য এবং মূল্য সমান নহে। যাহা হউক, তাঁহাদের আপত্তি টিকিল না; কিন্তু ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই; কারণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির তেমন আদর নাই, যদি কেহ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি পাইয়া থাকেন, এবং যদি তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাচনকারী অভিভাবকেরা অথবা নিয়োগকারী বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতি তাঁহাকে পরীক্ষার্থ আহ্বান করেন, এবং তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে, অথবা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহাকে আর নিযুক্ত করা হয় না।

যাহাদিগকে এক বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হয়, তাহাদিগকে কোন জিম্নাসিয়ম্ অথবা রিয়েল্ স্কুলে সেই বৎসরটি কাটাইতে হয়, প্রোজিম্নাসিয়ম্ বা উচ্চ বার্গার্ বিদ্যালয়ে থাকিলে চলে না। এই উপায়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকেরা উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য এবং শিক্ষা-কার্য্যের পরিজ্ঞান লাভ করে। শিক্ষানবিশ সচরাচর বেতন পায় না; কিন্তু যদি সে প্রধান শিক্ষকের সহকারীরূপে কার্য্য করে, তবে তাহাকে বেতন দিতে হয়। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে কেহ শিক্ষানবিশী করিতে যায়, সে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হয় যে, শিক্ষানবিশকে পরিক্লান্ত শিক্ষকদিগের সাহায্যকারী বলিয়া মনে না করা হয়; তাহাকে তাহার বিবেচনা অনুসারে যাহা উৎকৃষ্ট, সেই উপায়ে শিক্ষা ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ দিতে হইবে, এবং বৎসরের মধ্যে কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে সে যাহাতে পড়াইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৎসর শেষ হইলে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে সে তাহার পারদর্শিতার নিদর্শনপত্র লাভ করে।

শিক্ষানবিশীর সময়টা কোন নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে থাকিলেও চলে; কিন্তু ফ্রান্সে নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের যতটা গুরুত্ব, ইহাদের ততটা গুরুত্ব নাই। ফ্রান্সের ন্যায় এখানে নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের তেমন প্রয়োজনও নাই, আর এখানকার শিক্ষকের পক্ষে নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অপরিহার্য্যও নহে। ফ্রান্সের নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের জ্ঞান এবং তাহার স্বাধীন প্রয়োগ যতটা শিক্ষা দেয়, শিক্ষাপ্রণালী ততটা শিক্ষা দেয় না; কিন্তু এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা জর্ম্মনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জিম্নাসিয়মে যে পরিমাণে সম্পাদিত হয়, ফ্রান্সের উচ্চ বিদ্যালয়ে তাহা হয় না। ইহাতেই ফ্রান্সের নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের গুরুত্ব। জর্ম্মনীর নর্ম্ম্যাল

বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংসৃষ্ট; ভাবী শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা করেন, নর্ম্যাল বিদ্যালয় সাধারণতঃ তাহারই দৃঢ়তা এবং সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদন করিয়া দেয়। এখানে পুরাতত্ত্ব এবং প্রাচীন ভাষায় ব্যুৎপত্তি-লাভই শিক্ষকের প্রধান কার্য্য, সুতরাং ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যিনি যত লাভবান্ হন, শিক্ষক শিক্ষাবিষয়ক বিদ্যালয়ে পড়িয়া তত লাভবান্ হইতে পারেন না। উল্‌ফ্ যখন হেল্ নগরের ভাষাতত্ত্ব শিক্ষালয়ে প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি পার্থিববিদ্যাবিশারদ কতকগুলি শিক্ষক প্রস্তুত করিবার যত্ন করেন, সেই হইতে জর্ম্মনীতে ইহার বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি হইয়াছে। এই বিদ্যালয় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উল্‌ফ্ ক্রমান্বয়ে বিশ বৎসর ইহার অধ্যক্ষতা করেন; অবশেষে জেনার যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন্ হেল্ নগরের বিশ্ববিদ্যালয় তুলিয়া দেন, তখন উল্‌ফ্ বার্লিনে যাইয়া তত্রত্য শিক্ষাবিভাগের সদস্য হন। হেল্ নগরের অবস্থানের শেষ অবস্থায় ঐ বিদ্যালয়ে এমানুয়েল্ বেকার্ তাঁহার সহকারী ছিলেন। তাহাতে দ্বাদশ জন বৃত্তিধারী ছাত্র ছিল, প্রত্যেক ৪০ থেলার্ বা ৬ পৌণ্ড করিয়া দুই বৎসরের জন্য ক্ষুদ্র একটি বৃত্তি পাইত। বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক অধ্যয়ন শেষ না করিলে কেহ এ বৃত্তি পাইত না; তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে কোন বিভাগের ছাত্র ইচ্ছা করিলে অধ্যাপন-সময়ে উপস্থিত হইতে পারিত। ইহারা অনেকেই উপস্থিত হইত; আর প্রথমবারের বৃত্তিপ্রার্থীদিগের যে পরীক্ষা হয়, তাহাতেই ৬০ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল, এই বিদ্যালয়ে ব্যাখ্যা এবং তর্ক, এই দুই বিষয়ের শিক্ষা হইত। কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা শিক্ষা হইত। তর্ক শিক্ষার প্রণালী এরূপ ছিল;—কোন একটা বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে কিছুদিন পরে দুই বা ততোধিক বৃত্তিভোগী ছাত্র সেই বিষয়ে রচনা করিয়া দিত; কখন বা উল্‌ফ্ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া একটি বিষয় নির্দ্দেশ করিতেন, এবং ছাত্রেরা তাহার সম্মুখেই সেই বিষয় লইয়া লাটিন্ ভাষায় মৌখিক তর্ক বিতর্ক করিত। উল্‌ফ্ এ বিষয়ে যে নিয়ম অবলম্বন করিতেন, সকল বিখ্যাত শিক্ষকেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন;—তিনি নিজে সেই তর্ক বিতর্কে যোগ না দিয়া কেবল বিষয়টি নির্দ্দেশ করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন, আর সেই তর্ক বিতর্কের পরিচালন করিতেন এবং শেষ মীমাংসায় কে কি বলিল তাহাই একত্র সাজাইয়া বলিয়া দিতেন মাত্র, কিন্তু মূল তর্ক বিতর্ক শিক্ষার্থীরাই চালাইত। হেল্ নগরে অনাথ শিশু-নিবাসের সঙ্গে যে একটি লাটিন বিদ্যালয় ছিল, অধিক অগ্রসর বৃত্তি-ভোগিগণ তথায় যাইয়া অধ্যাপন করিত। ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালনে উল্‌ফের যে উদ্দেশ্য ছিল, উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়মাবলীতে সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষাতেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য, উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহের জন্য প্রাচীন ভাষায় বিচক্ষণ শিক্ষক প্রস্তুত করা। প্রত্যেক প্রুসীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে এখন একটি করিয়া এইরূপ ভাষা-তত্ত্ব-শিক্ষালয় আছে, তাহাতে অনধিক ১২ জন বৃত্তি-গ্রাহী ছাত্র থাকে; তাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক বৎসর পড়িলে তবে দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি পায়, এবং প্রাচীন ভাষা অধ্যয়ন করে।

প্রেম ও বৈরাগ্য।

(১)

ধর্ম্ম-বিষয়ে আমরা সচরাচর দুইটি বড় আপাত বিরোধী উপদেশ পাইয়া থাকি। ধর্ম্মের উপদেশ দিতে হইলেই লোকে বলিয়া থাকেন, সংসার কিছুই নয়, সংসারের সকল বস্তুই অসার, ভাই-বন্ধু দারা-সুত, ধন-অর্থ-মান-যশঃ প্রভৃতি সকলই অনিত্য, অতএব এ সকল ত্যাগ করিয়া একমাত্র নিত্য সহায় ধর্ম্মের সেবা কর। ফলতঃ কথায় বৈরাগ্যের শিক্ষা দেন, এবং বৈরাগ্যই যে ধর্ম্ম, তাহাই প্রচার করিয়া থাকেন। আবার এই আর একটি উপদেশ পাওয়া যায় যে, প্রেমই ধর্ম্মের সার ভাগ, প্রেম বিনা ধর্ম্ম-সাধন হয় না, প্রেমহীন হৃদয় পাষাণ তুল্য, ইত্যাদি। এই দুইটি উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে। যদিও কখন কখন ধর্ম্মবিশেষে এই দুইটি উপদেশের একটির বাহুল্য বশতঃ বলা হয় যে, অমুক ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, অমুক ধর্ম্ম বৈরাগ্য-প্রধান ধর্ম্ম, তথাচ এমন কোন ধর্ম্মই নাই যাহাতে বৈরাগ্য এবং প্রেম উভয়েরই উপদেশ নাই। এখন দেখিতে হইবে, এই দুই উপদেশের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে। প্রেম অনুরাগমূলক, বৈরাগ্য বিরাগ-জাত, অর্থাৎ প্রেমেরই ঠিক বিপরীত। তবে এই দুই বিরুদ্ধগুণের উপদেশ এক ধর্ম্মে কিরূপে সম্ভবে? এ স্থলে অনেকেই বলিবেন যে, ধর্ম্মে যে প্রেমের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা কি যে সে প্রেম? তাহা ভগবানের প্রতি প্রেম; এই ভগবৎ প্রেমে ও বৈরাগ্যে কোন পার্থক্যই নাই। কথাটি সত্য, ভগবৎ প্রেমে ও বৈরাগ্যে বিভিন্নতা নাই। কিন্তু ধর্ম্ম কি কেবল ভগবৎ প্রেমই শিক্ষা দেয়, এবং অন্য কোন প্রকার প্রেম-বিহীন হইয়া কি ভগবৎপ্রেম সম্ভব হয়? কোন্ ধর্ম্মে না জনক-জননীকে, ভাই-ভগিনীকে, পুত্র-কন্যাকে, আত্মীয়বন্ধু প্রভৃতিকে ভাল বাসিতে বলে, কোন্ ধর্ম্মে না অসহায়কে সাহায্য করিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে, গরীবকে দয়া করিতে শিক্ষা দেয়? কিন্তু এ সকলগুলিই কি সাধারণ প্রেমমূলক কার্য্য নহে? যে হৃদয়-বৃত্তি আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসিতে শিক্ষা দেয়, তাহাদের দুঃখে দুঃখী করে, সুখে সুখী করে, তাহাদের দুঃখ-নিবারণে এবং সুখবর্দ্ধনে আমাদিগকে প্রযত্নবান্ করে, যে বৃত্তি গরীবের অভাব দেখিলে আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তন্মোচনের জন্য আমাদিগকে কার্য্যোন্মুখ করে, তাহা কি অনুরাগমূলক প্রেম নহে? যদি এই সকল অনুরাগ-মূলক প্রেমের কার্য্য ধর্ম্ম সঙ্গত হয়, তবে তদ্বিপরীত-ভাব জাত বৈরাগ্যের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? অনুরাগের সহিত বিরাগের কি সম্বন্ধ? বাস্তবিক সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ বুঝিতে না পারায় অনেক সময়ে ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রচারকেরা সাধারণতঃ এই সম্বন্ধটি বুঝাইয়া দেন না, বরং তাঁহারা অনুরাগ-

মূলক কার্য্যগুলিকে মোহজনিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া বৈরাগ্যেরই প্রাধান্য প্রচার করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই বোধ হয় তাঁহারা আপনাদিগকে সংসারের সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চদরের ভাবিয়া থাকেন; এবং অজস্র সংসারের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মোপদেশকগণের একটা ধূয়া সংসারের নিন্দা করা। 'সংসার বিষম স্থান,' এখানে সকলই পাপ, সকলই মোহ, সকলই যন্ত্রণা; সাংসারিকতা অতীব ঘৃণ্য; এইরূপ কথা সকলেরই মুখে লাগিয়া আছে, এইরূপ কথা না বলিলে যেন ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়ই না। আমাদের দেশেরত কথাই নাই। বনে না যাইলে ধর্ম্মসাধন হয় না, ইহা এ দেশের সাধারণ ধারণা, কিন্তু এত যে সংসারের নিন্দা, সে সংসারটা কি? শিশুর জন্ম হইল—পিতামাতা—বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি পাঁচ জনের যত্নে স্নেহে সে প্রতিপালিত হইয়া একটি মানুষ হইল, মানুষ হইয়া আপনার প্রকৃত্যনুযায়ী কার্য্য করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তাহা দ্বারা পুনর্ব্বার শিশুর সৃষ্টি হইল, সে তাহার ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল, এবং এই সকল কার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় যে জ্ঞানোপার্জ্জন, ও ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য, তাহাও সে করিতে লাগিল। এই যে ধারাবাহিক এবং সমষ্টি-সংস্থজন-প্রণালী, ইহাইনা সংসার? ইহার মধ্যে শোক-তাপ-দুঃখ অনেক আছে বটে, কিন্তু জীব জীব থাকিতে ঐ সংসার ছাড়িবে কিরূপে? ছাড়িয়াই বা যায় কোথায়? যেখানে যাইবে, সেই স্থানেই না সংসারের সৃষ্টি হইবে? ফলতঃ ধর্ম্মোপদেশকগণের সংসার নিন্দায়—"সংসার না ছাড়িলে ধর্ম্ম হয় না" এইরূপ উপদেশে লাভ এই হয় যে, জীব ত সংসার ছাড়িতে পারেই না, পরন্তু ধর্ম্ম সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ধর্ম্মমন্দিরে বা সভাস্থলে ধর্ম্ম-তত্ত্বের অতি উচ্চ, অতি গূঢ় কথা সকল শুনিলে—যোগ-মার্গানুমোদিত উপাসনা পদ্ধতি, নির্ব্বিকল্প সমাধি, বায়ুরোধ, ঈড়া, পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের কার্য্য, সর্ব্ব কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ, প্রকৃতি বড় বড় কথা অবাক্ হইয়া শুনিলে, বিস্ময়ে মন পূর্ণ হইল, সভাস্থল হইতে উঠিয়া যাইবার সময় মনে মনে সঙ্কল্প করিলে, এইবার হইতে কিছু কিছু ধর্ম্মসাধন করিবে। বাড়ীতে পহুঁছিয়া দেখিল একটি পীড়িত সন্তান বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে,—এক ক্ষুধার্ত্ত শিশু বিকট চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে,—ভৃত্য নিজ কর্ত্তব্য না করিয়াই প্রস্থান করিয়াছে। তুমি জ্বালাতন হইয়া উঠিলে,—এই পাপ সংসারে থাকিয়া কি কখন ধর্ম্ম হয়, এইরূপ ভাবিয়া সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে, মন হইতে ধর্ম্মকে বিদায় দিলে। এইরূপ অবস্থা কি প্রতিনিয়তই সংঘটিত হইতেছে না? তবে কি সংসার ছাড়া ধর্ম্ম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই? জগদ্বিখ্যাত বেকনের একটি কথা আছে যে, যে সকল মানুষ, মানুষ ছাড়িয়া নির্জ্জন বনে থাকিতে ভালবাসে, তাহারা হয় দেবতা, না হয় পশু! এই কথাটি অতি সত্য। এমন এই দুই চারিজন দেবতা কিম্বা পশুর একটা সংসার ছাড়া ধর্ম্ম থাকিতে পারে। কিন্তু সে ধর্ম্মের সহিত জন-সমা-

জের সম্পর্ক কি? জন-সমাজ সংসারের লোক, সংসারের অনুরূপ ধর্ম্ম চাহে, যে ধর্ম্ম তাহাকে সংসারের অনিবার্য্য জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ করিবে, নিবার্য্য জ্বালাযন্ত্রণার দূরীকরণের জন্য উদ্যমশীল করিবে, কর্ত্তব্য-পালনে উৎসাহিত করিবে, অশান্তির মধ্যেও শান্তি দিবে, সেই ধর্ম্ম সে চায়। তাহা না করিয়া ধর্ম্ম যদি আসিয়া তাহাকে হঠাৎ বিষম বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া বলে,এ মায়া-মমতাময়, সংসার ত্যাগ করিয়া পলাইয়া এস, সে উত্তর করিবে, না ধর্ম্ম! আমি এ সকল ছাড়িতে পারিতেছি না, আমি আমার জ্বালা-যন্ত্রণা লইয়া থাকি, তুমি বরং বনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাস কর।

এইরূপ সংসারে এবং ধর্ম্মে বিরোধ দেখা যায়, ধর্ম্মের কথা শুনিতেও বেশ, বলিতেও বেশ, কিন্তু কাযে করিতে হইলেই লোকে বলে, তাহা হইলে ত আর সংসারে থাকা চলে না। বাস্তবিকই ধর্ম্মকে অনেক সময়ে এরূপ নিকট কঠোরতাময় বৈরাগ্যের বিভূতি মাখাইয়া অপরিজ্ঞাত পরকালের বিভীষিকাময় রং লাগাইয়া মাথায় জটাজুট বাঁধিয়া দিয়া এমন একটি ভয়াবহ জুজু করিয়া ফেলা হয় যে, লোকে ডাকিয়া তাহাকে ঘরে লইবে কি, তাহাকে রাস্তায় দেখিলাই ছুটিয়া পলায়,এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কপাটের ফাঁক দিয়া দেখিতে থাকে, চেহারাখানা কিরূপ। এরূপ হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ইহার কারণ প্রেম ও বৈরাগ্যের যথার্থ প্রকৃতি এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ না বুঝিতে পারা। এখন দেখা যাউক এই দুইয়ের প্রকৃতি কি। প্রথমতঃ প্রেম লইয়াই আরম্ভ করিতে হইবে।

সংসারের স্থিতি এবং গতি প্রেম লইয়াই। এই প্রেম কি তাহা বুঝিতে হইলে মানব-হৃদয়ে ইহার প্রথম জন্ম হইতে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত ইতিহাসটি অনুধাবন করিতে হইবে। শিশুর জন্ম হইল একটি রক্তমাংসের পিণ্ড, কেবল একটু নড়ে চড়ে ও ক্ষুধার্ত্ত হইলে বা কোন প্রকার শারীরিক বেদনা হইলে এক প্রকার শব্দ করে, এই মাত্র। সাধারণ কীট পতঙ্গাদি নীচ জাতীয় জীবের লক্ষণ ভিন্ন ইহাতে—তখন মানব-প্রকৃতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। যখন পেটটি ভরা থাকে; তখন টুপ টাপ করিয়া হাত পা ছুড়িয়া খেলা করে, ক্ষুধা পাইলেই কাঁদে, আর কিছু জানে না, আর কিছুই বুঝে না, আর কাহাকেও চেনে না। তাহার সুখ দুঃখের কারণ সম্পূর্ণরূপে তাহার সেই রক্তমাংসময় ক্ষুদ্র দেহটুকুর মধ্যেই নিহিত। কিন্তু কিছুদিন পরেই আর এ ভাব থাকে না, তখন সে লোক চিনিতে শেখে,আপনার মাকে চিনিয়া লয়। মাতৃ-অঙ্ক পাইলে শিশু বড় আনন্দিত হয়, মা যদি শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া প্রসন্নবদনে কথা কহেন, শিশু খল্ খল্ করিয়া হাসিতে থাকে। এখন শিশুর সুখের কারণ আর তাহার সেই দেহটুকুর মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহার মাতা পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়াছে। আরও কিছুদিন পরে মাতাকে যদি কাঁদিতে দেখে, শিশুর সম্মুখে ছল করিয়া মাতাকে কেহ যদি মারে শিশু কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়। এখন শিশুর দুঃখের কারণও তাহার নিজ দেহ ছাড়িয়া,

তাহার মাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। শিশুর হৃদয়ে প্রেমবৃত্তির প্রথম স্ফুরণ হইয়াছে, শিশুর প্রাণ মাতার প্রাণের সহিত এক হইয়াছে। অর্থাৎ শিশুর ক্ষুদ্র "আমি" টুকু আর তাহার ক্ষুদ্র দেহ মধ্যে আবদ্ধ নহে, উহা তাহার মাতাকে পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে; এখন সে যেমন নিজের সুখ দুঃখে, সেইরূপ মাতারও সুখদুঃখে সুখী দুঃখী হয়,—অবশ্য সে আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মাতার সুখ দুঃখ যত দুর বুঝিতে পারে, ততদুরই সুখী দুঃখী হয়। এই যে আমিত্বের বিস্তার, ইহাই প্রেম। সহজ কথায় পরকে আপন ভাবাই ভালবাসা বা প্রেম। শিশুর পক্ষে মাতাও প্রথমে পর থাকেন, যখন সে মাতাকে আপনার ভাবে, তখনই ভাল বাসে। এই যে প্রেমের প্রস্রবণ প্রথম খুলিল, ইহার ধারা অবিরাম বহিতে থাকিবে। শিশু মাতার পর পিতাকে চিনিল, ভাই ভগিনীদিগকে, পরিবারস্থ সকলকে একে একে চিনিল। সকলেই শিশুকে কোলে পিঠে করে, আদর করে; সেই আত্ম-পরিতৃপ্তিতে তৃপ্ত হইয়া শিশু ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন করিল; শিশু, তাহারা হাঁসিলে হাসে, কাঁদিলে কাঁদে, তাহাদিগকে খুসি করিবার জন্য হাত ঘুরাইয়া মাথা নাড়িয়া অনেক চেষ্টা করে; "আমা কাকা" "আমা দাদা" বলিয়া সকলেরই পূর্ব্বে একটি—"আমার" বিশেষণ লাগাইয়া দেয়। শিশুর "আমার" হইতে কেহ যদি না চায়, তাহার বড় অভিমান হয়। এইরূপে প্রেমের লক্ষণ সকলই তাহাতে পরিস্ফুট হয়, এবং শিশু পরিবারের মধ্যে একজন লোক হইয়া দাঁড়ায়।

মহাভারতের গল্প।

(পরোপকার)

(১)

ধার্ম্মিক-প্রবর মহামতি বিদুরের ইঙ্গিত মতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব সমাতৃক জীবন-সংশয়িত জতু-গৃহ হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রাহ্মণের বেশে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস-স্থান নির্দ্দেশ করিলেন, এবং ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতীব ক্লেশের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিয়তিনেমীর কুটিল আবর্ত্তনে রাজরাণী ও রাজনন্দনগণ ভাক্ত ব্রাহ্মণ সাজিয়া মুষ্টিমেয় ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন।

একদা ভীমসেন-ব্যতীত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলে পর তাঁহাদের আশ্রয়-দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। সদয়-হৃদয়া

কুন্তীদেবী ভীমসেনকে কহিলেন, "আমরা এতদিন যাবৎ এই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছি, ব্রাহ্মণ আমাদের এই বিপত্তির সময়ে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন, এখন ব্রাহ্মণের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ইহাঁদিগকে রক্ষা কর। বিশেষতঃ উপকারী জনের সাহায্য না করিলে ইহলোকে অযশঃ এবং পরলোকে পাপ-সঞ্চয় হইয়া থাকে।" উদারচেতা-ভীমসেন মাতৃ-বাক্য আকর্ণন করিয়া কহিলেন, "জননি! ব্রাহ্মণের কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে• আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমি অবশ্য সাধ্যমত তাঁহার বিপদুদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিব।"

তৎপরে কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিতেছেন, "আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম, যেস্থানে রাক্ষসের উপদ্রব হয়, তথায় বাস করা সঙ্গত নহে; তুমি কিন্তু পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকার করিয়াছিলে না। এখন আমার উপদেশ-লঙ্ঘনের ফলভোগ করিতে হইল। তুমি আমার ধর্ম্ম-পত্নী, বিশেষতঃ সর্ব্ব-ধর্ম্মে পারদর্শিনী, এবং একমাত্র শিশু তনয় তোমারি অভাবে জীবন-মৃত হইবে; এমতাবস্থায় আমি আত্মরক্ষা করিয়া তোমাকে কখনও রাক্ষস-মুখে অর্পণ করিতে পারি না; ইহাতে আমার অপযশঃ ও প্রত্যবায় হইবে। আর এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতী কন্যাকেও রাক্ষস-নিকটে প্রেরণ করা যাইতে পারে না, কারণ কন্যার জন্ম হইলে পিতৃগণ আশান্বিত হইয়া থাকেন, যদি সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা যায়, তবে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। অতএব বলিতেছি, তোমরা নিরস্ত হও, আমিই রাক্ষস সমীপে গমন করিব।" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "প্রভো! আপনি রাক্ষস-হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলে আপনার অভাবে সমস্ত পরিবার নষ্ট হইবে। আপনার পরলোক-প্রাপ্তি হইলে আমি সহমৃতা হইব; তখন কন্যা এবং পুত্র একেবারে নিঃসহায় হইবে। যদিও বা আমি কদাচিৎ আপনার সহ গমন না করি, তাহা হইলেও এই শিশু পুত্রকে পালন করা আমার দুঃসাধ্য হইবে। আপনার অভাবে আমরা তিন জনেই অনাথ হইব। অনাথের নিত্য নূতন বিপদ ঘটিয়া থাকে। আমাকে দরিদ্র দেখিয়া অকুলীন ব্যক্তি যৎসামান্য ধনদান করিয়া এই কন্যা গ্রহণ করিবে, পুত্র অপ্রাপ্ত-বয়সে ভিক্ষুক হইবে, কুলধর্ম্ম রক্ষা বা বেদাধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে না, চিরকাল মূর্খ থাকিবে. সুতরাং তাহা দ্বারাও পাপানুষ্ঠানের সম্ভাবনা হইবে। বলিষ্ঠ দুর্ম্মতিগণ আমার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে সমুদ্যত হইবে, তখন আমার ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। আপনি অপত্য-লাভের আশায় দারা গ্রহণ করিয়াছেন, একটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মিয়াছে; আপনি কন্যাকে সৎপাত্রসাৎ করিয়া পুত্রকে কুলানুযায়ী বিদ্যা-শিক্ষা দান করুন, এবং পুনর্ব্বার দারা গ্রহণ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন। বিশেষতঃ স্বামী-সেবাই স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; স্বামী-বিহীন নারীর জীবনে কোন আবশ্য-

কতা নাই। যে স্ত্রী আত্মবলি দ্বারা স্বামীকে রক্ষা করেন, তাঁহার ইহকালে সুযশঃ এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। স্বামীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে স্ত্রীর সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা হয়। অতএব আমিই রাক্ষসের নিকটে গমন করিব।" পত্নীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পতি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন দ্বিজ-কন্যা বলিলেন, "মাতা রাক্ষস সমীপে গমন করিলে এই শিশু অকালে প্রাণ হারাইবে, তাহা হইলে পিণ্ড-স্থান লোপ এবং কুলক্ষয় হইবেক; অতএব মাতা কোন প্রকারেই গমন করিতে পারেন না। কন্যার জন্ম হইলেই তাহাকে দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ অবশ্য ত্যাগ করিতে হয়, ইহা বিধাতার অখণ্ডনীয় লিপি, অতএব আমাকে কর্ব্বুর-করে অর্পণ করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।" কন্যার বাক্য শুনিয়া জনক জননী আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

পর-দুঃখে কাতরা কুন্তীদেবী সবিনয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা রোদন করিতেছেন কেন, কারণ জানিতে পারিলে এবং সাধ্যায়ত্ত হইলে অবশ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিব।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমরা যে জন্য রোদন করিতেছি, তাহার প্রতীকার করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। এই নগরে বক নামে এক নিশাচর বাস করে, সে বড় দুর্দ্দান্ত। নগরবাসী জনগণ তাহার সহিত এই নিয়ম করিয়াছে যে, প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ আহার্য্য সহিত তাহার নিকটে একটি নরবলি দিতে হইবে। অদ্য আমার পালা উপস্থিত। যদি আমি নিয়ম লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে দুষ্ট নিশাচর আমাকে সকুটুম্ব ভক্ষণ করিবে। নিজ পরিবার মধ্যে কাহাকেও বলি দিতে পারিতেছি না, মনুষ্য ক্রয় করিয়া দিতে পারি এমন অর্থও নাই। আমাদিগকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করে, এমন কেহ সুহৃৎ নাই, সুতরাং সপরিবারে রাক্ষস-স্থানে গমন করিব।" তখন বীর-পত্নী কুন্তী কহিলেন, "দ্বিজবর! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমার পঞ্চপুত্র বর্ত্তমান আছে, আমার একপুত্র আপনার জন্য রাক্ষস-স্থানে প্রেরণ করিব।" ব্রাহ্মণ কুন্তীর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি বলিলেন, "তোমরা অতিথি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, আমার আশ্রমে অবস্থান করিতেছ। লোকে আত্মবলি দিয়া ব্রাহ্মণকে রক্ষা করে, আর আমি ব্রাহ্মণ বলি দিয়া আত্ম-রক্ষা করিব? ইহা কখনও হইবার কথা নহে। অজ্ঞান-কৃত ব্রহ্ম বধেরই প্রতীকার হয় না, তাহাতে জ্ঞান-কৃত বধে আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই লোপ পাইবে, অধিকন্তু আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে।" কুন্তী কহিলেন, "আপনি যাহা কহিলেন, সে সকলই আমি অবগত আছি, কিন্তু পরের দুঃখ আমার সহ্য হয় না, বিশেষতঃ আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার দুঃখ আমি কোনমতেই সহিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার অনুরোধ তুমি আমাকে আর কোন কথা কহিও না। কুন্তী কহিলেন, আমার পুত্রগণ মহাবল পরাক্রান্ত ও নানাবিধ বিদ্যায় সুনিপুণ, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তাহাদিগকে পরাজয়

করিতে পারে। আমার পাঁচপুত্র বলিয়া যে তাহাদিগকে অনাদর করি, ইহা কখনও মনে স্থান দিবেন না। আমার পুত্রকে রাক্ষস নিধন করিতে পারিবে না, বরং আমার পুত্রই "এই দুরন্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া আপনার ও নগরের কল্যাণ সাধন করিবে। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া বলির অন্যান্য আয়োজন করুন।"

তার পরে কুন্তীদেবী ভীম-সমীপে উপনীতা হইয়া সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন, এবং ভীমসেন মাতৃ-আজ্ঞায় অকুতোভয়ে ব্রাহ্মণ সহ গমন করিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভীমসেনকে দেখিতে না পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। কুন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া কহিলেন,"আমি ব্রাহ্মণের উপকার সাধন এবং নগর রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীমকে অনুমতি দিয়াছি, সেই জন্য ভীম বক-রাক্ষস-সমীপে গমন করিয়াছে।" যুধিষ্ঠির মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমর্ষভাবে কহিলেন, "মাতঃ! আমরা যাহার বলবিক্রমে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইব আশায় এখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘৃণিতভাবে জীবন ধারণ করিতেছি, যাহার ভয়ে কৌরবগণ সর্ব্বদা সুশঙ্কিত, যে আমাদিগকে জতুগৃহ হইতে রক্ষা করিয়া হিড়িম্বক-বনে স্কন্ধে বহন করিয়াছে এবং হিড়িম্বকে বধ করিয়া সকলকে রক্ষা করিয়াছে, আপনি কোন্ প্রাণে এমন গুণধর তনয়কে রাক্ষসমুখে অর্পণ করিলেন? গর্ভধারিণী মাতার এবম্বিধ আচরণ ত কোথায়ও দেখা যায় না। আপনি রাজকন্যা, রাজরাণী, বোধ হয় বিপদে পতিত হইয়া আপনার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে।" কুন্তী কহিলেন, "বৎস! আমি ভীমের প্রতাপ বিশদরূপে অবগত আছি, তাহাকে পরাজয় করিতে পারে এমন কেহ অদ্য পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। বারণাবতে তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ আমা সহ তোমরা চারিজনকে ভীম অবলীলাক্রমে স্কন্ধে বহন করিয়াছে; হিড়িম্বকে নিধন করিয়া হিড়িম্বার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, ভীম-হস্তে বক নিহত হইবে। উপস্থিত ভয় হইতে ত্রাণ করার সমান পুণ্য নাই, বিশেষতঃ নিজের প্রাণ দিয়াও গো ব্রাহ্মণের রক্ষা করিবে। যে কার্য্যেতে রাজ্য এবং ব্রাহ্মণ রক্ষা পাইবে, যাহাতে অব্যয় ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তির সঞ্চয় হইবে, সেই কার্য্যে তুমি কেন যে বিষাদযুক্ত হইলে, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" ধর্ম্ম-বন্ধু যুধিষ্ঠির জননীর সুনীতি-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি সর্ব্বদা পর দুঃখে কাতরা সেই জন্য পর-পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য নিজপুত্র দান করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ এই সঙ্কটে ত্রাণ পাইবেন এবং আপনার আশীর্ব্বাদ ভীমসেনও রাক্ষস বধ করিতে সমর্থ হইবে। এতদিনে নিশ্চয় বুঝিলাম, আপনার অলৌকিক পরোপকার-ব্রতের মহিমায় আমরা দুস্তর বিপৎ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। আপনি বিপ্রবরকে বলিয়া দিবেন, যেন ইহা অন্যত্র রাষ্ট্র না হয়।" কুন্তী তাহাই করিলেন।

যথাসময়ে ভীমসেন দুর্জ্জয় রাক্ষসকে

বিনাশ করিয়া মাতৃ ও ভ্রাতৃ সমীপে সমস্ত বিবৃত করিলেন। মাতা সস্নেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। কুন্তীদেবীর অপরিসীম দয়ায় একচক্রা নগরী শত্রু-বিহীন হইল, নগরবাসিগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। এবিষয়ে বঙ্গভাষার দরিদ্রতা লেখক মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। সুখের বিষয়, এ দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য নব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-পরিষদ-সমিতি অগ্রসর হইয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই উক্ত সমিতি কতকগুলি ভৌগোলিক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন। একটি জিনিস দাঁড়াইলে তবে তাহার সমালোচনা চলে, সুতরাং সূচনাতেই এ বিষয়ের সমালোচনা সমীচীন নহে। শব্দগুলিকে সহজ, সরল, সংস্কৃতানুগত এবং একার্থবোধক করিতে সমিতি অবশ্যই যত্ন করিতেছেন; এখন ঐগুলি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত এবং সর্ব্বজন-পরিচিত হইলেই তাঁহাদের শ্রম সফল হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার বিগত দুই সংখ্যায় এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে কয়েকটি সারবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টসম্মিলনীর অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ। ছাত্রদিগের যত্নে স্থাপিত এবং অদ্যাপি প্রধানতঃ তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিলেও ইহার সঙ্গে দেশীয় গণ্য ব্যক্তিদিগের যোগ এবং গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। এ বৎসরের আয় ১৩০৫৷/৬, তন্মধ্যে গত বারের মজুত ছিল ৫৫২৷৶০ আনা। এবার ৩৮৮৷৷/৬ ব্যয় হইয়া ৯১৬৸৶০ আনা হাতে রহিল। ইহা দ্বারা আর্থিক অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক দেখা যাইতেছে।

এবার ৮৫৭ জন পরীক্ষার্থিনী আবেদন করেন, এবং ৬৬৩ জন পরীক্ষায় উপস্থিত হন, তন্মধ্যে ৪৯৬ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৭৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তীর্ণা মহিলাদের মধ্যে ৩৬৫ জন অবিবাহিতা, ৪২ জন বিবাহিতা, ১০ জন বিধবা, অবশিষ্ট ৭৯ জন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। অবিবাহিতার সর্ব্বোচ্চ বয়স ১৬ বৎসর, সর্ব্বনিম্ন; বিবাহিতার সর্ব্বোচ্চ বয়স ২৮ বৎসর, সর্ব্বনিম্ন ৭; বিধবার সর্ব্বোচ্চ বয়স ৩০ বৎসর, সর্ব্বনিম্ন ৮। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ৪২১, মুসলমান ৭৪, এবং খৃষ্টান। এ বিবরণও সন্তোষজনক।

নামের তালিকা দেখিলে দেখা যায়, হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ, সকল শ্রেণীরই সম্ভ্রান্ত লোকেরাই ইহাতে যোগ দিয়াছেন। এটি বিশেষ আশাপ্রদ, কিন্তু নামের সংখ্যা আশানুরূপ নহে। মোটের উপর সম্মিলনীর অবস্থা দেখিয়া দিন দিন আমাদের আশা বর্দ্ধিত হইতেছে।

সভ্যদিগের তালিকাটি যত্নের সহিত প্রস্তুত হয় নাই; ইহাতে না আছে স্থানানুক্রম, না আছে বর্ণানুক্রম, না আছে সংখ্যা, ভরসা করি সম্মিলনীর কার্য্য-নির্ব্বাহক মহোদয়দিগের যত্নে ভবিষ্যতে এ অসুবিধাটি দূর হইবে।

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল। | ২য় সংখ্যা।

জাপানীর মুখে জাপানের কথা।

বলবীর্য্য এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে জাপান আজকাল এসিয়াতে সর্ব্বপ্রধান রাজ্য, অনেক ইয়ুরোপীয় রাজ্যের সমকক্ষ বলিতেও সঙ্কোচ হইবার কারণ নাই। কিন্তু জাপানের এ উন্নত অবস্থা অতি আধুনিক, —এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে ইহার এতটা উন্নতি হইয়া উঠিয়াছে। এই উন্নতির মূল প্রথমতঃ উন্নত হইবার—প্রতিবাসী চীনের সমকক্ষ হইবার ইচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ সেই ইচ্ছা পরিপূরণের উপযোগী শিক্ষা। বড় হইবার ইচ্ছা করিলেই কেহ বড় হয় না, ইচ্ছার অনুরূপ শক্তি চাই, আবার শয্যায় শয়ন করিয়া শক্তি চাহিলে তাহা কেহ পায় না, সে জন্য যত্ন চাই, অক্লান্ত পরিশ্রম চাই, বিদ্যার কঠোর উপাসনা চাই। জাপান সে যত্ন, সে পরিশ্রম, সে কঠোর তপস্যা করিয়াছে; তাই সে শক্তিলাভ করিয়াছে, সে বড় হইয়াছে,—তাহার গৌরবে আজ পরাক্রান্ত চীন কম্পিত, জগৎ চমৎকৃত! এতদিন জাপান তপস্যায় নিযুক্ত ছিল—নীরবে শক্তি সঞ্চয়ে নিরত ছিল, তাই তাহার সংবাদ বড় কেহই লয় নাই। কিন্তু আজ তাহার সংবাদ শুনিবার জন্য, তাহার অবস্থা জানিবার জন্য, সকলেই উৎকর্ণ। পুস্তকে এবং সংবাদ পত্রে জাপান সম্বন্ধে যিনি যাহা পাইতেছেন, তিনি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছেন। কিন্তু সে সমস্ত বিবরণ বিদেশীয় বিরচিত, সুতরাং তাহা পাঠ করিয়া তেমন তৃপ্তি হয় না। যদি কোন জাপানী নিজে আসিয়া তাহার নিজের দেশের বর্ণনা করে, তবে তাহা শুনিবার জন্য প্রবল কৌতূহল জন্মে না কি? সৌভাগ্যক্রমে একটী জাপানবাসীর সঙ্গে আমরা কয়েক ঘণ্টা আলাপ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম; আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তিনি ইংরাজী এবং বাঙ্গালা খুব ভালরূপ জানেন, সুতরাং মনের সুখে তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল আলাপ করিতে পারিয়াছিলাম। অবশ্য সে আলাপ বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয় নাই, এবং তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত কথা মনেও নাই; তথাপি যতদূর মনে আছে, পাঠকমহোদয়দিগের পরিতৃপ্তির জন্য তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

জাপানীদিগের আদি বাস-স্থান ভারতবর্ষ। যখন বুদ্ধদেব ধর্ম্ম-প্রচার করেন, তখন জাপানে জন-মানব ছিল না। তিনি নিজেই বহুসংখ্যক শিষ্য সঙ্গে লইয়া চীনদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। চীন হইতে জাপানে যাইয়া দেখেন তথায় লোকজন নাই, অথচ স্থানটি মানবের বাসোপযোগী। তিনি নিজের অনেক গুলি শিষ্য তথায় রাখিয়া আইসেন, এবং তাহার পরে আরও অনেকে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই উপনিবেশ হইতেই বর্ত্তমান জাপান জাতির উৎপত্তি। যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতির অধিবাসী যেমন হিন্দু, জাপানের অধিবাসীরাও সেইরূপ হিন্দু।

জাপানে হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দুইই প্রচলিত, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য জাতিভেদ নাই, হিন্দু এবং বৌদ্ধ এক জাতি—জাপানী। আমাদের দেশে শাক্তে বৈষ্ণবে যতটা ভেদ আছে, জাপানে হিন্দু এবং বৌদ্ধতে ততটা ভেদও নাই। ধর্ম্মের জন্য দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, দল পুষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধ এক পাড়ায়, এক বাড়ীতে বাস করিতেছে, এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেছে, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদিও চলিতেছে। শাক্তের কন্যা কি শৈবে বিবাহ করে না? ফলতঃ সেখানে সকলেই হিন্দু, তবে কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা শৈব; হিন্দু এবং বৌদ্ধ বলিয়া বিভাগ করা সমীচীন নহে। জাপান সাম্রাজ্য কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি; তন্মধ্যে একটি দ্বীপের ৪। ৫টি নগরেই হিন্দুর সংখ্যা চারি লক্ষ; বৌদ্ধের সংখ্যা কিছু অধিক।

হিন্দুর দেবতার মধ্যে শিবই প্রধান, এবং তাঁহার উপাসকেরা শৈব বলিয়া পরিচিত। কালী, দুর্গা, গণপতি প্রভৃতি শিবের পরিবার সকলেই আছেন এবং তাঁহারাও পূজা পাইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের নামে পরিচিত কোন সম্প্রদায় নাই। শৈব মাত্রেই মস্তকে শিখা ধারণ করে, বক্তার মস্তকেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার আর কোন কাম নাই, কেবল সন্ধ্যা-পূজা-জপ-তপ, কেবল ধর্ম্মের আলোচনা,—অথবা ঐ সকল কার্য্যে যিনি একান্তভাবে নিবিষ্ট হইয়াছেন, সংসারের আর কোন সংবাদ রাখেন না, তিনিই ব্রাহ্মণ।

মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে দেব-মন্দির আছে, দেবতা স্থাপিত আছেন। হিন্দুরমণীরা সেখানে দলে দলে যাইতেছে, পূজা দিতেছে, স্তব পাঠ করিতেছে, আশীর্ব্বাদ লইতেছে। এ বিষয়ে পুরুষদিগের তাদৃশ অনুরাগ নাই। ভারতেও তাই—এখানেও ভক্তিমতী করুণাময়ী রমণীর হাতেই ধর্ম্ম-রক্ষার ভার। হিন্দুর গৃহে গৃহে দেব-দেবী স্থাপিত আছেন—ঘরের দেয়ালের গায়ে একখানি তক্তার উপরে তাঁহারা স্থাপিত। পরিবারের সকলেই ইঁহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ যিনি দেবসেবা তাঁহারই কার্য্য,—তিনি পুষ্পাদি দিয়া তাঁহাদের পূজা করিতেছেন, অন্নব্যঞ্জন দিয়া ভোগ লাগাইতেছেন। যুবকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান-সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত —তাঁহাদের সময় যখন আসিবে, তখন তাঁহারাও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। সে সময় আইসেও বিলম্বে—শতবর্ষ-ব্যাপী পরমায়ু

ভোগ করিয়া অতি অল্প লোকই মরে। বক্তার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে। দেখিতে চল্লিশের ঊর্দ্ধ বলিয়া বোধ হয় না তাঁহার পিতা মাতা এবং পিতামহ এখনও সুস্থদেহে বাঁচিয়া আছেন।

জাপানীরা বড় মিশুক এবং আমোদপ্রিয়। ভদ্রলোক মাত্রেরই বাড়ীতে একটী সাজান বৈঠকখানা আছে, তথায় দৈনিক নিয়মিত কাযের সময় ছাড়া আর সর্ব্বদাই প্রায় গান বাদ্য এবং আমোদ প্রমোদ চলিয়া থাকে। কাযের সময় কায কর, অন্য সময়ে আমোদ কর——জীবনের সুখ উপভোগ কর, ইহাই জাপানী যুবকের কথা। কাযের সময়ে কায করা যে কেবল মৌখিক কথা নহে,কিন্তু প্রাণের কথা,জাপানের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার প্রমাণ। যাহারা কেবল আমোদ ভিন্ন আর কিছু চায় না, আর কিছু জানে না, জাপানের ন্যায় উন্নতি লাভ করা তাহাদের ভাগ্যে স্বপ্নেও অসম্ভব। উন্নত উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা প্রাণপণে খাটিতে জানে, প্রকৃত আমোদ তাহাদেরই অধিকার এবং প্রকৃত আমোদ কেবল তাহারাই উপভোগ করিতে পারে।

জাপানের সর্ব্বত্রই আকাডেমি নামে বিদ্যালয় স্থাপিত আছে, এই সকল বিদ্যালয়ে গণিত, বিজ্ঞান, বিবিধ ভাষা এবং বিবিধ ব্যবসায়ের শিক্ষা হইয়া থাকে; এমন কি, যুবকেরা ইহাতে যুদ্ধ-বিদ্যারও শিক্ষা পায়।

রমণীদিগেরও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পুরুষদিগের মত নহে। রমণীদিগের প্রধান কার্য্য গৃহস্থালী এবং সুচিকর্ম্ম। রেশমের কাপড়ে বোঁটা তুলাই সুচিকর্ম্মের মধ্যে প্রধান। ইতর শ্রেণীর রমণীরা কৃষিকার্য্য করে। সমস্ত জাপানী পুরুষ যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, রাজ-কার্য্যে বা যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তথাপি জাপানে অন্নাভাব হইবে না, জাপানী রমণীগণই কৃষিকার্য্য দ্বারা দেশের অন্ন-সংস্থান করিতে পারিবে। প্রয়োজন হইলে জাপানী রমণী বন্দুক লইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারে, বারুদ গোলা এবং বন্দুক হাতের কাছে রহিয়াছে, অথচ ব্যবহার জানে না বলিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে পারিতেছে না,এমন রমণী জাপানে প্রায় নাই। কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়েই যে তাহাদের শিক্ষা হয়, তাহা নহে; যে কোন প্রকার সম্ভাবিত বিপদ উপস্থিত হইলে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা প্রায় সকলেই শিক্ষা করে।

জাপানীদিগের পরিচ্ছদ বাঙ্গালীর মত—বাহিরে হেট্, কোট, পেণ্টালুন, বাড়ীতে ধুতি এবং চাদর; কিন্তু সে ধুতি চাদর রেশম-নির্ম্মিত, তুলা নির্ম্মিত বস্ত্র কেহ পরিধান করে না।

আহারে জাপানীর সঙ্গে বাঙ্গালীর কোন প্রভেদ নাই। উভয় জাতিরই প্রধান আহার মাছ এবং ভাত। কিন্তু কপাল-গুণে এবং অবস্থার কৃপায় ভেতো বাঙ্গালী ঘৃণার পাত্র, আর ভেতো জাপানী গৌরবের আস্পদ!

বাঙ্গালায় যত ধান জন্মে, জাপানে তত জন্মে না, তথাপি জাপানে অন্নাভাব হয় না। ইহার কারণ, জাপান হইতে ধান চাউলের রপ্তানি রাজ-বিধি অনুসারে

একেবারে নিষিদ্ধ। আমাদের যেমন ৪০ সেরে মণ, জাপানে সেইরূপ একটী পরিমাণ আছে, তাহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা আমাদের পাকি ৬৬ সেরের তুল্য। জাপানে চাউলের মূল্য যখন খুব চড়িয়া যায়, তখনও টাকায় সেই পরিমাণ অর্থাৎ প্যাকি ৬৬ সের চাউল পাওয়া যায়। জাপানের টাকার নাম ইয়েন, তাহা আমাদের টাকা হইতে কিঞ্চিৎ বড় মাত্র। দুইটি পয়সা খরচ করিলেই একজনের ভরপেট মাছ ভাত খাওয়া হইয়া যায়। ঘরে মাছ ভাত খাওয়ার এই খরচ; তবে যাঁহারা ধনী এবং বাবু গোছের লোক, তাঁহারা প্রায়ই হোটেলে আহার করিয়া থাকেন। হোটেলে একবেলা আহার পাঁচ টাকার ন্যূন খরচে হয় না। এ বিষয়েও জাপানীর সঙ্গে বাঙ্গালীর কতকটা সাদৃশ্য আছে। তবে প্রকাশ্যে আর গোপনে, এই মাত্র প্রভেদ।

অন্ন এত সুলভ হইবার কারণ, রপ্তানির অভাব। এ বিষয়ে জাপান-গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্ক; অন্য সমস্ত জিনিস বিদেশে যাউক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু একটী তণ্ডুল দেশের বাহিরে যাইতে পারিবে না। চাউলের রপ্তানি থাকিতে ভারতের অন্নাভাব ঘুচিবে না। আমাদের রাজ-জাতি ইংরাজের চাউলের দরকার খুব বেশী। ভারতের রপ্তানির দ্বার অনর্গল রাখিয়াও তাঁহাদের পোষায় না, সময়ে সময়ে অন্যত্রও না কি তাঁহারা হাত বাড়াইয়া থাকেন। একবার একখানি ইংরাজী জাহাজ জাপানের কোন বন্দরে যাইয়া নঙ্গর করে, এবং গোপনে গোপনে চাউল কিনিতে থাকে। জাহাজ বোঝাই হইয়াছে, বন্দর ছাড়িবে, এমন সময়ে কতকগুলি জাপানী যাইয়া সেই জাহাজে উঠিল, এবং সমস্ত চাউল কাড়িয়া রাখিয়া জাহাজ খানি তাড়াইয়া দিল। এই মূল্যবান্ শিক্ষা পাইয়া আর কেহ কখন জাপানে চাউল কিনিতে যায় না।

জাপানে মদ্য-পানে দোষ নাই। তবে যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাহাদেরই এ বাবুগিরি পোষায়, দরিদ্র লোকে সে কদভ্যাস প্রায় রাখে না। বক্তা একটি জাপানী গান করিলেন, তাহার সুর অনেকটা উড়িয়া গানের সুরের মত। তিনি যখন তুড়ি দিয়া গান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া বোধ হইল জাপানের সব আমোদ-প্রমোদ তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। সেই গানের অর্থ এক বোতল মদ আর এমন একটা অশ্লীল কথা যে তাহা উচ্চারণ করা যায় না।

গানের অর্থটা শুনিয়াই বোধ হইল, জাপানীদিগের যৌননীতি তেমন উন্নত নহে। বিবাহ কেবল মাত্র বা প্রধানতঃ প্রণয়েরই ব্যাপার। জাপানের বিবাহ-প্রণালী প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য প্রণালীর সংমিশ্রণে গঠিত—উভয়েরই মন্দ ভাগগুলি ইহাতে পূর্ণমাত্রায় আছে। প্রাচ্য বহু-বিবাহ রহিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রতীচ্য প্রণয়-ভিক্ষা বা কোর্টশিপ এবং স্বৈরচার মিলিয়াছে। যাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল, তাঁহার নিজের তিনটি

তাঁহার পিতার দুইটী, এবং তাঁহার পিতামহের ছয়টি বিবাহ! ইহাতে ব্যভিচার হয় না কি? বিবাহের পূর্ব্বে ব্যভিচার অসম্ভব; কেননা যাহার বিবাহই হয় নাই, তাহার আবার ব্যভিচার কি? ব্যভিচার বিবাহের পরে হইতে পারে। যে স্বামীকে ভাল বাসে, প্রণয়ই তাহাকে ব্যভিচারিণী হইতে দিবে না; আর যে ভাল বাসে না, সে কি ভাবে চলে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রয়োজন কি? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ইহাঁরা ইউরোপেরও এক কাঁটা উপরে উঠিয়াছেন। বিবাহ চ্ছেদের বিধি আছে; কিন্তু তাহা এতই কঠিন যে, সে বিষয়ে কেহ যত্ন করে না। বিবাহে বয়সের কোন নিয়ম নাই, তবে সচরাচর পুরুষের বিংশ বর্ষে এবং স্ত্রীর ত্রয়োদশ বর্ষে বিবাহ হইয়া থাকে।

যাঁহার সঙ্গে কথা হইল, তাঁহার জন্ম ভারতবর্ষে—তিনি ভারতীয় হিন্দু। এখানে তাঁহার নাম ছিল গঙ্গাপ্রসাদ, এখন তাঁহার জাপানী নাম গঙ্গাসা বা গঙ্গাছা। সা বা ছা বলিতে ভদ্রলোক বুঝায়। বিশেষ কোন ঘটনাবশতঃ তাঁহার পিতা এবং পিতামহ জাপানে যাইয়া বাস করেন। তখন তিনি নাবালক ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পরিবারের সকলকে লইয়া গিয়া তিনি পিতৃপিতামহের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহার নিজের স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের সে দেশ ভাল লাগিল না, তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পরিবারের আর সকলেই জাপানে রহিয়া গেল। প্রথমা স্ত্রী দেশে চলিয়া আসিলে ক্রমে তিনি তিনটি বিবাহ করিয়াছেন, এবং পুত্রকন্যায় ছয়টি সন্তান হইয়াছে। তিনি চিকাগো নগরের মেলায় যাইতেছিলেন, পথে বাতরোগে একাঙ্গ অচল হওয়াতে চিকিৎসকের উপদেশে এই দেশে থাকিয়া যান। এই দুই বৎসরে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, শীঘ্রই তিনি স্বদেশে যাইবেন।

জাপান সমুদ্রে অবস্থিত হইলেও শীত প্রধান দেশ। এখানে তাপ-পরিমাণ সচরাচর ২০ হইতে ৩০ ডিগ্রী—৮০ ডিগ্রী কখনও হয় না।

কলিকাতা হইতে জাপানে যাইতে ১৫ দিন সময় এবং ৪১৲ টাকা জাহাজ ভাড়া লাগে। নিজের আথায়, নিজের ভাণ্ডে, নিজের হস্তে পাক করিয়া খাইয়া—হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া যাতায়াত করিবার সুবিধা এই সকল জাহাজে আছে। নিজের আথাটি কিন্তু এইরূপ,—একটা প্রকাণ্ড তুন্দুরের ভিতর অনবরত অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার চারি দিকে বহুতর আথা কাটা রহিয়াছে, যে সে আথায় তোমার দাইল রুটি বা ভাত তরকারী রাঁধিয়া লইতে পার। জাপানী জাহাজে মুসলমান প্রভৃতি অন্য কোন জাতি থাকে না—তুমি আহ্নিক করিতে বা জল খাইতে বসিয়াছ, অমনি কোন প্রয়োজন না থাকিলেও একটা খালাসী আসিয়া তোমার উপর দিয়া চলিয়া গেল, জাপানী জাহাজে সে ভয় নাই। কিন্তু জাপানে বেড়াইতে যাইতে হইলে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে। জাপানে যাইয়া জাহাজ লাগিবামাত্র সেখানকার পুলিস আসিয়া

তোমার অনুমতি-পত্র দেখিতে চাহিবে। যদি তাহা না দেখাইতে পার, তবে তখনই তোমাকে হাজতে লইয়া গিয়া আবদ্ধ রাখিবে। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই অপর সকল স্বাধীন দেশের রাজ-দূত থাকেন। তুমি যদি ভারতবাসী হও, তোমাকে তোমার রাজ-দূত অর্থাৎ ইংরাজ রাজ-দূতের নিকট পুলিসের যখন খুসী তখন লইয়া যাইবে, এবং তিনি তোমাকে তোমার দেশে পাঠাইয়া দিবেন, এই হইল তোমার জাপান দেখা! কিন্তু পর-রাষ্ট্র-সচিবের অনুমতি-পত্র লইয়া গেলে সেই পত্রে যতদিনের উল্লেখ আছে, ততদিন জাপানে থাকিতে এবং ইচ্ছামত দেখিতে শুনিতে পার।

হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি জাপানের স্থায়ী অধিবাসী হইতে পারে না—জাপান সম্রাটের নিকট প্রজা-স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। জাপানে স্থানের তুলনায় অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপনের পথ দেখিতে হইতেছে, সুতরাং বিদেশীকে অধিবাসী করিয়া লওয়া তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে; তবে যে ভারতবাসী হিন্দুকে স্থান দেয়, সে কেবল নিজের জাতি ভাই বলিয়া। কিন্তু সে যেমন তোমাকে জাতি ভাই বলিয়া নিজের ঘরে স্থান দিতেছে, তুমি তাহাকে সেইরূপ জাতিভাই বলিয়া গ্রহণ করিতেছ কি না, তাহার পরিচয় দিতে হইবে। সে পরিচয় কি?—না, নাম-পরিবর্ত্তন এবং বিবাহ। তোমার নাম যদি গঙ্গাপ্রসাদ হয়, তবে তাহাকে গঙ্গাসা করিয়া লও, আর একটি জাপানী কন্যা বিবাহ কর, তাহা হইলেই তুমি জাপানী হইলে। জাপানী তোমাকে স্বজাতি বলিয়াই অধিবাসের অধিকার দেয় এবং কন্যা দান করে, অন্য জাতির সঙ্গে, এমন কি চীনদিগকেও প্রাণান্তে এ অধিকার দিবে না। যে তোমাকে এত ভালবাসে, স্থানের সঙ্কুলান না হইলেও তোমাকে স্থান দেয়, তাহাকে স্বজাতি বলিয়া সাগ্রহে আলিঙ্গন করিবার সাহস, সততা এবং উদারতা যদি তোমার না থাকে, তবে কোন্ মুখে সে অধিকার চাহিবে?

জাপানের এই ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে এবং ভ্রাতৃ-প্রেম-প্রদর্শনে অনেক ভারতবাসী মোহিত হইয়াছেন, অনেকে তাহার স্বাধীন ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। এই যে চীনের সঙ্গে ঘোরযুদ্ধ হইল, ইহাতে ভারতবাসী কেহ ছিল কি? বক্তা বলেন অনেকে ছিল। তিনি জাপানবাসীকে ভারতবাসী বলিতে চাহেন না, তবে জাপানবাসী অসংখ্য হিন্দু সৈনিক এবং বহুতর উচ্চপদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ যে ইহাতে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিলেন।

অনেক বাঙ্গালীও সেখানে আছেন, এবং কেহ কেহ অতি উচ্চদরের সম্মানও উপভোগ করিতেছেন। টোকিয়ো নগরের আসাকুশা নামক বিখ্যাত দেব-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বাঙ্গালী। আসাকুশার অর্থ কুশাসন। একজন যোগী বহুকাল কুশাসনে এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় ভক্ত হিন্দুগণ এই স্থানে একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ ও শিব স্থাপন করিয়াছেন। টোকিয়ো পার্লে

মেণ্টের একজন সম্ভ্রান্ত সভ্য কাউণ্ট্ শিনাগাবা; ইনিও বাঙ্গালী। টোকিয়োর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট্ও গামা এই ভারতবর্ষেই কোন হিন্দু পরিবারে জন্মিয়াছিলেন।

ভারতবাসীর ন্যায় তিব্বত এবং তাতারবাসীও জাপানবাসীর স্বজাতি, মধ্যস্থলে কেবল চীনেরাই বিজাতি মঙ্গলীয়। এই যে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হইল, ইহাতে একটি তাতারবাসী বা তিব্বতবাসী জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে নাই, ধরিবেও না। ইহারা নামে মাত্র চীনের অধীন হইলেও ডালয় লামার আজ্ঞাধীন; কিন্তু ডালয়লামা তাহাদিগকে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কখনও আজ্ঞা দিবেন না। তিব্বত এবং তাতার যে হিন্দুর অধ্যুষিত দেশ, কৈলাস বা কিউন্‌লেন্ পর্ব্বতই তাহার পরিচয়।

চীনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ কি? এক কথায় বলিতে গেলে কোরিয়াকে চীনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করা। কিন্তু ইহা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য, ইহা ছাড়া বাহিরের কারণ আরও অনেক ছিল।

চীনের অত্যাচার কি? সে অনেক, কিন্তু প্রধান একটি। কোরিয়ার রমণীগণ সুন্দরী; চীন-সম্রাট্ সেই দেশ হইতে বালিকা লইয়া আমেরিকার পেরুদেশে নাকি তাহাদিগকে বিক্রয় করেন। এই ব্যবসায় সম্রাটের একচেটিয়া; তিনি ইহা সভ্যজগতের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে চালান, এবং ইহাতে তাঁহার অনেক লাভ হয়। এই পাশব অত্যাচারে কোরিয়াবাসী ব্যতিব্যস্ত, অথচ প্রতিবিধানে অক্ষম। কোরিয়াবাসী তাতার, সুতরাং জাপানীর স্বজাতি, কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে তাহারাও প্রতিবিধানে অক্ষম। এবার অন্যান্য কারণে চীনের সঙ্গে উপস্থিত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাই কোরিয়া হইতে চীন সম্রাটের সেই অবৈধ ব্যবসায় উঠিয়া যাইবার সুযোগ হইল।

চীন এবং কোরিয়া রুষাধিকারের নিকটবর্ত্তী; এখানে জাপানের প্রভাব দেখিয়া যদি রুষ-সম্রাট্ বাধা দেন? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। ইউরোপীয়েরা যেরূপ নির্লজ্জভাবে অন্যায় করিয়া রাজ্যের পর রাজ্য দখল করিতেছেন, জাপানি তাহা করিতেছে না। যাহার রাজ্য যত বিস্তৃত সে তত দুর্ব্বল, জাপান তাহা জানে, সুতরাং রাজ্যবিস্তারে তাহার স্পৃহাও নাই। তবে কাহারও সঙ্গে প্রকৃত যুদ্ধের কারণ যদি উপস্থিত হয়, তবে পরাজিত আততায়ীর নিকট হইতে ভূমি বা অর্থ লইয়া যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ করিতে সে বাধ্য। যুদ্ধের সময়ে কেহ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন কি? চীন যদি জয়ী হইয়া জাপান অধিকার করিয়া বসিত, কেহ তাহাতে বাধা দিতেন কি? জাপানের কার্য্যে বাধা দিবার পূর্ব্বে রুষিয়াকে অনেক কথা ভাবিতে হইবে। এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া—আন্তর্জাতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদি রুষিয়া জাপানকে বাধা দিতে উপস্থিত হন, জাপান সে জন্য প্রস্তুত আছে। প্রত্যেক জাপানী বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ-ব্যাপারে সুশিক্ষিত, জাপানী রমণীগণও প্রয়োজন হইলে বন্দুক হাতে লইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, এ কথা আগেই বলিয়াছি। প্রত্যেক জাপানী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলেও যে জাপানে

রাজনীতিদিগের কৃপায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে না, এ কথাও বলা হইয়াছে।

যাহার রাজ্য যত বিস্তৃত, সে যদি তত দুর্ব্বল, তাহা হইলে ইংরাজেরা যে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, আরও দিন দিন কত রাজ্য অধিকার করিতেছেন, তাঁহারা ইহাতে কি দুর্ব্বল হইতেছেন? এক প্রকার রোগ আছে, তাহাতে শরীর ফুলিতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগী শরীরের পুষ্টি দেখিয়া বড় খুসী হয়; কিন্তু রোগের বৃদ্ধি হইয়া গেলে যখন সে দুর্ব্বলতা অনুভব করে, তখন আর ঔষধ খাইয়াও রোগ সারাইতে পারে না। ইংরাজ এবং রুষের সেই রোগ জন্মিয়াছে; কিন্তু এখনও তাঁহারা তাহা টের পান নাই, কাযেই ভারতবর্ষ লইয়া এত গণ্ডগোল করিতেছেন। বিশেষতঃ ইংরাজেরা ভারতের সার কিছু রাখেন নাই, তাই তাঁহাদের মধ্যে অনেক দূরদর্শী ব্যক্তির মনে ভারতের প্রতি আদর কমিয়া গিয়াছে। এখন যদি প্রচুর মূল্য লইয়া ভারতবর্ষ কেহ কিনিতে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইংরাজেরা ইহা অনায়াসে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারেন। বোধ হয় এ বিষয়ে কথকের সঙ্গে অনেকেরই মত-ভেদ হইবে। তবে পতনের পূর্ব্বে যে কোন কোন রাজ্যে অসাধারণ বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

ইংরাজেরা যদি ভারতবর্ষ বিক্রয় করিতে দাঁড়ান, তবে জাপান তাহা খরিদ করিতে পারেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলিলেন; দরিদ্র অথচ বিস্তৃত ভারতবর্ষকে ক্রয় করিয়া জাপান আপনার বিপদ আপনি আহ্বান করিবে না; তবে গয়াক্ষেত্রটা পাইলে কিনিতে পারে। গয়া-সম্বন্ধে জাপানী হিন্দু এবং বৌদ্ধের একমত, কেন না জাপানের হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ই হিন্দু। গয়াতে বৌদ্ধ জগতের অবাধ অধিকার থাকা উচিত, এবং ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের তাহাতে বাধা দেওয়া অন্যায়। ইহাতে অবশেষে তাঁহাদেরই ক্ষতি। বৌদ্ধেরা এখন তাঁহাদের ধর্ম্ম-ক্ষেত্র গয়ার অধিকার চাহিয়াছেন, তখন ইহা তাঁহারা লইবেন। হিন্দুরা যদি সদ্ভাবে উহা ছাড়িয়া না দেন, বৌদ্ধেরা কিনিয়া লইবেন; কিন্তু তাহাতে হিন্দুর লাভ নাই, কেন না, হিন্দু তাহা বেচিতে পারিবেন না। দেশের ভূমি বিদেশীর নিকটে বিক্রয় করিবার অধিকার একমাত্র রাজার। ভারতের রাজা ইংরাজ, হিন্দুর ধর্ম্মে তাঁহার সহানুভূতি নাই। ইংরাজ বণিক, সুতরাং প্রচুর অর্থের লোভ পাইলে গয়া বিক্রয় করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি থাকিবে না। ইংরাজ গয়া বিক্রয় করিলে প্রচুর টাকা পাইবেন, তাহার উপরে সমস্ত বৌদ্ধজগতের কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি এবং বন্ধুতা লাভ করিবেন, চতুর ইংরাজ এ সুযোগ ছাড়িবেন কি? পক্ষান্তরে হিন্দুর সকল দিকেই ক্ষতি। গয়া তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে, সে জন্য তাঁহারা একটি পয়সাও পাইবেন না, তাহার উপরে সমস্ত বৌদ্ধজগতের সহানুভূতি তাঁহারা হারাইবেন। রাজনীতি লইয়া ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ এবং ধর্ম্ম লইয়া মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ একেইত আছে, তাহার উপরে সমগ্র বৌদ্ধ-মণ্ডলীর সঙ্গে বিবাদ হইতে

চলিল, ইহা হিন্দুর পক্ষে মঙ্গলের কথা নহে। এ মূল কথাটা যে হিন্দুরা বুঝিতেছেন না, তাঁহাদের পরাধীনতাই ইহার কারণ। পরাধীন জাতি অত্যাচার অবিচারে হৈ চৈ করে বটে, কিন্তু প্রকৃত রাজনীতি—দেশের প্রকৃত স্বার্থ তাহাদের মস্তিষ্কে সহজে প্রবেশ করে না। ভারতবাসী হিন্দুর পক্ষে জাপানবাসীর এ কথাগুলি বিশেষ চিন্তার সহিত বিবেচ্য। গয়া-ব্যাপারের শ্রাদ্ধ না হইতে একটা প্রীতিকর মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, ভারতে কি এমন হিন্দু নাই?

ইতিহাসে আমরা যে ভাবে শিক্ষিত, তাহাতে জাপানীর সকল কথায় সমানভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ নহে। সত্যই কি ভারত, তিব্বত, তাতার এবং জাপান এক জাতির—একই হিন্দু জাতির অধ্যাসিত? সত্যই কি ইহাদের নীতি এবং প্রকৃতি একই হিন্দুধর্ম্মে গঠিত? সত্যই কি ইহাদের হৃদয় একই হিন্দু-প্রেমে পরিচালিত? সত্যই কি ইহাদের ধমনীতে একই হিন্দু-শোণিত প্রবাহিত? ভবিষ্যৎ সমাজের ইতিহাসতত্ত্ববিৎ! এ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার ভার তোমারই হাতে রহিল। ভারতের জাতীয় ব্যাপ্তি যদি গিরি-সাগর-সীমা সমুল্লঙ্ঘন করিয়া দূর-প্রসারিত হয়, তবে ভারতের জাতীয় হৃদয়কেও প্রাকৃত সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নততর উদারতা-প্রদর্শনের জন্য—চিরবিস্মৃত সহোদরকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবার জন্য, প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতের দরিদ্রতা প্রমাণ করিবার জন্য বক্তা পকেট হইতে দুই খানি কাগজ বাহির করিলেন, তাহাতে জাপানীর বাণিজ্যের অবস্থা সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। এই তালিকায় দেখা গেল, রেশম এবং দীপ-শলাকার ব্যবসায়ে ভারতের বার্ষিক যত টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শতকরা যথাক্রমে ২০ টাকা এবং ১৬॥০ টাকা এক মাত্র জাপানই লইয়া থাকে। অন্যান্য অনেক জিনিসের কথাও তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে সব কথা স্মরণ নাই।

কিন্তু এই ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইলাম বাঙ্গালীর কলঙ্কে। শিক্ষকতা এবং কেরাণিগিরিতে বাঙ্গালী সিদ্ধ-বিদ্য, জাপানেও তিনি প্রধানতঃ ঐ দুই কর্ম্মই করিয়া থাকেন। বাণিজ্যাদিতেও ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু জাপানের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে বাঙ্গালীর অধিকার নাই! ইংরাজ হিংসা বা ভয় করিয়া বাঙ্গালীকে স্বতোব্রতী সৈনিক হইতে দেন না, এইত আমাদের বিশ্বাস; কিন্তু জাপানে তাহাতে অন্তরায় কি? যে জাপানে ভারতবাসী মাত্রেই তুল্যাধিকার পাইয়া থাকে, সেখানে বাঙ্গালী একটি অধিকারে বঞ্চিত কেন? জাপানী বলেন, বাঙ্গালীর নিজের নৈতিক দুর্ব্বলতা এ পথের অন্তরায়। বাঙ্গালীর যে বল বা সাহস নাই, বাঙ্গালী যে বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিতে না পারে, তাহা নহে; কিন্তু বাঙ্গালীর স্বার্থপরতা এবং মৃত্যু-ভয় তাহার চরিত্রকে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে, অন্যান্য সমস্ত সদ্গুণ এই দোষে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যে মৃত্যু-ভয়ে ভীত

অথবা স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় প্রলুব্ধ হইয়া লজ্জা, ভদ্রতা, আত্ম-সম্মান এবং স্বজাতি-প্রীতি পদতলে দলন করিতে পারে, তাহার হাতে বন্দুক দিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে সাহস পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষ যদি উচ্চতর পদের প্রলোভন দেখায়, বাঙ্গালী অম্লান-বদনে স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিবে; যুদ্ধে বন্দীকৃত বাঙ্গালীকে নিষ্কুষিত অসি দেখাইয়া প্রতিপক্ষ যদি রহস্য ভেদ করিয়া লইতে চায়, বাঙ্গালী প্রাণের মমতায় আত্ম-পক্ষের সমস্ত গুহ্য কথা বলিয়া দিবে। কিন্তু জাপানীর চরিত্র সেরূপ নহে, জাপানী বিপক্ষের সর্ব্বময়-কর্ত্তৃত্বে পদাঘাত করিয়া স্বপক্ষ-দলে পদাতিক হইয়া থাকিবে, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিয়াও স্বপক্ষের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিবে না। বাঙ্গালীর এরূপ ঘৃণিত চরিত্রের কি প্রমাণ জাপানে পাওয়া গিয়াছে? জাপানীরা ঠকিয়া শিখিবার জাতি নহে, তাহারা দেখিয়াই সাবধান হওয়া উচিত মনে করে। বাঙ্গালীরা যখন সে দেশে আছেন, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যে নীচতার পরিচয় কখনও দেন নাই, এমন বোধ হয় না। প্রকৃত চরিত্র লোকে সাবধান হইয়া কয়দিন লুকাইয়া রাখিতে পারে? বোধ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নীচতার পরিচয় পাইয়াই জাপান-গবর্ণমেণ্ট যথার্থ বিজ্ঞতার সহিত এ বিষয়ে সাবধান হইয়াছেন।

বাঙ্গালী ভাই! তোমার এ দুর্নাম সমূলক কি অমূলক, তাহা তুমিই জান, কেন না মনের অগোচর পাপ নাই। যদি এ দুর্নাম অমূলক হয়, তবে স্বজাতি-প্রেম স্বার্থত্যাগ, আত্ম-সম্মান এবং নির্ভীকতা দ্বারা—কেবল বাক্যে নহে, কিন্তু কার্য্য দ্বারা—জগৎ-সমক্ষে তাহার পরিচয় দেও; আর যদি সমূলক হয়, তবে তোমাদের কলঙ্কিত মুখ লুকাইবার জন্য লোক-মাতা ধরিত্রীকে দ্বিধা হইতে বল, আর না হয় পতিত-পাবনী জাহ্নবীর জলে সকলে যুগপৎ আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া জাতীয় কলঙ্ক ধৌত কর, জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর!

প্রেম ও বৈরাগ্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এখন শিশুর এই প্রেমতত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাহার সেই আধ-মুখের "আমার" বিশেষণটি বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। "আমি" যদি আমার দেহ মধ্যেই আবদ্ধ থাকি, তাহা হইলেত আর দেহ বহির্ভূত বিষয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না। বৃক্ষের ডাল, লতার পাতা, মন্দিরের চূড়া, শৃগালের লাঙ্গুল প্রভৃতিতে বস্তুর সহিত সম্বন্ধীয় সংলগ্নতা সম্পর্ক আছে। কিন্তু শিশুর দেহ-রুদ্ধ আমির সহিত তাহার পিতা মাতা কাকা দাদার কি সম্পর্ক থাকিতে

পারে? ক্ষুদ্র-বুদ্ধি শিশু কি সম্পর্ক অবগত হইয়া তাহাদের পূর্ব্বে "আমার" বিশেষণটি ব্যবহার করিয়া থাকে? এ সম্পর্ক আর কিছুই নহে, শিশুর আমিটি তাহার দেহরূপ গুটিকা ভেদ করিয়া তাহার মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহার আমি বিস্তৃত হইয়া সকলকেই বেষ্টন করিয়াছে,—এ আমি আর শুদ্ধ ব্যক্তিগত আমি নাই, এখন তাহা পরিবার-গত আমি হইয়াছে, কাযেই শিশু "আমা দাদা," "আমা কাকা" প্রভৃতি বলিতে শিখিয়াছে। "আমি" চৈতন্যময় আত্মা, ইহা স্থান-কাল দ্বারা আবদ্ধ থাকে না, দেহমাত্র অবলম্বন করিয়াও ইহা অনন্ত প্রসারণশীল, ব্যক্তিত্ব হইতে সাধারণত্বে পরিণত হওয়াই ইহার ধর্ম্ম।—এই যে আত্মার প্রসারণ ইহা প্রেমের দ্বারাই সংসাধিত হয়, অথবা এই প্রসারণ ক্রিয়াই প্রেম। প্রেমের ইহা অপেক্ষা আর সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হইতে পারে না।

তাহার পর দেখা যাউক, শিশুর এই প্রেমের দ্বিতীয় পরিণাম কি হয়। শিশু বালক হইল—বাড়ীর বাহির হইয়া গ্রামের সমবয়স্ক ছেলেদের সহিত খেলা আরম্ভ করিল, তখন আমার বন্ধু, আমার মিত্র, আমার বন্ধুর পিতা, আমার বন্ধুর মাতা, আমাদের গ্রামের লোক, আমাদের গ্রামের নদী, আমাদের গ্রামের বাগান প্রভৃতি বহুতর "আমাদের" সৃষ্টি হইল। বালকের তরল নির্ম্মল—প্রেমধারা গ্রামের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত অভিষিক্ত করিয়া ফেলিল। তখন শিশুর সেই পরিবারগত "আমি" একটি গ্রাম সাধারণ-গত বৃহৎ আমিত্বে পরিণত হইল। গ্রামের কোন লোকের বিপদ হইলে দুঃখ হয়, গ্রামের কোন ক্ষতি হইলে প্রাণে আঘাত লাগে, সুদূর বিদেশে যদি স্বগ্রামের কোন লোক দেখিতে পায়, তবে মনে করে নিজেরই যেন কতক অংশ দেখিতে পাইল।

ক্রমে বালক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। তখন আমার—সহপাঠী, আমার বিদ্যালয় পণ্ডিত, আমার গুরু প্রভৃতি আবার অনেক গুলি "আমার" সৃষ্ট হইল। বালকের আমিত্ব আরও অনেক প্রবৃদ্ধায়তন হইল। তাহার উপর জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারাও তাহার আমিত্বের বিস্তার হইতে লাগিল। চৈতন্যময় আত্মা কালদ্বারাও নিরুদ্ধ নহে। স্বদেশের ইতিহাস পাঠে বালকের আমার দেশ বলিয়া জ্ঞান জন্মিল, কল্পনা ও প্রেম-মূলক সহানুভূতি-বলে ইতিহাস-বিবৃত স্বদেশের সমস্ত ঘটনাগুলির সহিত বালকের হৃদয় কখন নাচিতে, কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে লাগিল, শত্রু-সংগ্রামে স্বদেশের জয়-ধ্বজা যখন উড্ডীন হইল, বালকের হৃদয় তখন উল্লাসে পূর্ণ হইল; যখন শত্রু জয়লাভ করিল, তখন তাহার মনও বিষাদময় হইল। স্বদেশবাসী বীরগণের মহত্ব পাঠ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে উচ্চাশা উদ্দীপিত হইতে লাগিল, আবার তাহাদের নীচতা ভীরুতা অবগত হইয়া মন চির ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে স্বদেশের সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ের সহিত হৃদয় গ্রথিত হইয়া বালকের সেই গ্রাম-সাধারণ গত আমিত্ব সমগ্র দেশগত আমিত্বে পরিণত

হইল। এদিকে জগন্নিহিত নিয়ম সকল অধ্যয়ন ও পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, তাহাদের সহিত নিজের সাদৃশ্য দেখিয়া, যে জ্ঞানময় শক্তি আমার অন্তরে কার্য্য করিতেছে, সেই জ্ঞানময় শক্তিই এই জগত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত ও নিয়মিত করিতেছে বুঝিয়া জগৎ এবং আমি সমানভাবে একই নিয়মের একই শৃঙ্খলার অধীন দেখিয়া, বালক এই জগৎ এবং জগৎনিয়ন্তার সহিত ক্রমে ক্রমে আপনার আত্মীয়তা অনুভব করিতে লাগিল।

তৎপরে বালক যুবকত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহার হৃদয়ে নবভাব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যে প্রেম-প্রবাহ জন্ম হইতে এক ধারায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া—খরবেগে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এখন খরতর বেগ ধারণ করিল। নদীর বেগ যখন অত্যধিক হয়, তখন আর তাহা একধারে অধিকক্ষণ থাকে না। যুবকের প্রেম প্রবাহও সেইরূপ এই স্থলে ত্রিধারায় বিভক্ত হইল। একধারা ভগবানের প্রজাজনয়িতৃ-বিধানের বশীভূত হইয়া—মোহিনী রমণী প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিজ পরিবার-স্বজনের দিকে ধাবিত হইল। তখন সেই যুবকের আমিত্ব নিজ ভার্য্যার আমিত্বের সহিত মিশিয়া এক-বৃহত্তর রমণীয় আমিত্বে পরিণত হইল। আবার তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়া তাহা আরও বিস্তৃত হইতে লাগিল। আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার জামাতা প্রভৃতি প্রেম-বিস্তারের আত্মার বিস্তারের আমিত্বের বিস্তারের নূতন নূতন জিনিস নিত্য উদ্ভূত হইতে লাগিল। আর এক ধারা জনসাধারণের হিতার্থে ধাবিত হইল, এই ধারা স্বগ্রামবাসী স্বনগরবাসী স্বদেশবাসী সকলকে পবিত্র প্রেমে স্নাত করাইয়া তাহাদের কল্যাণার্থ কীর্ত্তি স্থাপনে উদ্যমী হইয়া ক্রমশঃ স্বদেশ-সীমা অতিক্রম করতঃ মানবসাধারণের প্রেমে, এবং তাহা হইতে জীব মাত্রেরই প্রতি প্রেমে পরিণত হইল। এই দুই ধারার মধ্য দিয়া একটি সূক্ষ্ম অথচ গভীর জ্ঞান-ধারাও প্রবাহিত হইতে থাকে; ইহা সকল বস্তুর সমন্বয় করিতে করিতে, সকলের মধ্যেই জ্ঞানময় চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব দেখাইতে দেখাইতে, সকল বস্তুরই একত্ব প্রমাণ করিতে করিতে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। এই জ্ঞান-ধারাকেও প্রেম-ধারার একটি শাখা বলিলাম, কারণ বাস্তবিকই ইহা প্রেম-সম্পৃক্ত। একবারে প্রেম-সম্পর্ক ভাব-সম্পর্ক শূন্য যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞানই নহে, তাহা কেবল শুষ্ক শূন্য জ্ঞান-গর্ব্বমাত্র। যে জ্ঞান হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, বিশ্বাস প্রদান করে, আত্মার বিস্তার করে, তাহাই যথার্থ জ্ঞান এবং তাহা প্রেম ও ভাবমিশ্রিত।

যুবকের বয়সের সঙ্গে এই জ্ঞান-ধারা ক্রমে অধিকতর প্রসারণ-শীল হয়, এবং অন্য দুইটির বেগ ও ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে, তখন তাহারা শীতল সাম্য মূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে। কীর্ত্তি-স্থাপনাভিলাষী যুবকের উদ্দাম উৎসাহ এখন ধীর স্থির বিজ্ঞতায় পরিণত হয়, প্রচণ্ড আবর্ত্তময় প্রমদানুরাগ এখন শান্ত আবেগ-হীন স্নেহ-রাশিরূপ ধারণ করে। স্রোতস্বিনী যখন সাগর-সঙ্গমের সন্নিকট হয়, তখন স্বভাবতঃই

তাহার বেগ কমিয়া যায়।—অবশেষে এই দুই পার্শ্ববর্তী প্রেম-প্রবাহ ধীরে ধীরে আবার মধ্য ধারার সম্মিলিত হইয়া যুক্ত বেণীর সৃষ্টি করে। এখন স্বজন-প্রেম, মানব-প্রেম, জীব-প্রেম, জগৎ-প্রেম, সমস্ত সম্মিলিত হইয়া এক দুকূল-প্লাবনী বিশ্ব-প্রেম-ধারায় পরিণত হইয়া—সর্ব্বময় ভগবৎ-প্রেমরূপ মহাসমুদ্রে নিপতিত হয়। তখন সে লোকের আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই পর থাকে না, সকলই আপনার;—পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-পৃথিবী, সাগর-ভূধর সমস্তই তাহার আত্মার সহিত এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া, তাহার সহিত এক পরিবার-ভুক্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে, পরস্পরের প্রতি চাহিতে চাহিতে, সেই ভগবৎপ্রেম সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে সেই ক্ষুদ্র শিশুর রক্ত-মাংসময় দেহ-পিণ্ড-নিরুদ্ধ "আমি"টি সলিল-নিষিক্ত তৈল-বিন্দুর ন্যায়, ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে সমস্ত জগন্ময় প্রসারিত হইয়া যায়।

ইহাই হইল প্রেম-বৃত্তির পূর্ণ ইতিহাস। প্রেমের এইরূপ ধারা-বাহিক এবং পূর্ণ বিকাশ অবশ্য অতি দুর্লভ। কিন্তু এইটি ইহার স্বাভাবিক প্রণালী। সামাজিক মনুষ্যমাত্রেই এই প্রেমের পথে নিশ্চয়ই—কতক না কতক অগ্রসর হইয়াছে। সামাজিক মনুষ্যের আত্মা সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিরুদ্ধ হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়ই কতকগুলি আত্মেতর বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি বিস্তৃত হইয়া থাকে। আত্মার এই বিস্তৃতি আমাদের চক্ষুগ্রাহ্য নয়, তাহা না হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম, মানব-সমাজের বহু লোকের আত্মার প্রেমরূপ বিস্তৃতি কেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র-দ্বারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সমগ্র সমাজটিকে যেন জমাট করিয়া একটি বিরাট সমাজ-আত্মার সৃষ্টি করিয়াছে। যেখানে ব্যক্তিগত প্রেম প্রবল, সেখানে এই সমষ্টি-সমাজ-আত্মার প্রভাব ও প্রচুর, আবার যেখানে প্রত্যেক লোকের প্রেম-বৃত্তি দুর্ব্বল এবং অদূরগামী, সেখানে সমষ্টি সমাজ-আত্মাও দুর্ব্বল হইবে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের এই প্রেম-বৃত্তির শক্তিতে অনেক পার্থক্য আছে। অধিক লোকেরই প্রেম পরিবার-সীমা অতিক্রম করিয়া আর উঠিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার সম্পূর্ণরূপে পরিবারগতাত্মও হইতে পারে না, একেবারে স্বার্থ-নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদের সহিত পশুর পার্থক্য অতি সামান্য। অনেকের প্রেম সপরিবার অতিক্রম করিয়া স্বদেশ-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যে সমাজের অধিক লোক এইরূপ, সেখানে একটি বিরাট জাতীয় আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে দেশের সকল লোকই সেই আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেন সকল লোক মিলিয়া যাইয়া একটি লোক হইয়াছে। আমরা অনেক সময়ে ইংরাজদিগকে স্বার্থপর বলিয়া উপহাস করি, বাপ ছেলের ঘরে দুই দিন খাইলে তাহার জন্য ছেলে বাপের কাছে বিল পাঠায়, বাকে বাপের পরিবার বলিয়া সাহায্য করিতে সন্তান ভার বোধ করে, ইত্যাদি রূপে অনেক উপহাসের কথা বলিয়া থাকি। কতকটা অবস্থার জন্য

এবং চরিত্রগত স্বাধীন ভাবের জন্ত ইংরাজের আমাদের তুলনায় এ দোষটি অনেক পরিমাণে থাকিলেও তাঁহাদের অতুল প্রভাবশালী স্বজাতি-প্রেম সকল দোষ হরণ করিয়াছে। আমরা যে গর্ব্ব করি, তাহা কেবল স্বপরিবার-গত প্রেমের। নিজ বাড়ীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের—প্রেম কচিৎ বাহির হয়; আর যদি হয়, তবে সে এরূপ ক্ষীণ ও সূক্ষ্মভাবে যে, তাহা অনেক সময়েই অনুভূত হয় না। ইংরাজ কিন্তু স্বজাতি-প্রেমের প্রেরণায় এমন স্বার্থ নাই যাহা ত্যাগ করিতে পারে না,কারণ সকল ইংরেজ এক বিরাট জাতীয়-আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইংরাজীতে নাগরিক (Citizen) বলিলে যে লোক-সমষ্টির অন্তর্ভূত একটি বিশেষ লোকের কতকগুলি সাধারণ স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের ভাব বুঝাইয়া দেয়, আমাদের মধ্যে সে ভাবটি অতীব দুর্ব্বল।(১)সেইরূপ ইংরাজীতে State বলিলে এক শাসনপ্রণালীর অধীনে রাজা হইতে সামান্ত প্রজা পর্য্যন্ত সকলকে অন্তর্গত করিয়া যে একটি সমগ্র লোক-মণ্ডলীর ভাব মনে হয়, সেটিও আমাদের নাই। (২) সেটি যে আজ আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন বলিয়া নাই তাহা নহে; সেটি আমরা পূর্ব্ব হইতেই হারাইয়াছিলাম। আজ কাল মিউনিসিপ্যালিটি—বলিয়া—নগরে নগরে এক একটি লোক সমষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে। নিজ আবাস নগরকে আমার বলিয়া ভাল বাসিয়া তাহার জন্ত কিছু কার্য্য করিতে ইহা শিক্ষা দেয়।—কাহারও নিজ বাড়ীতে কোন বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত হইলে তিনি যেমন যত্নের সহিত কষ্ট স্বীকার করিয়া সে কার্য্যের তদ্বির করেন, সেইরূপ যদি স্বনগর বা স্বপ্রদেশের কোন কার্য্যে নিঃস্বার্থ-ভাবে যত্ন করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার স্বপরিবারের ক্ষুদ্র সীমামা অতিক্রম করিয়া মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর করা হয় না?

প্রেম-প্রবাহের যে ত্রিধারা বর্ণনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে ধারা সাধারণ মানব-প্রেমের দিকে ধাবিত হয়, স্বগ্রাম-সেবা, স্বনগর-সেবা, স্বপ্রদেশ-সেবা প্রভৃতি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপ। এই ধাপে ধাপে চলিতে চলিতে প্রেমের বিস্তার আত্মার মহত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, স্বপ্রদেশ-প্রেম স্বদেশপ্রেম জাগরিত করিয়া দেয়, এবং তাহা হইতে মানবসাধারণ ও জীব-সাধারণের প্রতি অবশেষে ছড়াইয়া পড়ে। ভারত-

(১) তাহার প্রমাণ, আমাদের ভাষায় Citizen শব্দের ঠিক একটা প্রতিশব্দ নাই। গড়িয়া পিটিয়া এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়া "নাগরিক" এই শব্দটিতে ঐ ভাব্টুকু যদি আনিতে পারা যায়। 'নাগর' কিন্তু নহে; নাগর অন্তরূপ ব্যবহারে লাগিয়াছে। শিঃ পঃ সঃ।

(২) মহীয়র্ উইলিয়ম্স্ যে সকল অর্থ দিয়াছেন, তাহার কোনটিই এ স্থলে খাটে না। লেখক মহাশয়ের 'লোক-মণ্ডলী' অথবা প্রচলিত 'জনসাধারণ' শব্দ দ্বারা ক্রমে এ অভাব দূর হইতে পারে। শিঃ পঃ সঃ।

ঋষীয়গণ যে এক সময়ে—এই উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের—জীব-প্রীতি হইতেই বিশেষ অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল কয়জন এ দেশীয় লোকের এই ধারায় প্রেম-প্রবাহ ছুটিয়া থাকে? কিছুদিনের জন্য স্বজাতি-প্রেমের, স্বদেশ-বৎসলতার এক প্রকার ক্ষণিক পূর্ব্বাভাস শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় বটে। কিন্তু প্রেম-প্রবাহ যেখানে ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছে, সেইস্থানে পঁহুছিয়াই এই সকল ভাব সেই প্রথম বর্ণিত—ধারায় আবার বাঁকিয়া পড়ে, স্বদেশ-প্রেম, মানব প্রেমের ধারা, জ্ঞানের ধারা সকলই শুষ্ক হইয়া যায়, আর আজন্ম-প্রবাহিত সমগ্র সলিল-স্রোতই নিজ পরিবারের তোষণ ও পোষণ-রূপ ধারায় ছুটিতে থাকে! এইটিই তখন মূল স্রোতঃ হইয়া পড়ে, যত চলতী কার-বার, নৌকা-ষ্টীমারের যাতায়াত এইটি দিয়াই হইতে থাকে, আর বাকী সব মরা সোঁতা হইয়া যায়। ইহার সাগরসঙ্গম হইবে কিরূপে? স্বদেশ এবং মানব-প্রেম-ধারা ও জ্ঞান-ধারা প্রবাহিত থাকিলে তবে ত তাহাদের আকর্ষণে এই সপরিবারের তোষণ ও পোষণরূপ ধারা ক্রমে ক্রমে আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্ব-প্রেম-ধারায় পরিণত হইয়া ভগবৎপদ-প্রান্তে যাইয়া মিলিত হইবে? কিন্তু সে আকর্ষণ না থাকায় ইহা ক্রমে ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া পঙ্কিল, দুর্গন্ধময়, জঞ্জালময়, স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে যাইয়া মিলিত হয়। ক্ষুদ্রতার খোলস না খুলিতে পারিলে ত আর ভগবানকে পাওয়া যায় না। যে পরিমাণে ক্ষুদ্র আমি বৃহৎ আমি হইব, সেই পরিমাণে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতার খোলস খুলিতে, ক্ষুদ্র আমিকে বৃহৎ করিতে অসাধারণ প্রসারণ-শক্তিশালী প্রেমরূপ ষ্টীম ভিন্ন আর কোন শক্তি কি সমর্থ হয়? এই প্রেম-শক্তিই স্বার্থপর, পরস্পর বিবদ-মান, পশুতুল্য মানবকে পরিবার-প্রেমিক, পরিবার-প্রেমিককে স্বগ্রাম-প্রেমিক, স্বগ্রাম-প্রেমিককে স্বদেশ-প্রেমিক, স্বদেশ-প্রেমিককে মানব-প্রেমিক এবং মানব-প্রেমিককে বিশ্ব-প্রেমিক বা ভগবৎ-প্রেমিক করিয়া দেয়, ইহাকেই বলে তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণের বিকাশ। আবার যে দেশের অধিক লোকই স্বপরিবারকে ভাল বাসিতে পারে না, তাহা-দের অধিক লোক কখনও স্বদেশ-প্রেমিক হইতে পারে না, যে দেশের অধিক লোকই স্বদেশ ভালবাসে না, তাহাদের মধ্যে অধিক লোকে কখনও মানব-প্রেমিক হইতে পারে না। আবার যে দেশের লোক মানুষকে ভালবাসে না, তাহাদের মধ্যে অধিক লোক ভগবৎ-প্রেমিক হইতেও পারে না। সমা-কার বিশিষ্ট, সমসুখদুঃখী স্বজাতিকেই যে ভাল বাসিতে পারিল না, সে আবার অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় ভগবানকে কিরূপে ভাল বাসিবে? ভগবৎ-প্রেম মানব-হৃদয়-মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়া—ইহাতে একবারে লাফ দিয়া পৌছান যায় না। রীতিমত ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে, সুদৃঢ় সুদীর্ঘ স্তম্ভ উত্তোলন করিতে হইবে, একখানি একখানি করিয়া ইটের উপর ইট দিয়া গড়িতে

পড়িতে তবে এই চূড়ার নির্ম্মাণ হইবে। প্রেম বৃত্তির পূর্ণ ও ক্রমশঃ বিকাশই এই সকল ক্রিয়া। প্রেম-বৃত্তির বিকাশ করিতে হইলে আবার আমাদের অন্যান্য সমস্ত বৃত্তি গুলিরই অনুশীলন করিতে হয়। প্রেম আমাদিগকে স্বপরিবারের জন্য স্বদেশের জন্য, মানবের জন্য, ভগবানের জন্য যে সকল কার্য্যে ধাবিত করিবে, তাহার সকলেতেই জ্ঞান, বুদ্ধি, ধীরতা, কর্ম্ম-দক্ষতা প্রভৃতি সকল সদ্গুণেরই আবশ্যক করিবে। অতএব দেখা যায়, ভগবৎ-প্রেম সম্পূর্ণরূপে আমাদের সমস্ত মানস এবং শারীরিক বৃত্তি-গুলির সর্ব্বাঙ্গীন ও সামঞ্জস্য বিশিষ্ট উন্নতি ও বিকাশের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

জীবনের রঙ্গভূমে মানুষ দর্শক নয়,
ঈশ্বর দেখেন নিজে মানবের অভিনয়।

তৈল সহ মিশে তৈল, জলে মিশে জল,
সাধু সহ মিশে সাধু, খল সহ খল।

ধর্ম্মই ধর্ম্মের বল, সুখ-শান্তি-দ্বার,
সাধুতাই সাধুতার পূর্ণ পুরস্কার।

বিন্দু বিন্দু জল দিয়া অসীম সাগর,
পল অনুপল দিয়া কল্প কল্পান্তর।

কোটীপতি হইবারে যদি থাকে মন,
করিওনা কপর্দ্দকে অযত্ন কখন।

কলহে বিবাদে গল্পে দিন চলে যায়,
উন্নতির অবসর পাইবে কোথায়?

শাসিতে পারিনা নিজ ক্ষুদ্র পরিবার,
রাজার শাসনে ধরি কত ফের ফার।

শুধু বাক্যে সব কার্য্য হয় কি সাধন?
মশক করিতে নারে মাতঙ্গ মর্দ্দন।

আপনি হইতে বড় কে না বাঞ্ছা করে?
কদাচিৎ কেহ বড় লক্ষের ভিতরে।

ধনে কুলে বড় নহে, বড় হয় মনে;
ভোগে বেশে সুখী নহে, সুখী হয় জ্ঞানে।

বক্তৃতায় করে যেই স্বদেশ উদ্ধার,
পর-দ্বারে ভিক্ষা করে জননী তাহার।

নিরন্তর পূজা লাভে অভ্যাস যাহার,
বারেক বঞ্চিত হ'লে সর্ব্বনাশ তার।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

এই সকল বিদ্যালয়ে সচরাচর দুইজন করিয়া অধ্যাপক থাকেন; ইহঁাদের একজন গ্রীক্ এবং অন্যজন লাটিন্ পড়ান। বৃত্তিগ্রাহী বা নিয়মিত ছাত্র ছাড়া অনিয়মিত বহু সংখ্যক ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পড়ে। বার্লিন নগরের ভাষা-তত্ত্ব-শিক্ষালয় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে; এই সময়ের মধ্যে বেক্ বট্‌মান্ বার্ণহার্ডি, লাচ্‌মান্ এবং হাপ্ট্ ইহার অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছেন। বন্ নগরের বিশ্ববিদ্যালয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে, এবং নেক্, বেল্‌কার, রিট্‌শল্ এবং ওট্টোজান্ ইহাতে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছেন। অন্য দেশের ভাষা-তত্ত্ব শিক্ষার্থীগণ এই দুইটি নামের তালিকা পড়িলে তাহাদের মুখে জল আইসা বিচিত্র নহে।

উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের অভাব দূর করিবার জন্যই ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বন্ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রাকৃত-বিজ্ঞান-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এবং উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ইতিহাস শিখাইবার উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ নগরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে একটি ইতিহাস-শিক্ষালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিখাইবার বিশেষ উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য ব্রেস্‌লা, গ্রিফ্‌স্‌বল্‌ড্ এবং কোনিগ্‌স্‌বর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও ঐরূপ ইতিহাস-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বার্লিন্, কোনিগ্‌স্‌বর্গ এবং হেল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত এবং প্রাকৃত-বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্যও ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ভাষা-তত্ত্ব-শিক্ষালয় এবং ইতিহাস-শিক্ষালয়ের ন্যায় এই সকল বিদ্যালয়েরও উদ্দেশ্য তত্তদ্বিষয়ে বিশেষ উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করা।

সাধারণ বিদ্যালয়ে যাহারা ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবে, সেই সকল জর্ম্মনেরা ফরাসী দেশে বেড়াইতে যাইয়া এক বৎসর কাল সেই দেশে থাকিয়া তাহার ভাষা-শিক্ষা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে বার্লিনে আবার পর্য্যটন-বৃত্তি নামে এক প্রকার বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। বার্লিন নগরে ফরাসী ভাষার যে রাজকীয় বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ফরাসী ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য ৪৫ পৌণ্ড করিয়া দুই দুই বৎসরের জন্য দুইটি বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠা রাজকীয়। রাজা, সভা-সমিতি এবং অপসাধারণ ব্যক্তিগণ, সকলেই এইরূপ শিক্ষালয়ের স্থাপনকর্ত্তা। যতগুলি শিক্ষালয়ের কথা বলা হইল, তাহার কোনটিতেই বার্ষিক খরচ ১০০০ থেলার বা ১৫০ পৌণ্ডের অধিক নহে। অল্প খরচে প্রুসিয়াতে কত কাম হয়, তাহা ভাবিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়।

বার্লিন, কোনিগ্‌স্‌বর্গ, ব্রেস্‌লা, ষ্টেটিন্ এবং হেল্ নগরে শিক্ষকতা-শিক্ষার বিশেষ বিদ্যালয় আছে। ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ছাত্রকে শিক্ষা-ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করা; কিন্তু এই সঙ্গে তাহার মানসিক পরিকর্ষণ-কার্য্যে যাহাতে অবহেলা না হয়, তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীকে শিক্ষক-পদ প্রার্থনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, এবং কোন বিদ্যালয়ে

শিক্ষানবিশ না হইয়া সে এখানে দুই কি তিন বৎসর শিক্ষকের ব্যবসায় শিক্ষা করে। প্রত্যেক ছাত্রকে সপ্তাহে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় (বার্লিনে সাপ্তাহিক ৬ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট আছে।) কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে যাইয়া পড়াইতে হয়। এইরূপে যে বিদ্যালয়ে যাইয়া সে পড়ায়, সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমিতির অধিবেশনে তাহাকে উপস্থিত থাকিতে হয়, এবং এক জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের সঙ্গে তাহাকে বাস করিতে হয়। বার্লিনে শিক্ষকতা-শিক্ষার বিদ্যালয় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ছাত্রেরা প্রথমে একটিমাত্র জিম্‌নাসিয়মে যাইয়া পড়াইতে পারিত; ১৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে সকল জিম্‌নাসিয়মের দ্বারই তাহাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন তথায় ১০ জন বৃত্তিধারী আছে এবং তাহাদের বৃত্তিও বড় বড়; অন্যান্য যে সকল শিক্ষালয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তদপেক্ষা এখানে খরচও অধিক, বার্ষিক ২৩৯০ থেলার। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বেক্ এই বিদ্যালয় এবং অত্রত্য ভাষা-তত্ত্ব শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এইরূপে এক হস্তে এই দুই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা ন্যস্ত হইবার ফল এই হইয়াছে যে, সমগ্র জর্ম্মনীতেই ভাষাতত্ত্বে শিক্ষকের বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখা যায়। ষ্টেটিনে চারিজন বৃত্তিধারী আছে; তাহাদের বৃত্তিও বড়, আর তাহারা দুই কি তিন বৎসর কাল সেই বৃত্তি ভোগ করিতে পায়। এই শিক্ষালয় পোমারেনিয়া প্রদেশের উপকারের জন্য প্রতিষ্ঠিত; এই জন্য বৃত্তিধারিগণ এই সর্ত্তে বৃত্তি পায় যে, যখন তাঁহাদের বৃত্তি শেষ হইবে, তখন প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি তাহাদিগকে যেখানে পাঠাইবেন, সেইখানে যাইয়া তিন বৎসর কাল শিক্ষকতা করিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, প্রুসিয়াতে বৃত্তিসংখ্যা এত অধিক নহে যে বৃত্তিধারী দ্বারা সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ পূরণ করা যাইতে পারে। আবার দেখা গিয়াছে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদিগকে নানাবিষয়ে এত খাটিতে হয় এবং এতই ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, বৃত্তিধারীকে তাঁহাদের নিকট রাখিতে অথবা শ্রেণীতে তাহাকে স্থান দিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক। এই কারণে শিক্ষানবিশদিগের শিক্ষানবিশীর বৎসরেও তাঁহারা তাহাদিগের উপর যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে নূতন ব্রতিগণ বহুদর্শী শিক্ষকের সান্নিধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করে। এইজন্য প্রস্তাব হইতেছে, প্রাথমিক শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য আর নূতন বিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া কয়েক জন ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সে জন্য কিছু কিছু অর্থ দিয়া প্রত্যেকের নিকট অনধিক তিন জন শিক্ষানবিশ দুই বৎসর করিয়া রাখা, এবং এই সকল শিক্ষানবিশকে অবস্থা বিবেচনায় বৃত্তি দেওয়া। যোগ্যতর ব্যক্তিদিগকে এই উপায়ে শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্ব্বে দুই বৎসর কাল তাহাদের ব্যবসায় শিখাইতে পারা যাইবে এমন আশা করা যায়।

শিক্ষানবিশীর নিয়মিত সময় অতীত হইলে শিক্ষানবিশ কায পায়। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক-নিয়োগে রাজকীয় কর্ত্তৃত্ব অনিবার্য্য। রাজ-পরিপুষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে রাজার শক্তি অবিসম্বাদিত; অপসাধারণ-পরিপুষ্ট বিদ্যালয়ের পরিপোষকেরা শিক্ষক মনোনীত করিতে পারেন বটে, কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে কর্ত্তৃপক্ষ কারণ প্রদর্শন করিয়া তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন। শিক্ষা-সচিব কর্ত্তৃক রাজশক্তি পরিচালিত হয়, এবং রাজ-পরিপুষ্ট সমস্ত জিম্‌নাসিয়ম্‌ও রিয়েল্ স্কুলের প্রধান শিক্ষককে তিনি নিযুক্ত করেন। প্রাদেশিক শিক্ষাসমিতি শিক্ষা-সচিবের নামে এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে এই সকল বিদ্যালয়ের অপরাপর উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক এবং রাজ-পরিপুষ্ট প্রোজিম্‌নাসিয়ম্ ও উচ্চ বার্গার্ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। রাজ-পরিপুষ্ট বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি নিজ কর্ত্তৃত্বেই নিযুক্ত করেন। নাগরিক কিম্বা অপসাধারণ-পরিপুষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-নিয়োগে রাজকীয় সম্মতি এবং সচিবের মঞ্জুরি চাই; অপরাপর উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক-নিয়োগে সচিবের সম্মতি এবং প্রাদেশিক শিক্ষাসমিতির মঞ্জুরি প্রয়োজনীয়। অন্যান্য শিক্ষকের নিয়োগ সমিতিই মঞ্জুর করিতে পারেন, শিক্ষা-সচিবের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। সমস্ত শিক্ষককেই পদ-গ্রহণের সময়ে রাজকীয় বশ্যতার জন্য শপথ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রাজ-পরিপুষ্ট বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের নিয়োগ, উন্নয়ন বা স্থানান্তরীকরণের জন্য শিক্ষা-সচিব আদেশ করিলে প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য।

যাহা হউক, ফরাসী দেশের উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা-সচিবের যত ক্ষমতা আছে, প্রুসিয়াতে শিক্ষা-সচিবের তত ক্ষমতা নাই। ফরাসী শিক্ষা-সচিব উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে পদ-চ্যুত করিতে পারেন; প্রুসিয়ার শিক্ষা সচিব শিক্ষককে তিরস্কার করিতে পারেন, তাহার একমাসের বেতন বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু নিজের ক্ষমতায় তাহাকে পদ-চ্যুত করিতে পারেন না। বার্লিন্ নগরে রাজ কর্ম্মচারীদিগের বিচারের জন্য একটি বিচারালয় আছে, বার্লিনের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের চারিজন সভ্য দ্বারা এই বিচারালয় গঠিত; উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা কোন ঊর্দ্ধতন শিক্ষকের পদ-চ্যুতির বিচার ইহাঁদের নিকটেই হইয়া থাকে। এখানে বিচার হইয়া গেলে শিক্ষা-সচিবের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইতে পারে। এরূপ স্থলে শিক্ষা-সচিব দুইজন মধ্যস্থ মনোনীত করিতে বাধ্য, এবং এই দুইজনের মধ্যে একজন বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারী হওয়া চাই। ইহাঁরা যে মীমাংসা করিবেন, তাহাই চরম। নিম্নতন শিক্ষকদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতির নিকট তাহার বিচার হয়, এবং ইহাঁরাও উচ্চ বিচারালয়ের ন্যায় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন ও উকীলের

কৈফিয়ৎ জবাব শুনিয়া থাকেন। শিক্ষা-সচিবের নিকট ইহাঁদিগের নিষ্পাদিত মোকদ্দমারও পুনর্বিচার হইতে পারে; এই পুনর্ব্বিচারে শিক্ষা-সচিব একজন মাত্র মধ্যস্থ গ্রহণ করেন, কিন্তু রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে মধ্যস্থকে রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বিচারার্থ যে বিচারালয় আছে, তাহার মত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রুসিয়া এবং জর্ম্মনীর অন্যান্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়, শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ফরাসীদেশের মত যাহাতে অবাধে এবং যথেচ্ছরূপে কায না করিতে পারেন, তাহার যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। শাসন-বিভাগের যথেচ্ছাচার দমন করিবার এই আকাঙ্ক্ষা টিউটনিক জাতির স্বভাব-সিদ্ধ। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে জর্ম্মনীর প্রণালী-গত পার্থক্য থাকিলেও মূলে মিল রহিয়াছে; কিন্তু ফরাসী প্রণালীর সঙ্গে জর্ম্মন্ প্রণালীর যত নিবিষ্ট চিত্তে তুলনা করা যাইবে, ততই ইহাদের পার্থক্য অনুভূত হইবে।

বর্ত্তমান যুগের শাসন-প্রণালীতে একজন শিক্ষা-সচিবের নিয়োগ অপরিহার্য্য হইলেও ইহার যে সকল অসুবিধা আছে, তাহা গোপন করা কর্ত্তব্য নহে। গ্রন্থকারের বিবেচনায়, ফরাসীদেশের সাধারণ শিক্ষা-কার্য্য অত্যধিক পরিমাণে রাজ-নৈতিক প্রভাবে পরিচালিত। প্রুসীয় শিক্ষা-সচিবের কতকগুলি ক্ষমতা রহিয়াছে, এবং বিবিধ আদেশ-প্রচার দ্বারা তিনি সেই সকল ক্ষমতার পরিচালনও করিয়া থাকেন; কিন্তু ইংলণ্ডে সেরূপ করিলে সাধারণের বিরক্তি উত্তেজিত হইত। তিনি প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতিকে এই বলিয়া উপদেশ দেন যে, শিক্ষকদিগের বিদ্যা এবং অধ্যাপন-শক্তির যেমন কোন অভাব থাকিবে না, সেইরূপ তাহাদিগের প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোন দোষও থাকিবে না; শিক্ষক-পদ-প্রার্থীর ব্যবসান্তর্গত এবং ব্যবসায়-বহির্ভূত, এই উভয়বিধ আচরণ কিরূপ তাহা জানিতে হইবে; এবং যাহারা বালকদিগকে রাজা এবং রাজ-শক্তির প্রতি বশ্যতা শিক্ষা দিবে, কেবল তাহারাই শিক্ষক হইতে পারিবে।

জর্ম্মন্ শিক্ষা-সচিবের এই উক্তি ইংলণ্ডে কি ভাবে গৃহীত হইবে, লেখক তাহা জানেন; এবং বর্ত্তমান শিক্ষা-সচিব ডাক্তার ভন্ মুলার(১) রাজ-স্বার্থের অত্যন্ত পক্ষপাতী, একথা বলিলে যে আরও বিপদ হইবে, এ কথাও তিনি বুঝেন। ইংলণ্ডে সচিব-দিগের আচরণ সংযত রাখিবার জন্য যে সকল শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে সেখানে তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা খুব কম। যাহা হউক, লেখক যদিও এরূপ ভাষায় অনুমোদন করেন না, তথাপি তাঁহার বিশ্বাস, ইংলণ্ডের শিক্ষা-কার্য্যে যেরূপ অজ্ঞতা এবং অরাজকতা বিরাজ করে, তাহার তুলনায় শিক্ষা-সচিবের ঐরূপ ভাষা অধিক শোচনীয় বা অনিষ্টকর নহে। কিন্তু ভাষা এইরূপ হইলেও, ফরাসীদেশে শিক্ষার উপরে রাজ-নীতির যেরূপ প্রভাব, জর্ম্মনীতে তাহার কিছুই নাই বলিলেই হয়। গ্রন্থকার মনে করেন, ইংলণ্ডে শিক্ষার উপরে রাজ-

(১) ইনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হন।

নীতির যতটা প্রভাব আছে, জর্ম্মনীতে তাহার অধিক নাই। এ বিষয়ে আমূলতত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর জর্ম্মনীতে রাজনীতির বিশেষ পীড়াপীড়ি ছিল, এই পীড়াপীড়ির যখন খুব প্রাদুর্ভাব, গ্রন্থকার তখনই সে দেশে যান, এবং রাজ-শক্তির বিরুদ্ধাচারীদিগের সঙ্গে তিনি বিশেষরূপে আলাপ করেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রাজ-শক্তির যে ভাবে পরিচালনা হওয়া উচিত, তাহাই হইতেছে; সাহিত্য-বিজ্ঞানের স্বার্থ ছাড়া শিক্ষা-কার্য্যে কোন রাজকীয় স্বার্থ চালাইতে গেলে সাধারণ লোকে তাহা সহ্য করিবে না; আর এ সম্বন্ধে সচিবেরাও সর্ব্বদা সাধারণের মতের সহিতই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থকার শুনিতে পান, জনৈক প্রধান শিক্ষকের রাজ-নৈতিক মত অনুকূল নহে বলিয়া ডাক্তার ভন্ মুলার তাঁহার নিয়োগ নামঞ্জুর করেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে সেই শিক্ষকের দেখা হইলে তাঁহার মুখে তিনি শুনিলেন যে, ঐরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল; এ কথা তিনি আরও অনেকের মুখে শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনায় জনসাধারণ এবং জর্ম্মন্ উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য দায়ী প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, যাহাকে একটা নাগরিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতে শিক্ষা-সচিব অসম্মত হইয়াছিলেন, তাহাকে কয়েক মাসের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজ-পরিপুষ্ট অন্য এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতে তিনি বাধ্য হন। সেই শিক্ষক এবং আরও অনেকে বলিয়াছিলেন, রাজ-নৈতিক মতের জন্য তাঁহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার হইয়াছিল, প্রধান শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন শিক্ষকের নিয়োগে এরূপ ব্যবহার কখনও হইয়াছে বলিয়া কেহ জানে না।

ইহার কারণ এই যে, প্রুসীয়দিগের ন্যায় যখন কোন জাতি শিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তি কর্ষণের উপকারিতা বুঝিতে পারে, আর তাহাদের বিদ্যালয় গুলি সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী বলিয়া যখন তাহাদের বিশ্বাস হয়, তখন তাহারা অন্য কোন স্বার্থের অনুরোধেই এ উপকারিতা নষ্ট করে না; আর রাজ-নৈতিক প্রয়োজন বশতঃ অন্য সকল বিভাগে যে কোন পরিবর্ত্তন হউক না কেন, শিক্ষা-বিভাগে সে জন্য কোন পরিবর্ত্তনই হয় না। ফরাসী দেশে শিক্ষার উপকারিতায় জাতিগত বিশ্বাস জন্মে নাই, তত্রত্য বিদ্যালয় গুলিও তাহার অনুরূপ হয় নাই; সেখানে শিক্ষা অপেক্ষা রাজ-নীতি অধিকতর প্রবল, কাযেই বিদ্যালয়ের পরিচালনে রাজ-নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মোপদেশ যে শিক্ষা এবং পরীক্ষার একটি অংশ, এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। প্রুসিয়াতে প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক, এই দুই মত ধর্ম্মই রাজ বিধির অনুমত; সাধারণ বিদ্যালয় গুলিও হয় প্রোটেষ্টাণ্ট, নয় ক্যাথলিক, আর না হয় মিশ্রিত। কিন্তু রাজ-বিধিতে মিশ্রিত

বিদ্যালয়-সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং উভয় শ্রেণীর শিক্ষকই নিযুক্ত হইয়া থাকেন; তবে কোন্ বিদ্যালয়ে কোন্ সম্প্রদায়ের শিক্ষক সংখ্যা অধিক বা অল্প হইবে, অধিকাংশ স্থলেই প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা তাহা নির্দ্ধারিত হয়। বিদ্যালয় যে সাম্প্রদায়িক, তাহার উপাসনা ভজনা প্রভৃতি অবশ্য সেই সম্প্রদায়েরই অভিমত। যাহারা বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাহাদের নিয়োগসম্বন্ধে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের একমত হওয়া চাই। ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা বিদ্যালয়ের ধর্ম্মোপদেশ পরিদর্শন করিতে এবং তদ্বিষয়ে নিজের কোন মন্তব্য প্রাদেশিক সমিতিকে জানাইতে পারেন। যে শ্রেণীর যে শিক্ষক, সচরাচর ধর্ম্ম-শিক্ষাটি তাঁহারই কায, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যাঁহারা অধ্যাপন করেন, তাহাদের এ কায নহে। সচরাচর প্রোটেষ্টাণ্ট বিদ্যালয়ের ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধারণ শ্রেণীর লোক, কিন্তু ক্যাথলিক বিদ্যালয়ের ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যবসায়ী ধর্ম্ম-যাজক। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল সাম্প্রদায়িক ছাত্রই যাইতে পারে। কোন বিদ্যালয়ে ক্যাথলিকের সংখ্যা অধিক, কোনটিতে বা প্রোটেষ্টাণ্টের সংখ্যা অধিক; তবে ক্যাথলিকেরা ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে যাইতেই ভাল বাসে। কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ে যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র-সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে রাজাদেশে তাহাদের জন্য একজন স্বতন্ত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ইহাঁর খরচ সেই বিদ্যালয় হইতে দিতে হয়। গ্রন্থকার বন্ নগরের জিম্‌নাসিয়মে এই ব্যবস্থা দেখিয়াছিলেন। যখন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ছাত্রসংখ্যা অল্প হয়, তখন তাহাদের পিতামাতাকে নিজ ব্যয়ে তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়াতে লোক-সংখ্যা এইরূপ ছিল;—প্রোটেষ্টাণ্ট ১১,২৮৯,৬৫৫; ক্যাথলিক ৬,৯০১,০২৩; এবং য়িহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায় প্রায় ৩০০,০০০। সেই সময়ে প্রুসিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৬৬,১৩৫, তন্মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট ৪৬,৩৬৯, ক্যাথলিক ১৪,৯১৯, অবশিষ্ট য়িহুদি ৪,৮২০।

যে সকল সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্মের সংস্কৃত মতে চলেন, তাঁহারা সকলেই প্রোটেষ্টাণ্ট নামে অভিহিত হওয়াতে ইংলণ্ড অপেক্ষা এখানে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। রাজা আপনাকে 'খৃষ্টান' বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং হলণ্ড ও ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় ধর্ম্ম-শিক্ষায় নিরপেক্ষ থাকেন না। এই জন্য উভয় সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়েই ধর্ম্মশাস্ত্রের বৈধিক-সূত্রানুযায়ী শিক্ষা হয়।

প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক ভিন্ন আর কেহ খৃষ্টান বলিয়া গণ্য হয় না, এবং খৃষ্টান ভিন্ন য়িহুদি বা অন্য কেহ শিক্ষক নিযুক্ত হইতে পারে না। যে দেশে বিদ্যাবুদ্ধিতে উন্নত বহুসংখ্যক য়িহুদি বাস করে, সে দেশে এ নিয়মের ফল প্রত্যক্ষভাবেই অনুভূত হয়। প্রুসীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোন য়িহুদি ভৈষজ্য বা গণিতের অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস কিম্বা মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপনে তাঁহার অধিকার নাই। ফরসী দেশ এ সম্বন্ধে যুক্তি এবং ন্যায়-পরতার আদর্শ, এবং জর্ম্মণী ও ইংলণ্ড উভয় হইতেই উন্নত। সে দেশে রাজকীয় ধর্ম্ম-যাজক ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন্ ধর্ম্মোপদেষ্টা কি শিক্ষা দিলেন, তাহা কেহ দেখিতে যায় না।

এই সকল অন্তরায় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রুসীয় ব্যবস্থার বিরোধী। এ বিষয়ে প্রুসীয় মন্ত্রী-সভার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং আর দীর্ঘকাল এ সকল অন্তরায় থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

কোন শিক্ষক নিযুক্ত হইলে তিনি উর্দ্ধতন শিক্ষক বা সাধারণ শিক্ষক রূপে পরিচিত হন, নিম্নতন শিক্ষক বলিয়া কোন কথার ব্যবহার প্রুসিয়াতে নাই। উর্দ্ধতন শিক্ষকের এ উপাধির উল্লেখ তাঁহার নিয়োগ-পত্রেই থাকে। সর্ব্বোচ্চ দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীকে পড়াইতে পারিবেন বলিয়া যাঁহার নিদর্শন-পত্রে উল্লেখ থাকে, তিনিই উর্দ্ধতন শিক্ষক। কোন শিক্ষক নামে উর্দ্ধতন, কেহ বা পদে উর্দ্ধতন। যাঁহারা সাধারণ শিক্ষকরূপে দীর্ঘকাল কায করিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছেন, তাঁহারা নামে উর্দ্ধতন শিক্ষক বলিয়া পরিচিত; কিন্তু এই সম্মানের উপাধি পাইলেও, যে শ্রেণীকে পড়াইবার অধিকার তাঁহাদের নিদর্শন-পত্রে উল্লিখিত নাই, সে শ্রেণীকে তাঁহারা পড়াইতে পারেন না। নিয়ম এই যে, যে বিদ্যালয়ে সাতজন সাধারণ শিক্ষক আছে, সেখানে প্রধান শিক্ষক ছাড়া আর তিনজন মাত্র উর্দ্ধতন শিক্ষক থাকিতে পারিবে; কিন্তু যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা অধিক, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। যাঁহারা বিশেষ বিদ্বান্ এবং শিক্ষা-কার্য্যে বিশেষ-রূপে কৃতকার্য্য, শিক্ষা-সচিব তাঁহাদিগকে অধ্যাপকের সম্মানিত আখ্যা প্রদান করেন। প্রধান শিক্ষক অধ্যাপক আখ্যা পাইলে তাঁহার মর্য্যাদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পূর্ণ-পদ অধ্যাপকের তুল্য হয়; অপর কোন শিক্ষক এই আখ্যা পাইলে তাঁহার মর্য্যাদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের তুল্য হয়। এ স্থলে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে ইংলণ্ডে কোন কোন রাজকীয় পদবীর

ন্যায় জর্ম্মনীতে অধ্যাপক-পদবীরও নির্দ্দিষ্ট মানমর্য্যাদা আছে। জর্ম্মন্ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ইংলণ্ডীয় প্রধান শিক্ষকের যতটা সাদৃশ্য আছে, ফরাসী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ততটা সাদৃশ্য নাই; কিন্তু ইংরাজ প্রধান শিক্ষকের মত জর্ম্মন্ প্রধান শিক্ষককে প্রথম শ্রেণীর সমস্ত বিষয়ত পড়াইতে হয়ই না, সমস্ত প্রাচীন ভাষার অধ্যাপনও করিতে হয় না। অপরাপর শিক্ষক যে ভাবের শিক্ষক, জর্ম্মন্ প্রধান শিক্ষক সে ভাবের শিক্ষক নহেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের ন্যায় তিনিও যে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন না। সচরাচর তিনি যে বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই বিষয়েই প্রথমশ্রেণী এবং অপরাপর শ্রেণীতেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কার্য্য সমস্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান; তিনি তত্ত্বাবধান উপলক্ষে এক একটি শ্রেণীতে যতবার উপস্থিত হন, ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ততবার উপস্থিত হইতে পারেন না।

ইতিপূর্ব্বে অতি অল্প স্থলেই শিক্ষকের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল; কিন্তু শিক্ষকেরা ছাত্র-দত্ত বেতনের অংশ না লইয়া যাহাতে নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হয়, প্রুসিয়াতে এখন সেই ব্যবস্থা ক্রমেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এখন ছাত্র-দত্ত বেতন এবং বিদ্যাত্র সম্পত্তির আয় শিক্ষকদিগের ইচ্ছামত ব্যয়িত হইতে পারে না। বিদ্যালয়ের হিসাবে সমস্ত আয় এবং শিক্ষকদিগের বেতন লিখিত হয়; ব্যয় বাদে কিছু উদ্বৃত্ত হইলে তাহা স্বতন্ত্র তহবিলে জমা থাকে, এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তাহা ব্যয়িত হয়। খুব বড় বিদ্যাত্র সম্পত্তি অল্পই আছে; স্কুল্‌ফর্টা প্রভৃতি দুই এক স্থানে যাহা আছে, তদ্দ্বারা শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত করিবার চেষ্টা করা হয়; আর বার্লিন্ নগরের বিদ্যালয়ে ছাত্র-বেতনের পরিমাণ অধিক হওয়াতে সেখানেও শিক্ষকেরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতন পাইয়া থাকেন; কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সাধারণের নির্ব্বাচিত সভাদ্বারা নিয়মিত অথবা সাধারণের পরিদর্শনে চালিত; ইহাতে শিক্ষকদিগের কোন হাত নাই। স্কুল্‌ফর্টা বিদ্যালয়ের বার্ষিক আয় ৮০০০ পৌণ্ড; ইহার প্রায় ২০০০ পৌণ্ড শিক্ষকদিগের বেতনে যায়, এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্ত খরচপত্র নির্ব্বাহিত হইয়া প্রায় ঐ পরিমাণ অর্থই তহবিলে জমা থাকে।

জগতের শান্তি।

(২)

এইত পৃথিবীর বর্ত্তমান মান-চিত্র। এই মান চিত্র দেখিয়া কে এমন আশা করেন যে পৃথিবীর অশান্তি কখনও দূর হইবে? সৈন্য-সংখ্যার বৃদ্ধি নৌ-বলের দৃঢ়ীকরণ, নূতন নূতন মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কার, এ সকল শান্তি-বিস্তারের উপাদান নহে; শান্তি-বিস্তারের উপকরণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির জিনিস।

ইউরোপবাসীরা যে ইচ্ছা করিয়া শান্তি-বিরোধী, এমন কথা বলিতেছি না। তাঁহারা যখন কোন দেশের সঙ্গে বন্ধুতা বা বাণিজ্য-সংস্রব স্থাপন করেন, তখন হয়ত প্রকৃত শান্তির ইচ্ছাই তাঁহাদের মনে মনে থাকে। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতি-গত লোভ এবং প্রভুত্ব লিপ্সা এতই প্রবল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াও শান্ত থাকিতে পারেন না। ইউরোপীয়দিগের রাজ্য-বিস্তারের ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখা যায়, আগে বন্ধুতা পরে বৈরিতা, প্রায় সর্ব্বত্রই এই নীতি।

ইউরোপীয়দিগের প্রকৃতি এরূপ হইবার কারণ কি? একটি জন-সাধারণের প্রকৃতি-বৈশেষ্যের কারণ অবধারণ করা সহজ কথা নহে। দুই চারি কথায় তাহা প্রকাশও করা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহাদের সকল কার্য্যেই মানসিক প্রেম অপেক্ষা আসুরিক অপ্রেমেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সকল কার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্ম-কার্য্যেই বোধ হয় অধিকতর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বিপ্লবের সময়েই বোধ হয় সে পরিচয় দিবার বিশেষ সুযোগ হয়; কিন্তু ইউরোপের ধর্ম্ম-বিপ্লবগুলি বিশেষ প্রণিধানের সহিত পাঠ করিয়া দেখুন, তাহাতে সঙ্কীর্ণতা এবং আসুরিকতার যত উদাহরণ পাইবেন, উদারতা এবং প্রেমের তত উদাহরণ পাইবেন না। এই অপ্রেম এবং আসুরিকতা কি তাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে শিক্ষা দেয়? কখনই না। শত্রুকে ভালবাসিবার কথা নিজে যিশু বলিয়া গিয়াছেন, এবং নিজে শত্রুকে ভালবাসিয়া তিনি সেই উপদেশের উপাদেয়তা রক্ষা করিয়াছেন। তবে এ রক্ত-পিপাসা ইহাঁরা কোথা হইতে পাইলেন? আমাদের বোধ হয় নিজের প্রকৃতি হইতে। "ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রং পঠতীতি কারণং"—ধর্ম্ম-শাস্ত্র-পাঠে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। খৃষ্টানেরা বলেন, কিন্তু আপন রক্ত দিয়া মানবের জন্মাধিকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। জন্মাধিকৃত পাপ কি, তাহা আমরা জানি না; আর সেরূপ কোন পাপ থাকিলেও সে জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার তাঁহার কি অধিকার ছিল, তাহাও আমরা বুঝি না। তবে ইহা বুঝি যে, তাঁহার আত্ম-শোণিতে যে ক্রুশ কলঙ্কিত হইয়াছিল, বহু শতাব্দী

যুড়িয়া তাঁহার দানব-প্রকৃতিক শিষ্যেরা অনেক বিশ্বাসী সাধুর শোণিতে সেই ক্রুশ পুনঃ পুনঃ কলঙ্কিত করিয়াছেন!

ফলতঃ ইউরোপীয় জাতি নিবহের বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য যতই থাকুক, তাঁহাদিগকে দিয়া যে জগতের অশান্তি দূরীকৃত হইবে, এবং তাহার স্থানে প্রেম ও ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আশা হয় না। শারীরিক এবং মানসিক বলাবল পরীক্ষায় বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা অগ্রণী হইতে পারেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের বলে—প্রেম-প্রবণতায় অগ্রণী হওয়া তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই, —সে পথে বিধাতা বিমুখ, প্রকৃতি প্রতিকূল! কথায় কথায় বল-বিক্রমের গর্ব্ব করা, কথায় কথায় অসি নিষ্কষিত করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া যাঁহাদিগের স্বভাব, তাঁহারা কবে যে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, সে কথা বিধাতাই জানেন! খৃষ্টানদিগের কোন কোন সম্প্রদায় কোন কোন উৎসবে এখনও যিশুর রক্ত এবং মাংসের অনুকল্প-স্বরূপ মদ্য এবং রুটি খাইয়া থাকেন। গুরুদেবের রক্ত-মাংস ভক্ষণ করিয়া যে বিকট গুরু-ভক্তি প্রকাশ করা হয়, তাহার মূলে কোন রাক্ষসিক প্রথা বিদ্যমান ছিল কি না, তাহাই বা কে বলিবে?

শিক্ষার উপরে অনেক আশা, অনেক নির্ভর স্থাপন করা যায় বটে, কিন্তু শিক্ষাতে অসাধ্যসাধন হয় না। শিক্ষা প্রকৃতিকে মার্জ্জিত করে বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত দেখুন না কেন? পণ্ডিত মোক্ষমুলর সংস্কৃত-শাস্ত্রে পণ্ডিত। আজ কাল ইংরাজের মনে সংস্কৃতের প্রতি যদি কিছু শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, হিন্দু জাতিকে মানুষের মধ্যে গণ্য করিবার যদি কিছু ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তবে ইনি সে জন্য অনেক পরিমাণে ধন্যবাদ পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইনিও হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। বেশ বুঝিয়া যাইতেছেন, বেশ বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ এমন একটী কিন্তু বসাইয়া দিলেন যে সব মাটি করিয়া ফেলিলেন! একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কলির আরম্ভে। আমাদের পঞ্জিকা বলে, আর চারি বৎসর গেলে কলির পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ণ হইবে। এই হিসাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপ্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, ঘরে ঘরে পঞ্জিকা রাখা ভারতের চিরন্তন প্রথা; ঐতিহাসিক সময় নিরূপণে যে আবার অনুমান বা ইচ্ছা পূর্ব্বক বেশী কমী করিতে পারা যায়, ভারতবাসী তাহাও জানিত না। কিন্তু সেই দৃষ্ট প্রমাণ থাকিতেও উক্ত মহাত্মা অনুমান-তত্ত্ব লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এখনও তিন হাজার বৎসর অতীত হয় নাই, এই আশ্চর্য্য অনুমানের বলে ভারতবাসীকে অবাক্ করিলেন! আরও আশ্চর্য্য এই, ভারতবাসীর মধ্যে ইঁহার মতানুসারীর একেবারে অভাব নাই! এই পণ্ডিতের আর একটি অনুমান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তবে হিন্দু প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হইবে! হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু-প্রকৃতি যদি তিনি বুঝি-

তেন, তবে এমন অদ্ভুত অনুমান তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিত না। প্রাচ্য-ভাষার অপর পণ্ডিত মণিয়র্ উইলিয়ম্‌স্। বুদ্ধদেবের জীবন এবং ধর্ম্ম-সমালোচন করিতে যাইয়া ইনি বলিয়াছেন, বরাবর এক বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে বুদ্ধের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। যিনি রাজ্য ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, ধ্যান-ধারণা সমাধি দ্বারা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত, আর লেখকের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ!

শিক্ষায় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে না, প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের জন্য ক্রিয়া চাই। ইউরোপীয় জাতি-নিবহের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন না হইলে, তাঁহাদের হৃদয় হইতে আসুরিকতা ধৌত করিয়া না ফেলিলে তাঁহাদের কামানের মুখ বন্ধ হইবে না, জগৎও শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না।

ক্রিয়া চাই, কিন্তু ক্রিয়ার উপদেষ্টা কে? আর তাঁহারা যে সে উপদেশ গ্রহণ করিবেন, ক্রিয়া অবলম্বন করিবেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?

উপদেষ্টার অভাব নাই। দেব-প্রকৃতির আকর, জগতের শিক্ষা-দাত্রী, মানব-ধর্ম্মের প্রসূতি, মহর্ষিদিগের জননী ভারত-ভূমি আজিও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার বর্ত্তমান সন্তানেরা জ্ঞানহীন, বীর্য্যহীন, ক্রিয়াহীন বটে; কিন্তু তাঁহার চিরজীবী সন্তান কাল-জয়ী মহর্ষিগণ আজিও বর্ত্তমান আছেন, আজিও তাঁহার সেই অমরাত্ম ত্রিকালদর্শী সন্তানেরা জগতে পতিত ভারতের গৌরব রক্ষা করিতেছেন, উপদেশ চাহিলে আজিও তাঁহারা উপদেশ দিতে পারেন। ফলতঃ আর্য্য-মহর্ষিদিগের উপদেশ এখন আর স্থান-বিশেষ বা পাত্র-বিশেষে নিবদ্ধ নহে; এখন আর যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র বিচার নাই, জগতের সকল জাতির নিকটেই এখন সে উপদেশের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। অপাত্রে উপদেশ পড়িলে যে অনিষ্টের আশঙ্কা, তাহা যে প্রচুর পরিমাণে না হইতেছে, এমন নহে; তবে কচিৎ ইষ্টও দেখা যাইতেছে, এবং ভবিষ্যতে ইহার আরও যে ইষ্ট ফল ফলিবে, এমন আশাও হইতেছে।

মানুষ যতই পতিত হউক, তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। রাক্ষস-কুলের তরণীসেন (বিভীষণের কথা বলিতেছি না) এবং দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ এ বিষয়ে প্রমাণ। তাঁহাদের কথা মনে করিলে আশা হয়, একদিন দেব-দানবে কোলাকুলি হইবে, একদিন সুরাসুরে মিলামিলি হইবে, একদিন পৃথিবী শান্তি উপভোগ করিতে পাইবে।

প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের প্রধান উপায় আহারের পরিবর্ত্তন। সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক, আহার এই ত্রিবিধ। আর্য্যেরা যে আহারের ব্যবস্থা করেন, তাহা সাত্বিক গুণের বিবর্দ্ধক; ইউরোপীয় জাতিদিগের আহার রজোগুণ এবং তমোগুণের পরিপোষক। মধ্যমাংস-ভূয়িষ্ঠ, অপক্ক, অর্দ্ধপক্ক বা দীর্ঘকালের পক্ক সামগ্রী ইহাদিগের প্রকৃতিতে অতি প্রিয়। ইহাদের খাদ্য এবং প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। এই খাদ্যে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে না পারিলে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন

অসম্ভব। যাহারা কিছুকাল মাত্র মদ্য খাইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ঐ ওষধি ছাড়া কত কঠিন, নব-প্রবিষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসাদে এদেশে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন ঐরূপ খাদ্য বাল্যাবধি আহার করা যাঁহাদের বংশ-পরম্পরায় অভ্যাস, তাঁহাদের পক্ষে উহা পরিত্যাগ করা কতদূর কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে,ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। পাঠক হয় ত জানেন, ইংলণ্ডে কিছুকাল হইতে নিরামিষ-ভোজনের উপকারিতা প্রচার হইতেছে, এবং তথায় নিরামিষ-ভোজীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। আনিবেশান্ত এবং কর্ণেল্ অল্‌কট্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর আশা আরও দৃঢ় হইতেছে, জগতে প্রেম-প্রচারের দিন আরও নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে।

ফলতঃ ভারত-ভূমিই প্রেম এবং ধর্ম্মের জননী, ভারতবাসীই প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারের প্রকৃত পাণ্ডা। আর্য্যদিগের জন্য আর্য্য-ধর্ম্ম এবং অনার্য্যদিগের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতই প্রসব করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে খৃষ্টধর্ম্মের সম্মান এবং অভিমান এত অধিক, তাহাও যে ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত, সে প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে, কালে আরও পাওয়া যাইবে। অন্য জাতি প্রেম-প্রচারের অভিলাষী হইলেও বন্দুক এবং তরবারি তাহাতে প্রতিবন্ধক। যাহাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাণের মমতা অধিক, তাহারা তরবারির ভয়ে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু তরবারির সাহায্যে প্রেম-প্রচার অসম্ভব—যাহার হাতে তরবারি থাকে, তাহার মুখে প্রেমের কথা কেহ শুনিতে চাহে না। এখন বর্ম্মাবৃত ইউরোপের হাতে তরবারি, এখন সে বিজয়-মদে উন্মত্ত; এখন তাহার মুখে রাজ্য-বিস্তার এবং শক্তি-প্রচারের কথা শোভা পায় বটে; কিন্তু তাহার মুখে প্রেমের কথা শুনিলে লোকে উপহাস করিবে। ভারতবাসীর সে অন্তরায় নাই। তাহার হৃদয়ে জ্ঞান এবং প্রেম আছে, অথচ হাতে তরবারি নাই, সুতরাং তাহার মুখে প্রেমের কথা শুনিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও অনুকূল। ভারত এখন সিংহের করতলে অবস্থিত; এ সিংহ জীবিত থাকিতে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির অত্যাচার বলিয়া কোন ভয় নাই। জ্ঞান এবং প্রেমেই ভারতের প্রাধান্য, শৌর্য্য-বীর্য্য আত্ম-রক্ষার্থ অবান্তর বিষয় মাত্র। বাড়ীর কর্ত্তা দ্বারে প্রহরী রাখিয়া নিশ্চিন্তে প্রাসাদে বসিয়া জ্ঞানের চর্চ্চা করেন, প্রেমের আদান-প্রদান করেন, শান্তি উপভোগ করেন। ব্রাহ্মণ যখন ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা এবং প্রকৃত পরিচালক ছিলেন, তখনও তিনি অস্ত্র-ধারণে হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই,—ক্ষত্রিয়ের হাতে প্রহরিত্ব দিয়া তিনি জ্ঞান-ধর্ম্মেরই উন্নতি করিয়াছেন। সেই সকল ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, বীর্য্য এবং রাজ্য দীর্ঘকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের সেই জ্ঞান-ধর্ম্ম আজিও ভারতকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ভারত ভিতরে প্রকৃতিতে যাহা ছিল, আজিও তাহাই

আছে, কেবল বাহিরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র—কেবল হস্ত হইতে হস্তান্তরে তাহার প্রহরার ভার অবতারিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রেম-বিস্তারে কেবল ব্রাহ্মণেরই অবসর ছিল, এখন ঈশ্বরের কৃপায় ভারতবাসী মাত্রেরই সে অবসর হইয়াছে; ব্রাহ্মণ কেবল ভারতবাসীরই ব্রাহ্মণ, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের এই অনুকূল বাতাস উপেক্ষা না করিলে ভারতবাসী জগতের ব্রাহ্মণত্ব—জগতের পৌরাহিত্য গ্রহণ করিতে পারেন। এই জন্যই—বোধ হয় জগতের ঘোর অশান্তি ঘুচাইয়া প্রেম বিস্তার করিবার জন্যই বিধাতা ইংরাজকে ভারতে পাঠাইয়া ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, সীমান্তে যুদ্ধ লাগিয়াছে; একটি বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতে যাও দেখি? যাহাকে স্পর্শ করিলে তুমি আপনাকে অপবিত্র মনে কর, সেও একটি চড় দিয়া তোমার বন্দুকটি কাড়িয়া লইবে, অধিকন্তু বিধি-ভঙ্গের অপরাধে তোমাকে বিচারালয়ে বা দণ্ডালয়ে উপস্থিত করিবে; কিন্তু প্রেম-প্রচারের ব্রত লইয়া রিক্তহস্তে পৃথিবীর বড় বড় প্রতাপশালী সম্রাটদিগের নিকটে যাইয়া জ্ঞানের কথা, ধর্ম্মের কথা, শান্তির কথা, প্রেমের কথা বল, আদর পাইবে, অভ্যর্থনা পাইবে, ব্রত-ফল লাভ করিবে।

ভারত হইতে প্রেম শান্তির স্বর্গীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য সভ্য জগৎ যে প্রস্তুত হইতেছে, অশান্তির কোলাহলে বধির না হইয়া ধীর ভাবে চিন্তা করিলে তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইবে। ভারতবাসী আর্য্যতনয়! এ সুযোগ ছাড়িও না, বিধাতার এ নির্দেশ অবহেলা করিও না। তোমার জন্যই—পদাহত ধূলি-কণাকে শিরোদেশে তুলিয়া দিবার জন্যই বিধাতা এ সুযোগ আনিয়া দিয়াছেন, জগৎকে শান্তিসলিলে স্নাত এবং প্রেমামৃতে পরিতৃপ্ত করিবার এ সুযোগ ছাড়িও না।

কিন্তু ব্রত বড় কঠিন। জগতের দেবদানবকে প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া পৃথিবীর অশান্তি দূর করিবার ব্রত কেবল দেবতারই সাধ্য, কেবল মহাশক্তি মহর্ষিদিগেরই সম্পাদ্য। অতএব আগে সেই শক্তি লাভ কর, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক, এই চতুর্ব্বিধ শিক্ষা দ্বারা আগে দেবতা হও, মহর্ষি হও, তাহার পরে জগতের শিক্ষা-গুরুর পদ-প্রত্যাশী হইও, জগতের প্রেম-শান্তি-বিধানে আকাঙ্ক্ষা করিও। এই চতুর্ব্বিধ শিক্ষা হইতে যে চারি প্রকার শক্তি জন্মিবে, তাহাতেই মানবের ভবিষ্যবংশের আশা। শিক্ষা ধনের জন্য নহে, শিক্ষা দম্ভের জন্য নহে, শিক্ষা দাসত্বের জন্যও নহে—এই চতুর্ব্বিধ শক্তি লাভ করিয়া উন্নত হওয়া, প্রকৃত মানুষ হওয়া, এবং জগৎকে অশান্তির হস্ত হইতে মুক্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর্য্যগণ! আপনারা চিরদিন বাগ্দেবীর সেবক, শক্তির উপাসক—জগতের মধ্যে শাক্ত নাম কেবল আপনাদিগেরই আছে। আপনারা নিজের মহত্ব ভুলিবেন না, জাতীয় উদ্দেশ্য ভুলিবেন না—পদ-তলে পড়িয়া ধূলি ধূসরাঙ্গ হইয়াছেন বলিয়া আশা ছাড়িবেন না। অশান্তিপীড়িতা মাতা ধরিত্রী আপনাদের মুখের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন,

আপনারা বাগেদবীর বরে শক্তি প্রাপ্ত করিয়া —শিক্ষাদ্বারা উপযুক্ত হইয়া, ক্ষান্তি, ধৈর্য্য, প্রেম, উদারতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া অগ্রসর হউন, মা আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ঈশ্বর আপনাদিগের সহায় হইবেন।

মহাভারতের গল্প।

(ন্যায়পরতা)

(২)

একদা দৈত্য-পতি প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং ঋষি-প্রবর অঙ্গিরা-তনয় সুধন্বার মধ্যে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কি রাজা শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইল। বিরোচন বলিতেছেন,রাজা শ্রেষ্ঠ। সুধন্বা বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা তর্কের মীমাংসা করিতে না পারিয়া মধ্যস্থ মানিতে বাধ্য হইলেন। উভয়ের মধ্যে এই পণ স্থির করিলেন যে, যিনি ন্যায়-বিচারে পরাজিত হইবেন, তাঁহারই প্রাণ দণ্ড হইবে। তৎপর কোন্ সাধু পুরুষ-সন্নিধানে বিচার প্রার্থনা করিতে হইবে। বিরোচন বিপ্র-নন্দনকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুধন্বা বলিলেন, "তোমারি পিতার নিকটেই বিচার প্রার্থনা করিব।" তখন উভয়ে দৈত্য-পতি প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সুধন্বা দৈত্য-রাজ-সমীপে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন।

প্রহ্লাদ সুধন্বার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি সত্য বাক্য বলি, তাহা হইলে আমার পুত্রের প্রাণদণ্ড হয়, আর মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে আমাকে নিরয়ে গমন করিতে হইবে। এখন উপায় কি? তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মহর্ষি কশ্যপের নিকটে উপদেশ চাহিলেন। মহামনা কশ্যপ কহিলেন, "লোক তাপিত হইয়া সভায় আগমন করিলে সাধু মহাজনগণ ন্যায়-বিচার করিয়া তাহাকে তৃপ্ত করেন। যিনি সভাতে উপস্থিত থাকিয়া ন্যায়ত বিচার না করেন, নিশ্চয় তাঁহার অধোগতি হয়। অন্যায়কারী ইহলোকে প্রতিনিয়ত ক্লেশ পায় এবং অবিলম্বে তাহার পুত্র-শোক ও অর্থ-শোক উপস্থিত হইয়া থাকে। অধার্ম্মিকের পক্ষ হইয়া যিনি তর্ক করেন, পাপের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে আশ্রয় করে, আর যিনি অধার্ম্মিককে জানিতে পারিয়া তাহার নিন্দাবাদ না করেন, তিনি পাপের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করেন। যিনি সাক্ষী হইয়া পক্ষপাত করেন,তাঁহার শত পুরুষ পর্য্যন্ত নরক ভোগ করেন।"

দৈত্য-পতি প্রতিভা-সম্পন্ন কশ্যপ-স্থানে প্রাগুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্থির করিলেন, ধন, জন ও যৌবন, এই গুলি ক্ষণস্থায়ী, ইহার জন্য কখনও সত্য পথ-ভ্রষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে, সুতরাং পুত্রকে কহিলেন, "যাঁহাকে আমি বন্দনা করি, তিনিই শ্রেষ্ঠ। সুধন্বা ব্রাহ্মণ, তোমার সমস্ত, অতএব তিনি

তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমা হইতে মুনিবর অঙ্গিরা শ্রেষ্ঠ। তোমার জননী হইতে সুধন্বার জননী শ্রেষ্ঠা।" তৎপর সুধন্বাকে কহিলেন, "দ্বিজবর! এখন বিরোচন আপনার সম্পূর্ণ অধীন, তাহার জীবন-মরণ আপনার হাতে, আপনার যাহা অভিপ্রেত হয় করুন।" সুধন্বা কহিলেন, "আপনি যে অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া ন্যায়-মার্গচ্যুত হয়েন নাই, আপনি যে সত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, আমি ইহাতে নিরতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। আপনার পুত্র বিরোচন দ্বিগুণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক। ইহার প্রতি আমার কোন হিংসা বা দ্বেষ রহিল না।" তখন সভাস্থ সকলে সুধন্বার ক্ষমাগুণের ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করিলেন।

তৎপর সুধন্বা প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক যথাবিধি সম্পূজিত হইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

শ্রীদিনকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নূতন পঞ্জিকা।—সন ১৩০২সাল। কবিরাজ শ্রীনিশিকান্ত সেন কবিভূষণের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের প্রশংসাপত্র সম্বলিত ঔষধাদির মূল্য-নিরূপণ তালিকা। বিনা মূল্যে বিতরিত। কেবলমাত্র এক আনা ডাকমাশুল লাগিবে।

বিজ্ঞাপনাদি বাদ দিলেও পঞ্জিকা খানির পরিমাণ ২৫৫ পৃষ্ঠা, সুতরাং ফাকি নহে, ইহা দ্বারা গৃহস্থদিগের দৈনিক পঞ্জিকার প্রয়োজন সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবে।

শিশুরঞ্জন-পাটীগণিত— প্রথম ভাগ, সচিত্র। বিবিধ প্রসিদ্ধ গণিতগ্রন্থ প্রণেতা এবং ঢাকা কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীকালিপদ বসু এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা ৭৬। ১ হারিসন রোড, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার ২৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রকৃত প্রতিভা যাঁহার আছে, তিনি নিতান্ত পুরাতন বিষয়েও নূতন পথ দেখাইতে পারেন, নিতান্ত জটিল বিষয়কেও সরল এবং সহজ করিতে পারেন, নিতান্ত নীরস এবং বিরক্তিকর বিষয়কেও সরস মনোহর করিতে পারেন। কিন্তু মানবের দুর্ভাগ্যক্রমে জগতে প্রতিভা বিরল, সুতরাং প্রতিভাপ্রসূত ফলও বিরল।

সুখের বিষয়, সমালোচ্য গ্রন্থ খানিতে গ্রন্থকার প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। পাটীগণিত এমন সুন্দর, সরল এবং সরস হইতে পারে, কালিপদ বাবুর শিশুরঞ্জন পাটীগণিত দেখিবার পূর্ব্বে আমাদের সে ধারণা ছিল না।

ইহাতে সংখ্যা গণন লিখন ও পঠন এবং পাটীগণিতের প্রথম অমিশ্র চারিনিয়ম বিবৃত হইয়াছে মাত্র; ইহাতেই ২৬৭টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্দ্বারাই বুঝা যাইবে, শিশুদিগকে গণিত বুঝাইতে গ্রন্থকার কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। সংখ্যা গণন-শিক্ষার জন্য যে সকল সুন্দর সুন্দর বহুবিধ ছবি দিয়াছেন, তাহাতে সংখ্যা-গণন-শিক্ষার সঙ্গে শিশু এক অপূর্ব্ব আমোদ পাইবে। চারি বৎসরের শিশুকে পাটীগণিত শিক্ষা এতদিন একরূপ অসম্ভব ছিল, কালীপদ বাবুর কৃপায় এখন তাহা সম্ভব হইল।

ইহাতে অনেক সুন্দর সহজ বোধ্য নিয়ম

প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই চারিটা উদ্ধৃত করিতে পারি, এমন স্থান আমাদের নাই।

সুপ্রসিদ্ধ শুভঙ্করের অনুকরণে যোগ-বিয়োগাদির নিয়মগুলি আর্য্যা অর্থাৎ পদ্যে লিখিত হইয়াছে। শিক্ষকেরা আগে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুদিগকে নিয়মগুলি শিখাইয়া পরে যদি এই পদ্য গুলি মুখস্থ করান, তাহা হইলে তাহাদের স্মরণ শক্তির বিশেষ সাহায্য হইবে।

"যাহাতে কোমলমতি বালকবালিকাগণ আমোদের সহিত শিক্ষালাভ করিতে পারে, এবং শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে অঙ্ক শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে," গ্রন্থকার "তজ্জন্য বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম" করিয়াছেন, এবং তাঁহার যত্ন পরিশ্রম সফলও হইয়াছে। আমরা অচিরেই বঙ্গের ঘরে ঘরে তাঁহার পুস্তকের আদর দেখিয়া সুখী হইব।

ধরণী।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। সম্পাদক শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। আকার ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

আমরা এই নূতন পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। ইহার নির্ব্বাচিত বিষয় এবং লিখন-প্রণালী উভয়ই উৎকৃষ্ট।

প্রভা—মাসিক পত্র ও সমালোচন। [illegible] হইতে শ্রীসাম্ব্রাচরণ মিদ্যা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার ডিমাই ৮ পেজী ২ ফর্ম্মা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। লেখা মন্দ নহে, ভ্রাতৃ-স্নেহের গল্পটি সুন্দর হইয়াছে। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র পাইয়াছি। পত্রিকা খানিকে স্থায়ী হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

কবিতা-কলাপ।—(নীতি মূলক কতিপয় পদ্য প্রবন্ধ) শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজী ৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা মাত্র। নির্ব্বাচিত নীতি-মূল বিষয়গুলি ভাল, বালকদিগের পাঠোপযোগী; কিন্তু লিপি-কৌশলের অভাব বশতঃ গ্রন্থকার উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

সখা ও সাথী—পূর্ব্বে সখা বাহির হইত, পরে সাথী বাহির হয়। ১৩০১ হইতে উভয়ে মিলিয়াছেন। সখা ও সাথীর উদ্দেশ্য ভাল, লেখাও উৎকৃষ্ট—সরল, শিক্ষাপ্রদ এবং স্থানে স্থানে আমোদজনক। কিন্তু এ আবার কি—কোমলমতি বালকদিগের কাগজে আবার "আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড" কেন? অমৃত মণ্ডিত বিষের টোব দিয়া যাঁহারা গ্রাহক ধরা সুবিধা মনে করিয়াছেন, তাঁহারা ধরুন; কিন্তু নির্ম্মল-হৃদয় নিষ্পাপ বালকদিগের জন্য এ ফাঁদ কেন? সংসার এবং কালের সমাজই এ বিষয়ে বালককে শিক্ষা দিবে, তাহাতে আবার সাহায্যের প্রয়োজন কি? আমাদের বিনীত নিবেদন, সখা এবং সাথীর সুশিক্ষিত এবং সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আমাদের উপর বিরক্ত না হইয়া কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

দাসী।—দাসাশ্রমের মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ। আকার ডিমাই ৮ পেজী ৫৬ পৃষ্ঠা। সর্ব্বত্র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

বর্ত্তমান চতুর্থ ভাগে দাসীর আকার বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা উন্নতিরই লক্ষণ। দাসীর লেখা এবং দাসাশ্রমের কার্য্য উভয়ই বিশেষ সন্তোষ-জনক।

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩০২ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

বঙ্গসাহিত্যের চরম দুর্গতি।

আমরা দুইটি কারণে সমালোচনের উপর কিছু নারাজ। প্রথম কারণ, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে না পারিলেই বিপদ! লেথকেরা প্রায়ই আপন আপন লেখাকে বেদ পুরাণাদির ন্যায় অভ্রান্ত মনে করেন, মুখে বিনয় প্রকাশ করিলেও মনে মনে সে ভাবটা থাকিয়া যায়, সুতরাং কেহ কোন দোষ দেখাইয়া দিলে তাঁহারা চটিয়া যান, এবং সমালোচককে চিরশত্রু বলিয়া চিনিয়া রাখেন! কাম কি নিরর্থক এ শত্রুতা অর্জ্জন করিয়া? যাহার আয়ুঃ আছে সে বাঁচিবে, যাহার গুণ আছে সে আদর পাইবে, যাহার কিছুই নাই সে আপনা হইতে অনাদরে মরিয়া যাইবে; তবে কায কি নিরর্থক শত্রু-বৃদ্ধি করিয়া? বোধ হয় এই কারণেই বঙ্গায় সাহিত্য-পরিষদ সমালোচনার ভারটা গ্রহণ করেন নাই। কাযটি ভালই হইয়াছে; পরিষদকে স্থায়ী করিতে হইলে এই অবশ্যম্ভাবী আত্ম-দ্রোহের বীজ বপন না করাই কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গালা সাহিত্যে আদৌ জিনিসই নাই, তবে সমালোচন কিসের? আগে জিনিস, পরেত সমালোচন? আগে প্রকৃত জিনিসের উৎপত্তি হউক, পরে সমালোচন বা সমালোচকের অভাব থাকিবে না। নবাঙ্কুরিত সাহিত্যের মস্তকে সমালোচনের গুরুভার চাপিলে তাহা বাড়িতে পারিবে কেন? এখন আগাছা কুগাছা যত পারে জন্মিতে থাকুক, কালে আগাছা সব পুড়িয়া যাইবে, থাকিতে কেবল সুগাছাই থাকিবে। সত্য বটে প্রকৃত সমালোচনা নব-রোপিত বৃক্ষ-মূলে জল-সেকের ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু সমালোচককে শত্রু মনে না করিয়া তাহার কথায় ভ্রম সংশোধন করিলেত সে উপকার? নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাসূচক সমালোচনে কিছু মাত্র উপকার নাই। এপর্য্যন্ত স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের সমালোচনা যত জনে করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই শ্রেণীর সমালোচক। তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসায় বঙ্কিম চন্দ্র নিজে মনে মনে লজ্জিত হইতেন কি না জানি না; কিন্তু এইরূপ স্তুতি-মূলক সমালোচনে যে তাঁহার অনিষ্ট হইয়াছে,

গুণের সঙ্গে দুই একটা দোষের উপরে সমালোচকের চক্ষু পড়িলে বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন বঙ্কিমচন্দ্র যে উজ্জ্বলতর হইতে পারিতেন, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু অনেক সময়ে সমালোচন একটা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। আজ আমরাও একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই প্রবন্ধটি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

গত বৈশাখের জন্মভূমিতে "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" শীর্ষক ৪০ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধের সৌভাগ্যবান্ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত। হারাণ বাবু "বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর স্থান" এবং "ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র" নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজী নামে পরিচিত দুই সভা হইতে দুইটি পদক (স্বর্ণ কি রৌপ্য জানি না) পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। লেখক সৌভাগ্যবান্, কেন না, তিনি দুই দুইটা পদকে পুরস্কৃত। কিন্তু পুরস্কর্ত্তাদিগকে কোন্ বিশেষণে অলঙ্কৃত করিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাঁহারা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদ-দলিত মাতৃভাষার প্রবন্ধ লেখককে পদক দ্বারা সম্মানিত করিতে জানেন, তাঁহাদের আসন লেখকেরও উপরে, তাঁহারা সমগ্র জাতির ধন্যবাদার্হ। হারাণ বাবু ঐ দুইটি প্রবন্ধকে এক করিয়া জন্মভূমিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই একীকরণ-সময়ে তিনি কোথাও "পরিবর্ত্তিত" করিয়াছেন, কোথাও "পরিবর্দ্ধিত" করিয়াছেন; সুতরাং তিনি ততটা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও আমরা বুঝি, এই উপলক্ষে তিনি বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত প্রবন্ধটির স্থানে স্থানে যথাশক্তি যথোচিত পরিমার্জ্জিত এবং পরিশোধিতও করিয়াছেন। এহেন প্রবন্ধের একটা সমালোচনা হওয়া কি উচিত নহে? আমরা কল্পনার চক্ষু কর্ণে দেখিতেছি শুনিতেছি, সভাস্থলে করতালির উপর করতালি পড়িয়া বক্তাকে উৎসাহিত করিতেছে, "এমন হয় নাই হবে না, শুনি নাই শুনিব না," ইত্যাকার প্রশংসা-বাদের প্রত্যেক বর্ণ বক্তাকে পুরস্কৃত করিতেছে। তাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বজন প্রশংসিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই না তিনি পুরস্কার পাইয়াছেন? সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধটি বঙ্গভাষার প্রকৃত অবস্থার পরিজ্ঞাপক। এক জন বিদেশী যদি বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে চাহেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রবন্ধটি সর্ব্বাগ্রে পড়িবেন। এই সকল কারণেই বর্ত্তমান-পুরস্কৃত প্রবন্ধটি কেমন হইয়াছে আমাদিগকে দেখিতে হইল।

সুখের বিষয় প্রবন্ধ লেখক সমালোচনে বিমুখ নহেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই তাঁহাকে "বিশেষ করিয়া" বলিয়াছেন, "যদি সাহিত্যের যথার্থ উপকার করিতে চাও তবে প্রকৃত সমালোচনা করিতে সুরু কর;—ইহাতে তোমার ঐ * * মাসিক পত্রিকা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"

(বৈশাখের জন্মভূমি, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

লেখকের "ঐ * * * মাসিক পত্রিকা" তে কিরূপ সমালোচনা বাহির হইত, তাহা আমরা জানি না; তবে সমালোচ্য প্রবন্ধের স্থানে স্থানে "প্রকৃত সমালোচনা সুরু" করিয়া তিনি বঙ্কিম বাবুর সম্মান রাখিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত দেখুন ;—"আজিকার দিনে সাহিত্যের ভিতর যে এত কণ্টক আবর্জ্জনা জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে, তাহার প্রধান কারণ প্রকৃত সমালোচকের অভাব, বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী সমালোচকের অভাব। সমালোচকরূপ দক্ষ মালীর অভাবে বঙ্গদর্শনের সেই 'সাজান বাগান' শুকাইয়া যাইতেছে। কেহ কাহাকে মানে না,—সম্ভ্রম-ভয়-সঙ্কোচের চক্ষে কেহ কাহাকে দেখেও না। তাই সুকুমার-সাহিত্য-কাননে আগাছা-কুগাছা-কণ্টক-আবর্জ্জনার এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, অনেক কার্য্য করিয়া, অনেক বেগ পাইয়া, পায়ে কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলে, তবে এক আধটা ভাল ফুল তুলিতে পারা যায়।" (ঐ, ঐ) কোন্‌টি যে আগাছা আর কোন্‌টি যে আগাছা নয়, তাহা কেমন করিয়া জানিব, কথাটা একটু বলিয়া দিলে বোধ হয় ভাল হইত। যাহা হউক, প্রবন্ধকারের অভয়-দানে আমাদের কর্ত্তব্য-পালন আরও সহজ হইল।

প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ বা স্বস্তিবাচন এই—"বিশীর্ণা স্রোতস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে ছিল। তেমন উন্মাদ আবেগ, উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গ-ভঙ্গ, কূলপ্লাবী চাঞ্চল্য,—কিছুই দৃষ্ট হইত না। বৃন্তচ্যুত, বিশুষ্ক পুষ্প যেমন নিঃশব্দে ভূপতিত হয়, স্রোতস্বতীর গতি তেমনি শব্দহীন, প্রাণহীন,—অথচ কেবল আকর্ষণের বলে গতিমাত্রে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইতেছিল। পথিক তৃষিত প্রাণে স্রোতস্বতী-পানে ছুটিতেছে,—তৃষা মিটিতেছে না,—আকুল প্রাণে ফিরিয়া আসিতেছে। পিপাসা যত বাড়িতেছে, প্রাণে ব্যাকুলতা ততই উদ্রিক্ত হইতেছে।"

এস্থলে প্রথমই দেখুন, "আবেগ," "তরঙ্গ-ভঙ্গ" এবং "চাঞ্চল্য" এই তিনটি বিশেষ্যের যথাক্রমে তিনটি বিশেষণ আছে, যথা—"উন্মাদ' "উচ্ছৃঙ্খল" এবং "কূলপ্লাবী"; কিন্তু "উন্মাদ" শব্দটি কিছুতেই বিশেষণ হইতে পারেনা। তাহার পরে পুষ্পের সঙ্গে নদীর তুলনা আশ্চর্য্য কল্পনা! পুষ্পের সঙ্গে নদীর সাদৃশ্য কোথায় বলুন দেখি? ভাবে বোধ হয় লেখক গতিতে এই সাদৃশ্যের আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের গতি কি তুল্য? নদী দিবা রাত্রি একটানা চলে, কিন্তু ফুলটি খসিয়া টুক্ করিয়া পড়িয়াই থামে। আবার দেখুন, নদীর গতি জীবনের চিহ্ন—বহতা নদীই জীবিত, কিন্তু পুষ্প না মরিলে বৃন্তচ্যুত হয় না—খসিয়া পড়ে না। কিন্তু আমার ভুল হইয়াছে, লেখক নদীর সঙ্গে পুষ্পের তুলনা করেন নাই, তিনি নদীর গতির সঙ্গে পুষ্পের তুলনা করিয়াছেন। "পুষ্প যেমন নিঃশব্দে ভূপতিত হয়, নদীর গতি তেমনই" ইত্যাদি। "কেবল আকর্ষণের বলে গতিমাত্রে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইতেছিল।" কাহার অস্তিত্ব—স্রোতস্বতীর না গতির? পুষ্পের বেলায় কি করিবেন? বৃন্ত হইতে খসিবার পূর্ব্বে কি পুষ্পের "অস্তিত্ব পরিলক্ষিত" হয় না? "পথিক তৃষিত প্রাণে" নদীতে জল খাইতে গিয়াছিল, তবে আবার "আকুল প্রাণে ফিরিয়া আসিতেছে" কেন? —সাপ দেখিয়া, কুমীর দেখিয়া, না কাঁটা বন দেখিয়া? নদীর জল কোন কারণে বিস্বাদ না হইয়া থাকিলে "তৃষা মিটিতেছে না" কেন, তাহা বুঝা যায় না। নদীতে "কূলপ্লাবী চাঞ্চল্য" না থাকিলেই যদি

তাহার জলে পিপাসা না যায়, তবে আশ্বিন হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত এগার মাস জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মরিতে হয়।

"ধর্ম্মে বা সমাজে অথবা সাহিত্যে যখনই কোন বিশেষ অভাব পড়িয়াছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে, কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব সাধনা বলে সে অভাব পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান এবং মানব হৃদয়ে প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া এই মর জগতে অমরত্ব লাভ করেন।" (ঐ, ২৫৮পৃষ্ঠা)।

"যখন" এর পর একটা "তখন" নিতান্তই চাই, গদ্যে তাহা অনুক্ত রাখিবার কোন কারণ বা নিয়ম দেখিনা। যাহা হউক লেখকের সম্মানার্থ না হয় "তখন" টা অনুক্তই ধরিয়া লইলাম। কিন্তু "যখন" এর বেলায় "পড়িয়াছে" ক্রিয়ার ব্যবহার করিয়া "তখন" এর বেলায় "যান" এবং "করেন" বলা যুক্তি এবং রীতি উভয়েরই বিরুদ্ধ। "যখন" এবং "তখন" যদি একই কাল-দ্যোতক হয়, তবে ক্রিয়াতে ভিন্নকাল ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য কি?

"বঙ্গভাষার যখন সব থাকিয়াও যেন-কিছু নাই,—যখন ভাষা, শব্দ-সম্পদে সৌভাগ্য-শালী হইলেও একরূপ অচেতন বা প্রাণহীন, তখন অতি নিভৃতে, বীণাপাণির পদতলে বসিয়া, 'সাহিত্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মবীর' অপূর্ব্বসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন। সুপ্ত সিংহ সহসা জাগিয়া উঠিল। ধন ধান্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ হইল।"

(ঐ, ঐ)

"যেন-কিছু"র মধ্যে একটা যোজক চিহ্ন দিয়া "যেন" টাকে "কিছু"র সঙ্গে এমন করিয়া বাঁধিয়া দেওয়াতে বেচারী "যেন"র উপরে যেন কিছু বেশী স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে। ঐ চিহ্নটা "ধন ধান্যে"র মধ্যে দিলে বরং ভাল হইত। সে যাহা হউক, "সাহিত্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মবীর" যে "অপূর্ব্ব সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন," সে কি নিদ্রিতভাবে? তাহা না হইলে "সুপ্তসিংহ সহসা জাগিয়া উঠিল" কেমন করিয়া? সিংহ জাগিয়া উঠিলে যে "ধন ধান্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ" হয়, একথা আমরা এই নূতন শিখিলাম। লেখকের অলঙ্কার-প্রিয়তা খুব বেশী; কিন্তু যাহা তাহা একটা অলঙ্কার হইলেই হইল,—ভাল হইল কি মন্দ হইল, গায়ে লাগিল কি না লাগিল, সে দিকে দৃষ্টি নাই, এই দুঃখ।

"মনের কথা খুলিয়া বলিলে বোধ হয় কতকটা গোঁড়ামী প্রকাশ পাইবে,—তথাপি অম্লান-বদনে বলিতে পারি, সমগ্র বাঙ্গালা ভাষা এক দিকে, আর একা বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে! কারণ, সমগ্র বাঙ্গালী নর-নারীর হৃদয়ের উপর তিনি প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।"

(ঐ ঐ)

লেখক "অম্লান-বদনে" বলিতেছেন, "সমগ্র বাঙ্গালা ভাষা এক দিকে; আর একা বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে।" বঙ্কিমের ব্যতিরেক বা প্রতিপক্ষতা অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে নহে, কিন্তু "সমগ্র বাঙ্গলা ভাষা"র সঙ্গে! ঐরূপ ঘোর প্রতিপক্ষতার "কারণ" কি? লেখক বলিতেছেন, "কারণ, সমগ্র বাঙ্গালী

নর-নারীর হৃদয়ের উপর তিনি প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।” যদি “সমগ্র বাঙ্গালা ভাষার” সঙ্গে তাঁহার এমন প্রতিপক্ষতা ছিল, তবে কোন্ গুণে “সমগ্র বাঙ্গালী নর-নারীর হৃদয়ের উপর তিনি প্রবল আধিপত্য স্থাপন” করিলেন ? বোধ হয় তিনি ইংরেজী জানিতেন, আর ডিপুটি গিরি করিতেন, এই জন্য ! এই অন্তঃসার-পূর্ণ কথা কয়টি বলিলে “গোঁড়ামী প্রকাশ পাইবে” বলিয়া লেখক মহাশয় আশঙ্কা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সে আশঙ্কা অমূলক। উদ্ধৃত বাক্য পাঠ করিয়া পাঠক তাঁহাকে আর যাহাই বলুন, তাঁহাকে “গোঁড়া” বলিতে পারিবেন না। অবশ্য “গোঁড়ামী প্রকাশ” পাইবার জিনিস এই প্রবন্ধের ভিতরে অনেক আছে, এবং তাহা চিনিয়া লইবার বুদ্ধির অভাব ও পাঠকের নাই। দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের ছত্র কয়েক পরেই দেখুন ;—“মুখে কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন,—কোন-না-কোন প্রকারে এ যুগে বঙ্কিমের শিষ্য নয় কে ? যিনি বঙ্কিমকে গালি পাড়েন, তিনিও সেই বঙ্কিমী ঢঙে ‘সাদার পিঠে কালি’ দিয়া থাকেন।” স্বস্তি স্বস্তি ! ইহার উপরে আর কথা নাই। “সাদা” শব্দটির অর্থ কি ? আমরা কিন্তু অভিধানে এইশব্দটী পাইলাম না। অভিধানে “শাদা” আছে।

“বস্তুতঃ, ভগীরথের ন্যায় অপূর্ব্ব সাধনা-বলে বঙ্কিম নব-জলধারা ঢালিয়া সেই ক্ষীণ-হৃদয়া, রুদ্ধ স্রোতস্বতীকে সাগরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন। * * * তবে দুঃখ এই, মহারথী অর্জ্জুনের-শরাঘাতে-বিদীর্ণা (যোজক চিহ্নের ব্যবহার দেখিবেন !) ভোগবতীর ন্যায় বঙ্কিমের বিরহে নেতৃহীন বঙ্গ-সাহিত্য আজি শতধারে বুক ভাসাই-তেছে।”

(ঐ, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

দেখুন দেখুন, লেখকের উপমা-প্রয়োগ-নৈপুণ্যটা একবার দেখুন ! “উপমা কালি-দাসস্য” চিরদিনের প্রচলিত কথা ; কিন্তু এখন তাহা ভুলিতে হইবে, কারণ অলঙ্কার-শাস্ত্রে বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিতের নূতন প্রতিভা-সূর্য্য সমুদিত ! বাবু রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিম বাবু “বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দা-কিনীর অবতারণ করিয়াছেন” ; কিন্তু হারাণ বাবুর অসংযত-কল্পনা তাহাতে পরিতৃপ্ত নহে। তিনি ভগীরথের গঙ্গা আনিবার পূর্ব্বে “ক্ষীণহৃদয়া, রুদ্ধ স্রোতস্বতী”র সৃষ্টি করিয়া একটি পৌরাণিক সত্যের নূতন সংস্করণ করিয়াছেন, আবার বঙ্কিম বাবুর আনীত এই “নব-জলধারা”র সাহায্যে তাহাকে “সাগরের সহিত মিলিত করিয়া” রবীন্দ্রনাথের ত্রুটিটুকুও পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ; ইহাতে বাল্মীকি এবং রবীন্দ্র উভয়েই তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবেন সন্দেহ নাই ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বঙ্কিমচন্দ্রের এ নূতন সাগরের নামটি কি ? তাহার পরে দেখুন, অর্জ্জুনের বাণে ভোগবতী বিদীর্ণ হইয়াছিল—পৃথিবী নহে। এখানেও ব্যাসের ভ্রম-সংশোধন ! জলময়ী নদী যে কেমন করিয়া বিদীর্ণ হয়, আর জল কাটিতে বা কাটাইতে অর্জ্জুনের মত বীরের যে কি প্রয়োজন হয়, আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা কিন্তু তাহা ধারণ করিতে অক্ষম।

"ছোট ছোট ভাবময়ী কথা কিন্তু মর্ম্মস্তল স্পর্শ করে।" (ঐ, ঐ)

বাঙ্গলাভাষায় মর্ম্মস্থল আছে, অন্তস্তল আছে, মর্ম্মতল আছে, কিন্তু "মর্ম্মস্তল" আজ আমাদের নূতন শিক্ষা হইল। অনেকের মুখে "গঙ্গাস্তীর" শুনিতে পাওয়া যায় বটে। ইহা বৈদিক সংস্কৃত, না হারাণ বাবুর আর্ষ প্রয়োগ?

"আসল কথা ভাবযুক্ত মর্ম্মকথা ভাষার পক্ষে যত কার্য্যকরী, ফেনাইয়া বা ফাঁপাইয়া অবাস্তব শব্দাবলীর সংযোজনে, ভাষার পরিপুষ্টি ত দূরের কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনা মাত্র।"

(ঐ, ২৬০ পৃষ্ঠা)

এখানে একটা "যত" আছে, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির জন্য একটা "তত" নাই। "কার্য্যকরী"র পরে চাই কমা দেও, চাই দাঁড়ি দেও, বাক্য-গঠনের এই হাস্যকর অজ্ঞতা কিছুতেই ঢাকে না! এসব ভুল বালকেরাও করে না।

"একটি ক্ষুদ্র যূথিকা পুষ্প যে সুগন্ধি দান করিবে, রাশীকৃত করবীর সাধ্য কি যে, তাহার স্থান অধিকার করে?"

(ঐ, ঐ)

"তাহার স্থান" অর্থাৎ সেই "সুগন্ধি"র "স্থান"। "ক্ষুদ্র যূথিকা"র "স্থান" নহে। ফুল যে গন্ধের স্থান অধিকার করিতে পারে না, সে কথা ত বলাই বাহুল্য। "তাহার স্থান অধিকার করে?" না বলিয়া "তাহাদের?" বলিলে অল্প কথায় হইত, একটা অর্থও পাওয়া যাইত! "সুগন্ধি" এই পদটি পুষ্পের বিশেষণ করিলে ভুল হইত না, "সুগন্ধি" অর্থ সুন্দর গন্ধ নহে, যাহাতে সুন্দর গন্ধ আছে, তাহাই। সু পূর্ব্বক গন্ধ শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিয়া সুগন্ধি পদ নিষ্পন্ন হয়।

"নিমচাঁদ রূপী বহু শিক্ষিত-পুঙ্গব তখন বঙ্গ সমাজে বিরাজ করিতেছেন।" (ঐ, ঐ)

"তখন * * * বিরাজ করিতেছেন" যদি শুদ্ধ হয়, তবে "এখন * * বিরাজ করিতেছিলেন" বলিলে দোষ কি?

"তিনি (অর্থাৎ কবি) আবশ্যক বোধে বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হন;—যুগ যুগ ধরিয়া যাহার বিমল-রাশি নিখিল সংসার উপভোগ করিতে থাকে।" (ঐ, ২৬১)

"যাহার"—যৎ শব্দের এইরূপ ব্যবহার ইংরাজীর নিতান্ত নিন্দিত অনুকরণ। তাহাও বা যাই হউক, এই "যাহার"টি কাহার পরিবর্ত্তে বসিল? "তিনি"র পরিবর্ত্তে কি? তাহা হইলে..কিন্তু একটি চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হইলেও কি চমৎকার ভাব প্রকাশ পায়! কবি সব "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া" কোন অপূর্ব্ব সৃষ্টি, কোন চমৎকার কৌশলময়ী কল্পনার অভিনব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন না, কিন্তু তিনি নিজেই "প্রস্তুত" হইয়া বসিলেন! নিমিত্ত কারণ এবং সমবায়ি কারণের প্রভেদ টা যে কি, সে জ্ঞানও নাই!

পাঠক! চুলিশ পৃষ্ঠা প্রবন্ধের আমরা মোটে চারিটি পৃষ্ঠার নমুনা দেখাইলাম; সমস্ত দেখাইতে পারি, সে স্থান আমাদের নাই। কিন্তু আপনি যদি একবার কষ্টস্বীকার করিয়া প্রবন্ধটি পড়েন, আগা গোড়াই এই

রূপ ভাবের ব্যভিচার এবং ভাষার শ্রাদ্ধ দেখিতে পাইবেন, যেখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করিলেই হারাণ বাবুর বিদ্যা আপনাকে চমৎকৃত করিবে।

২৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন, "বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিল। (একি আর মিথ্যা কথা?) তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিল, দেখিল, চারিদিক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত।" "দেখিল" কে? আহা! এই সকল ভুলের জন্য নিরীহ বালকদিগের পৃষ্ঠের উপর দিয়া কতই না বেত্রাঘাত যায়!

২৭৯ পৃষ্ঠা দেখুন, "পাপীকে পোড়াইতে, তাহার হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর খাক করিতে বঙ্কিমের ন্যায় কবি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্ভব?" "পোড়াইতে * * খাক করিতে * * কাহার দ্বারা সম্ভব?" ভাষাটি অনুকরণযোগ্য!

২৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন, "নারীজাতির উপর তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি।" "তাহা"টি এ স্থলে কোন্ কারক? যে সকল ভুলের জন্য বালকেরাও লজ্জিত হয়, সেই সকল ভুলপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া হারাণ বাবু দুই দুইটা পদক পাইলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে শ্লাঘার কথা হইলেও জাতি এবং জাতীয় ভাষার পক্ষে সেরূপ নহে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল—এক কথায় ভুল অসংখ্য বলিলেও হয়; দৃষ্টান্ত যথা,—

"গুণীন গ্রন্থকার" (ঐ, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

"কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে।" (ঐ, ২৭০ পৃষ্ঠা)

"তাঁহার লক্ষ্য বড় উচ্চ, বড় মহান্" (ঐ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

"মহান্ উদ্দেশ্য" (ঐ ২৮০ পৃষ্ঠা)

"অন্তর্প্রকৃতিতে তুমুল সংগ্রাম প্রদর্শনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য" (ঐ, ২৮৮ পৃষ্ঠা।)

"মহান্ চরিত্র" (ঐ, ২৯১ পৃষ্ঠা)

"পাবলিক মতের উপর কখন আত্ম-নির্ভর করিতে নাই।" (ঐ ২৯৫ পৃষ্ঠা)

কাহাকেও দৃক্পাত না করিয়া" (ঐ, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

পুরস্কৃত প্রবন্ধের ভাষাটা যে কিরূপ হইয়াছে, তাহাই আমরা দেখাইলাম। মূল বিষয়ে, অর্থাৎ বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে হারাণ বাবুর মতামতে সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকিতেই নানা কারণে আমাদের ইচ্ছা আছে, এবং সে বিষয়ে নীরবই থাকিব; তবে দুইটী স্থান কাণে বড়ই বাধিয়াছে, দুইটী স্থানে হারাণ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব প্রখ্যাপন করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে অগৌরবই ঘোষণা করিয়াছেন, এজন্য ঐ দুইটী স্থান-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

একস্থানে হারাণ বাবু বলিতেছেন,—"জর্জ্জ ইলিয়টের গভীর ভাবও লিপি-কুশলতা, ভিক্টর হিউগোর সূক্ষ্মদৃষ্টিও মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা, ডিকেন্সের সরসও মর্ম্মস্পর্শী রসিকতা এবং স্কটের বৈচিত্র্যময় প্লট্ (প্লটের বুঝি বাঙ্গালা অনুবাদ হয় না!) এই চারি জনের কিছু কিছু বঙ্কিমের মধ্যে দেখিতে পাই, অথবা চারিজনের কিছু কিছু লইয়াই আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র। সুতরাং উপন্যাস-জগতে তিনি রাজ রাজেশ্বর।"

(ঐ, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হারাণ বাবুর অলঙ্কার-প্রিয়তা কিছু অধিক। এ স্থলে প্রযুক্ত অলঙ্কারটি ব্যাজস্তুতি কি ব্যাজোক্তি, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। যিনি বঙ্কিম বাবুর "গোঁড়ামী প্রকাশ" করিয়া আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করেন, তিনি যে স্তুতিচ্ছলে তাঁহার নিন্দা করিবেন, এমন বিশ্বাস হয় না। আমাদের বোধ হয় হারাণ বাবু প্রতিজ্ঞা কয়টা সরল ভাবেই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু উপপত্তির উল্লেখ করিতে যাইয়া দেখেন কি সর্ব্বনাশ! তখন আর কি করেন, সুতরাং একটা বিপরীত উপপত্তি বসাইয়া দিলেন! তিনি ভাবিলেন একটা অমোঘ "সুতরাং"-এর জোরেই সমস্ত গোলযোগ ঢাকা পড়িবে; কিন্তু এই "সুতরাং" এর অন্তরালে কতটা হাস্যকর ব্যাপার যে প্রচ্ছন্ন রহিল, তাহা তিনি বুঝিলেন না। মনে করুন কেহ যদি বলে, "হারাণ বাবু একটুকু বাঙ্গালা জানেন, একটুকু ইংরাজী জানেন, একটুকু সংস্কৃতও জানেন, অথবা এই তিনভাষার কিছু কিছু লইয়াই হারাণ বাবু। সুতরাং ভাষা-জগতে তিনি রাজ-রাজেশ্বর।" তাহা হইলে স্বয়ং হারাণ বাবুই কি বক্তাকে উপহাস করিবেন না? দরজি অনেক বড়লোকের জন্য বহুমূল্য বস্ত্রের পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেই সকল বস্ত্রের পরিত্যক্ত টুকরা গুলি তালিদিয়া ফকির চাঁদ দরবেশ একটী "আলখাল্লা" প্রস্তুত করিয়াছে, "সুতরাং পরিচ্ছদ-জগতে" ফকিরচাঁদ "রাজ রাজেশ্বর।" এরূপ উপপত্তি যে নিতান্ত হাস্যকর, তাহা আবার বুঝাইয়া দিতে হয় কি? "চারি জনের কিছু কিছু লইয়াই আমাদের বঙ্কিম চন্দ্র" কি না, সে কথার বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না; কিন্তু সে কথা যদি সত্য হয়, তবে একটি কেন সহস্রটি "সুতরাং" ও তাহাকে "উপন্যাস-জগতে" "রাজ রাজেশ্বর" করিতে পারিবে না। সকলের নিকট হইতে "কিছু কিছু" লইয়া ভিক্ষুক হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু "রাজ রাজেশ্বর" হইবার উপকরণ স্বতন্ত্র।

আর এক স্থলে হারাণ বাবু বলিতেছেন, —"ভাষাকে লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলের মত—যখন যেমন ইচ্ছা—ব্যবহার করিতে এক বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ সমর্থ হন নাই।"

(ঐ, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

আর বঙ্কিমের সমালোচক মহাশয়ই কি সে বিষয়ে কম!

তাহার পরে বঙ্কিম যে একাধারেই নানা মূর্ত্তি, তাহাই দেখাইবার জন্য বঙ্কিম চন্দ্রের লেখা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উদ্ধৃত অংশ গুলির প্রথমেই বঙ্কিম চন্দ্রের "ভাষাকে লইয়া ক্রীড়া"—ভাষার উপরে তাঁহার অত্যাচার এবং যথেচ্ছাচার প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, কেনা বলে? কিন্তু যাহার উপকার করা হয়, তাহাকে লইয়াই "ক্রীড়া" করিবার—তাহার উপরেই অত্যাচার করিবার অধিকার আছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি না।

উল্লিখিত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই "বন্দে মাতরং" গান। ইহার ভাব গম্ভীর—স্বদেশ-প্রীতির উত্তেজক, কিন্তু বিকৃত সং-

যোগের দোষে ইহার ভাষাটি নিতান্ত দূষিত হইয়াছে, কেবল বিষয়ের পবিত্রতার গুণেই ইহা হাস্য-রস উদ্দীপ্ত করিতে পারে নাই। নমুনা দেখুন,—

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
কে বলে মা তুমি অবলে।
+ + + + +
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি (!!) তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।" ইত্যাদি।

এখন একবার হৃদয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলুন দেখি পাঠক, বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ এই অপূর্ব্ব "খিঁচুড়ি" রাঁধিলে তাহার স্তুতিগানে মাতৃভাষাকে চরিতার্থ করা দূরে থাকুক, আপনারা কেহ তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতেন কি? এমন অপূর্ব্ব রুচি, এমন অদ্ভুত কল্পনা বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন জাতির ভাষায় কখন ও স্থান পাইয়াছে কিনা জানি না, অন্ততঃ আমরা তাহা দেখি নাই। বাঙ্গালী অদ্ভুত জাতি, তাহার কল্পনাও অদ্ভুত! কিন্তু এ পথে একা বঙ্কিম বাবুই চলেন নাই, তাঁহার অগ্র পশ্চাতে আরও অনেক অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি চলিয়াছেন; তবে প্রভেদ এই, তাঁহারা গম্ভীর ভাবের সঙ্গে হাস্যকর ভাষার সংযোগ করেন নাই, কিন্তু বঙ্কিম বাবু তাহা করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু ছাড়া আরও যে অনেকে এ পথে চলিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন;—

(১)

"বেগারের ওয়াইফ্ ব'লে,
ইন্‌সলটেড্ ক'র্‌লে মোরে,
আমি তাই ইন্‌ভিটেশন্ পেলেমনা।
আর যত ছিল ভটার্,
আন্‌লে সব দিয়ে লেটার্,
আমি কি লেটার্স্ ম্যাটার্ হ'লেমনা।"

ইত্যাদি।

(২)

"ভিক্ষার্থং মে বিফলমটনং
কিছু তাতে মিলে না।
কশ্চিদ্দাতা যদি কিছু দিতে চায়
তত্র বাদী মাগীরা।"

ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় এইরূপ বিকৃত সংযোগের ভাষায় উদ্ভট শ্লোক বা কবিতার অভাব নাই, কিন্তু কেহ তাহাদের আদর করে না, কেহ রচয়িতাদিগের নামও জানে না। বঙ্কিম বাবু জানিতেন, তিনি যাহাই লিখুন, তাহার প্রশংসাকারী পাওয়া যাইবে, তাই তিনি "ভাষাকে লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলের মত—যখন যেমন ইচ্ছা—ব্যবহার" করিয়া গিয়াছেন, আর হারাণ বাবুও তাঁহার প্রশংসিত অংশ-সমূহের শীর্ষ-ভাগেই তাহাকে—ভাষার উপরে যথেচ্ছাচারের সেই দৃষ্টান্তকে স্থান দিলেন।

হারাণ বাবুর লব্ধ-পুরস্কার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া কয়েকটি কথা আমাদের মনে হইতেছে;—

প্রথম। সমালোচ্য প্রবন্ধে পুরস্কৃতের যোগ্যতা অপেক্ষা পুরস্কর্ত্তাদিগের উদারতাই অধিক প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয়। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তাহার উন্নতির জন্য এরূপ প্রবন্ধের লেখককেও পুরস্কার দিতে হইতেছে।

তৃতীয়। আমরা অনুমান করি, এই

প্রবন্ধ-পরীক্ষার প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয় নাই;—একমাত্র হারাণবাবুই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, একমাত্র হারাণ বাবুই দুইটী পদক পাইলেন। যদি এ অনুমান যথার্থ হয়, তাহা হইলে হারাণ বাবু আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র, কারণ তিনি প্রবন্ধটী লিখিয়া আমাদের মুখ রাখিয়াছেন, মাতৃভাষার গৌরব বাড়াইয়াছেন, বঙ্কিমবাবুকে সম্মান দেখাইয়াছেন।

চতুর্থ। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিলে ভাষার গৌরব বর্দ্ধিত এবং বঙ্কিমের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হইতে পারিত, এমন মনীষা-সম্পন্ন কোন লেখক এ প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন নাই কেন? আমাদের বোধ হয় বঙ্কিমের স্তাবকেরাই এজন্য দায়ী। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও ছিল, একথা বলা, আর ভীমরুলের চাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা তুল্য কথা। ইচ্ছা করিয়া এমন অসম সাহসিক কার্য্যে কে প্রবৃত্ত হয়?

গতবারে আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম, "বঙ্কিম বাবুর নামে একটী বার্ষিক পুরস্কার প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং যে বৎসর যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবেন, সেই বৎসরে তাঁহাকে তাহা পুরস্কৃত করা হউক। ইহাতে অল্প ব্যয় পড়িবে, পুরস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর নাম বঙ্গবাসী পাঠ করিবে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার হইবে, যে গুণে বঙ্কিম বাবুর বিশেষ খ্যাতি তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে, এবং প্রতি বৎসর সকলে সমবেত হইয়া বঙ্কিম বাবুর জীবন ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিবার একটা সুযোগ স্থায়ী হইয়া যাইবে—জাতীয় শক্তি ফূর্ত্তি-লাভের একটা অবসর পাইবে।"(শিক্ষা-পরিচর, ৪র্থ ভাগ, ৯৪পৃষ্ঠা) আমরা আশা করি, উদার-হৃদয় পুরস্কর্ত্তাগণ আমাদের প্রস্তাবটি আর একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে জন্মভূমির সম্পাদক মহাশয় একটা ফুটনোটে বলিয়াছেন, ""জন্মভূমির লক্ষ্য এবং এই প্রবন্ধের লক্ষ্য দুই বিভিন্নদিকে অবস্থিত হইলেও কেমন এক অপূর্ব্বভাবে সম্বদ্ধ, তাহা চিন্তাশীল পাঠক লক্ষ্য করিবেন।" প্রবন্ধের মধ্যে মডেল-ভগিনী হইতে অকারণে বা গুহ্য কারণে উদ্ধৃত পাঁচ কি ছয় পৃষ্ঠা পড়িলেই পাঠক এই "অপূর্ব্ব" সম্বন্ধ "লক্ষ্য" করিবেন, সে জন্য বিশেষ "চিন্তাশীল" হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

অমরনাথের পাঠদ্দশা।

(৪)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন দিবস পরে পুরোহিত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বাবাকে ডাকিয়া লইয়া মণ্ডপের বারাণ্ডায় দুইজনে বসিলেন। বাবা। "আমি এ কয়েক দিন যাবৎ প্রত্যহ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

পুরোহিত। "বাবা, তুমি আমাকে যে

গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়াছ, তাহা দুই এক দিনের চিন্তায় হইতে পারে না। আমার বোধ হয় কেহ জন্ম ভরিয়া এ বিষয়ে চিন্তা করিলেও তোমার ফরমাইস মত একটি কথায় শিক্ষার ঠিক উপায়টি বলিয়া দিতে পারে কি না সন্দেহ।"

বাবা। "অন্যে জন্ম ভরিয়া চিন্তা করিয়া যাহা না পারে, আপনার একদিনের চিন্তাতেই তাহা হয়।"

পুরোহিত। "দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া স্বজাতির অধঃপতনে ভীত এবং দুঃখিত হইয়া শিক্ষা বিষয়ে অনেক সময়ে অনেক কথা ভাবিয়াছি বটে, কিন্তু তুমি যে এমন কঠিন সমস্যায় আমাকে ফেলিবে, তাহা কখন মনেও করি নাই। যাহা হউক, আমি তোমার কথা রাখিয়াছি, তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমি যে কর্ম্মটি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, তাহা পদ্যে সংক্ষেপে লিখিতেছি। বাঙ্গালায় পদ্য লিখিবার আমার অভ্যাস নাই, তবু পদ্যেই চেষ্টা করিয়াছি। এটী আমাদের সংস্কৃত রীতি। মনে রাখিবার উপযুক্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু বলিতে হইলেই ঋষিগণ কবিতার আশ্রয় লইতেন। তাহার কারণ এই, কবিতা যত সহজে মনে থাকে, গদ্য তত সহজে থাকে না। গদ্যের ভাষায় ভুল পড়িবার খুব সম্ভব, ভাষায় ভুল পড়িলে কাযেই ভাবেও ভুল পড়িবে; কিন্তু পদ্যে সেটী হয় না—পদ্যে ভাষার সঙ্গে ভাবটি চিরদিনের জন্ম অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে মনের সঙ্গে বাঁধা থাকিয়া যায়।" এই বলিয়া পুরোহিত বাবার হাতে একখানি লেখা কাগজ দিলেন। বাবা কাগজ খানি হাতে লইয়া দেখিলেন, তাহাতে এই কবিতাটি লেখা আছে;—

"আপনি মহৎ হব,
উন্নত করিব দেশ,
প্রাণপণে যত্ন করি
ঘুচাব জীবের ক্লেশ।"
ছোট হও বড় হও,
থাক যেখানে সেখানে,
জাগাও এ শুভ ইচ্ছা
শিশুর কোমল প্রাণে।

বাবা। "আপনি বলিয়াছিলেন বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতে জানেন না, এইত বেশ লিখিয়াছেন। আমি যত্ন করিলেও এরকম লিখিতে পারিতাম না।"

পুরোহিত। "তোমার প্রশংসা রাখিয়া দাও বাপু, প্রশংসা চাই না; আমি যে কথাগুলি বলিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি না তাই বল।"

বাবা। "এমন সুন্দর সরল ভাষায় লিখিয়াছেন, তবু বুঝিব না?"

পুরোহিত। "আচ্ছা, তাহা হইলেই হইল। কবিতার প্রথম চারিটি ছত্র শিশুদিগের জন্য, আর শেষ চারিটি ছত্র অভিভাবকদিগের জন্য। আমার নিকট যাহা চাহিয়াছিলে, তাহাত পাইলে; এখন তুমি কি করিবে বল দেখি?"

বাবা। "প্রথম চারিটি ছত্র অমরকে দিয়া এখনই মুখস্থ করাইতেছি। আমিও সপরিবারে কবিতাটি মুখস্থ করিব। ইহার পরে কবিতাটি স্বর্ণাক্ষরে ছাপাইয়া আমার বন্ধুবান্ধব যিনি যেখানে আছেন সেখানে এক এক খণ্ড পাঠাইয়া দিব, আমার প্রজা-

দিগের মধ্যে বিতরণ করিব, এবং আয়নায় বাঁধিয়া উহা শয়ন-গৃহে, বিদ্যালয়ে, বৈঠকখানায় এবং পান্থ-নিবাসে সর্ব্বসমক্ষে লটকাইয়া রাখিব।”

পুরোহিত। “আচ্ছা আগে অমরকেই শিখাও দেখি।”

বাবা আমাকে ডাকিলেন, এবং আমি নিকটে গেলে পুরোহিতকে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে বাবা বলিলেন, “এই শ্লোকটা মুখস্থ কর দেখি?” আমি একটুকু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আশ্চর্য্য বোধ করিবার প্রথম কারণ, এখন প্রাতঃকাল, সুতরাং খেলার সময়, এখন শ্লোক মুখস্থ করিতে বলেন কেন? দ্বিতীয় কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল শ্লোক কেবল মা ই জানেন, এখন দেখিতেছি বাবাও তাহা জানেন। বাবা একবার শ্লোকটি বলিলেন, আমি দাঁড়াইয়া মনোযোগ দিয়া শুনিলাম। তিনি আবার বলিলেন, আমার মনে থাকিয়া গেল, আমি শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ফেলিলাম। আবৃত্তি করিয়াই আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম। বাবা আমার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, “শ্লোক কাকে বলে, আর কবিতা কাকে বলে, তাও আপনি জানেন না? আপনি যা বলিলেন, তা যে কবিতা!” বলা বাহুল্য, বাবা যে শ্লোক জানেন না, সে বিষয়ে কেবল আমার মারই যে অবিসম্বাদিত পাণ্ডিত্য, এখন তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। পুরোহিত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্লোকে আর কবিতায় প্রভেদ কি বলিতে পার?” আমি বলিলাম, “বেশ! আপনিও তা জানেন না? কবিতা এই, যা কিছু কিছু বুঝা যায়, আর শ্লোক যা একেবারেই বুঝা যায় না।”

বাবা হাসিতে লাগিলেন, আর পুরোহিত অতি আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “বা! বা! বেশ বলেছে! ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে এ বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহার কণ্ঠে মা সরস্বতী নৃত্য করিবেন।”

বাবা। “কবিতা এবং শ্লোকের প্রভেদ বেশ শিক্ষা হইল। আচ্ছা আবার বল দেখি কবিতাটি মনে আছে কি না।”

আমি আবৃত্তি করিলাম,—

“আপনি মহৎ হব,
উন্নত করিব দেশ,
প্রাণ পণে যত্ন করি
ঘুচাব জীবের ক্লেশ।”

বাবা বলিলেন, “আচ্ছা বেশ হইয়াছে, এখন খেলিতে যাও, দেখিও যেন কবিতাটি ভুলিও না।”

আমি “ভুলিব না” বলিয়া খেলারদিকে ছুটিলাম, কিন্তু নিমাই আসিয়া আমাকে কোলে লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিল। অন্দরে প্রবেশ করিয়াই দেখি মা আমার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।—আমাকে কোলে লইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা! বলত শুনি পুরোহিত ঠাকুর তোমাকে কি শিখাইলেন?” আমি বলিলাম, “পুরোহিত শিখান নাই মা! বাবা শিখাইয়াছেন। বাবা একটা কবিতা শিখাইয়াছেন, কিন্তু তিনি ভুল করিয়া উহাকে

শ্লোক বলিতেছিলেম। আচ্ছা আপনিই বলুন ত মা, এটা কবিতা নয় কি ?—

'আপনি মহৎ হব,
উন্নত করিব দেশ,
প্রাণপণে যত্ন করি
ঘুচাব জীবের ক্লেশ।'"

মা আমার মুখের দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে হাসি এবং চক্ষে জল দেখা দিল। আমি শ্লোক এবং কবিতার যে প্রভেদ দেখাইয়া ছিলাম, তাহাও বলিলাম, কিন্তু মা কোন উত্তর না দিয়া সেই ভাবেই আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে এবং কাঁদিতে লাগিলেন, সুতরাং আমি এভাবে শ্লোক এবং কবিতার পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

এদিকে আমি খেলিতে চলিয়া গেলে পুরোহিত বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ীতে পোষা পাখী আছে ?"

বাবা। "আছে একটা ময়না আর একটা কাকাতুয়া।"

পুরোহিত। "তাহারা পড়িতে জানে !"

বাবা। "ময়নাটী ত অনেক গুলি বুলি শিখিয়াছে, কাকাতুয়া ও দুই চারিটা বলিতে পারে।"

পুরোহিত। "তবে তাহাদিগকেও এই কবিতাটি শিখাও।"

বাবা। "তাহাতে কি হইবে ?"

পুরোহিত। "তাহারাও বিদ্বান্ হইবে।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

পুরোহিত। "কেন বাপু, আমার কথার ত ঘোর পেঁচ কিছু নাই ? তুমি অমরকে যে ভাবে কবিতা শিখাইলে, সেভাবে শিখিয়া যদি অমর বিদ্বান্ হইতে পারে, তবে পাখী গুলি কি অপরাধ করিল ? কথা মুখস্থ করিলেই যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে পাখীরও সে অধিকার আছে।"

বাবা। "আমি কবিতাটি বুঝিয়াছি বলিয়া ভুল করিয়াছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাকে কবিতাটি বুঝাইয়া দেন।"

পুরোহিত। "বুঝিয়াছ বই কি, কবিতার অর্থ অবশ্যই বুঝিয়াছ, তবে সে সম্বন্ধে নিজের কর্ত্তব্যটি বোধ হয় তেমন পরিষ্কার করিয়া বুঝ নাই।"

বাবা। "আচ্ছা তাহাই বুঝাইয়া দেন।"

পুরোহিত। "কবিতার প্রথমার্দ্ধে তিনটি বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে, যথা, (১) নিজে মহৎ হইব, (২) দেশকে উন্নত করিব, (৩) জীবের ক্লেশ দূর করিব। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পিতামাতার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সে কর্ত্তব্য এই যে, প্রাগুক্ত তিনটি ইচ্ছা সন্তানের মনে জন্মাইয়া দেওয়া। প্রকৃত ভাবে ধরিতে গেলে নিজে মহৎ হইব, এই একমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট, কারণ স্বদেশ-প্রীতি এবং জীব-হিতৈষা আত্ম-মহত্ত্বের বাহিরে নহে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-চিন্তা করিতে করিতে এক প্রকার আত্ম-বিকৃতি—এক প্রকার আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা জন্মিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে জীবের দুঃখে অবজ্ঞা ও স্বদেশের দুর্দশায় উদাসীনতা আসিয়া পড়ে। এই স্বার্থপরতা যাহাতে

মনে না আসিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই অন্য দুইটী ইচ্ছার যোগ করিয়াছি।”

বাবা। “ইহার মধ্যে এত কথা রহিয়াছে, তাহা আমি ভাবি নাই। বুঝিয়াছি বলাটা আমার নিতান্তই ভুল হইয়াছে।”

পুরোহিত। “বুঝা অপেক্ষা করাটা আরও কঠিন। অমর কবিতাটি মুখস্থ করিয়াছে, একটা পাখীও ইহা মুখস্থ করিতে পারে, এসম্বন্ধে পাখীতে আর অমরেতে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল ইচ্ছাতে। হাজার যত্ন করিলেও পাখীর মনে এ ইচ্ছা জন্মাইতে পারিবে না, কিন্তু যত্ন করিলে অমরের মনে এ ইচ্ছা জন্মাইতে পার, অমরেতে এবং পাখীতে ইহাই প্রভেদ।”

বাবা। “কেমন করিয়া ইচ্ছা জন্মান যায়।”

পুরোহিত। “বুদ্ধির উদ্বোধন এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা। যে যাহার মর্ম্ম বুঝে না, সে তাহার জন্য ইচ্ছাও করে না। একটা বহুমূল্য রত্ন বানরের হাতে দেও, সে তাহার মর্ম্ম বুঝিবে না, সুতরাং তাহা ফেলিয়া দিবে; কিন্তু একটি ফলের মর্ম্ম সে বুঝিবে, কাযেই তাহার জন্য প্রাণান্ত হইবে। বনের পশু, সে কেবল ফলের মর্ম্মই বুঝে; মহত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিবার বুদ্ধি তাহার নাই, সুতরাং সে ইচ্ছাও তাহার হইবে না। মহত্ত্ব বুঝিবার বুদ্ধি মানুষ মাত্রেরই আছে, তবে সকলের অন্তরে তাহার উদ্বোধন হয় না—সকলের সে বুদ্ধি জাগে না। আলোচনায় সে বুদ্ধি জাগে, দৃষ্টান্তে কার্য্য-প্রবৃত্তি হয়, এবং কার্য্য-প্রবৃত্তিতে সে বুদ্ধি জীবন্ত থাকে অথবা প্রকৃত জীবন লাভ করে। কেবল বুদ্ধি-সেই লোকে অনুষ্ঠান করে না—করিতে পারে না। তুমি যদি নৃত্য শিখিতে চাও, সহস্র উপদেশেও তাহা শিখিতে পারিবে না, কিন্তু কেহ নাচিয়া দেখাইয়া দিলে অনায়াসেই শিখিতে পারিবে। সংসার-রঙ্গ-ভূমে সকলেই এই নিয়মের অধীন। পুত্রকে সাধু হইবার জন্য উপদেশ দিয়া তুমি নিজে যদি চুরি কর, সে কখনও সাধু হইবে না, তোমার মত চুরিই করিবে। যদি পুত্রকে সাধু দেখিতে চাও, তবে তোমাকে সাধু হইতে হইবে—সাধুতার নাচ নাচিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। কথাটা বুঝিতে পারিলে।”

বাবা। “বুঝিয়াছি, একথা বলিবার সাহস আরনাই; তবে বোধ হয় বুঝিতেছি। আমি দেখিতেছি, সন্তানশিক্ষায় ইচ্ছা জননকেই আপনি প্রধান স্থান দিতেছেন। কেবল ইচ্ছা জন্মাইয়া দিতে পারিলেই কি হইল, আর কিছু করিতে হইবে না?”

পুরোহিত “সন্তান শিক্ষায় ইচ্ছা-জনন কেবল প্রধান নহে, ইহাই একমাত্র সম্বল। তবে কোন কোন বালকের প্রকৃতি কিছু দুর্ব্বল, ইচ্ছা জন্মিলেও তাহারা অভিভাবকের উপরে কতকটা নির্ভর করে। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যাহার প্রকৃত ইচ্ছা জন্মিয়াছে, কোন বাধা বিঘ্ন তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে না, জগতের সমস্ত মহাজনের জীবনেই এ কথার প্রমাণ পাইবে। কেবল ইচ্ছার বলেই মানুষ বড় হয়, কেবল ইচ্ছার অভাবেই সে নর-পশু হয়।

পিতা মাতা বা শিক্ষক চির দিন সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা দিতে পারেন না, চিরদিন পাপ-প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারেন

না; কিন্তু শুভ ইচ্ছা চিরদিন সঙ্গে থাকে, চিরদিন বিপদ হইতে রাখে। পিতামাতা এবং শিক্ষক বালককে আর কিছু দিতে না পারিয়াও যদি কেবল সৎ সঙ্কল্প দিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট ধন দিলেন মনে করিতে পারেন; কেননা এই ধন তাহার চিরদিনের সম্বল হইবে।"

বাবা।"ইচ্ছা জননের প্রয়োজন বুঝিলাম। ইচ্ছার বলে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহাজনেরা যে মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে তাহা ও বুঝা যায়। কোন মন্দ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মিয়া গেলে তাহা হইতে সন্তানকে নিরস্ত করা যে পিতামাতার পক্ষে কত কঠিন, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু শুভ ইচ্ছা জন্মাইবার উপায় কি? ব্যাপার টাত বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পুরোহিত।"গাছ জন্মাইবার উপায় কি? ছায়া ও আগাছা আবর্জ্জনা দূর করিয়া অনুকূল ভূমিতে বীজ রাখিয়া দিলেই সে আপনার কায আপনি করিয়া লয়, আর কিছু করিতে হয় না; সেইরূপ শুভ ইচ্ছার প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া অনুকূল অবস্থার মধ্যে শিশুকে রাখিয়া দেও, সে আপনার কার্য্য আপনি করিয়া লইবে। তুমি যে এ প্রশ্ন করিবে, তাহা আগেই আমি ভাবিয়াছি, এবং সেই জন্য একটা কবিতাও লিখিয়া আনিয়াছি, এই ধর, পড়িয়া দেখ।" এই বলিয়া পুরোহিত বাবার হাতে এক খানি কাগজ দিলেন। বাবা পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে এই কবিতাটি লেখা আছে,—

"ব্যাখ্যান, উৎসাহ-দান
দৃষ্টান্তের প্রদর্শন,
এ তিনে নিশ্চয় করে
শুভ ইচ্ছা উৎপাদন।"

বাবা কবিতাটি পড়িয়া, বলিলেন, "আমি যত ভাবিতেছি এবং আপনার কথা শুনিতেছি, ততই নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।"

পুরোহিত। "বিষয়টা এইরূপই বটে। আচ্ছা, তুমি তোমার প্রশ্ন ভাবিয়া রাখিবে, আমিও ভাবিয়া তাহার উত্তর দিব। আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, এখন আসি।"

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

শুধু যত্নে মহাকবি কোথায় কে হয়?
শুধু সারে সুঁহি-তরু শাল কভু নয়।

দিন রাত্রি প্রাণপণে করিলে ঘর্ষণ,
ভাসেনা সোণার কান্তি পিত্তলে কখন।

ঘর্ষণে শরীর যদি সুন্দর হইত,
কৃষ্ণবর্ণ রূপাজীবী কেহ না থাকিত।

সাধু-সঙ্গ হওয়াই কি সবে ভাল হয়?
স্বর্ণের ঘর্ষণে কভি কৃষ্ণ বই নয়!

হাসে না যে, তাবে সদা, অল্প কথা কয়,
ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, সামান্ত সে নয়।

প্রেমাবেশে অধিকার করে যার প্রাণ,
স্বার্থ-নীচতার তাতে নাহি রহে স্থান।

হৃদয়ে হইলে পূর্ণ প্রেমের উদয়,
এই দেহে মানবের পুনর্জ্জন্ম হয়।

প্রেমের নিকটে কিছু বাছিবার নাই,
সব তার পরিজন, সব তার ভাই।

বারেক প্রেমের জলে নাহিতে পারিলে,
পাপ-মলিনতা নাহি স্পর্শে কোন কালে।

শুষ্ক গাছে ফুটে ফুল, মৃত প্রাণ পায়,
মরু হয় রসময় প্রেমের বন্যায়।

বিশ্বময় প্রেমে যার ডুবিয়াছে প্রাণ,
বাহ্য কোলাহলে তার নাহি ভাঙ্গে ধ্যান।

প্রতিভা বিধির নিজ ইচ্ছাকৃত দান,
প্রতিভার মূল্য নহে ধন, যত্ন, প্রাণ।

প্রতিভা কি কারো মুখে পরিচয় চায়?
দীপ দিয়া দিবাকর কে কারে দেখায়?

অদৃশ্যে ফুটিলে ফুল গন্ধে জানা যায়,
প্রতিভা অকুলে যদি, তবু না লুকায়।

বনে বনে জনমে না সুগন্ধি চন্দন,
জনে জনে প্রতিভার হয় না স্ফুরণ।

লেখার চটকে কিম্বা কথার বাহারে,
থাকিত প্রতিভা যদি, কি দুঃখ সংসারে!

প্রতিভা আপন মনে আত্ম-পথে চলে,
সকলের সঙ্গে তার কিছুই না মিলে।

প্রতিভা স্বর্গের দেবী, কখন কখন,
ক্ষুদ্র এধারায় তার হয় পদার্পণ।

যতদিন প্রতিভার বসতি ধরায়,
ততদিন কেহ তারে চিনিতে না পায়।

তৃতীয় নয়ন-কর্ণ ফুটে নাই যার,
কেমনে সে পরিচয় পাবে প্রতিভার?

বীজেতে অশ্বত্থ তরু যে পায় দেখিতে,
জীবন্ত প্রতিভা শুধু সে পারে বুঝিতে।

অঙ্কুরেতে চিনে কেহ দিব্য দৃষ্টি-বলে,
স্থূলবুদ্ধি মূর্খে গাছ চিনে শুধু ফলে।

যখনি প্রতিভা আসি জন্মে এ ধরায়,
যুগান্তর না করি সে কখন না যায়।

অশান্তি, আঁধার, ঘোর দুর্দ্দশা যখন,
প্রতিভার আবির্ভাব অদূরে তখন।

দুঃখে দগ্ধ ধরা যবে করে হাহাকার,
তখনি প্রতিভা করে প্রতিকার তার।

নিদাঘের তীব্র তাপ অসহ্য যখন,
তখনি জলদ করে পানীয় বর্ষণ।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

রাজকীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের একটি বেতন-তালিকা অবধারিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল; বেতনের এই হার সকল প্রকার রিয়েল্‌স্কুল এবং অপসাধারণ উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত বেতনের হার অপেক্ষা উচ্চ। এই তালিকা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নয়টি স্থানের জন্য প্রথম শ্রেণী; বার্লিন্ এবং ফ্রুল্‌ফর্টার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল, সুতরাং ঐ দুই স্থান ইহার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। দ্বিতীয় শ্রেণী চৌত্রিশ স্থানের জন্য, এবং তৃতীয় শ্রেণী আটান্ন স্থানের জন্য। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূত নয়টি নগর রাজধানীর নীচে হইলে ও অন্যান্য নগর অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী এবং তাহাদের জিম্‌নাসিয়মের সংখ্যাও নয়টি হইতে অনেক অধিক। এই সকল নগরের রাজকীয় জিম্‌নাসিয়ম্-সমূহে প্রধান শিক্ষকের বার্ষিক বেতন ২৭০ পৌণ্ড; অন্যান্য শিক্ষক দিগের বেতন যোগ্যতা এবং কার্য্যকালের দীর্ঘতা অনুসারে ৯০ পৌণ্ড হইতে ১৯৫ পৌণ্ড পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর চৌত্রিশ নগরের হার, প্রধান শিক্ষকের বার্ষিক ২৪০ পৌণ্ড, এবং অন্যান্য শিক্ষকের বার্ষিক ৮২ পৌণ্ড ১০ শিলিং হইতে ১৭২ পৌণ্ড ১০ শিলিং পর্য্যন্ত। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত আটান্ন নগরের হার, প্রধান শিক্ষকের বার্ষিক ১৯৫ পৌণ্ড, এবং অন্যান্য শিক্ষকের বার্ষিক ৭৫ পৌণ্ড হইতে ১৫০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত। এই হারে যাহা নির্দ্দিষ্ট, তাহাই পদের নির্দ্ধারিত বেতন। যদি কোন পদের সঙ্গে সরকারী বাসার বন্দোবস্ত থাকে, তবে তাহার জন্য শতকরা ১০ পৌণ্ড কর্ত্তন করা হয়। কদাচিৎ কোন স্থানে দান-ভাণ্ডারের সাহায্যে শিক্ষক দিগের আয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বার্লিনের একটি বিদ্যালয়ে এই উদ্দেশ্যে কোন দাতব্য ভাণ্ডার হইতে বার্ষিক ৪৫৫ পৌণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রুশিয়ার কোন শিক্ষকের বেতনই বার্ষিক ৩৫০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত উঠেনা। সমগ্র প্রুসীয় রাজ্যের মধ্যে ফ্রুলফর্টা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রলোভনের সামগ্রী; কিন্তু তিনি ও মোটে বার্ষিক ৩০০০ পৌণ্ড এবং সরকারী বাসা পাইয়া থাকেন মাত্র। শিক্ষকতার সঙ্গে অন্য কোন কায করিতে পারিলে তাহাতে নিষেধ নাই; দৃষ্টান্ত যথা, বন্ নগরীয় জিম্‌নাসিয়মের প্রধান শিক্ষক লাটিন্ ভাষাবিৎ ডাক্তার শোপেন ঐ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের এক জন অধ্যাপক; কিন্তু এইরূপ বাহিরের কার্য্য দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্যে প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারিবে না; এবং এরূপ প্রতি বন্ধক ঘটিতেছে কি না, বিদ্যালয়ের পরিদর্শকেরা ও সে দিকে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যের ক্ষতি না করিয়া কোন শিক্ষক গৃহ-শিক্ষকতা দ্বারাও নিজের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে শ্রেণীতে পড়ান, সেই শ্রেণীর কোন ছাত্রের গৃহ-শিক্ষক হইতে হইলে প্রধান শিক্ষকের অনুমতি চাই। প্রুসীয় শিক্ষকের আয় এই রূপে নানা উপায়ে বর্দ্ধিত হইলেও ইংরাজের চক্ষে তাহা নিতান্ত সামান্য বলিয়াই বোধ হইবে।

প্রুসিয়ার লোকের আয় সর্ব্ব বিষয়েই ইংলণ্ড বাসীর অপেক্ষা ঢের কম, কিন্তু প্রুসীয়েরা মিতব্যয়ী এবং আড়ম্বরশূন্য। ১৮৫১

খৃষ্টাব্দে প্রথমে শিক্ষক দিগের বেতন-বৃদ্ধি হয়, তাহার পরে তাঁহার আয় ও বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু জর্ম্মন্ দিগের সচরাচর যেরূপ আয়, তাহাতে শিক্ষক দিগের এই আয় নিতান্ত অল্প বলা যায় না। স্কুলফর্টা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বার্ষিক আয় তিন শত পৌণ্ড, আর বাসাটির ভাড়া লাগেনা; কিন্তু তাঁহার চারিদিকে লোকের যদিও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাই, তথাপি তাঁহার অপেক্ষা অধিক সুখ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন এবং তাঁহার প্রতিবাসী লোকেরা যাহা করিয়া থাকে, তিনি তাহা করিতে পারেন; ইহাইত প্রকৃত বিভব। জর্ম্মন শিক্ষকেরা বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন; যে দেশ বিজ্ঞপ্তি-প্রাপ্ত হয় নাই, সেদেশে ধনের ন্যায় সম্মানের ও মূল্য আছে। মোটের উপর দেখা গিয়াছে, প্রুসীয় শিক্ষকেরা বিরক্ত অথবা অসন্তুষ্ট নহেন; দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা উৎসাহের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, এবং ইহাতে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

প্রুসীয় বিদ্যালয়, ছাত্র, এবং শিক্ষক-সম্বন্ধে এখনও যাহা বক্তব্য আছে, গ্রন্থকার যে দুই তিনটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের বর্ণনোপলক্ষে সে সকল কথা বলিবেন। এরূপ করিলে বর্ণনার সাহায্যে অনেক কথা পাঠকের সহজ-বোধ্য হইবে এবং পড়িতে তাঁহার আমোদ ও জন্মিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বার্লিনে চারিটি রাজকীয় জিম্নাসিয়ম আছে, তন্মধ্যে একটি রিয়েল্স্কুল্-যুক্ত; চারিটি নাগরিক জিম্নাসিয়ম্ আছে, তাহার মধ্যে ও একটি রিয়েল্স্কুল্-যুক্ত; তদ্ব্যতীত আর ও চারিটি নাগরিক রিয়েল্স্কুল্ এবং একটি উচ্চ বার্গার্ বিদ্যালয় আছে। এই সকল গুলিই ছাত্রদ্বারা পরিপূর্ণ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সকল বিদ্যালয়ে ৬,৮৭৪ জন ছাত্র পড়িত। ইহাদের কোন কোনটার সঙ্গে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাহাদের ছাত্র-সংখ্যা এ গণনায় ধরা হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও বার্লিনে বিদ্যালয়ের অভাব ঘুচে নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের নাগরিক সভার উচ্চশিক্ষা-বিধানার্থ বার্ষিক ব্যয় ছিল ৪০,০০০ পৌণ্ড; কিন্তু ইহাতেও অভাব দূর না হওয়াতে তাঁহারা আর ও কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সমস্ত প্রুসিয়া জুড়িয়া এই এক কথাই শুনা যায় যে, উচ্চ-শিক্ষার বাসনায় প্রণোদিত ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু তাহাদের জন্য যথেষ্ট-পরিমাণ বিদ্যালয় নাই। রাজকীয় সাহায্য বর্দ্ধিত হইতেছে, নাগরিক সভা-সমূহও সে জন্য ব্যয়-বৃদ্ধি করিতেছেন, তথাপি বিদ্যালয়ে ছাত্র ধরিতেছে না,—ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি করিয়াও ছাত্রের সংখ্যা কমাইতে পারা যাইতেছে না। যদি কোন নাগরিক কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম এবং অধিকার লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে সে জন্য যে নাগরিক

দরিদ্র-বিদ্যালয়ের ব্যয়-সম্বন্ধে কার্পণ্য হইবে না, আর শিক্ষা-বিষয়ক রাজকীয় ব্যবস্থার সর্ত্তানুসারে বিদ্যালয়টি চালাবার সংস্থান যে তাঁহাদিগের আছে, সেবিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষ-জনক প্রমাণ দিতে হইবে। সর্ব্বত্র এই রীতি প্রতিপালিত হয়। সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে বার্লিনের ফ্রেডারিক্ উইলিয়ম্ জিম্নাসিয়মই বোধ হয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রেক্রাঘার্স্ জিম্নাসিয়মের ছাত্র-সংখ্যা ইহার তুল্য বটে, কিন্তু প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি রিয়েল্‌স্কুল্ ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত আছে; আবার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজ-কন্যা এলিজাবেথ্ তাঁহার নামে যে বালিকা-বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন, তাহাও ইহার সঙ্গে মিলিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ২,২০০ ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে জিম্নাসিয়মে ৫৮১, রিয়েল্‌স্কুলে ৬০১, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫২২, এবং বালিকা-বিদ্যালয়ে ৪৯৬। সমগ্র প্রুসিয়াতে হেল্ নগরের রিয়েল-স্কুল্ বাদ দিলে কেবল এই বিদ্যালয়েই ছাত্র-বেতন দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। জিম্নাসিয়ম্, রিয়েল্‌স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়, এই চারিটির সাকল্য বার্ষিক ব্যয় ৬৫,০০০ থেলার, বার্ষিক ছাত্র বেতন আদায় হয় ৫৩,০০০ থেলার। ইহার বিদ্যাত্র সম্পত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহার বার্ষিক আয় ৪০০ থেলার মাত্র। এই অকুলান পূরণ করিবার জন্য রাজ-কোষ হইতে বার্ষিক ১০,০০০ থেলার প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই অকুলান কিন্তু জিম্নাসিয়মের জন্য নহে, কারণ তাহার ছাত্র-বেতনে ব্যয়-নির্ব্বাহ হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে; তবে তাহার সঙ্গে আর যে তিনটি বিদ্যালয় মিলিত আছে, তাহাদের জন্যই এই অকুলান পড়ে।

এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস যাহা, প্রুসিয়ার অনেক উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাস তাহাই। ধর্ম্ম যাজনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, কালে ইহা রাজকীয় তত্ত্বাবধানের অধীন হইয়াছে। জোহান্ হেকার্ কর্ত্তৃক ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিন নগরে সর্ব্ব প্রথম রিয়েল্‌স্কুল-স্থাপনের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। হেকার্ ফ্রেডারিক্‌ষ্টেটে ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন; তাঁহার যাজনাধীন ক্ষুদ্র বিদ্যালয় গুলিকে একত্র করিয়া তিনি তাহার রিয়েল্‌স্কুল নাম রাখেন। প্রথম হইতেই এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দেখা যায়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার ছাত্র-সংখ্যা ৮০৮ ছিল, ২০বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা ১২৬৭ দাঁড়ায়। ট্রিনিটি ধর্ম্ম-মন্দিরের যাজকেরা এবং তাঁহার নিযুক্ত পরিদর্শকেরা ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন; সামান্য গৃহ-সম্পত্তি ছাড়া ইহার আর কোন সম্পত্তিও তখন ছিল না, সাধারণের দানে এবং ছাত্র-বেতনে ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত। যে সকল বিদ্যালয় একত্রীকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে লাটিন্ বিদ্যালয়টি প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, এবং পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় ইহা ফ্রেডারিক্ উইলিয়ম্ জিম্নাসিয়ম্ এই নাম প্রাপ্ত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহার গৃহ পুন-র্নির্ম্মিত হয়, এবং রাজকোষ হইতে তদর্থে ১০,০০০ পৌণ্ড প্রদত্ত হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার-কালে অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়ের ন্যায় ইহাও রাজকীয় শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাধীন হয়। কেবল সাধারণের মতানুসারেই এ

পরিবর্ত্তন হয় নাই; সাধারণের কল্যাণার্থ রাজধানীর প্রধান বিদ্যালয়টী বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত হয়, এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের তত্বাবধায়কেরাও ইহাতে মত দিয়াছিলেন। ফ্রেডারিক্ উইলিয়ম্ জিম্‌নাসিয়ম্ এখন ব্রাণ্ডেন্‌বর্গের শিক্ষা-সমিতির তত্বাবধানে স্থাপিত; স্থানে স্থানে শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্রই এই সমিতির হাতে মূল বিভাগীয় তত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়।

এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রোটেষ্টাণ্ট্ সাম্প্রদায়িক। গ্রন্থকার যখন ইহা পরিদর্শন করেন, তখন ইহার ৬০০ ছাত্রের মধ্যে কেবল ২০ জন ক্যাথলিক এবং ১৫ জন য়িহুদি ছিল। একত্রীকৃত বিদ্যালয় গুলির প্রধান শিক্ষক একজন, এবং তাহাদের অধ্যাপনও একত্র সম্পাদিত। সর্ব্বশুদ্ধ ৬৬ জন শিক্ষক আছেন, তন্মধ্যে কেবল জিম্‌নাসিয়মেই ২১ জন। এই ২১ জনের মধ্যে ১১ জন উর্দ্ধতন শিক্ষক, এবং এই ১১ জনের মধ্যে ৬ কি ৭ জন শিক্ষক অধ্যাপকের উপাধি প্রাপ্ত। প্রধান শিক্ষক ডাক্তার কার্দিনাঙ্‌রাঙ্ক, ইহাঁর ভ্রাতা উক্ত নামের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ এখানে প্রধান শিক্ষক আছেন, এবং ৪০ বৎসরেরও অধিক হইল শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি এবং উর্দ্ধতন ৭ জন শিক্ষক বিদ্যালয়েই অবস্থিতি করেন। বিদ্যালয়-গৃহের জাঁকজমক বেশী কিছু নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অতীতের একটী স্মৃতি-চিহ্ন আছে, উহা হেকার্-প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদ্যালয়ের স্মরণিক লিপি। ইংলণ্ডের ন্যায় জর্ম্মনীতেও এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু ফরাসী দেশে এ প্রথা নাই। এখানে ছাত্রাবাস নাই; প্রথমে যে ছাত্রাবাস বিদ্যালয়েরই অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রেরই একরূপ বেতন, বার্ষিক ২৬ থেলার (৩ পৌণ্ড ১৮ শিলিং)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতনও তাই, কেবল রিয়েল্‌স্কুলে ২ থেলার কম। বার্লিনের একটি মাত্র বিদ্যালয়ে ফ্রেডারিক উইলিয়ম জিম্‌নাসিয়ম্ হইতে ৪ থেলার অধিক বেতন লাগে, আর সর্ব্বত্রই বেতনের পরিমাণ এক থেলার কম। প্রুসিয়ার বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্র-বেতনের বিশেষ ন্যূনাধিক্য পরিলক্ষিত হয়; স্থান এবং বিদ্যালয়ের অবস্থা-বিবেচনায় বেতন নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইংরাজের চক্ষে অল্প বোধ হইলেও রাজধানীস্থ বিদ্যালয়ে ছাত্র-বেতনের এই পরিমাণ অপেক্ষা কৃত অধিক। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-বেতনের হার নিম্ন হইতে ক্রমে অধিক হইয়াছে; দৃষ্টান্ত যথা, ওয়েট্‌স্লার্ জিম্‌নাসিয়মে বার্ষিক ছাত্র-বেতন ষষ্ঠ ও পঞ্চম শ্রেনীতে ১০ থেলার, চতুর্থ, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৬ থেলার, এবং দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেনীতে ২০ থেলার। কোনকোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-বেতন এতই কম যে নিম্নশ্রেনীতে ৮ থেলার এবং উচ্চ শ্রেনীতে ১৪ থেলার মাত্র। প্রুসিয়াতে বার্ষিক ছাত্র-বেতন গড়ে ২০ থেলারের কম ভিন্ন বেশী নহে। রিয়েল্‌স্কুল এবং উচ্চ বার্গার্ বিদ্যালয়ের বেতন সচরাচর জিম্‌নাসিয়ম্ হইতে কম নহে। ছাত্র-বেতন এইরূপ অল্প হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রেডা-

রিক উইলিয়ম জিম্‌নাসিয়মে নিম্ন শ্রেণীতে ১৬ থেলার এবং উচ্চ শ্রেণীতে ২০ থেলার মাত্র ছাত্র-বেতন ছিল। প্রাদেশিক কোন কোন বিদ্যালয়ে বেতন এতই অল্প ছিল যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়; এমন কি, কোন কোন বিদ্যালয়ে দুই, আড়াই ও তিন থেলার পর্য্যন্ত ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রেস্‌লা জিম্‌নাসিয়মে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সকলেরই বেতন ৮ থেলার লাগিত, এখন সেখানে সকলেরই বেতন ২৪ থেলার লাগে।

গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন, ফ্রেডারিক উইলিয়ম্ জিম্‌নাসিয়মে ৬০০ ছাত্রের মধ্যে শতকরা ১০জন বিনা বেতনে পড়ে। অবৈতনিক ছাত্র-সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ; কোন কোন স্থলে শতকরা ২৫ জন পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়িতে পায়; কিন্তু মোটের উপরে অবৈতনিক ছাত্র-সংখ্যা শতকরা ১০জনের অধিক হইবে না। যাহারা দরিদ্র, অথবা সাধারণের সাহায্যে যাহাদের কোনরূপ দাবি আছে, তাহারাই বিনা বেতনে পড়িতে পারে। ফ্রেডারিক উইলিয়ম্ জিম্‌নাসিয়মে কয়েকটি বৃত্তিরও বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু স্থানান্তরে কোন কোন পুরাতন বিদ্যালয়ের বর্ণনা-স্থলে সে বিষয়ের উল্লেখ হইবে।

বড় বড় বিদ্যালয়ে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে; আবার উচ্চশ্রেণীতে চল্লিশ ও মধ্য এবং নিম্ন শ্রেণীতে পঞ্চাশের অধিক ছাত্র একত্র পড়িতে পারিবে না বলিয়া যে নিয়ম আছে, তাহাও রক্ষিত হইতে পারে না। শিক্ষক অপেক্ষা স্থানের অকুলানই অধিক। যাহা হউক, ইংলণ্ডের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ন্যায় জর্ম্মণীর প্রথম শ্রেণীতেই ছাত্র-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ছাত্র-সংখ্যা খুব বেশী হইলে জর্ম্মণেরা প্রত্যেক শ্রেণীকে উচ্চ এবং নিম্ন এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়া লয়, অথবা দুই সমান অংশে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক অংশের অধ্যাপন-কার্য্য ঠিক সমান ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে।

গ্রন্থকার প্রথমেই প্রথম শ্রেণীতে ডাক্তার রাঙ্কের অধ্যাপন শ্রবণ করেন, তখন গ্রীক পড়া হইতেছিল। অধ্যাপক লাটিনে কথা কহিতে ছিলেন, ছাত্রেরাও লাটিনে তাহার উত্তর করিতেছিল। এই প্রথা পূর্ব্বে খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও অনেকটা আছে। এই প্রণালীতে জর্ম্মন্ বালকেরা লাটিন ভাষায় আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বন্ নগরের বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ডাক্তার সোপেন্ মুখে মুখে লাটিন ভাষায় যে অনুবাদ করান, তাহা শুনিয়া গ্রন্থকার চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ইংরাজ বালক অপেক্ষা জর্ম্মন্ বালকের লাটিন ভাষায় শব্দ-জ্ঞান এবং ভাষা-ব্যবহারের ক্ষমতা নিশ্চয়ই অধিক। কিন্তু ইংরাজ বালকেরা যেমন রচনাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করে, গ্রন্থকারের বিবেচনায় জর্ম্মন্ বালকেরা সেরূপ পারে না। পদ্য-রচনায় ইহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয়; এ সম্বন্ধে বড় বড় জর্ম্মণ পণ্ডিতেরাও কেবল যে নৈপুণ্য-বিহীন তাহা নহে, কিন্তু ভাল লাটিন জানা থাকিলে শব্দ-নির্ব্বাচনে যে রূপ দক্ষতা থাকা উচিত, তাহাও তাঁহাদের নাই। লাটিন গদ্য-সম্বন্ধেও এ কথা অনেকটা খাটে; ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের

উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র সিসিরো বা টেসিটসের অনুকরণে যেমন প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, জর্ম্মণীতে কোন ছাত্র তেমন পারিবেনা।

কিন্তু রুগ্‌বি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মনে যে ভাব হইত, বার্লিন্ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপন শুনিয়া গ্রন্থকারের তাহাই স্মরণ হইয়া ছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইটালীর প্রাচীন ভাষা-শিক্ষা-বিধায়ক বিদ্যালয়ে যেমন, সেইরূপ এখানেও এমন একদল ছাত্র প্রস্তুত হইতেছে, যাহারা গ্রীক্ পড়িতেছে, গ্রীক্ জানে, এবং গ্রীক্ নাটক গুলি সুন্দর রূপে বুঝিতে পারে। কোন্ নাটকের উদ্দেশ্য কি, তদুল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ও তাহাদের চরিত্র কিরূপ, আহার প্রধান স্থায়ীভাব কোন্‌টি, ইত্যাদি বিষয় রুগ্‌বি অপেক্ষা বার্লিনের ছাত্র ভাল বুঝে; কিন্তু লেখার পরিমাণ ও প্রণালী এবং তাহাতে অভিব্যক্ত ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। বৈকালে অধ্যাপক জমৃট্ যখন সিসিরোর বক্তৃতা পড়াইতেছিলেন, তখন ও এইরূপ ভাবই মনে হইয়া ছিল। বালকেরা বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ঐ বক্তৃতা অধ্যয়ন করিয়াছিল, এখন তাহারা দ্রুত গতিতে তাহার পুনরাবৃত্তি এবং জর্ম্মন ভাষায় তাহার অনুবাদ করিতেছিল। শিক্ষক যতদূর সম্ভব অল্প কথা বলিয়া ছাত্রদিগকে দিয়াই কায করাইতে ছিলেন, কেবল কোথা ও ভুল চুক কিছু হইলে তাহাই ধরিতে ছিলেন। বার্লিনের অন্যান্য বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাটিন অন্য যে সকল গ্রন্থের অধ্যাপন গ্রন্থকার দেখিয়া ছিলেন, তাহাতেও এইরূপ ছাত্রেরা পড়াটি বেশ ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল; যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন হইত কেবল সেই খানেই শিক্ষক এক আধটি কথা বলিতেন, অথবা ছাত্রদের যাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, এমন কোন তুল্যার্থ বাক্য উর্দ্ধৃত করিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া দিতেন। সচরাচর শিক্ষক কথা কহিতে হইলেই প্রশ্ন করিতেন, আর তাঁহার প্রশ্নে কিছু বাদ ও যাইত না। হোরেস্ নামক কবির ছন্দে বালক দিগের যথাযথ জ্ঞান দেখিয়া গ্রন্থকার বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রীতি এই, ছাত্রেরা ছন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এগারটি ওড্ নামক কবিতা গ্রহণ করে, এবং এই গুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলে আর অগ্রসর হয় না। এই গুলি আয়ত্ত হইয়া গেলে তখন তাহারা আদ্যোপান্ত পড়িয়া কবিতা গুলি শেষ করে। ইংলণ্ডের ভাল ভাল বিদ্যালয়ে এবং এখানে গ্রীক এবং লাটিনের দৈনিক পাঠ্য-পরিমাণে কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু বিদ্যালয়েই হউক আর ঘরেই হউক, ইংরাজ কিম্বা ফরাসী বালক অপেক্ষা জর্ম্মণ বালক অধিক পড়ে। এখানে ছাড়তি পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বালকেরা সাধারণতঃ হোমার পড়িয়া শেষ করে। ইংলণ্ড অপেক্ষা এখানে অধিক সংখ্যক বালকের এ সকল ভাষায় অধিকার জন্মে। জর্ম্মণেরা বিদ্যালয়ে থাকিতেই প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে উদার মত সংগঠন করে, এবং প্রত্যেক গ্রন্থকারের স্বদেশীয় সাহিত্যে এবং জগতের সাহিত্য-সমাজে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করে; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে জর্ম্মনেরা এবিষয়ে ইংরাজ

অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের ব্যুৎপত্তি কত অধিক। এই প্রকারে লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় ছাত্রের অধিকতর জীবন্ত আগ্রহ জন্মে, এবং ঐ সকল ভাষা-শিক্ষায় ফলও অধিককাল স্থায়ী হয়। এই বিষয়ে জর্ম্মণেরা যেমন শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ ইংলণ্ডের বালকেরা গ্রীক্ ও লাটিন রচনায়, বিশেষতঃ গ্রীক্ ও লাটিন পদ্য-রচনায় শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থকার বলেন, তিনি ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশে যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল দেশের বিদ্যালয়ে যে গ্রীক্ ভাষায় কবিতা লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এ কথা বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ। এক দিন দেখা গেল ফ্রেডারিক্ উইলিয়ম্ জিম্‌নাসিয়মে লেসিংকৃত চুট্‌কী কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার লিখিতে ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রেরা আপন আপন লেখা শিক্ষকের হাতে দিলে তিনি একটি ছাত্রকে দাঁড়াইতে বলিলেন। ছাত্রটি দাঁড়াইয়া নিজের কথায় প্রথম হইতে প্রবন্ধের মর্ম্ম বলিতে লাগিল; এবং কোন স্থানে ভ্রম হইলে শিক্ষক তাহা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। সে কিছুদূর বলিয়া গেলে তাহার পর হইতে আর এক জন বলিতে লাগিল, এইরূপে প্রবন্ধটি শেষ হইল। গ্রন্থকার ফ্রান্সের নর্ম্যাল্ বিদ্যালয়ে মলেয়ার্-কৃত "শিক্ষিতা রমণী" নাটক-গ্রন্থেরও এইরূপ অধ্যাপন দেখিয়াছিলেন। উভয় স্থলের অধ্যাপনই তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, আর তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে, ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপন অপেক্ষা উহা অনেক উচ্চ।

বিদ্যালয়ের মধ্য-বিভাগে লাটিনের আলোচনার যে পদ্ধতি দৃষ্ট হইল, গ্রন্থকারের মতে ইংলণ্ডে তাহাও প্রচলিত নাই। এখানে অধ্যাপনের বিষয় ছিল ওভিডের গ্রন্থ। বালকদিগকে এই ভাষার কিয়দংশ বাড়ীতে জর্ম্মন্‌ভাষায় অনুবাদ করিয়া আনিতে বলা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে তাহারা আবার উহা লাটিন্ গদ্যে পুনরনুবাদ করিতে আদিষ্ট হইল। ইহার পরে ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বালকদিগকে ওভিডের কবিতার কোন কোন স্থানে মুখস্থ আবৃত্তি করিতে বলা হইল; কিন্তু এ স্থলেও যে বালক যাহা আবৃত্তি করিল, জর্ম্মন্-গদ্যে তাহাকে তাহার অর্থও করিতে হইল।

পঞ্চম শ্রেণীতে ধর্ম্ম-শিক্ষাও শুনা গেল। এই শ্রেণী প্রাথমিক শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া এ রীতি মন্দ নহে; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রন্থকার পছন্দ করেন না।

বন্ নগরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে ধর্ম্ম-শিক্ষা শুনিয়াছিলেন, গ্রন্থকারের মতে তাহা নিতান্ত নিরর্থক এবং অনুপযোগী। বার্লিনের পঞ্চম শ্রেণীতে যে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেখা গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ ধর্ম্ম-গ্রন্থের কোন গল্পাংশ হইতে বালকদিগকে কয়েকটি সুন্দর প্রশ্ন করা হইল; তাহার পরে তাহারা লুথর্ কৃত প্রশ্নোত্তর মুখে মুখে বলিল; সর্ব্বশেষে তাহারা স্তুতি-গান আবৃত্তি করিল। উক্ত শ্রেণীতে যে দুই কি তিনটি ক্যাথলিক এবং য়িহুদি বালক ছিল, তাহারা ধর্ম্ম-শিক্ষার সময়ে উপস্থিত হয় নাই।

প্রুশীয় বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে

শিক্ষকেরা পুস্তক-নির্ব্বাচন করেন, কিন্তু বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতির সম্মতি-ব্যতীত সে নির্ব্বাচন কার্য্যকর হয় না। কোন নূতন পুস্তক উপস্থিত হইলে বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতি সম্মতি দিবার আগে শিক্ষা-সচিব এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মতামত লইয়া থাকেন। যখন কোন পুস্তক এক জিম্‌নাসিয়মের জন্য মঞ্জুর হয়, তখন তাহা তদ্বিভাগীয় অন্য জিম্‌নাসিয়ম্ বা প্রোজিম্‌নাসিয়মে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু জিম্‌নাসিয়মের জন্য মনোনীত পুস্তক রিয়েল্‌স্কুলে, বা রিয়েল্‌স্কুলের জন্য মনোনীত পুস্তক জিম্‌নাসিয়মে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন, ফরাসী শিক্ষা-সভা অথবা প্রুসিয়ার বিভাগীয় শিক্ষা সমিতি এবং শিক্ষা-সচিবের ন্যায় ইংলণ্ডেও পুস্তক-পরীক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইংলণ্ডের শিক্ষা বিভাগে অনেক বিষয়ে অরাজকতা আছে বটে, কিন্তু তথাকার পুস্তক-বিভ্রাটের কাছে আর কিছুই লাগে না। ইংলণ্ডে অধ্যক্ষেরা আপন আপন বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পারেন। অনেকে পুস্তকের ব্যবসায় করেন, এজন্য অন্য বিদ্যালয়ের প্রচলিত পুস্তক তাঁহারা চালান না, সুতরাং তাঁহাদের বিদ্যালয়ে কোন বালক পড়িতে গেলে তাহাকে সমস্তগুলি পাঠ্য পুস্তক কিনিতে হয়। এক বৎসরের মধ্যে কোন বালক যদি তিন কি চারিটি বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন করে, তবে তাহাকে তিন কি চারি প্রস্থ নূতন পুস্তক কিনিতে হয়। ইহা নিতান্তই অন্যায়। তাহার উপরে আবার ভালরূপে নির্ব্বাচিত না হওয়াতে এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই নিতান্ত জঘন্য; ইংলণ্ড ভিন্ন বিলাতের অন্য কোন দেশের উচ্চ-বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা এত অধিক জঘন্য পুস্তক পড়িয়া সময় নষ্ট করে না।

গ্রন্থকার গ্রেফ্রায়ারদিগের বিদ্যালয়েও পড়া শুনিতে গিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ও ফ্রেডারিক উইলিয়ম্ জিমনাসিয়মের তুল্য। ইংলণ্ডের ভাল ভাল বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই সকল বিদ্যালয়ের যত মিল আছে, ফরাসী বিদ্যালয়ের সঙ্গে তত মিল নাই। গ্রেফ্রায়ার বিদ্যালয়ের ইতিহাস এই।

পূর্ব্ব হইতে ফ্রান্সিস্-পন্থীদিগের একটা মঠ ছিল, সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারের সময়ে তাহা উঠিয়া যায়। তাহার পতন-ভূমিতেই ইহা স্থাপিত। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে সহর-মাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে উক্ত প্রদেশের সামন্ত-রাজ ঐ মঠের তৃতীয় অংশে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ করেন। সহরের শাসনকর্ত্তাগণ ইহার বিদ্যাত্র সম্পত্তির সংস্থান করিলেন, এবং সামন্তরাজও নিজে কিছু সম্পত্তি দিয়া উহা তাঁহাদিগের হাতেই ছাড়িয়া দিলেন।

এখানে পাঠের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহা হইতেই ষোড়শ শতাব্দীর লোকের বিদ্যানুরাগ বুঝিতে পারা যায়,—সপ্তাহে ১৩ ঘণ্টা গ্রীক, ১০ ঘণ্টা লাটিন, ২ ঘণ্টা ন্যায়, ২ ঘণ্টা পাটী গণিত এবং ৫ ঘণ্টা সংগীতের শিক্ষা হইত। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহার ছাত্র সংখ্যা চারি শত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এখানে মাতৃভাষার শিক্ষা আরম্ভ হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংরাজের প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মনেরা মাতৃভাষার আলোচনায় মনোযোগী হইয়াছে।

চরিত-কুসুমাঞ্জলি।

মানব জীবনের সঙ্গে পুষ্পের তুলনাটি অতি সমীচীন, অতি সুন্দর। উভয়ই সুগন্ধযুক্ত, উভয়ই সুন্দর, উভয়ই দেবার্চ্চনার উপকরণ। আদর্শ জীবন চিরদিনই লোকশিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল—বিশেষতঃ বর্ত্তমান দুর্নীতির যুগে আদর্শ জীবনের বড়ই প্রয়োজন। আমরা এখন হইতে মধ্যে মধ্যে এই পবিত্র সুগন্ধি কুসুম চয়ন করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই উপহারে অতীত এবং বর্ত্তমান উভয় শ্রেণীর জীবনই গৃহীত হইবে, এবং সম্ভবপর হইলে এই সঙ্গে বর্ণিত ব্যক্তির প্রতিকৃতিও থাকিবে। বলিয়াছি, আদর্শ জীবন লোক-শিক্ষার অনুকূল, কিন্তু সম্পূর্ণ আদর্শ জীবন মনুষ্যের নহে, তাহা দেবতার। অতএব আমরা যাঁহার জীবনে যেটুকু আদর্শ পাইব, তাহাই অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া, মাতৃভাষার গঙ্গা জলে ধৌত করিয়া, পরমারাধ্যা জন্ম-ভূমির চরণে অঞ্জলি দিব। যে ফুল দেবতার অঞ্জলিতে লাগে, তাহার ছোট বড় নাই, অগ্র পশ্চাৎ নাই—যখন যেইটি হাতে উঠে, তখন সেইটিই পূজায় লাগে। দ্রোণের মূল্য অধিক কি পদ্মের মূল্য অধিক, গন্ধরাজ অগ্রে দেয় কি রজনী গন্ধা অগ্রে দেয়, দেব-পূজার বিধানে তাহার কোন উল্লেখ নাই—কুসুমের সৃষ্টিকর্ত্তাও স্বয়ং তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ কি না সন্দেহ। আমরাও এই সংগ্রহে অঞ্জলিদানের রীতিই গ্রহণ করিব, যখন যেটি হস্তগত হইবে, তখন তাহাই পাঠককে উপহার দিব।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে আদর্শ জমিদারের বিশেষ প্রয়োজন। প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া প্রজা-পুঞ্জের সুখসমৃদ্ধির জন্য যাঁহারা প্রাণপণে যত্ন করেন, তাঁহারাই আদর্শ জমিদার। আজ আমরা যাঁহার চিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি তিনি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইনি খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী। ইঁহার নিবাস উত্তরবঙ্গে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনিয়া গ্রামে।

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের সমকালে এই বংশের এক জন আদি পুরুষ রামনাথ চাকী কুচবেহারের রাজ-সংসারে চাকুরী করিতেন। তাঁহার পুত্র রামনারায়ণ মোগলসম্রাট্দিগের নিকট হইতে ১০৯৪ বঙ্গাব্দে কাকনিয়ার জমিদারী এবং তৎসঙ্গে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুইশত বৎসরের অধিক কাল হইল মহিমারঞ্জনের বংশ সম্মানিত জমিদারের পদ-গৌরব উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের রামরুদ্র রায় চৌধুরী এবং তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহাদিগের জনহিতৈষণা এবং বিদ্যানুরাগ উভয়ই অসাধারণ ছিল। বেদান্ত-শাস্ত্রে শম্ভুচন্দ্রের অগাধ

শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।
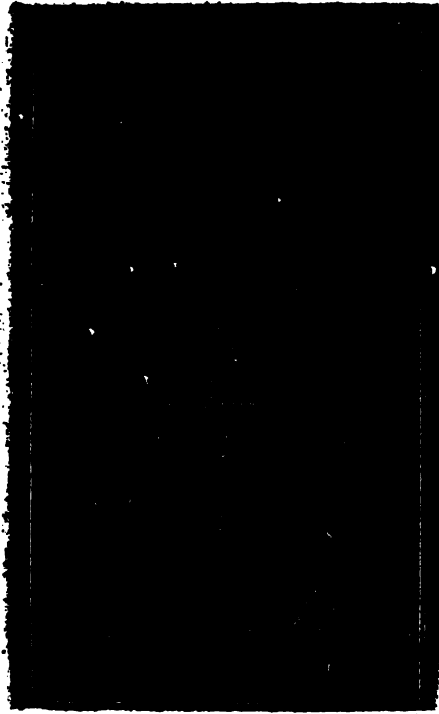
পাণ্ডিত্য ছিল, এবং সংস্কৃতের উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর যত্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজবাটীতে একটি বাঙ্গালা মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করেন, এবং নিজ-ব্যয়ে অনেকগুলি পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত হইতে পারস্যে এবং পারস্য হইতে সংস্কৃতে বহু গ্রন্থের অনুবাদ করান। তাঁহার স্থাপিত মুদ্রা-যন্ত্র আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং আজ প্রায় ৩৬ বৎসর হইল "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" নামে এক খানি সপ্তাহিক সংবাদ-পত্র রাজ-ব্যয়ে এই যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইয়া উত্তরবঙ্গের কল্যাণ সাধন করিতেছে। শম্ভুচন্দ্রের আর একটি অমর কীর্ত্তি তাঁহার স্থাপিত পুস্তকালয়; এই পুস্তকালয়ে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী এবং ইংরাজী বহুতর পুস্তক রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ হস্ত-লিখিত সংস্কৃত পুস্তকও ইহাতে আছে।

বর্ত্তমান রাজা মহিমারঞ্জন শম্ভুচন্দ্রের পুত্র। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি মহিমা-রঞ্জনের জন্ম হয়। রঙ্গপুর জেলা-স্কুলে মহিমারঞ্জন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অপ্রাপ্ত-বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়াতেই বোধ হয় বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া ইনি স্বয়ং রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। বড়লোকের সন্তানের

সুখ-ভোগের প্রলোভন প্রচুর, বিশেষতঃ অভিভাবক না থাকিলে এবং বিষয়াধিপত্য নিজের হাতে পড়িলে, সে প্রলোভন জয় করিবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই থাকে। যদি বা কেহ ভোগ-স্পৃহা দমন করিয়া বিষয়-সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলেও বৈষয়িক চিন্তা এবং বৈষয়িক কার্য্য তাঁহার সময়কে এমন ভাবে গ্রাস করিয়া ফেলে যে আত্মোন্নতির যত্ন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। মহিমারঞ্জন কিন্তু সে শ্রেণীর লোক নহেন। তিনি বিষয়-কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলা এবং দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াও যথেষ্ট আত্মোন্নতি করিতে পারিয়াছেন। যদিও পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনি ততটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অধিকার যথেষ্ট। ইংরাজীতে বলিতে কহিতে তিনি যেমন পটু, বিবিধ দুরূহ বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধিও সেইরূপ সহজে প্রবেশ করিতে পারে। তিনি একজন সুপটু বক্তা, ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকে অনেক সময়ে মোহিত হইয়াছেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার। তিনি একজন সুকবি এবং তন্ত্রী-যন্ত্র-বাদক। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ রুচি আছে, এবং তাঁহার রচিত অনেক গানও রহিয়াছে, কিন্তু তিনি নিজে গায়ক নহেন। তাঁহার বিনয় ও সদালাপ প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলেরই প্রীতিকর।

কিন্তু মহিমারঞ্জনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ প্রজা-রঞ্জন। তাঁহার সাধ্যায়ত্ত কোন বিষয়েই প্রজাবর্গের অভাব না থাকে, এই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ বাসনা; আর কার্য্য বা বাক্যদ্বারা কাহাকেও কষ্ট দিয়াছেন, মৃত্যুকালে একথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হইতে না হয়, এই তাঁহার প্রাণ-গত কামনা। নিজের বাস-ভূমি কাকিনিয়াতে ইংরাজী বিদ্যালয়, বঙ্গবিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং কবিরাজী, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার নিজ ব্যয়ে স্থাপিত হইয়া সাধারণের অসীম উপকার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর সহরে এবং নিজ জমিদারীর অনেক স্থানে আরও অনেকটি বিদ্যালয় আছে, বাড়ীতে সদাব্রত আছে, কাশীতে অন্নসত্র আছে। প্রতিবৎসর মাঘ মাসে কাকিনিয়াতে তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি শিল্প কৃষিপ্রদর্শিনী মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার বিস্তর টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার প্রজারা কলিকাতা প্রভৃতি দূরদেশে অর্থব্যয় করিয়া যাইয়া মেলা দেখিতে পারে না, তাই তাহাদিগের উপকারের জন্যই এত অর্থব্যয়। প্রজাদের মধ্যে কেহ দরিদ্র থাকে, মহিমারঞ্জনের সে ইচ্ছা নাই। অনেক প্রজাকে তিনি নিজ-ব্যয়ে গরু, গাড়ী ও লাঙ্গল কিনিয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রসাদে আজ তাহারা প্রায় সকলেই স্বচ্ছন্দ অবস্থার গৃহস্থ। অনেকে মনে করেন রাজানুগ্রহে প্রজাদের এইরূপ উন্নতি হওয়াতেই আজ কাল সে অঞ্চলে মজুর পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মবিষয়ে তিনি অত্যন্ত উদার ও নিরপেক্ষ। ব্রাহ্মের ব্রহ্মমন্দির, হিন্দুর ধর্ম্ম-সভা, মুসলমানের মসজিদ, কিছুতেই মুক্তহস্ত হইতে

তাঁহার আপত্তি নাই। কোন ধর্ম্মে তাঁহার বিদ্বেষ নাই, তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সার্ব্বভৌম ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। বালকদিগের ধর্ম্ম এবং নীতির আলোচনা ও উন্নতির জন্য তিনি একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দানে তিনি হিন্দুভাবাপন্ন অর্থাৎ আড়ম্বর শূন্য। দুঃখীর দুঃখ মোচন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রজার অভাব দূর করাই তাঁহার ব্রত। প্রজার খাজানা মাপ দিতে তাঁহার মত ক্ষিপ্রহস্ত জমিদার মোট বাঙ্গালায় বোধ হয় অতি অল্পই আছেন। কোন কর্ম্মচারী যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পীড়িত হন, তাহা হইলে দুই চারি বৎসর কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইতে না পারিলেও তিনি পূর্ণ বেতন পাইয়া থাকেন। কর্ম্মচারীদিগের মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের অসহায় স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের ভার রাজা বাহাদুরই লইয়া থাকেন। যাহারা রাজ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য, এমন অনেক ব্যক্তির পরিবার ইহাঁর নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। বঙ্গদেশে আর কত জন জমিদার এভাবে প্রজারঞ্জন ও অমাত্যপালন করিয়া থাকেন, আমরা জানিনা।

মহিমারঞ্জনের সুযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র শ্রীমান্ কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী সংপ্রতি বিষয়কার্য্যে পিতার বিশেষ সাহায্য করিতেছেন, সুতরাং রাজা বাহাদুর বিষয় ব্যাপারে কতকটা শিথিলচেষ্ট হইয়া আত্মচিন্তা ও ধর্ম্মালোচনায় বিলক্ষণ অবকাশ পাইয়াছেন। মহেন্দ্ররঞ্জন ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সংস্কৃত-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যাহা হউক, এখনও আর্য্য-জাতির গৌরব-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন।

মহিমারঞ্জনকে সম্মানিত করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যথার্থই রাজোচিত কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ইহাঁকে রাজা উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি এই সম্মানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সম্মান এবং সুখশান্তি উপভোগ করুন, আর চিরদিন প্রজা-পুঞ্জের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুন ইহাই ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

প্রেম ও বৈরাগ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইহাই-এক্ষণে আমরা প্রেম-বৃত্তির বিকাশ-প্রথা ও কার্য্য-প্রণালী দেখিলাম। প্রেম কি বুঝিলাম। কিন্তু প্রেম যদি আমাদের ধর্ম্মজীবন- লাভের এতদূর সহায় হইল;- তবে বৈরাগ্য কি কায করে? ধর্ম্মোপদেশকদিগের মুখে যে বৈরাগ্যের এত প্রশংসা, সে বৈরাগ্যের স্থান কোথায়? আমরা যে প্রথম প্রশ্ন করিয়াছি, প্রেমের সহিত সেই বৈরাগ্যের সম্বন্ধ কি? প্রেমের প্রবাহ-যেমন অগ্রসর হইয়া ধাবিত হইতে থাকে, আত্মা

ক্ষুদ্র গল্প। পাগলী গাই। (সত্যমূলক।)

গোপালের একটি গাই ছিল। তাহার ক্ষুধা হইলেই সে যাহাকে দেখিত তাহাকেই মাথা নাড়িয়া মারিতে যাইত, কিন্তু কাহাকেও মারিত না, কিছু খাইতে দিলেই শান্ত হইত ; এই জন্য গোপাল তাহার পাগলী নাম রাখিয়া ছিল।

গোপাল পাগলীকে যেমন ভালবাসিত, পাগলী ও গোপালকে সেইরূপ ভালবাসিত। গোপাল প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া আগেই পাগলীকে কিছু খাইতে দিত, এবং গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কিছু কাল তাহার আদর করিত, তাহার পরে পড়িতে বসিত। আবার বিদ্যালয় হইতে আসিয়া আগেই পাগলীকে খাইতে দিত, পাগলীর আদর করিত, তাহার পরে সে হাত পা ধুইয়া নিজে খাইত। গোপাল যেন পাগলীর সকল মনের ভাবই বুঝিত, এবং মানুষের মত তাহার সঙ্গে কথা কহিত।

পাগলী গর্ভবতী ছিল, একদিন সকালে মাঠে ঘাস খাইতে যাইয়া বিয়াইল। এই তাহার প্রথম বিয়ান।

রাখাল ও আর যে সকল লোক নিকটে ছিল, তাহারা বাছুর দেখিতে যাইতে ছিল, কিন্তু পাগলী তাহাদিকে মারিতে গেল, কাযেই তাহারা কেহ বাছুরের নিকটে যাইতে সাহস পাইল না। গোপালের বাড়ী নিকটেই ছিল, রাখাল গোপালকে ডাকিয়া সংবাদ দিল।

গোপাল সংবাদ পাইয়াই পড়া ছাড়িয়া দৌড়িয়া মাঠে গেল। মাঠে যাইয়া সে দেখিল, পাগলী বাছুরের গা চাটিতেছে, আর কেহ একটুকু নিকটে আসিলেই তাহাকে তাড়িয়া মারিতে যাইতেছে।

গোপাল যাইয়া পাগলী বলিয়া ডাক দিলেই পাগলী তাহার দিকে চাহিল, এবং হঁঃ, হঁঃ করিয়া আহ্লাদের সহিত একরূপ শব্দ করিতে লাগিল। গোপাল মনে করিল, পাগলী যেন বলিতেছে, "দেখ দেখি আমার কেমন সুন্দর বাছুর হইয়াছে! তুমি এতক্ষণ বাছুর দেখিতে না আসিয়া কি করিতে ছিলে? অন্য লোকে বাছুরটা লইয়া যাইবে বলিয়া আমি তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিতেছি না।"

গোপাল পাগলীকে আদর করিয়া কথা কহিতে কহিতে যাইয়া বাছুরটি ধরিয়া তুলিল; পাগলী ও কাছে দাঁড়াইয়া একবার বাছুরকে, আরবার গোপালকে চাটিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল যেন দুইটির উপরেই তাহার সমান স্নেহ। লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল।

গোপাল ছেলে মানুষ, বাছুরটি কোলে লইতে তাহার খুব কষ্ট হইল। কিন্তু পাগলী আর কাহাকেও নিকটে আসিতে দিলনা, কাযেই গোপাল অতি কষ্টে বাছুরটি লইয়া আগে আগে যাইতে লাগিল, পাগলীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী গেল।

গোপালের দাদা বিদেশে চাকরী করেন। গোপাল গ্রামের বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া জলপানী পাইল, সুতরাং তাহাকেও পড়ার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশ যাইতে হইল। বিদেশ যাইবার কয়েক দিন আগে হইতে

গোপাল প্রায় সর্ব্বদাই পাগলীর কাছে থাকিত, তাহার সঙ্গে কথা কহিত, তাহার গায়ে হাত বুলাইত, আর তাহাকে খাইতে দিত। পাগলীকে ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে হইলেই গোপালের অত্যন্ত কষ্ট হইত।

গোপালের যাইবার দিন আসিল। গোপাল ভাত খাইল, কাপড় চোপড় ও পুস্তকাদি বাঁধিয়া সঙ্গের লোকের কাছে দিল, এবং মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া পাগলীর কাছে গেল। পাগলী মাথা গুঁজিয়া খাইতেছিল, গোপালকে দেখিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। গোপাল তাহাকে সোহাগ করিতে লাগিল, তাহার গায়ে হাতবুলাইয়া দিল, এবং তাহাকে বলিয়া কহিয়া বিদায় লইল। যাইবার সময়ে গোপাল মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষের জল পড়িতেছে। পাগলীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও চক্ষের জল ছাড়িয়া দিয়াছে! গোপালেরও চক্ষে জল আসিল; কিন্তু পড়িতে না গেলেত চলে না, কাযেই সে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিতে লাগিল। কাঁচা বাছুর হারাইলে গাই যেমন করিয়া ডাকে, গোপাল চক্ষের আড়াল হইলে পাগলী সেইরূপ হাম্বা হাম্বা করিয়া কয়েকটা বিশাল ডাক ছাড়িল। সে দিন পাগলী ভাল করিয়া খাইল না; গোপাল যে পথে গিয়াছে, সমস্ত দিনই ফিরিয়া ফিরিয়া সেই পথের দিকে চাহিল আর ডাকিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোপাল আসিল না দেখিয়া সে এত ডাকিয়া ছিল যে, তাহার ডাকে পাড়ার লোক অস্থির হইয়াছিল।

গোপালের মার সম্পত্তির মধ্যে দুই ছেলে আর পাগলী গাই। গোপাল বাড়ী হইতে গেলে তিনি একেবারে অস্থির হইলেন, এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিন রাত্রি মালা জপ সার করিলেন। পাগলী অনেক খানি করিয়া দুধ দিত; গোপাল বাড়ী হইতে যাওয়ার পর হইতে গোপালের মা দুধ ছাড়িলেন, এবং পাড়ার লোককে পাগলীর দুধ বিলাইয়া দিতে লাগিলেন।

পাগলীও গোপালকে ভুলিল না। সে গোপালের নাম শুনিলেই হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকিত, আর দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিত। পাড়ার লোকে অনেক সময়ে আসিয়া তামাসা দেখিবার জন্য মিছামিছি করিয়া গোপালকে ডাকিত। পাগলী গোপালের নাম শুনিলেই খাওয়া ছাড়িয়া মাথা তুলিত, কাণ খাড়া করিয়া পথের দিকে চাহিয়া ডাকিত, আর দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিত।

গোপাল বাড়ী হইতে যাওয়ার পর হইতে গোপালের মা প্রায়ই আহার করেন না। তাঁহার শরীর একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি গোপালের আদরের জিনিস বলিয়া তিনি পাগলীর সেবা করিতে লাগিলেন।

বর্ষা আসিল। গোপালের মা এত কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তিনি বর্ষার জল-কাদার মধ্যে আর পাগলীর যত্ন করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া পাড়া প্রতিবাসীর পরামর্শে পাগলীকে বিক্রয় করিতে হইল। ক্রয়কারী যখন পাগলীকে লইয়া চলিল, তখন পাগলীও কাঁদিল, গোপালের মাও কাঁদিলেন।

কিছু দিন পরে গোপাল বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়াই গোপাল পাগলীর ঘরের দিকে চাহিয়া মাকে পাগলীর কথা জিজ্ঞাসা করিল, গোপালের মা পাগলীনির জন্য যে কষ্ট পাইয়াছেন, আগে সে সব কথা বলিয়া পরে পাগলীর বিক্রয়ের কথা বলিলেন। শুনিয়া গোপালের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে মার কষ্ট কমিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া সে মনকে প্রবোধ দিল।

গোপাল এখন বড় হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, টাকা পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু এখনও পাগলীর কথা উঠিলে তাহার চক্ষে জল আইসে। সেই হইতে আর কখনও গোপাল গরু পোষে না।

যেমন ক্ষুদ্রাকার হইতে বৃহত্তর আকার ধারণ করিতে থাকে, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর আত্মার জন্য যে ক্ষুদ্র-আত্মার প্রতি উদাসীনতা, তাহাই বৈরাগ্য। পরিবারের হিতের জন্য যে নিজ আরামের প্রতি অনাস্থা, তাহা বৈরাগ্য। স্বদেশের হিত-কামনায় যে নিজ পরিবারের প্রতি উদাসীনতা তাহা বৈরাগ্য। সমগ্র মানব মণ্ডলীর হিতার্থ যে স্বজাতির প্রতি উদাসীনতা, তাহা বৈরাগ্য। ভগবৎপ্রেমে উচ্ছলিত-হৃদয় হইয়া সকল বিষয়ে যে উদাসীনতা, তাহা ও বৈরাগ্য—বোধ হয় তাহাই চরম বৈরাগ্য। এই রূপে ক্রমশঃ উচ্চাঙ্গের বৈরাগ্যের সাধন হয়। কিন্তু এই বৈরাগ্য প্রেমের পশ্চাদ্বর্ত্তী। প্রেম বর্ষার নদীর ন্যায় দুকূল প্লাবন করিয়া তরঙ্গোচ্ছাস তুলিতে তুলিতে সাগরের দিকে ধাইতেছে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই তীরে যে বন্যা-জল-পরিত্যক্ত বেলা-ভূমি রহিয়া যাইতেছে, তাহাই বৈরাগ্য। কদলী বৃক্ষ যেমন নূতন নূতন কোষ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং অবশেষে সর্ব্বমধ্যভূত সার ভাগ দ্বারা ফল প্রদান করে, আর বাহিরের কোষগুলি ক্রমশঃ মলিন ও শুষ্কপ্রায় হইতে থাকে, প্রেম ও সেইরূপ স্বপরিবার, স্বগ্রাম, স্বদেশ প্রভৃতি নব নব কোষ গ্রহণ করিয়া প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং ভগবৎ প্রেমরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয় এবং প্রথম প্রথম কার কোষ গুলি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক প্রায় হইয়া আইসে। এই যে প্রথম কার কোষ গুলির শুষ্ক প্রায়তা, ইহাই বৈরাগ্য। কিন্তু ইহা ও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বাহিরকার কোষ গুলি শুষ্ক প্রায় হইলেও তাহাদিগকে একবারে তুলিয়া ফেলিয়া দিবার উপায় নাই, তাহা হইলে কদলী বৃক্ষ ও প্রাণে মরিবে মানব-সমাজ ও বিধ্বস্ত হইবে, কাহার ও ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবেনা। বাহিরের কোষ গুলিই ভিতরের সার বস্তুর আবরণ, রক্ষা ও বৃদ্ধির সহায়তা করে।

বৈরাগ্যকে অনেক সময়ে স্বার্থ-ত্যাগ বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কিন্তু স্বার্থ-ত্যাগ নহে, কেবল বৃহৎ স্বার্থের জন্য সামান্য স্বার্থের ত্যাগ। আমার হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহগত "আমি" প্রেম পুষ্ট হইয়া পরিবার গত "আমি" হইল, সেই পরিবার গত "আমি" নিজসমাজগত "আমি" হইল, নিজ-সমাজগত "আমি" আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডগত এবং তৎপরে ব্রহ্মগত "আমি" রূপ ধারণ করিল। সেই শেষ অবস্থাতেও "সোঽহং"। অহং ত আর কোথাও ঘুচিল না তবে বড় "আমি"র জন্য ছোট "আমি"র কিছু ক্ষতি করা স্বার্থ-ত্যাগ না স্বার্থ-বৃদ্ধি? বাড়ীর গৃহিণী যে তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পান না করিয়া, সন্তানবর্গের পরিবার বর্গের সেবায় অবিরাম পরিশ্রম করিতে থাকেন, তিনি কি তাহাতে স্বার্থ-ত্যাগ করিতেছেন বলিয়া ভাবেন? প্রতিবেশিনীরা আসিয়া বলে বটে "আহা গৃহিণী, তোমার কত কষ্ট হইতেছে"। কিন্তু তাহারা যে বাহিরের লোক; প্রেমের বলে গৃহিণী যে সমস্ত পরিবারটির সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তিনি যে এক তিলার্দ্ধের জন্যও ভাবেন না যে পরের জন্য খাটিতেছেন, বরং ভাবেন আপনার জন্য আপনি খাটিতেছেন,

তাহাতে আবার কষ্ট-স্বীকার কি হইল? এ কথা বাহিরের অপ্রেমিক লোকে কি করিয়া বুঝিবে? স্বদেশবৎসল স্বদেশের জন্য, ভগবদ্ভক্ত দেশ-কাল-জাতি-নির্ব্বিশেষে লোক-হিতার্থ যে সকল কঠোর ব্রত, কঠোর তপস্যা সাধন করেন, তাঁহারা কি সে সকল ত্যাগ স্বীকার বলিয়া কখন ভাবেন? বাহিরের অপ্রেমিকগণ বলিয়া থাকেন বটে বড় ত্যাগ স্বীকার, কিন্তু তাঁহারা ভাবেন তাঁহারা নিজের কায করিতেছেন। অনেক অপ্রেমিক লোক এই সকল প্রেমিক লোকের অনুকরণে বড় কায করিতে যান, কিন্তু দুই দিন না যাইতে যাইতেই বলিতে থাকেন, এত কায করিলাম; ইহার প্রতি-দান কি? প্রেম কি কখন প্রতিদান চায়? কাহার নিকট চাহিবে, পরকে যে পর রাখেনা, সে আর প্রতিদান চাহিবে কিরূপে, আপনার নিকট কি কেহ প্রতিদান চায়? অগ্রে প্রেমিক হওয়া চাই, আপনাকে বড় করা চাই, তবে বড় কাযে হাত দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। অতএব প্রেম-প্রবাহের মুখ সর্ব্বদা অনর্গল রাখিতে হইবে, যাহাতে ইহা পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে বিস্তৃত হইয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হইতে পারে। অনেকে এমন বলিতে পারেন যে, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে অগ্রসর হইবার আবশ্যক কি, চৈতন্য নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কেমন একবারে বিশ্বপ্রেমিক ভগবদ্ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুকরণ করিলে কি হয় না? তাঁহাদের অনুকরণ একবারে অসম্ভব। সোডা লেমনেডের শিশির ভিতর বলপ্রয়োগ দ্বারা অনেক পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, সেই জন্যই সিপিটি নাড়িতে না নাড়িতেই সেই বায়ু বুদ্বুদ তুলিয়া প্রবলবেগে বহির্গত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হয়; সেইরূপ এই সকল মহাত্মা বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলেই হউক বা ভগবানের বিশেষ প্রসাদাৎ-ই হউক, মহাপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধরা-ধামে জন্মগ্রহণ করেন, সে প্রেম অচিরেই বন্যার ন্যায় দেশ বিদেশ ছাইয়া ফেলে। লেমনেডের বোতলে যতটুকু বায়ু থাকিতে পারে, যদি ঠিক ততটুকুই থাকিত, এবং তাহাকে পূর্ব্ববৎ বেগবান করিতে হইত, তাহা হইলে তাহাতে অনেক তাপ-সংযোগের আবশ্যক হইত, অনেক সময় লাগিত, অনেক কাঠখড় পুড়িত। সেইরূপ সাধারণ লোককেও মহাত্মাদের ন্যায় প্রেমবান্ হইতে হইলে সময় সাপেক্ষ হইয়া পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে চলিতে হইবে, সদ্বৃত্তি সকলের ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি সমস্ত ডিঙ্গাইয়া একবারে ষোল আনা সাধু হইতে চাই, তাহা হইলে কেবল ভণ্ডামি বই আর কিছুই লাভ হইবে না।

শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩০২ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

প্রেম ও বৈরাগ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, উহা সোজা এবং স্বাভাবিক পথের। যে বৈরাগ্যের কথা বলিলাম, তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু একটি উল্টা পথ ও আছে,—এক প্রকার উল্টা বৈরাগ্যও আছে। সেই বৈরাগ্যের পক্ষপাতীগণ ধর্ম্ম-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই বজ্র-গম্ভীর নিনাদে উপদেশ দিতে থাকেন "ওরে! আমি, আমার করিস্ কি, যদি ধর্ম্ম চাস্ তবে "আমি" টাকে আগে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল।" এই উপদেশ মত সেই "আমি কে" নষ্ট করিবার জন্য অনেক কলকৌশল—উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু "আমি" কি কখন নষ্ট হইতে পারি,—আমি জগতের মধ্য-বিন্দু, আমি বিস্তৃত হইয়া,—সমস্ত জগৎকে আমার মধ্যে আনিব, সকলকে আমার করিব; সেই আমি কি কখন নষ্ট হইতে পারি? আমাদের শাস্ত্রে যে প্রেমোপদেশ আছে, তাহাতেও, "আমি" কে নষ্ট করিতে বলে না। সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন করিবে ইহাই উপদেশ,—"আত্ম" কে নষ্ট করিতে ইহা বলে না। যীশুখ্রীষ্ট জগতের একজন প্রেমাবতার, তাঁহার উপদেশ "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভাল বাসিবে।" কই এ উপদেশও ত "নিজ" কে নষ্ট করিতে বলে না। "আমি"ই হইলাম মাপকাঠি। আমরা সকলেই আপনার আপনার "আমিকে" সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসি। এই ভালবাসার মাপে সকলকে ভাল বাসিতে হইবে। যদি মাপ কাঠিটা ভাঙ্গিয়া ফেলি, তাহা হইলে আর মাপ করিব কি দিয়া? কিন্তু এই প্রখর বৈরাগ্য-বাদীরা সে কথা শুনিবেন না। "আমি" বেচারীর উপর প্রচণ্ড উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দেন, প্রেম-প্রবাহের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে শুকাইয়া ফেলিতে প্রয়াস পান, ইন্দ্রিয় সকলকে নিগ্রহ করিতে থাকেন। বিষয়, সংসার, প্রভৃতিকে মহাবিষ ভাবিয়া তফাতে যাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অমর "আমি" ইহাতে কি মরে? একটি নবোদগত সতেজ বৃক্ষচারার উপর যদি কোন ভারি পদার্থ চাপাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে সেই বৃক্ষচারা না মরিয়া যেমন বিকৃত ভাবে বক্রদিকে বহির্গত হইয়া পাকে, এই সকল বৈরাগ্য-বাদী

সাধুরও সেই দশা উপস্থিত হয়। আর সংসার ছাড়িয়াই বা যাবেন কোথায়? ঘুরিয়া ফিরিয়া সংসারের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হয়। সাধু আসিয়া হুকুম করিলেন, "বাবুজি, সের ভর আটা পোয়া ভর ঘীউ দিজিয়ে, ঠাকুরজীকা ভোগ লাগেগা।" ভোগ যে কাহার লাগিবে তা ঠাকুরজীই জানেন। পরিমাণে কিছু কম হইলেই সাধুর চক্ষু লাল হয়। ইহারাই আবার "আমিকে" বিনাশ করিয়াছে! ইহা অতি সাধারণ সাধুর দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু অসাধারণ সাধুদের ও প্রায় এক রকমে না আর একরকমে বিকৃতাবস্থা। (১) কেবল এই সাধুরা প্রধানতঃ কি যুক্তিতে এইরূপ মতাবলম্বী হন? সংসারের শোক-তাপের,পাপ মলিনতার, জ্বালা যন্ত্রনার ভয়ে। ভাগীরথী-বারি যদি গোমুখীর নিকট স্থির থাকিয়া সিদ্ধান্ত করে, "আমি যদি এই নিম্নস্থ মৃণ্ময় ভূভাগ বাহিয়া, জন-সমাজের মধ্য দিয়া, প্রবাহিত হইয়া সাগর সঙ্গমে যাই, তাহা হইলে ত আমাকে অনেক মলিনতা, অনেক জঞ্জাল, অনেক শব-দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া যাইতে হইবে; অতএব আমি বাষ্প হইয়া আকাশ-মার্গে উড়িতে উড়িতে যাইয়া সাগরের সহিত মিশ্রিত হই," তাহা হইলে যেরূপ যুক্তির কথা হইত, এই সকল বৈরাগ্য-বাদীরা সেইরূপ যুক্তিরই অনুসরণ করেন। তাঁহারা সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া, হৃদয়ের প্রেম-প্রবাহ-ধারার মুখ বন্ধ করিয়া, হিমালয়-শৃঙ্গের গভীর গহ্বরে কলকৌশলদ্বারা তাহাকে বাষ্পে পরিণত করতঃ আকাশপথে যাইয়া যদি সম্ভব হয়, ভগবৎসম্মিলন করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের উপকার হইলে হইতে পারে। কিন্তু যদি তাঁহারা প্রেমের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া সংসারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেন, তাহা হইলে স্বাভাবিক উপায়ে কল-কৌশলের সাহায্য-ব্যতীত অনায়াসে তাঁহাদের সাগর-সঙ্গম হইত। এবং দুইচারিটা শব-দেহ বা কিছু জঞ্জাল বহন করিলেও, ভাগীরথী-বারির ন্যায় জনসমাজে সুখ সৌভাগ্য বিতরণ করিতে করিতে, আনন্দের লহরী তুলিতে তুলিতে, প্রবাহিত হইয়া যাইতেন।

এইমতকেই বলে উল্টা বৈরাগ্য। এই মতের পক্ষপাতীরা স্বাভাবিক প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকে সহজ করিতে চেষ্টা করেন, প্রেমের সকল পর্য্যায় ত্যাগ করিয়া একবারে সর্ব্বোচ্চ ভগবৎপ্রেমের প্রয়াসী হন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অঙ্ক কষিতে দিলে সুবোধ ছেলেরা যত্নের সহিত আগা গোড়া গুণভাগ সমস্ত করিয়া, সমস্ত প্রক্রিয়া ঠিক করিয়া লিখিয়া যথার্থ উত্তরটি বাহির করে; ইহাতে তাহাদের উন্নতি হয়, অঙ্ক কষা সার্থক হয়। কিন্তু এমন চতুর ও আহাম্মক ছেলে অনেক আছে, যাহারা গুণ ভাগ করার ভয়ে, কিম্বা বুদ্ধির অভাবে কিছু না করিয়া পরের দেখিয়া কিম্বা পুস্তকের শেষ হইতে উত্তরটি লিখিয়া লয়। যাঁহারা সংসারে প্রেমিক না হইয়া সংসারের

(১) লেখক মহাশয়ের প্রদর্শিত পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সাধুত্বে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও কি বিকৃত অবস্থা? অথবা সেরূপ সাধু কি নাই? বোধ হয় এ কথা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। শিঃ পঃ সঃ।

কার্য্য না করিয়া একবারে ভগবৎপ্রেমিক হইতে ইচ্ছা করেন, এবং ভগবৎপ্রেমিকের ভাব ধরেন, তাঁহারা ঠিক এই বালকদের শ্রেণীর লোক। শিক্ষক কিন্তু এরূপ বালককে জানিতে পারিলেই বিদ্যালয়ের বাহির করিয়া দেন। সমাজ তাহা পারে না, বরং অনেক সময়ে ইহাঁদেরই পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে থাকে।

এইরূপ অস্বাভাবিক আত্মপীড়ন-মূলক উল্টা ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া সংসারের কার্য-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে করিতে, প্রেম ও আত্মার প্রসারণ করিতে করিতে অগ্রসর সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। আমাদের চতুরাশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য ও তাহাই।

এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন, যদি এই সংসারের কার্য্য করিতে করিতেই জীবন কাটিয়া যায়, তবে পরকালের দশা কি হইবে? কিন্তু ইহকালে আর পরকালে কি কিছু ভেদ আছে? আ'জের সহিত কা'লের যে সম্বন্ধ, ইহকাল আর পরকালে কি ঠিক সেই সম্বন্ধ নয়? মৃতব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আর মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তে কি ঠিক সেই সম্বন্ধ নয়? হস্তদ্বারা কোন বল নিক্ষেপ করিলে, যতক্ষণ সেই শক্তির ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ যেমন সেই বল নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিতে থাকে, আমরা ইহ লোকের কার্য্য কলাপ দ্বারা যেরূপ মতি-রতি-বাসনারূপ শক্তি আত্মায় নিয়োগ করি, আত্মাও সেই শক্তি-ক্ষয়-পর্য্যন্ত সেই নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিতে থাকেন। তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমন। শরীরের বিনাশরূপ মৃত্যু কেবল ভ্রমণকালের ডাক পরিবর্ত্তন। যেমন অনেক দূর যাইতে হইলে এক ঘোড়ায় বা এক গাড়ীতে চলে না, মধ্যে মধ্যে, যান-পরিবর্ত্তন করিতে হয়, জীবাত্মা ও তাহার সুদীর্ঘ ভ্রমণে বা রোগগ্রস্ত শরীররূপ ক্লান্ত ঘোড়া বা স্প্রীং ভাঙ্গা গাড়ী ত্যাগ করিয়া নূতন গ্রহণ করে মাত্র। ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাহাই যদি হইল, আরোহীরূপ দেহী আত্মার যদি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হইল, মৃত্যুর পূর্ব্বে যেরূপ মতি-রতি-বাসনা সংগ্রহ করিয়াছে, মৃত্যুর পরও যদি ঠিক তাহারই বাধ্য হইয়া, তাহাদ্বারাই প্রেরিত হইয়া আত্মাকে চলিতে হয়, তবে ইহকালে আর পরকালে প্রভেদ কি রহিল? ইহকালের যাহা যথার্থ কল্যাণকর, পরকালের ও কি তাহাই যথার্থ কল্যাণকর নয়? তবে আর লোকের সম্মুখ হইতে ইহকালের পটখানি একবারে সরাইয়া লইয়া শুদ্ধ পরকালের পটখানি ধরিবার আবশ্যক কি? ইহকাল এবং পরকাল একটী ধারাবাহিক স্রোতঃ, এই বিশ্বাসে ইহকালের কল্যাণপ্রদ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলেই কি যথেষ্ট পরকালের সঞ্চয় করা হয় না? অতএব পূর্ব্বে সংসার ক্ষেত্রে প্রেমপ্রেরিত কার্য্য সম্পাদনরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রথার বর্ণন করিয়াছি, তাহাতে পরকাল সম্বন্ধীয় কোন ব্যত্যয়ই হইতে পারে না।

অবশেষে আমি এই কথা বলিতে চাই। এই ভারতবর্ষ—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের চরণে বিক্রীত। ভারতবর্ষীয় আর্য্য মাত্রেই ইহাঁদিগকে ভগবানের অবতার বোধে হৃদয়ের হৃদয়ে পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহাঁদের চরিত্রের আদর্শ কিরূপ। যে

স্বাভাবিকী—ধর্ম্ম-প্রথার বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাঁদের মানবানুকৃত জীবনের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ কি তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদান করে না? ইহাঁরা কি সংসার-ত্যাগী বৈরাগীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, না সংসারের সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া আমাদের শারীর ও মানসবৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তিও বিকাশের চরম আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন? শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃ মাতৃ ভক্তি—তাহার ভ্রাতৃও ভার্য্যা-প্রেম, তাঁহার স্বজন ও প্রজা-বৎসলতা, তাঁহার সত্য-প্রিয়তাও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, তাঁহার বীরত্ব ও ধীরত্ব কি অনন্ত কালের জন্য এই ভারতবর্ষীয়দিগের জীবন নিয়ামক হইবার যোগ্য নহে? কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, যদিও আমরা তাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার স্বরূপ আরাধ্য দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছি, তথাপি তাঁহাদের স্বজীবন-প্রদত্ত আদর্শ-ত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক নেতাদিগের বিকৃত আদর্শে পরিচালিত হইয়া আসিতেছি। নির্ব্বাপিত অগ্নিতে আর অস্বাভাবিক নিবৃত্তিশিক্ষার শীতল জল না ঢালিয়া যাহাতে এই ভারতকাণ্ডারী নরদেব-দ্বয়ের নিজ জীবন-প্রদত্ত মহাদর্শে ভারতবাসী জীবন গঠিত করিতে শিক্ষা করে, ধর্ম্মোপদেশক মাত্রেরই এখন সেই উপদেশ দেওয়া উচিত।

শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মিসনারি বিদ্যালয়ে হিন্দু-বালিকা।

উদ্দেশ্য এবং প্রণালী-সম্বন্ধে মত-ভেদ থাকিলেও আমরা চিরদিন স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী। প্রাচীন ভারতে জাতীয় বিশুদ্ধ-প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত ছিল বলিয়াই ভারতের আর্য্যজাতি সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন; আবার সেই ভাবে রমণীদিগকে শিক্ষা দিতে পারিলে তবেই ভারতবাসী পুনরায় জগতের জাতি সমুচ্চয়ের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিতে পারিবেন, এই আমাদের বিশ্বাস। জননীকে অন্ধকারে রাখিয়া সন্তান আলোক পাইবে না, রমণীকে নীচন্ধে নিমগ্ন রাখিয়া কোন জাতি মহত্ব লাভ করিতে পারিবে না, ইহা প্রকৃতির অকাট্য নিয়ম, বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান। স্ত্রী শিক্ষার নাম শুনিলেই যাঁহারা ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চিত করেন, তাঁহারা আমা-[illegible] নমস্য হইলেও এ বিষয়ে তাঁহাদের মতানুসরণে আমরা অসমর্থ।

সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হিন্দু-সমাজ ধীরে ধীরে স্ত্রী-শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে, এবং এ বিষয়ে সামাজিক প্রতিকূলতা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। স্ত্রীলোকে লেখা পড়া জানে, স্ত্রী স্বামীকে পত্র লিখিতে পারেন,

মা ছেলেকে নিজে কয়েক খানি বই না পড়াইয়া বিদ্যালয়ে পাঠান না, এ সকল কথা শুনিলে আর কেহ পূর্ব্বের ন্যায় শিহরিয়া উঠে না—তেমন অসাধারণ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য প্রাণের মাঝে একটা কৌতূহলও জন্মে না। এক সময়ে পাড়ার মেয়েদিগকে পুঁথি পড়া শুনাইয়া এবং পত্র লিখিয়া দিয়া অনেক বাহাদুরী লইয়াছি, সে জন্য এ উদরও অনেক সন্দেশ এবং দুধচিড়া আত্মসাৎ করিয়াছে; কিন্তু এখনকার বালকদিগের ভাগ্যে সে উপলক্ষে সে সুযোগ বোধ হয় অতি অল্পই ঘটে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পিতা তনয়ার বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা শুনিলে প্রস্তাবকারীকে মারিতে উঠিতেন, আজ তিনি ইচ্ছা করিয়াও কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখুন, হয়ত তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, না হয়ত সে বিষয়ে উদাসীন, কিন্তু তিনিও আজ কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান—অন্ততঃ তাহাতে আপত্তি করেন না! সহসা এ উদারতার—বিনা রাজ-বিধিতেও সহসা এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কারণ বোধ হয় কয়েকটিই আছে। প্রথমতঃ ব্যবহারের সংক্রামকতা। পাড়ার সকলেই আপন আপন তনয়াকে বিদ্যালয়ে পাঠায়, তবে আর আমি একা আপত্তি করিয়া কি করিব? দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক জেদ। এক দিন, দুই দিন, না হয় দশ দিন গৃহিণীর জেদ উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু চিরদিন কে তাহা উপেক্ষা করিতে পারে? কিন্তু তৃতীয় কারণই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। মেয়েটি যদি একটুকু সুন্দরী হয়, একটুকু বয়ঃস্থা হয়, বিশেষতঃ একটুকু লেখা পড়া যদি জানে—অন্ততঃ উপন্যাসগুলি পড়িতে আর চিঠি পত্র লিখিতে যদি পারে, তাহা হইলে ছেলের নিকটে তাহার আদর হয়, অল্প পয়সায় তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারা যায়। এ প্রলোভন কি সামান্য? অনেক শ্রেণীতে এক একটি মেয়ে পাত্রস্থ করিতে পিতা মাতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়; একটুকু লেখা পড়া শিখাইলেই যদি টাকার খরচ কমিয়া যায়, তাহাতে অসাধ কাহার?

ফলতঃ যে কারণেই হউক, হিন্দু বালিকারা কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; আর এ বিষয়ে আর কোন বাধা বিঘ্ন যে কৃতকার্য্য হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু এক দিকে বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার দেখিয়া যেমন আনন্দ হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব দেখিয়া মনে ভয় হইতেছে। দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকেরা এখন পথে ঘাটে বক্তৃতা ছাড়িয়া দিয়া বালিকা-বিদ্যালয়-স্থাপনে মনোযোগ দিয়াছেন। পুরুষদিগের নিকটে ধর্ম্ম-প্রচারে অকৃতকার্য্যতাই-বোধহয় ইহার কারণ। তাঁহারা ঠিক কথাই বুঝিয়াছেন। যে সকল বালিকা তাঁহাদিগের নিকটে পড়িতেছে, তাহাদের হৃদয়ে যদি তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুর আচারব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা হিন্দু সমাজের দুর্গ-ভেদে অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইবেন,

দুই এক পুরুষ যাইতে না যাইতেই হিন্দু-ধর্ম্মের উপরে খৃষ্টধর্ম্মের জয়-লাভ দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবেন,—এত দিন বক্তৃতা করিয়া, পুস্তক লিখিয়া, যুক্তি তর্ক দিয়া এবং নানা বিষয়ে সুবিধা দেখাইয়া যাহা করিতে পারেন নাই, এখন হিন্দু-বালিকার সাহায্যেই তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হইবে; সে জন্য আর অর্থ-ব্যয় লাগিবে না, আর কোন কষ্টও পাইতে হইবে না।

বঙ্গ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় আছে, খৃষ্টান মিসনারিগণ তাহার প্রতিষ্ঠাতা। একবার কাশীতে যাইয়া শুনিলাম, তথায় চারিটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল; কিন্তু যখন শুনিলাম, ইহার অনুষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাতাগণ সকলেই খৃষ্টান মিসনারি, তখন হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু-ধর্ম্ম এবং হিন্দু-সমাজের দুর্ভেদ্য দুর্গ কাশীধামের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন অন্য স্থানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পশ্চিমাঞ্চলে আর্য্য-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ সংপ্রতি এ বিষয়ে উদ্বোধিত হইয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে আপনাদিগের ব্যবস্থানুসারে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সমাজের মঙ্গল-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা নিরতিশয় সুখের সংবাদ। কিন্তু বঙ্গদেশে এই অনুষ্ঠানের অভাব দেখিয়া আমরা যারপর নাই ভীত এবং দুঃখিত হইতেছি। কলিকাতার মহাকালী বিদ্যালয় ব্যতীত বঙ্গদেশের আর কোথাও হিন্দু-বালিকার একক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না।—অন্ততঃ আমরা তাহা অবগত নহি। গতবারে টাউনহলের মহতী সভায় শ্রীমতী আনিবেসান্তের সম্বর্দ্ধনার সময়ে মহাকালী বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের মুখে সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতীর স্তুতি পাঠ শ্রবন করিয়া আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই! মনে হইতে লাগিল, আবার বুঝি ভারতে বৈদিক কাল আসিল, আবার বুঝি ভারতের ঘরে ঘরে সংস্কৃত চর্চ্চা হইতে লাগিল, আবার বুঝি আর্য্য-রমণীর মধুর-কণ্ঠে বাগ্‌দেবীর বীণা ঝঙ্কৃত হইতে আরম্ভ করিল! সে দিনের সে আনন্দের জন্য মহাকালীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ দিয়াছি; তাঁহারা যদি কৃতকার্য্য হইতে পারেন—বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার গতি তাঁহারা যদি আর্য্যভাবের দিকে ফিরাইতে পারেন, এক দিন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে তাঁহাদের নাম বিঘোষিত হইবে, বঙ্গদেশের স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে, বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

হিন্দু পিতামাতা বালিকাকে বিদ্যালয়ে যদি না পাঠাইতেন, সে বরং ভাল ছিল; আমাদের মাতা, মাতামহী এবং পিতামহীর আদর্শে অক্ষরবর্জ্জিত প্রণালীতে আমাদের বালিকারা যদি শিক্ষিত হইত, তাহা হইলে আর্য্য-ধর্ম্ম এবং আর্য্য সভ্যতার কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বালিকাকে যদি বিদ্যালয়েই পাঠাইতে হয়, তবে তাহার জন্য নিজের জাতীয়

ভাবে ব্যবস্থা নাই কেন? সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছে বুঝিলাম; কিন্তু তাহার ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নাই কেন? বিষ ভক্ষণ অপেক্ষা উপবাস যদি ভাল হয়, তবে কুশিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা কি ভাল নহে? যাহাতে জাতীয়ভাব এবং জাতীয়ধর্ম্মের ক্ষতি করে, তাহাকে আমরা কুশিক্ষাই বলি।

মিসনারিদিগের স্থাপিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়ে বালিকাকে পাঠাইলে জাতীয় ভাব এবং জাতীয়-ধর্ম্মের ক্ষতি আছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ চিন্তা-শক্তির প্রয়োজন হয় না, সামান্য বুদ্ধিতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। মিসনারিরা স্বদেশ ছাড়িয়া এদেশে দারুণ গ্রীষ্মের জ্বালা সহিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন কেবল খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য। ইহাতে তাঁহাদের লাভ কি? লাভ জীবিকা। বিলাতের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারিণী সভাসমিতির নিকটে ইহাঁরা মোটা মোটা মাহিয়ানা পাইয়া থাকেন কেবল লোককে খৃষ্টান করিবার জন্য; অতএব ইহাঁরা মিষ্টকথাই বলুন আর বিদ্যা দানই করুন, ভিতরে ইহাঁদের ঘোরতর স্বার্থ রহিয়াছে। তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে পাঠাইয়া আমরা তাঁহাদের সেই স্বার্থ-সাধনেরই সহায়তা করি।

অনেক পিতামাতা মনে করেন, বালিকা বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখা পড়া শিখিবে, ইহাতে খৃষ্ট-ধর্ম্মের কি আছে? কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, যে কোন প্রকারে হিন্দু নীতি এবং হিন্দু-সংস্কারের মূল শিথিল করিতে পারিলেই খৃষ্ট-ধর্ম্মের পথ প্রশস্ত হইল। ফলতঃ মিসনারিদিগের বালিকা-বিদ্যালয়-স্থাপনের ইহাই উদ্দেশ্য। এটা কুসংস্কার, ওটা অসভ্যতা, সেটা ভ্রান্তি, এই বলিয়া তরলমতি বালিকাদিগের মনে হিন্দু-ধর্ম্ম এবং হিন্দু-সমাজ-সম্বন্ধীয় এটা ওটা-সেটা সকলটার প্রতিই যদি অশ্রদ্ধা জন্মাইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করা যায়, আর ঘরে যাইয়া তাহারা যদি পিতামাতার মুখে কেবল থোড় বড়ি-খাড়া ছাড়া আর কিছুই শুনিতে না পায়, তাহা হইলে হিন্দু-ধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজ আর কয় দিন টিকিবে? বালিকাদের মুখে বাড়ীতে এই সকল কথার আভাস না পাওয়া গেলেও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। শিক্ষকের কথা মানিয়া চলিবে, না মানিলে লেখা পড়া হয় না, এ উপদেশ বালিকাদিগকে পিতা মাতাই দিয়া থাকেন। মিসনারি-বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী প্রাগুক্ত রকমের উপাদেয় কথা-গুলি বলিয়া বালিকাদিগকে আবার সাবধান করিয়া দেন,—"বাড়ীতে এ সকল কথা কাহারও কাছে বলিও না, বলিলে বিদ্যালয়ে আসিতে দিব না।" বালিকারা বিদ্যালয়ে আমোদই অধিক পায়, কাযেই পাছে বিদ্যা-লয়ে যাওয়া বন্ধ হয়, এই ভয়ে বাড়ীতে ঐ সকল কথা মুখেও আনে না। ইহা আমা-দের কপোলকল্পিত নহে; এ সকল প্রাত্য-হিক অনুষ্ঠান—মিসনারিদিগের এরূপ আচ-রণ নিতান্ত স্বাভাবিক। আমরা জানি, মফস্বলের কোন মিসনারি-বালিকা-বিদ্যালয়ে খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যের জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে বালিকাদিগেরও শিক্ষা কি হউক

আর না হউক, হিন্দু-ধর্ম্মের সকলই যে কুসংস্কার, প্রত্যহই শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া বালিকাদিগকে কথায় কথায় তাহা বলিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু ঐ সকল কথা নীরবে শুনিবার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যালয়ে ঐ সকল কথার প্রতিবাদ করিবার তাঁহার কোন অধিকার ছিল না, সুতরাং তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি একটি উপায় বাহির করিলেন। বিদ্যালয়ের ছুটির পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তিনি সকল বালিকাকে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে ছুটি হইলেই প্রত্যহ তিনি বাহিরে দাঁড়াইতেন, এবং বালিকারা তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিত। তিনি বলিতেন, "তোমাদের গুরুমা তোমাদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ে যাহা বলেন, সে সকল কথা মিথ্যা, তোমরা তাহা শুনিও না। ইঁহারা ঐ সকল কথা তোমাদের নিকট বলিবার জন্যই মাহিয়ানা পাইয়া থাকেন, কাযেই বলেন। তিনি যে তোমাদের ধর্ম্মের এই সকল নিন্দা করেন, তোমরা তাঁহা বাড়ীতে বলিয়া দিও।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শিক্ষয়িত্রী এই সকল কথা ঊর্দ্ধতন সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিলে ব্রাহ্মণটি তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত হইলেন। ঐ বিদ্যালয় এখনও চলিতেছে, এবং তাহার ছাত্রী-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

মিসনারি-বিদ্যালয়ে বালিকা পাঠাইবার যে আর একটি প্রবল কারণ আছে, তাহার উল্লেখ হয় নাই। এই বিদ্যালয়ে বালিকা পাঠাইলে সচরাচর তাহাদের বেতন লাগে না, কিন্তু জাতীয়ভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বজাতীয় শিক্ষক রাখিতে গেলে প্রত্যেক বালিকার জন্য দুই চারি আনা বেতন না দিলে চলিবে কেন? তাহাদের জন্ত আর মিসন ফন্দ নাই যে, কিছু শিক্ষা হউক আর না হউক, প্রত্যহ হিন্দু ধর্ম্মের দুই চারিটা নিন্দা করিলেই মাসান্তে নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানা বুঝিয়া পাইবে! কিন্তু হিন্দু অভিভাবক জাতীয় স্বার্থ যতটা বুঝেন, পয়সার কথাটা তাহা হইতে ভাল বুঝেন। দুই গণ্ডা পয়সা লাগিবে শুনিলে এক পাত্র অমৃত ও তিনি ত্যাগ করিবেন, কিন্তু বিনা পয়সায় পাইলে এক পাত্র গরল পান করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। দুই চারি আনা পয়সার মমতায় হিন্দু অভিভাবক বালিকার যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহা তিনি বুঝেন না! হিন্দু বড় বড় রাজনীতি বুঝেন, বড় বড় বেদান্তের কূটতর্ক বুঝেন, কিন্তু এই স্থূল কথাটী বুঝেন না, ইহা বড়ই বিচিত্র!

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, সকলেরই এ বিপদ সমান। তবে ব্রাহ্মেরা বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা কতকটা নিজে নিজেই করেন; মুসলমানেরাও এরূপ শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা বালিকাকে নিরক্ষর রাখাই উচিত মনে করেন; সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে বিপন্ন কেবল হিন্দু। হিন্দু-ধর্ম্ম এবং হিন্দু-সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এ অনিষ্টের প্রতিবিধান চাই। প্রতিবিধান যে খুব কঠিন, তাহাও নহে। অন্ধ পিতা মাতা এ বিপদ দেখিয়াও না দেখিতে পারেন, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ যুবকেরা আর অধিক কাল এ বিষয়ে উদাসীন রহিবেন না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিঃসর্ব্বস্বতা এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মের অসারতা তাঁহাদিগের নিকট আর প্রচ্ছন্ন নাই। তাঁহারা অভিভাবকদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া এখনও এ বিষয়ে কিছু বলিতেছেন না; কিন্তু অভিভাবকেরা যদি শীঘ্র এ বিষয়ে জাগ্রত না হন, তাহা হইলে এ বিপদের প্রতিবিধান তাঁহারা নিজের হাতেই লইবেন। এ দেশে সকলেরই একতা এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞতা অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল যুবকদিগের মধ্যেই ঐ দুইটি গুণ কিয়ৎ পরিমাণে এখনও আছে। তাঁহারা বরং নিরক্ষর বালিকা বিবাহ করিবেন, তথাপি মিসনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত বালিকা বিবাহ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গত হইবে না। পুত্রের উপরে পিতামাতার আর সকল অধিকারই আছে; কিন্তু স্বধর্ম্ম-বিরক্ত, বিধর্ম্মানুরক্ত, আর্য্যাচারে বীতশ্রদ্ধ বালিকার সঙ্গে পুত্রকে জন্মের মত বাঁধিয়া দিতে তাঁহাদের কি অধিকার আছে?

সাহিত্য।

(৪)

সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ।

পূর্ব্বে ব্যাকরণ শাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিবার জন্য ব্যাকরণের সঙ্গে যাহা পঠিত হইত, তাহাকেই সাহিত্য বলিত, সুতরাং তখন সাহিত্য বলিতে কাব্য-শাস্ত্রকেই বুঝাইত। সাহিত্য-ব্যাকরণ সেই জন্য ডাকের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একটাকে স্মরণ করিলেই আর একটা মনে পড়ে। সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিও বোধ হয় এই মূলেই অনুসন্ধেয়।

কিন্তু এখন এই শব্দটির অর্থ যেন আর একটুকু প্রসারিত হইয়াছে; এখন সাহিত্য বলিলে কেবল কাব্যই বুঝায় না, কিন্তু ভূগোল ইতিহাস, জীবন-চরিত প্রভৃতি আরও অনেক জিনিস ইহাতে বুঝায়। বাস্তবিক যে সাহিত্য জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠতম উপায়, তাহা যে কেবল কল্পনায় বিনোদ-নৃত্যেই পর্য্যবসিত হইবে, আর বাস্তব-জগতের অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিষয় তাহার বাহিরে পড়িয়া থাকিবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে, যুক্তি-সঙ্গত নহে, স্বার্থসঙ্গতও নহে। জতীয় সাহিত্য বলিতে মনে যেমন একটা বিরাট্ ভাবের উদয় হয়, তাহার অর্থেও সেইরূপ একটা বিপুল ব্যাপকতা থাকা উচিত। আমার বোধ হয়, সাধারণ জনগণ পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে জাতীয় ভাষায় যাহা কিছু বিশেষ

পরিশ্রম বা চিন্তা-শক্তির সাহায্যে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

এই হিসাবে ধরিতে গেলে সাধারণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও কতকগুলি সংবাদ এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লিখিত হিসাব পত্র ও চিঠিপত্র ছাড়া আর প্রায় সমস্তই জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লিখিত, অনেক সুন্দর সুন্দর চিঠিপত্র ও অনেক সময়ে জাতীয় সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। একবার দেখা গিয়াছিল বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত জমিদার তাঁহার জমিদারীতে ধান, চাউল, লবণ, মরিচ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর বৎসর বৎসর কিরূপে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য বহু বৎসরের একটি ক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করাইতেছেন; যদি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে উহাও জাতীয় সাহিত্যের, অর্থাৎ জাতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে, সাহিত্যের ব্যাপক অর্থ ধরিলে একথাও বলা যাইতে পারে।

সাহিত্যের এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করিলে লিপিবদ্ধ পরিজ্ঞাত বিষয় মাত্রকেই সাহিত্য বলিয়া ধরিলে তাহার একটা শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন, অন্যথা বিশেষ গোলযোগের সম্ভাবনা। প্রতি বৎসর বঙ্গভাষা হাজারে হাজারে নূতন পুস্তক বাহির করিতেছে। সুতরাং আজ-কাল প্রকাশের পরিমাণ-পক্ষ ধরিলে বঙ্গভাষার দরিদ্রতা স্মরণ করিবার কোন কারণ দেখি না; কিন্তু যদি সাহিত্যের একটা শ্রেণী-বিভাগ হয়—কাচ হইতে কাঞ্চনকে পৃথক করিয়া লইবার একটা উপায় বিধান করা হয়, তাহা হইলে কেবল সংখ্যা দেখিয়া প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু সাহিত্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা নিতান্ত সহজ নহে। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জীবন-চরিত, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অভিধান, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ শাখা-প্রশাখায় মনুষ্যের লিপিবদ্ধ চিন্তা-রাশি বা সাহিত্যকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু বহিঃসূত্র ধরিয়া এই প্রণালীতে শ্রেণী বিভাগ করা তেমন সুবিধা-জনক হইবে না, কারণ ইহাতে বিভাগের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। অতএব অন্তঃসূত্র ধরিয়া সাহিত্যকে বিভক্ত করাই সুবিধা-জনক মনে করি। এতদনুসারে সমস্ত সাহিত্যকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—প্রয়োজন-বিধায়ক, প্রমোদ-বিধায়ক, জ্ঞান-বিধায়ক, চিন্তা-বিধায়ক, এবং শক্তি-বিধায়ক। কি প্রকার সাহিত্য কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে একটুকু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

প্রয়োজন-বিধায়ক বা প্রয়োজন-সাধক সাহিত্য। ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা অভিধান কেহ পড়িত না, যদি তদ্দ্বারা সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ না হইত। আবার, চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদরও বোধ হয় তেমন হইত না, যদি ইহাতে আরোগ্য লাভরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিত। এইরূপ রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থা, হিন্দু-গৃহের দিন-পঞ্জিকা, রেলওয়ে ও ডাক বিভাগের নিয়ম-পঞ্জিকা, ইত্যাদি বহুবিধ

য়ের পুস্তক কেবল বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জন্যই প্রণীত হয়, এবং সেই সকল প্রয়োজনের সাধনাকে যাহারা ব্যবসায় রূপে গ্রহণ করে, কেবল তাহারাই ঐ গুলি অধ্যয়ন করিয়া থাকে। অতএব সামাজিক কোন প্রয়োজন-সাধন বা অভাব-বিমোচন যাহার উদ্দেশ্য তাহাকেই প্রয়োজন-বিধায়ক সাহিত্য বলা গেল।

প্রমোদ-বিষয়ক সাহিত্য। কেবল হর্ষ, কেবল আমোদ, কেবলই হাস্য যাহার উদ্দেশ্য, এমন সাহিত্যের পরিচয় বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। রঙ্গ-রস-তামাসা উপন্যাস-নবন্যাস প্রভৃতির মনোহর বাক্য-বিন্যাসে কত জনের অর্থ-নাশ, সময়-নাশ এবং স্থলবিশেষে সর্ব্বনাশও যে হইতেছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তাস-পাশা খেলা অপেক্ষা পুস্তক পড়াতে যে অধিক উপকার বা মহত্ব আছে, অনেকেই তাহা বুঝেন না; আবার অনেক পুস্তকও এমন আছে যে, সে সকল পাঠ করিলে যে উপকার হয়, তাস-পাশাতে তদপেক্ষা অল্প উপকার কখনই হয় না। বরং অনেক সময়ে সে সকল পুস্তক অপেক্ষা তাস-পাশাকে অধিক উপকারী বলিয়াই মনে করিতে হয়। এই শ্রেণীর কোন কোন পুস্তকে বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাদের অনেক গুলিই কুরুচি এবং কুভাবের জন্য বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

জ্ঞান-বিধায়ক সাহিত্য। মনস্তত্ব, জড়-তত্ব, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। আমাদের পূর্ব্বগত মহাত্মাগণ যে সকল সত্য অনুভব বা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এই সকল গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এ সকল শিখিয়া জানিয়া বা মনে রাখিয়া বিদ্বান্ হই—যিনি যত অধিক মনে রাখিতে পারি, তিনি তত অধিক বিদ্বান্ হই। এ বিদ্যা যেন অন্যের যত্ন পালিত বৃক্ষের ফল, অন্যের হল-কর্ষিত ক্ষেত্রের শস্য, অন্যের প্রযত্ন-পার্জ্জিত ধন বা অন্যের হস্তে প্রস্তুত অন্ন। অন্যের বড় বড় কথা আকণ্ঠ পূরিয়া মুখস্থ করিয়া রাখি, আর তাহাই নিজের সম্পত্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া অন্যের তাক্ লাগাই।

চিন্তা-বিধায়ক সাহিত্য। যে গ্রন্থের বিদ্যা কেবল স্মৃতির বিষয় হইয়া কণ্ঠস্থ বাক্য মাত্রে নিবদ্ধ থাকে, তাহাকেই জ্ঞান-বিধায়ক সাহিত্য বলা গিয়াছে; কিন্তু যাহার বিদ্যা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া চিন্তা-শক্তিকে উন্মেষিত করিয়া দেয়, তাহাকেই চিন্তা-বিধায়ক সাহিত্য বলা যাইতে পারে। বিদ্যার সঙ্গে চিন্তাশীলতার যে প্রভেদ, জ্ঞান-বিধায়ক সাহিত্যের সঙ্গে চিন্তা-বিধায়ক সাহিত্যের সেই প্রভেদ। জ্ঞান-বিধায়ক না বলিয়া বিদ্যা-বিধায়ক বলিলেও ক্ষতি নাই। আমরা ইংরাজের বিদ্যা শিখিয়াছি, কিন্তু চিন্তা শিখি নাই; আমরা জীবন্ত বৃক্ষের চিত্রিত অনুকৃতি পাইয়াই তাহার নিকট ফল চাহিতেছি, আমরা জানি না যে বীজ বুনিয়া জল সিঁচিয়া গাছ না জন্মাইতে পারিলে ফলের আশা দুরাশা মাত্র। এ বিদ্যা অন্য কৃত চিন্তার ফল; আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি ফল পাইতেছি, কিন্তু তাহার এক একটির আবিষ্কারে যে কষ্ট, যে পরিশ্রম, যে চিন্তার প্রয়োজন

হইয়াছিল, তাহার কল্পনাও করিতে পারি না। ভাত এবং সন্দেশ না হইলে আমাদের এক দিন চলে না কিন্তু "চিনি জন্মে ইক্ষু-দণ্ডে, মূলে কিম্বা ফলে; ধান্য হ'তে বহির্গত তণ্ডুল কি. কলে;" তাহা আমরা অবগত নহি।

একই গ্রন্থের অংশ-বিশেষ জ্ঞান-বিধায়ক এবং অংশ-বিশেষ চিন্তা-বিধায়ক হইতে পারে. যথা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা-ভাগ এবং অনুশীলনভাগ। এক জাতীয় গ্রন্থই কোন খানি জ্ঞান-বিধায়ক, কোন খানি বা চিন্তা-বিধায়ক হইতে পারে, ইতিহাসে ইহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন ইতি-হাস কেবল ঘটনার তালিকা মাত্র; তৎ-পাঠে স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। আবার সেই ইতিহাসই গ্রন্থকার বিশেষের লিপি-চাতুর্য্যে এমন ভাবে লিখিত হয় যে, তৎপাঠে আপনা হইতে চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। ইংরাজী প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালিনী ভাষায় এ বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বিদ্যার উপার্জ্জন এবং চিন্তার উন্মেষণ, এই দুইটি কথা দ্বারাই বিদ্যা এবং চিন্তার পার্থক্য বেশ উপলব্ধি হইতেছে। বিদ্যা বাহিরের জিনিস, অন্যের যত্নে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কেবল সংগ্রহ করিতে পারিলেই বিদ্বান্ হওয়া গেল। কিন্তু চিন্তার মুকুল আমাদিগের ভিতরেই রহিয়াছে; চিন্তাশীল হইতে হইলে তাহাকে উন্মেষিত করা চাই—সেই মুকুলটিকে ফুটাইয়া লওয়া চাই। ইহাই শিক্ষা—জ্ঞানোপার্জনের সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার পার্থক্য এই খানেই বুঝিতে হইবে। যে শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষা দিতে জানেন না, কেবল বিদ্যা দিতেই জানেন, তিনি নিজের অবিরাম চিৎকারেই বিদ্যালয়কে পাঁচ ঘণ্টা গরম করিয়া রাখেন, বালককে চিন্তা করি-বার অবসর ক্ষণমাত্রও দেন না; যথোচিত পরিমাণে মানসিক উষ্ণতার কৌশল-যুক্ত প্রয়োগে কেমন করিয়া চিন্তা-কলিকাকে প্রস্ফুটিত করিতে হয়, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে একেবারেই প্রবেশ করে না! শিক্ষক বিদ্যা দেন, পরীক্ষা-প্রণালী বিদ্যা চায়, সমাজ এবং রাজ-সরকারেও বিদ্যাই আদর পায়, সুতরাং চিন্তা একরূপ নির্ব্বাসিত—জমকাল পরিচ্ছদ-ভূষিতা প্রভুত্ব-পরায়ণা কণ্ঠার প্রগল্‌ভতায় প্রতিভা-প্রসবিনী মাতা অনাদৃত এবং নিষ্প্রভ!

শিক্ষক বিদ্যালয়স্থ কতিপয় মাত্র বাল-কের শিক্ষাদাতা, আর গ্রন্থকার সমগ্র বর্ত্ত-মান এবং ভবিষ্যৎ সমাজের শিক্ষাদাতা; সুতরাং শিক্ষকে চিন্তোন্মেষিণী শক্তির যত-দূর প্রয়োজন, গ্রন্থকারে ঐ শক্তির তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক প্রয়োজন। গ্রন্থ-লিখনার্থ লেখনী ধারণ করিবার পূর্ব্বে সকল গ্রন্থকার যদি একথাটা একবার ভাবিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের সংখ্যা আরও কম হইত, প্রয়োজন হইলে একথা শপথ করিয়া বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পাঠকের সংখ্যাও যে অপেক্ষাকৃত অল্প হইত, একথা বলাই বাহুল্য। ভাল জিনিসের আদর নাই, বিশেষতঃ সাহিত্যে চিন্তাশীল গ্রন্থের কাটতি নাই, এ অতি পুরাতন কথা। অনেক ভাল গ্রন্থ একবারের অধিক ছাপাখানায় যায় না, আর অনেক

অকর্ম্মণ্য গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়াও মাটিতে পড়িতে পায় না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। গোয়ালা দুগ্ধ লইয়া রাস্তায় রাস্তায় হাঁকিয়া বেড়ায়, কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না, আর মদ্য-বিক্রেতা আপন দোকানে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া মদ্য বিক্রয় করে, তথাপি তাহার ক্রেতার অভাব হয় না, মহাত্মা তুলসীদাস একথা বহুকাল পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন।

বিচক্ষণ নিপুণ গ্রন্থকার যে কোন বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া অল্পাধিক পরিমাণে চিন্তা-শক্তির উন্মেষ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি এবং ইতিহাসেই এবিষয়ক অবসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পাঠযোগ্য জীবন-চরিতে এই চারি বিষয়ের কোন না কোনটি অভিব্যক্ত হয় মাত্র।

কেমন করিয়া, কি কৌশলে চিন্তা-শক্তির উন্মেষণ সাধিত হইতে পারে, অনেকের মনে মনে হয় ত এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, লেখক তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অক্ষম। এ লেখক ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; যাঁহারা মানব-জাতির প্রকৃত শিক্ষক যাঁহাদের বাক্যের প্রভাবে মানবের চিন্তা-শক্তি পরদায় পরদায় খুলিয়া যায়, তাঁহারাও আপনাদের এই সুদুর্লভ সর্ব্বজন-বাঞ্ছিত শক্তি অন্যকে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ কি না সন্দেহ। ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ শক্তি-ভূষিত করিয়া জগতে প্রেরণ করেন; এই মাত্র আমরা জানি; কিন্তু সেই শক্তির প্রকৃতি কি, এবং কেমন করিয়া তাহা আপনার কার্য্য-সাধন করে, সে তত্ত্ব যথার্থরূপে বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্য বোধ হয় তিনি কাহাকেও দেন নাই। গোলাপ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করে, কিন্তু সে গন্ধটা যে কি, তাহা সে নিশ্চয়ই বলিতে পারে না।

শক্তি-বিধায়ক সাহিত্য। জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে চিন্তা-বিধায়ক সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চ বটে, কিন্তু শক্তি-বিধায়ক সাহিত্যের স্থান তাহারও উপরে। মানব-প্রকৃতিতে চিন্তার স্থান অতি উচ্চ বটে, কিন্তু ভাবের স্থান সর্ব্বোপরি। চিন্তায় মানুষকে উন্নত করে, কিন্তু ভাব তাহাকে দেবত্ব দেয়। ভাবই মহত্ত্ব এবং মহত্ত্বই মানুষের শক্তি। হৃদয় এই মহত্ত্বের অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়াই মানব-প্রকৃতিতে এবং মানব-সমাজে তাহার প্রাধান্য। মানব-হৃদয়ের মহত্ত্বই জগৎকে চালিত করিতেছে, শাসিত করিতেছে, এবং উন্নত করিতেছে; সুতরাং হৃদয়ের মহত্ত্বকে শক্তি না বলিয়া আর কাহাকে শক্তি বলিব? বিদ্যা বা অর্জ্জিত জ্ঞান মানুষকে বড় করে, চিন্তা মানুষকে উন্নত করে, কিন্তু ভাব তাহাকে দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কার্য্যই মহত্ত্বের দ্যোতক—সচরাচর পরিদৃশ্যমান অকার্য্য নহে, কিন্তু আত্ম-বিস্মৃতির সঙ্গে পরের জন্য কার্য্য, জগতের জন্য কার্য্য, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কার্য্যই মহত্ত্বের দ্যোতক। এই কার্য্য করে কে? বিদ্যা বা জ্ঞান কার্য্যের উপাদান যোগায়, চিন্তা কার্য্যের কৌশল যোগায়, কিন্তু কার্য্যের শক্তি যোগায়—কার্য্য করে কেবল হৃদয়। যিনি যত উপাদান এবং যত কৌশলই সংগ্রহ করুন, দেবত্বের ভাবে—মহত্ত্বের স্পর্শে হৃদয়

অনুপ্রাণিত না হইলে মহত্ত্বোত্তক কার্য্যের কল্পনাও মনে স্থান পায় না। চিন্তাবিহীন ভাবে অনেক কার্য্য হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু ভাববিহীন চিন্তায় কোন কার্য্য হইতে দেখি নাই।

কাব্য সেই শক্তি-বিধায়ক সাহিত্য; কারণ হৃদয়সমুদ্রের মন্থন হইতে এ অমৃত সমুদ্ভূত, আর তাহা পান করিয়া জগৎ আনন্দে উন্মত্ত, দানব দেবত্ব-প্রাপ্ত। রাজার সমগ্র শক্তি, সমাজের সমগ্র শক্তি, নীতি-শাস্ত্রের সমগ্র শক্তি, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমগ্র শক্তি যাহা না করিতে পারিত, বাল্মীকির কল্পনার সৃষ্টি—কবির মানস কন্যা এক সীতার চরিত্র তাহা করিয়াছে, পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ভারত-ললনাকে জগতের শীর্ষ স্থানে তুলিয়াছে। আর কিছুতে তাহা পারিত কি—আর কিছুতে তাহা পারিতেছে কি? এই গুণেই ত বাল্মীকি এবং ব্যাস সমগ্র জগতে পূজিত, এই জন্যই ত কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস বঙ্গের ঘরে ঘরে অর্চ্চিত! কাব্য জগতে—সাহিত্য-জগতে এই সকল নর-দেবের আসন যুগ যুগ ধরিয়া অবিসম্বাদিত রহিয়াছে, চির দিন অবিসম্বাদিত থাকিবে পরবর্ত্তী কবিগণ যিনি যাহাই করুন, ইহা-দিগের পদ-ধূলি লইয়া সকলকেই মঙ্গলাচরণ করিতে হইবে।

বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ চায়। গণিত শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত একজন ঘোর মূর্খ এক সময়ে বলিয়াছিলেন, তোমরা যে হোমারকে লইয়া এত হৈ চৈ কর, হোমার কি প্রমাণ করিয়াছেন? হীরম সাহেব জনৈক গ্রন্থকার তাহার একটি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হোমারের কবিতা যদি সমগ্র গ্রীক জাতিকে এক বীর্য্যে, এক গর্ব্বে, এক আশায় এবং এক আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক ভাবের প্রবাহে চলিতে—এক জাতি বলিয়া বুঝিতে শিখাইয়া থাকে, তবে হোমার যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, কোন্ বিজ্ঞান বা গণিত এ প্রমাণ করিতে পারে?

রামায়ণ এবং মহাভারতে শক্তির তিনটি উৎস একত্র সম্মিলিত—ধর্ম্ম, ইতিহাস এবং কবিত্ব একত্র সমাবিষ্ট, এই জন্যই ইহাদের প্রভাব অসীম। কৃত্তিবাসের রত্নাকর যেমন "মরা মরা" জাপিয়া রাম-নাম জপের অধি-কারী হইয়াছিল, সেইরূপ ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, কেহ যদি রামায়ণ বা মহা-ভারত খানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিতে পারে, তবে সে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে, নিশ্চয়ই চরিতার্থ হইবে—গ্রন্থ-পাঠের পূর্ব্বে সে যেমন ছিল, গ্রন্থ পাঠের সমাপ্তি হইলে নিশ্চয়ই সে তদপেক্ষা উন্নত হইবে।

ফলতঃ ইহাই শক্তি-বিধায়ক সাহিত্যের ধর্ম্ম এবং ইহাই তাহার পরীক্ষা। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্ করিতেছ, এমন সময়ে, ইচ্ছা করিয়া যদি গঙ্গা জলে একটি ডুব দিয়া উঠিতে পার, শীতল হইবে; ইচ্ছায় না পার, কেহ যদি বল পূর্ব্বক তোমাকে গঙ্গা-জলে চোপড়াইয়া তুলে, তাহাতেও শীতল হইবে। সেইরূপ, সংসারের জ্বালাযন্ত্রনায় দগ্ধ হইতেছ, লোকের হিংসা, নীচতা এবং নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইতেছ, এমন সময়ে একবার রামায়ণ বা মহাভারত খানি পড়, তাহা হইলে দগ্ধ প্রাণে শান্তি পাইবে, দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি

সঞ্চারিত হইবে। রামায়ণ এবং মহাভারত রূপ অমূল্য রত্ন থাকিতেও যে হিন্দুর দারিদ্র্য ঘুচে না—হিন্দুর হৃদয়ে অশান্তি, নীচতা এবং অমুৎসাহ দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ ঐ গ্রন্থ দুইখানির অনাদর।

পঞ্চবিধ সাহিত্যের কথা বলা হইল; ইহাদের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব এবং উপযোগিতা কিরূপ, জাতিকে উন্নত করিবার শক্তি কাহাতে কি পরিমাণ, এবং বঙ্গের সাহিত্য-ভাণ্ডারে কোন্‌টির প্রাচুর্য্য বা কোন্‌টির অভাব, তাহা স্বতন্ত্র বিবেচ্য।

—০—

প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার নিদর্শন।

(১)

নাটকাদিতে প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতিই চিত্রিত হইয়া থাকে, অপ্রচলিত—সুতরাং অসঙ্গত—কিছু লিখিলে জন-সাধারণ তাহার আদর করে না, এইজন্য কেহ তাহা লেখেওনা। সুতরাং যখন যে নাটক লিখিত হয়, তাহাতে তাৎকালিক আচার ব্যবহার বর্ণিত হইয়া থাকে, মোটের উপরে একথা বলা যাইতে পারে।

উত্তরচরিত ভবভূতির লিখিত নাটক। স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, ভবভূতি কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন, সুতরাং সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের যে সামাজিক অবস্থা ছিল, উত্তরচরিতে অবশ্যই তাহার ছায়া-পাত হইয়াছে।

কেহ যদি বলেন উত্তরচরিতের বিষয় রাম-চরিত-বর্ণন, সুতরাং রামের সাময়িক অবস্থাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থকারের সাময়িক অবস্থা নহে; তথাপি, আমাদের তাহাতেও আপত্তি নাই। ভারতবর্ষে কোন না কোন সময়ে যে এই অবস্থা ছিল, তাহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভক বা সূচনায় এই গল্পটি আছে। একদা সূর্য্য-তাপের সময় পথিকের বেশে একজন তাপসী পঞ্চবটী বনে উপস্থিত। সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাসন্তী নাম্নী বনদেবতা ফল মূল ও জলদ্বারা তাপসীর সম্বর্দ্ধনা করিলে পর উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

বনদেবতা। আপনি কে?

তাপসী। আমার নাম আত্রেয়ী।

বনদেবতা। আর্য্যে আত্রেয়ি, আপনি কোথা হইতে এখানে আসিলেন, আর দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণের প্রয়োজনই বা কি?

তাপসী। এই প্রদেশে অগস্ত্যাদি বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা আছেন, তাঁহাদের নিকট বেদান্ত ও উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকির আশ্রম হইতে যাইতেছি।

বনদেবতা। অন্যান্য মুনিরাও যখন সেই প্রাচীন বেদজ্ঞ ঋষির নিকট পড়িতেছেন, তখন আপনার এতদূর-প্রবাসে যাইবার কারণ কি?

তাপসী। সেখানে সংপ্রতি পড়া শুনার ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত, তাই দীর্ঘ প্রবাস স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বনদেবতা। কিরূপ বিঘ্ন?

তাপসী। কোন বনদেবতা কেবল

মুখ ছাড়িয়াছে, এমন দুইটি অদ্ভুত শিশুকে সেই মহর্ষির নিকট আনিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদিগকে দেখিলে কেবল মুনি কেন, চরাচরস্থ সকল জন্তুর মনেই স্নেহের সঞ্চার হয়। সেই অতি-প্রদীপ্ত-প্রজ্ঞা-মেধা-যুক্ত বালক দুইটির সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া উঠিতে পারি না।

বনদেবতা। অধ্যয়নের এই বিঘ্ন।

তাপসী। আরও আছে।

বনদেবতা। আর কি ?

তাপসী। এক দিন মহর্ষি দেখিলেন, একটা ব্যাধ কামমোহিত একটি ক্রৌঞ্চকে বধ করিল, তখন তিনি অনুষ্টুপ্‌ছন্দে তাহাকে শাপ দিলেন।

বনদেবতা। এচ্ছন্দটাত বেদে নাই।

তাপসী। আবার ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে মহর্ষে! তুমি শব্দ ব্রহ্মে সিদ্ধ হইয়াছ, অতএব রাম-চরিত বর্ণনা কর। অতএব মহর্ষি রামায়ণ লিখিয়া মনুষ্যের মধ্যে শব্দব্রহ্মের উক্তরূপ ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন।

বনদেবতা। হায়, তবেত সংসারই প্লাবিত হইল।

তাপসী। এই জন্যই বলিয়া ছিলাম, অধ্যয়নের বড় বিঘ্ন উপস্থিত।

বনদেবতা। এটা বিঘ্নই বটে।

তাপসী। আমার বিশ্রাম হইয়াছে, এখন অগস্ত্যাশ্রমের পথটি বলিয়া দিন।

বনদেবতা। এই দিকে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া গোদাবরীর তীর দিয়া যান।

আমরা এস্থলে সকল কথা তুলি নাই, আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যে সকল কথার সংস্রব আছে কেবল তাহাই তুলিলাম।

এই কথোপকথন হইতে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ পাইতেছি ;—

(১) পুরুষ ছাত্রদিগের ন্যায় আত্রেয়ীও গুরুর নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন।

(২) আত্রেয়ী বাল্মীকির আশ্রম হইতে অগস্ত্যের আশ্রমে অধ্যয়নার্থ যাইতেছেন।

(৩) তিনি বাল্মীকির আশ্রম হইতে অগস্ত্যের আশ্রমে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে একাকিনী যাইতেছেন। এই পথটি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা উক্ত নাটকে শম্বুক কর্ত্তৃক দণ্ডকারণ্যের বর্ণনায় সুব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আর্য্য-রমণী ভীষণ বন্য জন্তু অপেক্ষা অসংযত মানব-পশুকেই অধিক ভয় করেন। তখন বাল্মীকির তপোবন হইতে দণ্ডকারণ্য ভেদ করিয়া একজন তাপসী অগস্ত্যাশ্রমে একাকিনী গিয়াছিলেন নির্ভয়ে, আর এখন ? এখন বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃত হইয়া পদব্রজে, বাষ্পীয় শকটে, কিম্বা বাষ্পীয় পোতে গমনাগমন করিতে ও রমণীর হৃদয় ভয়ে কম্পান্বিত—অনেক স্থলে দেখা যায় আপনার গৃহে থাকিলেও দুরাত্মাদিগের হাতে নিস্তার নাই! স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় এখন আসিয়াছে, না তখন ছিল ?

(৪) বেদের পরবর্ত্তী বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিবার জন্যই আত্রেয়ী অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছেন। তিনি বাল্মীকির তপোবনেই বেদাধ্যায়ন শেষ করিয়াছিলেন, সুতরাং বেদাধ্যয়নে স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধুদিগের অনধিকারিত্ব তাঁহাতেও বর্ত্তিয়াছিল, এই কথোপকথন হইতে তাহা উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় একটি বিদ্যাত্র সম্পত্তি লাভ করে, ইহাতে এখন ৩৩০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ছয় লক্ষ বাইট হাজার টাকা মজুত আছে। সিজিস্মণ্ড ষ্ট্রেট নামক এক ব্যক্তি এই সম্পত্তির দাতা। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য যে অধ্যক্ষ সভা আছে, তাহাতে দাতার বংশধর কেহ নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন, যথা,—সেণ্ট্ নিকস্ নামক গির্জার পুরোহিত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও দ্বিতীয় শিক্ষক, শিক্ষাবিভাগের একজন সভ্য, একজন বণিক্ এবং একজন ব্যবহারজীবী। এই অধ্যক্ষসভা স্বকীয় কার্য্যকলাপের জন্য বিভাগীয় শিক্ষা সমিতির নিকট দায়ী।

ষ্ট্রেট্ প্রদত্ত অর্থে চলিত ভাষা, জ্যোতিষ, এবং সংগীতের জন্য শিক্ষক পোষণ করে; ১২ জন ছাত্রের বাসা, বিছানা, অগ্নিও প্রদীপ যোগায়; আরও ২০ জন ছাত্রকে কেবল খাইতে দেয়; পুস্তকালয়, জ্যোতির্গণনালয়, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সংগ্রহে বার্ষিক উন্নতি বিধান করে। প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য কয়েক জন শিক্ষকের বেতনও ইহার সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়। শিক্ষকেরা মরিলে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য এবং তাঁহাদের বিধবা পত্নীদিগকে বার্ষিক ৪৫ পৌণ্ড হিসাবে বৃত্তি দিবার জন্য অন্য একটি দান ভাণ্ডার আছে। আর একটি বিদ্যাত্র সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ৪৫০ পৌণ্ড বিদ্যালয়ে এবং ১৫০০ পৌণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বৃত্তি প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা এবং সম্পত্তিদাতাদিগের সম্মানের জন্য প্রতি দুই বৎসর পরে একটি করিয়া উৎসব হয়। ১৮১৯ এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় ভূমিদান দ্বারা বিদ্যামন্দিরের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যখন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন, তখন তথায় একজন প্রধান শিক্ষক এবং অপরাপর ২৫ জন শিক্ষকের অধীনে ৫৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। এই বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক গড়ে শতকরা ২৫ জন ছাত্র ছাড়তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ফ্রেডারিক্ উইলিয়ম্ জিম্নাসিয়মের ন্যায় এখানেও শতকরা ১০ জন ছাত্র বিনা বেতনে পড়িতে পায়। নাগরিক সমিতি হইতে ইহাদের বেতন প্রদত্ত হয়। এই বিদ্যালয় রাজকোষ হইতে বার্ষিক ১০০ পৌণ্ড এবং বার্লিনের নাগরিক সমিতি হইতে বার্ষিক ১০০০ পৌণ্ড সহায্য পাইয়া থাকে।

সংস্থাপন এবং বিদ্যাত্র সম্পত্তি-দানের সর্ত্তানুসারে এই বিদ্যালয়ও প্রোটেষ্টাণ্ট্ শ্রেণীভুক্ত। এখানে ক্যাথলিক ছাত্র নাই বলিলেই হয়, তবে ৭০ কি ৮০ জন য়িহুদি ছাত্র আছে। সমুদায় ছাত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ দূরাগত, সুতরাং পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পড়া শুনা করিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ জর্ম্মনীতে বাড়ী হইতে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাইয়া পড়িবার রীতিই প্রবল; প্রুসিয়ার ৬৬,০০০ ছাত্রের মধ্যে ৪০,০০০ ছাত্রই বাড়ী হইতে যাইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে ২৬,০০০ বাড়ী হইতে যাইয়া পড়িতে পারে

না বটে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই কোন না কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিয়া পড়া শুনা করে। ছাত্র যে বাড়ীতে থাকিবে, তাহার পিতা মাতাই তাহা স্থির করিয়া দেন, কিন্তু প্রধান শিক্ষকের তাহাতে মত হওয়া চাই, কারণ ছাত্র যে বাড়ীতে থাকিবে, সেই বাড়ীর কর্ত্তা ছাত্রের বিদ্যালয় বহির্ভূত আচরণের জন্য দায়ী। সাধারণতঃ উত্তর-জর্ম্মনীর পারিবারিক জীবন ভদ্র ও দয়া দাক্ষিণ্যযুক্ত এবং ধর্ম্ম-ভীরু; ফরাসী দেশের ছাত্রাবাস হইতে এখানকার কোন পরিবারে রাখিলে ছাত্র অনেক ভাল থাকে। তথাপি প্রুসিয়ার লোকেরা বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট ছাত্রাবাস বৃদ্ধির প্রয়োজন অধিকতর রূপে অনুভব করিতেছেন।

ষ্টেট্-প্রদত্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ছাড়া আর সর্ব্ব বিষয়েই গ্রেফ্রায়ার বিদ্যালয়ের পরিপোষক বার্লিণের নাগরিক সমিতি। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিবে, সমুদায় জিম্নাসিয়মেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করিবার ক্ষমতা বিভাগীয় শিক্ষা সমিতির হাতে সর্ব্বদাই রহিয়াছে।

বার্লিনের আর একটি বিদ্যালয় জোয়াচিমষ্থল জিম্নাসিয়ম্ উল্লেখ যোগ্য। এখানে ছাত্র সংখ্যা ৪০৪ জন দেখা গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১২০ জন সাহায্য প্রাপ্ত, ১২ জন ছাত্রাবাসে অবস্থিত; অবশিষ্ট বাড়ী হইতে আসিয়া পড়িত। ইহাদেরও শতকরা ১০ জন অবৈতনিক। ছাত্রাবাসে অবস্থিত ছাত্রদিগকে বার্ষিক ২৪ পৌণ্ড দিতে হয়। সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রেরা সমস্ত খরচই পায় না; ইহাদের মধ্যে ২৫ জনকে বার্ষিক ৮ পৌণ্ড ১৪ শিলিং এবং ৭৫ জনকে বার্ষিক ৬ পৌণ্ড ১০ শিলিং করিয়া দিতে হয়। কেবল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ২০ জন ছাত্র সমস্ত খরচ পাইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয় রাজকীয় সাহায্যে স্থাপিত, এবং ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে জোয়াচিম্ ফ্রেডারিক্ নামক সামন্তরাজ হইতে বিদ্যাত্র ভূসম্পত্তি-প্রাপ্ত। ইহা প্রোটেষ্টাণ্ট্ সাম্প্রদায়িক। ইহার বর্ত্তমান বার্ষিক আয় বিদ্যাত্র ভূমি-সম্পত্তি হইতে ৩,০০০ পৌণ্ড এবং অন্যান্য তহবিল হইতে বার্ষিক কিঞ্চিদধিক ২,০০০ পৌণ্ড। স্বয়ং রাজা ইহার পরিপোষক, এই জন্য রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ ইহার তত্ত্বাবধায়ক।

এই বিদ্যালয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ; কারণ বটম্যান, মিডার, পাসৌ, জাম্‌ট্, কুগার্ এবং বার্ক ইহার শিক্ষক—শ্রেণীর অন্তর্ভূত। থিয়োক্রিটস-সম্পাদকের পুত্র ডাক্তার কিপ্লিং ইহার প্রধান শিক্ষক। জর্ম্মন্ শিক্ষকদিগের নাম সংগ্রহ করিতে গেলে এইরূপ প্রসিদ্ধ নাম সচরাচর উপস্থিত হয়। গ্রেফ্রায়ার বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন শিক্ষকদিগের মধ্যে হীন্‌ডর্ফ, স্পাল্‌ডিং এবং ড্রুয়সেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্মরণীয় ঘটনা-সম্বন্ধেও প্রুসীয় বিদ্যালয় অন্যান্য দেশের বিদ্যালয়ের নিকট পশ্চাৎপদ নহে। উপরি বর্ণিত জোয়াচিম্‌ষ্থল বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর একটি ছাত্র ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য অনেক ছাত্রের ন্যায় ফরাসী রাজ্যের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই

বালক লিপ্‌জিগে আহত হয়, ফ্রান্সে অভিযান করে, ওয়াটার্লুর যুদ্ধে উপস্থিত থাকে, আয়রন ক্রশ্‌ নামে সম্মান-চিহ্ন লাভ করে, এবং সেই চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আবার সেই চতুর্থ শ্রেণীতে যাইয়া পড়িতে বসে।

কিন্তু স্কুল্‌ফর্টা বিদ্যালয়ের সঙ্গে জর্ম্মনীর অন্য কোন বিদ্যালয়েরই তুলনা হইতে পারে না। কি প্রাচীনতা, কি সৌন্দর্য্য, কি সম্পত্তি, কি খ্যাতি, সর্ব্ব বিষয়েই ইহা ইংলণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় সমূহের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। এই নগরস্থ সেণ্ট মেরির গির্জা ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার পার্থিব ব্যবহার আরম্ভ হয়, এবং ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক মরিস্‌ এক শত প্রোটেষ্টাণ্ট ছাত্রের অবস্থানোপযোগী করিয়া এই মন্দিরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং ধর্ম্ম মন্দিরের সম্পত্তি বিদ্যাত্র সম্পত্তি করিয়া দেন। প্রুনীয় সাক্‌সনি প্রদেশে সাল্‌ নদীর তীরে উহা অবস্থিত। ইহার প্রান্তরে, কাননে, এবং পর্ব্বতে নির্ম্মিত প্রাচীন গৃহগুলি দেখিলেই বোধ হয়, "ইহাই ঈশ্বরের গৃহ এবং ইহাই স্বর্গের দ্বার,"—ইহার প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরের এই পরিচয়-বাক্য সার্থক। ইহাতে একটি ভজনালয় পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে স্মৃতি-সূচক উৎসবাদি নিয়মিত রূপে হইয়া থাকে। প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে ছাত্রেরা লাটিন ভাষায় একটি স্তুতি পাঠ করিয়া থাকে। প্রাচীন নিয়মানুসারে প্রত্যেক ছাত্রের একজন করিয়া শিক্ষক আছেন, প্রত্যেক শিক্ষকের নির্দিষ্ট ছাত্র আছে। জর্ম্মনীর মধ্যে এই বিদ্যালয়েই লাটিন কবিতার বিশেষ চর্চ্চা হয়, এবং ইটন্‌ বিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও ছাত্রদিগের রচনাবলি প্রচারিত হয়।

ইহার বিদ্যাত্র সম্পত্তি খুব বৃহৎ, এবং ধর্ম্ম-মন্দির পোষণের অনেক সম্পত্তি ইহার কার্য্যে লাগিয়া থাকে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থান প্রুসীয়ার হস্তগত হয়; তাহার পূর্ব্বে তত্রত্য ধর্ম্ম-যাজকের হস্তে ফৌজদারীও আদালতের সমস্ত ভারই ন্যস্ত ছিল। এখন ইহার সমস্ত সম্পত্তি সাক্‌সনির বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতির হাতে, তাঁহারাই একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ইহার বার্ষিক আয় আট হইতে নয় হাজার পৌণ্ডের মধ্যে।

ইল্‌জেন্‌ নামে স্কুল্‌ফর্টার একজন প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষক ছিলেন; তাঁহার হোমরিক সংগীত যিনিই পড়িয়াছেন, তিনিই এই নাম শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবেন। ইল্‌জেন্‌ ১৮০২ হইতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; তিনি যে সকল সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। অতি অল্প বিদ্যালয়ই এতগুলি প্রাচীন পণ্ডিত জন্মাইতে পারিয়াছে। গ্রীভিয়স্‌, আর্ণেষ্টি, রুণ্‌-ইকু, বটিগার, মিচার্লিক্‌, ফিক্‌টে, ডিসেন্‌, থিয়ার্স, স্পিজ্‌নার্‌, ডভার্লিন, প্যান্‌; ইহারা সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা ২০৫, তন্মধ্যে ১৮০ সাহায্য প্রাপ্ত, ২০ বৃত্তিপ্রাপ্ত, এবং ৪ কি ৫

জন অর্দ্ধবৃত্তি প্রাপ্ত। এই অর্দ্ধবৃত্তিধারিগণ কেবল খাওয়া বাদে আর সর্ব্ববিষয়েই সাহায্যপ্রাপ্তদিগের সুবিধাগুলি পায়। খাওয়ার জন্য বার্ষিক ৭ পৌণ্ড ১০ শিলিং দিতে হয়, এবং প্রত্যেকে একজন শিক্ষকের সঙ্গে থাকিতে পায়। সম্পূর্ণ খরচ দিয়া যাহারা থাকে, তাহারা একজন শিক্ষকের সঙ্গে থাকে খায়, এবং এজন্য বার্ষিক ৪৫ পৌণ্ড খরচ লাগে; তদ্ভিন্ন শিক্ষার বেতন স্বরূপ তাহাদিগকে বার্ষিক ৫ পৌণ্ড ৮ শিলিং করিয়া দিতে হয়।

সাহায্য প্রাপ্ত সকল ছাত্রেরই কিছু কিছু খরচ লাগে, তবে দানগ্রাহী ১৪০ জন ছাত্রকে অতি অল্পই দিতে হয়। পূর্ব্ব হইতে আহার প্রাপ্ত ৩০ জন ছাত্র আছে, তাহাদিগের বার্ষিক ৩ পৌণ্ড মাত্র লাগে; পরে আবার নূতন ২০ জন আহার প্রাপ্ত ছাত্রের বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বার্ষিক ৭ পৌণ্ড দিতে হয়। সাধারণতঃ কোন ছাত্রই যখন তখন দানগ্রাহী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দানপ্রার্থীছাত্রদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকটা রাজা মনোনীত করেন, আর অর্দ্ধেকটি ভিন্ন ভিন্ন নাগরিক সভা মনোনীত করেন। কর্টা যখন প্রুসিয়ার হাতে যায়, তখনকার সন্ধির নিয়মানুসারে স্যাক্সনির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি দান করিতে রাজা বাধ্য। সাধারণের দাতব্যে যাহাদিগের দাবী আছে, এমন ব্যক্তিদিগকে রাজ-দেয় অবশিষ্ট বৃত্তিগুলি সচিবদিগের পরামর্শানুসারে প্রদত্ত হয়। যাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর হয় নাই, এবং যে তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় অসমর্থ, তাহাকে বৃত্তি দেওয়া হয় না। এই বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী হইতে পড়া আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণী উচ্চ ও নিম্ন দুই বিভাগে বিভক্ত থাকাতে প্রকৃত পক্ষে ইহাতে ছয়টি শ্রেণীই আছে। তৃতীয় শ্রেণীর উভয় বিভাগে ৭৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর উভয় বিভাগে ৭৯ জন, এবং প্রথম শ্রেণীর উভয় বিভাগে ৪৯ জন ছাত্র আছে। কোন কোন ছাত্র বৃত্তির জন্য অনেকগুলি করিয়া ছাত্র মনোনীত হয়, এবং পরীক্ষায় যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই তাহা পায়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃত্তিপ্রার্থীদিগকে দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক হইতে হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গেলে এই বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক ১০ হইতে ১৫ পৌণ্ড পর্য্যন্ত অনেকগুলি বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয়ের রীত্যনুসারে সপ্তাহের মধ্যে একদিন অনধ্যায়; সেই দিন ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের পাঠ্য কিছু না পড়িয়া নিজের যাহা ইচ্ছা তাহাই পড়িতে পারে। সাধারণতঃ জিম্‌নাসিয়মের প্রথম শ্রেণীতেও ভাল ভাল ছাত্রেরা কোন কোন পাঠ্য বিষয়ে অবহেলা করিয়া নিজের রুচি মত পড়িতে পারে। ছাড়তি পরীক্ষার সময়ে এই স্বেচ্ছাধীন পাঠের ফল দেখাইতে হয়, এবং নিদর্শন-পত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। শিক্ষা-সম্বন্ধে ফরাসীর তুলনায় জর্ম্মন্‌দিগের স্বাধীনতা কত অধিক, এই প্রথাই তাহার দৃষ্টান্ত। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এরূপ প্রথা অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইবে। এরূপ স্বেচ্ছাধীন পাঠ প্রণালী-বদ্ধভাবে চালাইতে পারা

যায়, এ ধারণা কোন ইংরাজ ছাত্রের মনে হয়ত স্থানই পায় না, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা এইরূপ বিশ্বাস করেন, আর তাঁহাদের এ বিশ্বাস কতকটা সঙ্গতও বটে।

স্কুল্‌ফর্টার খেলা-ভূমি তত্রত্য বালকদিগের নিকট একটা অহঙ্কারের জিনিস্; বাস্তবিক বনাবৃত পর্ব্বত মালা ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে থাকাতে স্থানটি বড়ই মনোরম হইয়াছে। কিন্তু তথায় ইংরাজী খেলার আদর নাই, খেলা-ভূমিতে গেলেই ব্যায়ামোপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। জর্ম্মনেরা এখন বিশেষ যত্নের সহিত বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের চর্চ্চা করিতেছেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যায়াম-চর্চ্চা অধ্যয়নের অঙ্গীভূত হইয়াছে; বার্লিন্ নগরে একটি আদর্শ ব্যায়াম-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, বিবিধ বিদ্যালয়ে ব্যায়াম-শিক্ষক হইয়া কার্য্য করিবার জন্য তথায় ১৮ জন ছাত্রকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই সকল শিক্ষক বলিয়া থাকেন, সকল বয়সের এবং বালকদিগের সকল অবস্থার উপযোগী করিয়া তাঁহারা ব্যায়াম শিখাইতে পারেন। ব্যায়ামে জর্ম্মন্‌দিগের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া ফরাসিগণ বিস্মিত হইয়াছেন; বাস্তবিকও তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ব্যায়াম এতটা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ইংলণ্ডের কোন ভাল বিদ্যালয়ের ছাত্র বিদেশে ব্যায়ামের এই সকল বন্দোবস্ত দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয় না, তাহার স্বদেশীয় খেলার স্মৃতি তাহাকে অধিকতর আনন্দ দিতে থাকে। গ্রন্থকার বলেন, যে সকল বালককে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, এবং যাহাদের আমোদপ্রমোদের সময় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যায়াম চর্চ্চা ভিন্ন আর কিছুই তেমন উপকারী নহে। সাধারণতঃ অন্যদেশের বালক অপেক্ষা ইংলণ্ডের বালকদিগের খাটুনি অল্প, সুতরাং খেলাই তাহাদিগের অঙ্গচালনার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যে অল্প সংখ্যক ইংরাজ-ছাত্র খুব বেশী পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে একটুকু নিয়মিত ভ্রমণ ব্যতীত আর কিছুই ঘটে না। এইরূপ বালকের পক্ষে ব্যায়ামে বিশেষ উপকার আছে। যে সকল ক্ষুদ্র বালক খেলায় যোগ দিবার যোগ্য নহে, সুতরাং নিয়মিত খেলার পরিবর্ত্তে এ দিক ও দিক দৌড়াদৌড়ি করিয়া কেবল বেড়ায়, তাহাদের পক্ষেও বিদেশীয় ব্যায়াম প্রণালী অধিক উপকারী।

এ পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় সম্বন্ধেই যাহা কিছু বলা হইয়াছে, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক বা মিশ্র বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। কোলোন্ নগরস্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মস্ জিম্‌নাসিয়ম্ এই শ্রেণীর। কোলোন্ ক্যাথলিকদিগের স্থান; ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে একটি মাত্র ক্যাথলিক সাম্প্রদায়িক জিম্‌নাসিয়ম্ বর্ত্তমান ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে দুইটি ক্যাথলিক জিম্‌নাসিয়ম্ ছিল, একটির ছাত্র সংখ্যা ৩৮২ এবং অপরটির ছাত্র সংখ্যা ২৮১; আবার ৬০১ জন ছাত্র সহ প্রথম শ্রেণীর একটি রিয়েল্ স্কুলও ছিল। ইহা ছাড়া একটি প্রোটেষ্টাণ্ট্ সাম্প্রদায়িক জিম্‌নাসিয়ম্ আছে, এবং তাহার সঙ্গে রিয়েল্ স্কুল অর্থাৎ ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীও

রহিয়াছে। ইহারই নাম ক্রেতারিক উইলিয়ম্‌স্ জিম্‌নাসিয়ম্। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে একটা প্রাচীন বিদ্যালয় নাগারিক সমিতির হাতে। আইসে। অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা কিছু কমাইবার জন্য, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট্ ছাত্রদিগের শিক্ষার একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহারা ইহাকে একটি জিম্‌নাসিয়মে পরিণত করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট বন্ধু বান্ধব চাঁদা তুলিয়া উহার সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত একটি রিয়েল্ স্কুল খুলিয়া দেন; কিন্তু পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণী দুই বিদ্যালয়ের মধ্যেই সাধারণ ভাবে থাকিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহাতে রিয়েল্‌স্কুলের তিনটি মাত্র শ্রেণী আছে। জিম্‌নাসিয়ম্ বিভাগে ৩৫৬ জন এবং রিয়েল্ স্কুল বিভাগে ১০০ জন ছাত্র আছে। জিম্‌নাসিয়ম্‌টি যদিও প্রোটেষ্টাণ্ট সাম্প্রদায়িক, তথাপি ইহার প্রোটেষ্টাণ্ট্ ছাত্র সংখ্যা মোটে ১২৫ জন; ২১৫ জন ক্যাথলিক এবং ১৬ জন য়িহুদি। প্রুসিয়াতে প্রকৃত সাম্প্রদায়িকতা কত কম, ইহাতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। এই বিদ্যালয়টি প্রোটেষ্টাণ্ট্ সাম্প্রদায়িক, ইহার প্রধান শিক্ষক এবং অপর ১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে অধিকাংশই প্রোটেষ্টাণ্ট্, তথাপি ইহাতে ক্যাথলিক ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। বিদ্যালয়ের নিয়মিত ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রোটেষ্টাণ্ট্ মতেই হয়, কিন্তু ক্যাথলিকদিগের সংখ্যা এত অধিক থাকাতে তাহাদের জন্য এক জন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-শিক্ষকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এইরূপ অপর জিম্‌নাসিয়ম দুইটি ক্যাথলিক-সাম্প্রদায়িক হইলেও তাহাতে একজন করিয়া অতিরিক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্ম শিক্ষক আছেন। যে বিদ্যালয়ে ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ছাত্রের সংখ্যা অল্প, সে বিদ্যালয়ে তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হয় না, সে বন্দোবস্ত তাহাদের অভিভাবকদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে করিতে হয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-বেতন বার্ষিক ১৮ হইতে ২২ থেলার্ পর্য্যন্ত।

এই বিদ্যালয়ের সম্পত্তির আয় বার্ষিক ২০০ পৌণ্ডেরও কম। রাজ-সাহায্য ৯০০ পৌণ্ড। ছাত্র বেতনও প্রায় ঐ পরিমাণ। নাগরিক সভা প্রথমতঃ গৃহাদি দিয়াছেন, এখন ঐ সমস্তের মেরামতের জন্য বার্ষিক ৫০ পৌণ্ড দিতেছেন। ইহা রাজ পরিপুষ্ট বিদ্যালয়; কিন্তু কোলোনস্থ অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় ইহারও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান একটি স্থানীয় সভার হস্তে ন্যস্ত। এই সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ আছেন;—বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতির একজন প্রতিনিধি, তিন জিম্‌নাসিয়মের প্রধান শিক্ষকেরা, একজন ব্যবহারজীবী একজন ধনাধ্যক্ষ, একজন কার্য্যাধ্যক্ষ, এবং দুই জন নাগরিক। শেষোক্ত পাঁচ জন সাধারণ সভা দ্বারা মনোনীত এবং বিভাগীয় শিক্ষা-সমিতির সম্মতি-প্রাপ্ত। কোলোন্ নগরে সাধারণ শিক্ষার জন্য যে সকল দান-ভাণ্ডার আছে, তাহার পক্ষ হইতে একজন ক্যাথলিক পুরোহিত ও এই অধ্যক্ষ-সভার সভ্য আছেন। এই সকল দান-ভাণ্ডারের আয় সামান্য নহে, বার্ষিক প্রায় ৬০,০০০ থেলার বা ৯,০০০ পৌণ্ড। এই অধ্যক্ষ-সভার অধীন কেরাণী প্রভৃতি ৭ জন কর্ম্মচারী

আছে। এই সকল কর্ম্মচারী এবং অধ্যক্ষ-সন্তান সন্তানগণ নিয়মিত বেতন পাইয়া থাকেন।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কথা ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; রাজনৈতিক মত-ভেদের জন্য ইঁহারই নিয়োগে মত দিতে শিক্ষা-সচিব অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া গ্রন্থকার ইঁহার ক্ষমতার পরিচয়ে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইনি বলিলেন, শিক্ষক-নিয়োগ কার্য্যেও বিদ্যালয়ের ব্যাপার রাজনীতির চক্ষে দেখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব; ইনি যে কোনোন্ বিদ্যালয়ে রহিয়াছেন, ইহাই একথার প্রমাণ। ইনি বলিয়াছেন, শিক্ষক, এবং অধ্যাপকদিগের নিয়োগে রাজ-নীতি খাটা-ইতে হইবে, একথা গবর্ণমেণ্টের কল্পনাতেও স্থান পায় না। প্রধানতঃ কোন্ শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে, তাহা জানিবার জন্য গ্রন্থকার একদিন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বসিয়া ভর্ত্তির খাতা খানি আদ্যোপান্ত দেখিয়াছিলেন। দুই বিদ্যালয়েরই মধ্য-বিভাগের একটি শ্রেণী লইয়া প্রত্যেক বাল-কের বিবরণ তাঁহারা পড়িয়া দেখিলেন। ইহাতে দেখা গেল,রিয়েল্‌স্কুলের ছাত্রদিগেরই সামাজিক অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। সন্নিহিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ হইতে গৃহীত কতক গুলি কৃষক-বালকও ছিল,কিন্তু তাহারা সকলেই বৃত্তিধারী। অনেকগুলি ছাত্র রাজ-কীয় কর্ম্মচারীদিগের সন্তান। কিন্তু দেখা গেল, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্রেরই পিতা ব্যবসায়দার বলিয়া উল্লিখিত। গ্রন্থ-কার কয়েক বিষয়ে অধ্যাপনাও শুনিলেন, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষাই বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলেন। যিনি এই বিষয় শিক্ষা দিলেন, তিনি জাতিতে সুইস্ এবং ইংরাজীতে বেশ ভালরূপ আলাপ করিতে সমর্থ; তিনি বলিলেন, তিনি এক সময়ে অপিংহাম্ নগরে প্রচলিত-ভাষা-সমূ-হের শিক্ষক ছিলেন। বন্ নগরে ফরাসী ভাষার অধ্যাপন দেখিয়া যেমন হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ ভাষার অধ্যাপন দেখিয়া গ্রন্থকার বুঝিলেন, জর্ম্মন্ ছাত্রেরা আধুনিক ভাষা গুলি বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করে। সুইস্ শিক্ষক-টিও তাঁহারই একথায় সায় দিলেন। এমন কি, ফরাসী দেশেও এই সকল ভাষা ইংলণ্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে, উৎকৃষ্টতর শিক্ষকের অধীনে এবং উৎকৃষ্টতর রূপে অধীত হয়। জর্ম্মনীতে এই সমস্ত ফ্রান্স হইতেও উৎকৃষ্টতর। কিন্তু ফ্রান্সে গণিত অপেক্ষা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপন যদিও অপকৃষ্ট, জর্ম্মনীতে উক্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপন আরও অপকৃষ্ট। কিন্তু এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে অযোগ্য বিচারক, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করেন; বিশেষতঃ এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিবার কোন উপায় নাই, কারণ ইংলণ্ডের বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে কালের অভিজ্ঞতা তাঁহার আছে, সেকালে তথায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধীত হইত না। জর্ম্মনীর অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষার যেরূপ অধ্যাপন হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ হয়; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডাক্তার জাগার; ইনি যে একজন দক্ষ লোক, একথা ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইনি বলেন, যাঁহারা এ বিষয় বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহাদের সকলেরই মত এই যে, রিয়েল্-স্কুলগুলি শিক্ষা-দানে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। যদিও ইতিহাস, ভূগোল, এবং মাতৃভাষা জিম্‌নাসিয়ম্ এবং রিয়েল্ স্কুলের সমশ্রেণীতে তুল্য ভাবে অধ্যাপিত হয়, এবং রিয়েল্‌স্কুলে ফরাসী ভাষার শিক্ষায় অধিকতর যত্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহার প্রত্যেক বিষয়েই জিম্‌নাসিয়মের ছাত্র রিয়েল্ স্কুলের ছাত্রকে পরাস্ত করে। ডাক্তার জাগারের মতে প্রাচীন ভাষায় শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তি অধিকতর মার্জ্জিত হওয়াই ইহার কারণ।

জর্ম্মন্ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষেরা সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন। ডাক্তার জাগারের মত এস্থলে উদ্ধৃত করিবার কারণ, তিনি এক জন কার্য্যদক্ষ লোক, এবং তাঁহার দ্বিবিধ বিদ্যালয়ের বহুদর্শিতাই আছে। সুইজর্লণ্ডে এ আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায় না, কারণ সুইস্‌দিগের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন নহে, কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন। সুইজর্লণ্ডের রিয়েল্ স্কুলে লাটিন চলিত নাই; কিন্তু মনোবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে অবজ্ঞা করিয়া কেবল ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য শিক্ষা বিধানে একই অসুবিধা যে, সুইজর্লণ্ডেও রিয়েল্ স্কুলে লাটিন্ পড়াইবার কল্পনা হইতেছে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত গ্রন্থের উপসংহারে ব্যক্ত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

সাধারণতঃ উচ্চ বা উদার শিক্ষাই উচ্চ বিদ্যালয় গুলির উদ্দেশ্য,তবে একবিধ শক্তি-নিচয়ের পরিকর্ষণদ্বারা কাহারও বা শিক্ষা প্রকৃতি-তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হয়, কাহারও বা শিক্ষা অন্য-বিধ শক্তি নিচয়ের পরিকর্ষণ দ্বারা মানব-তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে বালককে কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, ইহা মনে করা ভুল; এজন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিলেও বালকের জীবনের লক্ষ্য এবং ভবিষ্যৎ ব্যবসায় অনুসারে তাহার মনোবৃত্তি আপনা হইতেই সেই দিকে প্রস্তুত হইতে থাকে। বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে যাহা শিখিয়াছে, ব্যবসায়ের দিকে তাহা চালিত করা, এবং তাহার সঞ্চিত জ্ঞানকে যথা সম্ভব বৈজ্ঞানিক ভাবে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করাই বিশেষ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ছাত্র যে জ্ঞান লইয়া আইসে, তাহা বিজ্ঞান-সম্মত শৃঙ্খলায় সজ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত করা, এবং সেই জ্ঞান যাহাতে ব্যবসায়-বিশেষে লাগে, তদর্থে তাহাকে পরিচালিত করাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

শিক্ষাবিষয়ে ঋষিবাক্য।

(৫)

বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃস্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্মান্ হিতঞ্চোপ দিশৎস্বপি
মনু। ২য়, অধ্যায় ২০৬ শ্লোক।

বিদ্যাদাতা গুরু, স্বযোনি অর্থাৎ. পিতৃব্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরু, এবং যাঁহারা অকার্য্য হইতে নিবারণ করেন ও যাঁহারা হিতোপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যবহার করিবে।

মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর প্রভেদ ধর্ম্ম লইয়া, মনুষ্যের ধর্ম্ম আছে, অন্য প্রাণীর তাহা নাই। আহার, নিদ্রাদি ইতর প্রাণীর ও আছে, মনুষ্যেরও আছে, একমাত্র ধর্ম্ম আছে বলিয়া মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতাও সর্ব্বপ্রাণীর উপর আধিপত্য স্থাপনের শক্তি আছে; এবং সেই ধর্ম্মবলেই মনুষ্য দেবত্বপ্রাপ্ত হইতে পারে।

যে ধর্ম্মের জন্য মনুষ্যের পশুত্বপরিহার ও দেবত্বলাভের অধিকার হইয়া থাকে, সেই স্পৃহনীয় সম্পত্তির লাভ ও রক্ষণ বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া যে মনুষ্যের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে শিক্ষায় সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা এবং সেই জ্ঞান যে গুরু শিক্ষা দেন, তাঁহাকে যে কোন্ বস্তু প্রতিদান করিলে ঋণমুক্ত হইতে পারা যায়, তাহা সমস্ত পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া যায় না।

যে শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, তাহা শিক্ষণীয় নহে, তাহা প্রতিরোধের জন্য রাজদণ্ড উন্মুক্ত রহিয়াছে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের বহু পথ আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অধ্যেতব্য বিষয়ের মধ্যেই যে সেই সকল পথ সংপ্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নহে, সেই জন্য তাহাদিকে অধর্ম্ম্য অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ করাও কদাচ সঙ্গত এবং সম্ভবপর নহে। কোন শাস্ত্রে সামান্য কর্ত্তব্য, কোন শাস্ত্রে বা বিশেষ কর্ত্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে, কোন শাস্ত্রে বা কর্ত্তব্যের অনুকূল উপদেশ আছে, অতএব শাস্ত্র মাত্রেই পাঠ্য। যেমন একমাত্র পরমেশ্বর হইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ একমাত্র কর্ত্তব্য হইতে ধর্ম্মের বহু পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ত্তব্য সামান্য ধর্ম্ম, তাহা হইতে বিবিধ বিশেষ ধর্ম্মের উৎপত্তি, গঙ্গা সামান্য, তাহাহইতে কাশীর গঙ্গা প্রয়াগের গঙ্গারূপ বিশেষত্ব।

কর্ত্তব্য ব্যক্তিও অবস্থাভেদে অপরিসংখ্যেয়, পুরুষের একরূপ কর্ত্তব্য, স্ত্রীর একরূপ কর্ত্তব্য। তাহা আবার বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদিভেদে বিভিন্ন। স্থূল কর্ত্তব্যের মধ্যে বহুবিধ সূক্ষ্ম কর্ত্তব্য আছে এবং সেই সকল কর্ত্তব্যের সঙ্গে অন্যান্য সমুদয় প্রাণীর কর্ত্তব্যের একটী অলক্ষিত অথচ সুদৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। মানবের নিজ কর্ত্তব্যের মধ্যেই পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, প্রতিবেশী, স্বগ্রামবাসী, স্বদেশী, স্বসমাজ সজাতির প্রতি কর্ত্তব্য এবং ইতর প্রাণীর প্রতি কে কর্ত্তব্য, তাহাও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের সোপানরূপ

শিক্ষার সময়ে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতিও

ব্রহ্মচারীর যে কর্ত্তব্য, তাহাতে উত্তমরূপে জ্ঞান লাভ করা উচিত। যদি সে কর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে পালিত না হয়, তাহা হইলেই অধর্ম্ম, কারণ অপালিত-কর্ত্তব্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও যেমন, অন্য আশ্রমে থাকিলেও সেইরূপ অপ্রাপ্ত-ব্যবহার শিশুর ন্যায় অনয়র আচরণ দ্বারা জগৎকে শান্তিহীন করিয়া তুলে। নিজে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইয়া অন্যকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করে। গৃহস্থাশ্রমের মূল কর্ত্তব্য বিদ্যাসমাপনের পর বিবাহ করিয়া পুত্রের পুত্র বা নিজের বার্দ্ধক্য দর্শন পর্য্যন্ত, এই কর্ত্তব্য যে যথাবিধি পালন করিয়া অন্য আশ্রমে প্রবেশ করে, সেই ধার্ম্মিক, যাহার এই কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সে অন্য আশ্রমে প্রবেশের অধিকারী হইতে পারে না, কারণ ভোগবাসনার নিবৃত্তি না হইলে, অন্য আশ্রমে তাহার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু অপত্যোৎপাদনাদি গৃহস্থের ধর্ম্ম হইলেও যতির পক্ষে তাহা অধর্ম্ম। বিশেষতঃ মূল ছাড়িয়া অগ্রভাগে গমনের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমের কর্ত্তব্য যথার্থরূপে পালন না করিয়া অন্য আশ্রমে প্রবেশ করা অসম্ভব না হইলেও বস্তুতঃ সে কার্য্য অসঙ্গত। অনাশ্রমীর দৃঢ় কর্ত্তব্য নাই।

এক এক বিষয়ে কর্ত্তব্যশেষ করিয়া অন্যের গ্রহণ করাই যৌক্তিক এবং ধর্ম্মের অনুমোদিত। ধর্ম্ম বলিয়া কর্ম্ম কার্য্য করা হউক আর না হউক, যথার্থ কর্ত্তব্য যদি পালিত হয়, তাহা হইলে অন্তর্নিহিত ধর্ম্মও কর্ত্তাকে আশ্রয় করে। অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যেরা চিত্তের চাঞ্চল্যাদি নিরোধে সক্ষম হইতে পারেনা, বিবিধ অনাচরিত কর্ত্তব্যের স্পৃহা তাহাকে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে দেয় না, দুর্জ্জয় রিপু স্বীয় প্রভাব বিস্তারে ক্ষান্ত হয় না। নিবেশ ব্যতীতও কিছুই হইতেও পারে না। প্রথমে বিশ্ব-স্রষ্টার কার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্টতা না করিতে পারিলে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্টতার আশা এবং চেষ্টা উভয়ই নিরর্থক হইয়া থাকে। মানবের কর্ত্তব্যনিচয় ঈশ্বরের সৃষ্ট। অতএব কর্ত্তব্যকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কারণ তাহার গর্ভেই ধর্ম্মনিহিত রহিয়াছে।

তবে সেইরূপ অধ্যাত্মজ্ঞানবলে কার্য্য কারণের সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে কামাদিকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কেবল অধ্যাত্মজ্ঞানই তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হইয়া থাকে। কিন্তু সেরূপ সৌভাগ্য সহস্র লোকের মধ্যে দুই এক জনের আছে কিনা সন্দেহ।

পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া প্রাণের ব্যাকুলতা জানাইতে অনেকে পারে, কিন্তু যাহার পুত্র হয় নাই, যে-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য জানে না, বা যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী বা অমলবিদ্য নহে, সে অনুভব করিতে পারে না যে, পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ কিরূপ? যদি তাহা জানা না থাকে, তাহাহইলে সে সহস্র ডাকিলেও তাহার আহ্বান ফলপ্রদ হইতে পারে না। যে পিতা পুত্রের ভাব নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা জ্ঞানবলে জানিয়াছে, সেই সে ভাব বুঝে এবং তাহার আহ্বানই ফলপ্রদ হয়। তদ্ভিন্ন কর্ত্তব্যপরায়ণের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহধারাও চির উন্মুক্ত। অতএব কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম এবং যাহাতে

মনুষ্যকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে, সেই বিদ্যাই বিদ্যা।

যাহাতে কর্ত্তব্য সাধনের আনুকূল্য করে, তাহা উপবিদ্যা। যাহা কর্ত্তব্যের প্রতিরোধক তাহা বিদ্যা নহে, তাহা শিক্ষিতব্য নহে। অন্যান্য যত প্রকার ধর্ম্ম মার্গ আছে, কর্ত্তব্য তাহাদের মূল। অতএব কর্ত্তব্য ধর্ম্ম।

কর্ত্তব্যকে ধর্ম্ম বলিয়া পালন করার রীতি আমাদের ক্ষীয়মাণ-সৌভাগ্য ভারত হইতে প্রায় অন্তর্হিত, কিন্তু তাহা সুখের মূল বলিয়া এখন সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। অন্যরূপে নাস্তিকতা থাকিলেও কর্ত্তব্যপরায়ণতা মানুষের সকল দুর্ভাগ্য দমন করিতে পারে। কারণ কর্ত্তব্যপরায়ণের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ দেখা যায়।

কর্ত্তব্যের আর একটি প্রভাব যদিও ঈশ্বরানুগ্রহেরই অন্তর্ভূত, তথাপি তাহা অনন্যোৎপাদ্য বলিয়া উল্লেখ যোগ্য। কর্ত্তব্যে অভ্যস্ত হইতে পারিলে অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি আর লুক্কায়িত থাকে না। যেমন ভক্তি বা জ্ঞান-ব্যতীত অন্য মার্গ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় অভ্যস্ত হইতে পারিলেও অনধীত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞাত আচারে অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় বলিয়া অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিও স্বতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্যও কর্ত্তব্যকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

মহামতি মেধাতিথি ও ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কার্য্য করিয়াছেন। কার্য্য আর কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র নহে।

কর্ত্তব্য দ্বিবিধ—সামান্য ও বিশেষ। বিশেষ কর্ত্তব্য ও দ্বিবিধ আত্মনীন ও সাম্প্রদায়িক। সামান্য কর্ত্তব্য মানব মাত্রেরই একরূপ। এই কর্ত্তব্যের সম্মান যত দিন পূর্ব্ববৎ রক্ষিত না হইবে, এই কর্ত্তব্যের উপকারিতা যত দিন মানব-সমাজ না বুঝিবে, ততদিন একজনের ক্ষতিতে নিজের ক্ষতি, একজনের লাভে নিজের লাভ বুঝিতে সমর্থ হইবে না এবং নিজের সুখদুঃখকে পরের সুখদুঃখের সমান বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। নিজে উন্নত হইতে হইবে, ইহা যেমন সকলের প্রার্থনীয়, সেইরূপ সকল মানবকে উন্নত করিবার অভিলাষ ও মানব মাত্রেরই থাকা আবশ্যক। তবে নিজে প্রস্তুত না হইলে অন্যকে প্রস্তুত করা অসম্ভব এই জন্য সর্ব্বোপরি আত্মকর্ত্তব্যের স্থান, কিন্তু তাহার সঙ্গে জাতিগত কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ট। স্বগ্রামীর কর্ত্তব্য গ্রামস্থ সকলেরই সমান, প্রদেশ, দেশও জনপদগত কর্ত্তব্যের সঙ্গে প্রত্যেক মানব সমসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল জরায়ুজতাই মানব-সমাজের সামান্য লক্ষণ নহে, কর্ত্তব্যগত সমতাও মানবত্ব রক্ষার অন্যতর লক্ষণ। কর্ত্তব্যগত একতা যেখানে নাই, বুঝিতে হইবে, সেখানে মানবত্ব নাই। মানবের সঙ্গে ভিন্ন মানবোচিত কর্ত্তব্য অন্যপ্রাণীর সঙ্গে থাকিতে পারে না।

পান, আহার, সুখ, শান্তি হইতে স্বাধীনতা পর্য্যন্ত সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য, মানব মাত্রেরই স্পৃহনীয়। যাহা সকলেরই স্পৃহনীয়, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার এবং সে সকল বিষয়ে নিরাপদ হইবার চেষ্টা সকলেরই সমান। পানীয়, খাদ্যাদি বিনা

কর্ত্তব্য লাভ করা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যাহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সকলেরই কর্ত্তব্য একরূপ। এই কর্ত্তব্যই সামান্য ধর্ম্ম বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। এই সব কর্ত্তব্যগুলা প্রথমে পরিবারগত, গ্রামগত, দেশগত, পরিশেষে বিশ্বগত হইয়া থাকে। যে মানবসমাজ এই কর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছে, ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ উন্নতিকে তাহারাই লাভ করিতে পারিয়াছে। তাহার পর সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্য, এবং আত্মনীন কর্ত্তব্য। আত্মনীন কর্ত্তব্য না বুঝিলে, সম্প্রদায়-গত কর্ত্তব্য বোধ হয় না এবং তাহা না হইলে জাতিগত কর্ত্তব্য ও আচরিত হইতে পারে না।

কর্ত্তব্যোপদেশ যাহাতে আছে সেই অধ্যেতব্য শাস্ত্র। কর্ত্তব্যের উপদেশ যিনি প্রদান করেন, তিনি যথার্থ গুরু।

উপাধ্যায়াদি অন্য বিদ্যাদাতা গুরু মানবকে কর্ত্তব্য বা তাহার ধর্ম্ম শিক্ষা দেন সুতরাং তিনি গুরুবৎ সম্মানার্হ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃব্যাদি শৈশব হইতেই শিশুকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন না, শৈশবে বিপথগামী হইলে মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও মানুষ পশু হইয়া যায়। সেই পতন হইতে যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারা গুরুবৎ প্রতিপূজ্য।

অকার্য্য হইতে যাঁহারা নিবারণ করেন, যাঁহারা হিতোপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা ও মনুষ্যত্ব সংরক্ষণের জন্য গুরুবৎ প্রতিপূজ্য। পুত্র ভৃত্যাদি হইতেও মানব এই উপকার পাইতে পারে বলিয়া মানবের অবজ্ঞার পাত্র কোন মানবই নহে।

—০—

লক্ষ্মীর কথা।

(১)

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পপ্রচ্ছ মাধবঃ।
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা ১

হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে সুখোপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীকে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে দেবি! কি উপায়ে তুমি মনুষ্যদিগের প্রতি নিশ্চলা হও?

তাহার উত্তরে লক্ষ্মী বলিতেছেন—

[illegible] যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জ্বলা।
[illegible] ॥ ২ ॥

[illegible] দেব! যে সংসারে শান্তা, [illegible] কর্ত্তব্যপরায়ণা কলহশূন্যা গৃহিণী বাস করেন, সেই সংসারে আমি বাস করি। ২।

শুষ্ক পরিষ্কার বায়ু স্বাস্থ্যকর, যেখানে তাহা থাকে, যাহাদের শরীরে তাহার বাতাস লাগে, তাহারা সহসা রোগে অভিভূত হয় না। রোগ জন্মাইবার সামান্য কারণও সেখানে বিরুদ্ধ-সংযোগের জন্য বলহীন হইয়া পড়ে। পরন্তু উৎসাহের অভাব, দুশ্চিন্তাদিও শরীর সম্বন্ধীয় সামান্য অসুখ সেখানে

স্থান পায় না। যদি মানুষের শরীর ও মনে কোন রোগ প্রবেশ না করে, তাহা হইলে হাত, পা, বুদ্ধি, ও অর্থউপার্জ্জনের এবং তাহা সুন্দর রূপে রক্ষা করিবার শক্তি-সম্পন্ন মনুষ্য কখনই লক্ষ্মীহীন হইতে পারে না। অতএব শুক্ল পারাবত যে গৃহে বাস করে, তথায় লক্ষ্মীও বাস করেন।

গৃহিণী যে সংসারে উজ্জ্বলা অর্থাৎ কর্ত্তব্য পরায়ণা ও কলহ-পরিশূন্যা, সে সংসারে লক্ষ্মী বাস করেন। গৃহিণীর কর্ত্তব্য অনেক—শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, আত্মীয়স্বজন, অতিথি, দাস-দাসী বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি সংসার-সংসৃষ্ট ব্যক্তি সকলের প্রতি তাহার এমন কর্ত্তব্য আছে, যাহাতে তাহাকে দেব-কন্যা মনে করিয়া সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারে। সংসার সম্বন্ধে তাহার এমনই সুন্দর কর্ত্তব্য আছে—যাহার জন্য সে সংসারকে সোণার সংসার করিয়া তুলিতে পারে। এই সকল কর্ত্তব্য বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবক-অভিভাবিকার নিকট, বিবাহের পর পতি-গৃহে আসিয়া সেখানকার অভিভাবক অভি-ভাবিকাদের নিকট শিক্ষা করিতে হয়। কন্যার পিতা মাতাই নিজ কন্যাকে গৃহিণীর সদ্গুণ শিক্ষা দিতে প্রথম অধিকারী এবং সেই উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। কারণ বালিকার একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য থাকে না, সে সময় যদি আমোদের সঙ্গে তাহাকে সদুপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে পুড়াইবার পূর্ব্বে মাটীর পাত্রে রেখা-পাতের ন্যায় বালিকার কোমল হৃদয়ে সেই সকল সদুপদেশ চিরস্থায়ী হইয়া যায়। শৈশবে হৃদয় যে ভাবে গঠিত হয়, অন্ত সময় তাহার অনুরূপ বিষয় সকল গ্রহণ করাই মানুষের স্বভাব। পিতা মাতা যদি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কন্যার হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ ও কলুষিত করিয়া তুলেন, তাহা হইলে জগতে প্রচুর উপাদেয় সামগ্রী থাকি-তেও শূকর যেমন বিষ্ঠার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, সেইরূপ সহস্র সদুপদেশ ঠেলিয়া ফেলিয়া সে কন্যা মন্দটুকু গ্রহণ করে। আবার পিতা মাতা যদি সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়া কন্যার হৃদয়কে পবিত্র ও উন্নত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে হংস যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধই পান করে, সেইরূপ বহু মন্দ বিষয় হইতে যেটা সার ও উপকারী তাহাই সে কন্যা গ্রহণ করে। কিন্তু এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর অধিকার ও দায়িত্ব অধিক। মাতা বা অন্য অভিভাবিকার সঙ্গে বালিকার একত্র বাস যতক্ষণ হয়, পিতা বা অন্য পুরুষ অভি-ভাবকের সঙ্গে তত সময় একত্র বাস হইতে পারে না, পুরুষের সাংসারিক কর্ত্তব্য এক অন্তঃপুরেই নিবদ্ধ নহে, কিন্তু রমণী অন্তঃপুরেরই অধীশ্বরী। যদি বা পুরুষ অভিভাবকের সান্নিধ্য বালিকার অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য নাও হয়, তাহা হইলেও মৃদু-স্বভাবা রমণীর নিকট প্রকৃতির অনুরূপ শিক্ষা লাভে কন্যার যেমন সুবিধা ও সুফলের আশা করা যাইতে পারে, পুরুষের নিকট সেরূপ আশা নাই। পুরুষের স্বাভাবিক গুণ কন্যাতে সংক্রামিত হইলে কন্যা উগ্রচণ্ডা—সিংহিনীতুল্য হইয়া

উঠে। এই জন্য শৈশব হইতেই কন্যাকে অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকটে সর্ব্বদা রাখিবার নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তদ্ভিন্ন পুরুষ-পরিবৃতা কন্যা অত্যন্ত নির্লজ্জা, কঠোর-স্বভাবা হইয়া থাকে।

তবে যেখানে কন্যার মাতাও সাংসারিক কর্ত্তব্যে অশিক্ষিতা, অর্থাৎ কেমন করিয়া স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে হয়, কেমন করিয়া সকল কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে হয়, কেমন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিতে হয়, কেমন করিয়া লজ্জা, বিনয়, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা নিস্পৃহতার অভ্যস্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ রমণীর সম্মান লাভ করিতে হয়, তাহা যদি না জানে, কেবল ক্রোধ, অভিমান, লোভ, চিৎকার স্বার্থ-পরতা, শঠতা, মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি অধনা গুণের আধার হয়, তাহা হইলে সে মাতা কন্যার পরমহিতৈষিণী হইলেও কন্যাকে গুণবতী এবং ভবিষ্যৎ সুখের অধিকারিণী করিতে কখনই পারে না।

এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"।

কন্যাকেও পুত্রের মত করিয়া পালন করিবে এবং অতি যত্নে তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবে। কারণ আজ যে কন্যা কাল সে গৃহিণী—জননী হইবে। তাহার সদুপদেশই অন্যে অপেক্ষা করিবে। কেবল খেলাইয়া বেড়াইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়া-ইতে দেওয়া ও উত্তম উত্তম খাদ্য ও বস্ত্র-দ্বারা কন্যাকে বর্দ্ধিত করা কন্যার পিতা মাতার কার্য্য নহে, তাহা রাক্ষসের কার্য্য। রাক্ষস অগোপনে একবারে মানুষ ভক্ষণ করে, যে পিতামাতা কন্যাকে সুশিক্ষা না দেয়, মন্দ হইতে নিবারণ না করে তাহারা গোপনে কন্যার মাথা যত দিন কন্যার জীবন, ততদিনের জন্য খাইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের দোষে সে কন্যা জীবনের মধ্যে কোন সুখভোগ করিতে পারে না এবং কাহাকেও সুখী করিতে পারে না, সুখী থাকিতে দেয় না; যেখানে যায় সেই স্থানেই দুঃখও অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই জন্য বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা মাতা, বংশ, সংসর্গ, স্বাস্থ্য, আকার আদি সমুদয় বিশেষ রূপে দেখার উপদেশ আছে। রমণী লক্ষ্মীও হইতে পারে, অলক্ষ্মীও হইতে পারে, লক্ষ্মীর আশায় অলক্ষ্মীকে গৃহে স্থান দেওয়া কাহারই অভিপ্রেত নহে।

কলহশীলা গৃহিণী-নিজের বুদ্ধি, বংশ ও উপদেশের মন্দতার পরিচয় দেয়। যাহার বুদ্ধি ভাল, সে বিবেচনা করিতে পারে—কলহে সুফল কিছুই নাই, বরং যত প্রকার মন্দ ফল আছে, তাহা কলহ হইতে উৎপন্ন হয়, বিশেষতঃ কলহের জন্য নিজের পিতা মাতা ও দেশ, উপদেশ আদির প্রতি লোকের একটা মন্দ বিশ্বাস স্থায়ী করিয়া দেওয়া হয়, তদ্ভিন্ন সংসারের কোন প্রাণীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ভালবাসা পাওয়া যায় না, এবং কাহাকে ভালবাসিতে পারা যায় না। এই জন্য বুদ্ধিমতী রমণী অন্য কলহ-শীলা রমণীর সহিত এক সংসারে বাস করিলেও অকারণে কটু কাটব্য শুনিলেও

নীরবে সমুদয় সহ্য করিয়া চলে। উত্তর করিলে কলহ, নীরব থাকিলে মন্দ কথা কিছুদিন শুনিতে হয় বটে, কিন্তু সে জন্য নিন্দাভাজন হইতে হয় না, পরন্তু সংসারের অপর সকলের মায়ামমতা ভক্তি, শ্রদ্ধা আদি সম্পূর্ণ রূপে লাভ করা যায়, কাযেই বুদ্ধিমতী রমণী কখনও কলহে যোগদান করেন না।

কন্যার বংশ যদি ভাল হয় তাহা হইলে কলহের নামেই সে ভীত হয়, অন্যে কলহের জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও বংশের গৌরব রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিয়াও সে সমুদয় সহ্য করিয়া চলে।

যে বাল্য হইতে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে জানে যে ক্রুদ্ধকে অনুনয় করিতে হয়, তাহার উপর ক্রোধ করিয়া আর ক্রোধ বাড়াইতে হয় না। ক্রোধের বৃদ্ধি হইলে কিছুই অকার্য্য এবং অবাচ্য থাকে না। যাহা অকার্য্য এবং অবাচ্য তাহাই মানুষের অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম তাহাই মানুষের অসুখের হেতু। যে সংসারে কলহ চলে, সে সংসারে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এক প্রাণীও সুখে থাকে না। কাযেই যাহার যাহা কার্য্য সে তাহা করিতে পারে না। যাহাকে উপার্জ্জন করিতে হইবে, সে উপযুক্ত রূপে উপার্জ্জন করিতে অসমর্থ হয়, যে ধনরক্ষা করিবে, সে বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে না এবং শরীর মনকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে কেহই সক্ষম হয় না; অতএব কলহে যে কেবল অশান্তি, ধনক্ষয় ও অর্থকষ্ট আনয়ন করে তাহা নহে, পরিবারস্থ সকলেরই স্বাস্থ্য হানি বা আয়ুঃ-ক্ষয়েরও তাহা হেতু স্বরূপ। কলহ যেখানে আছে, সেখানে অলক্ষ্মী আছে বুঝিতে হইবে, লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন "অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা" অলক্ষ্মীই কলহের আধার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রতিধ্বনি। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মাসিক পত্র ও সমালোচন। স্বত্বাধিকারী শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রামাণিক। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্য্যালয় ১৭৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। আকার ডিমাই ৪-পেজী ১৬ পৃষ্ঠা। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৵৹ আনা।

পত্রিকার পরিচালকেরা এইরূপে তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন;—"আজকাল বঙ্গভাষায় সাময়িক পত্র অনেক। সাহিত্য, সাধনা, নব্যভারত, পুরোহিত, জন্মভূমি, অনুশীলন, ভারতী, সখা ও সাথী, শিক্ষা-পরিচয়, বেদব্যাস, এই মহানগরী হইতেই এই সকল এবং আরও বহুসংখ্যক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। সকলের উদ্দেশ্য এক নহে। সকল কাগজের লেখকও এক ব্যক্তি নহেন। আর সকল লেখাই কিছু তেমন প্রয়োজনীয় হয় না। সুতরাং ইহার কোন এক খানি বা দুই খানি কাগজ

যাইয়া বর্ত্তমান কালের যুবক লেখক ও ভাবুকদিগের মধ্যে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, তাহা জানা যাইতে পারে না। সকল কাগজ লওয়া বহু-ব্যয়সাধ্য। এতগুলি টাকা কাগজে ক্রমে খরচ করেন, এক বঙ্গদেশে তেমন লোক খুব কম। অথচ এই উদ্দেশ্যটী সাধন করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। সাময়িক পত্রের সারবান প্রবন্ধ গুলি উদ্ধৃত করিয়া "প্রতিধ্বনি" আপনার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহাশয়দিগেরও সকল সাময়িক পত্র পাঠের অভাব ঘুচিবে। "প্রতিধ্বনি"র নিজের যে কিছু থাকিবে না তাহাও নহে। তবে সকল সাময়িক পত্রের পাঠের ফল যাহাতে পাঠকেরা অল্পব্যয়ে লাভ করিতে পারেন, "প্রতিধ্বনি" সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।" আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম প্রতিধ্বনি নিজের উদ্দেশ্য পালন করিতেছেন।

জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উন্নতি। সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অভিব্যক্ত। আকার ডিমাই ১২ পেজী ৮১ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা মাত্র।

সাহিত্য কি, জাতীয় সাহিত্য কাহাকে বলে, ইহার আবশ্যকতা কি, ইহার প্রতি কাহার কর্ত্তব্য কিরূপ এবং কে তাহার কতটুকু সম্পাদন করিতেছেন, কি কি উপায়ে ইহার উন্নতি হইতে পারে, এবং এই সকল বিষয়ে স্বদেশ ও বিদেশের অনেক মহাত্মা কে কি বলিয়াছেন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ইহাতে অবতারিত এবং অতি দক্ষতার সহিত সমালোচিত হইয়াছে। আজ কাল লেখা এবং বক্তৃতায় সার ভাগ অতি অল্পই থাকে; তাহার কারণ, লেখক কলমের জোরে লিখিয়া যান, এবং বক্তা মুখের জোরে বকিয়া যান, কিন্তু আপনাতে আপনি ধ্যাননিমগ্ন হইয়া অথবা পরের চিন্তা-সমুদ্রে ডুব দিয়া সার সংগ্রহ করিতে চাহেন না। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, দেবেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে চিন্তাশীলতা এবং অনুসন্ধিৎসা এই উভয়েরই প্রচুর প্রমাণ সুব্যক্ত রহিয়াছে। এই প্রবন্ধের জন্য যে তাঁহাকে বিস্তর খাটিতে হইয়াছে; প্রবন্ধের প্রত্যেক পৃষ্ঠাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অনাদৃত বঙ্গভাষার সেবায় যাঁহারা বিশেষরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, দেবেন্দ্র বাবু সেই সকল পূজনীয় মহাত্মাদিগের অন্যতম, সুতরাং তাঁহার হাত হইতে এইরূপ সারবান্ প্রবন্ধের আশাই আমরা করি। আমরা এই প্রবন্ধ পড়িয়া দেবেন্দ্র বাবুকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি; আর শিক্ষিত মাতৃভাষানুরক্ত বঙ্গবাসীকে এই প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। | ভাদ্র, ১৩০২ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

চরিত কুসুমাঞ্জলি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামধন বিদ্যালঙ্কার।

১২৩৭ বঙ্গাব্দে মালদহ জেলার অন্তর্গত কলিগ্রাম নামক একটী পল্লীগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বয়স যে সময় দুই বৎসর তৎকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তৎকালে তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

রামধন ও কৃষ্ণধন নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা বিশেষ কোনও বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। অকৃতবিবাহ দশাতেই ২০ বৎসর বয়সের সময় রামধনের ও ২৭ বৎসর বয়সের সময় কৃষ্ণধনের মৃত্যু হয়।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুক্ত শ্যামধন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রখরতা ছিল। শৈশবাবস্থাতেই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে লেখা পড়া শিক্ষা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা শৈশবাবস্থা হইতেই অত্যন্ত প্রবল ছিল, তিনি ৭।৮ বৎসর বয়সের সময় স্নান করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত পান করিয়া পরে আহারাদি কার্য্য করিতেন।

এই সময়ে ইঁহার পিতা ৺হরশঙ্কর লাহিড়ী মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। তিনি ছয় টাকা বেতনে জমিদারের কার্য্য করিতেন ও তাঁহার পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র সম্পত্তি দ্বারাই কোনও প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার পুত্রদিগকে ভালরূপ বিদ্যা শিক্ষা করাইবার ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাব নিবন্ধনও অন্য প্রকার সুবিধা না হওয়াতে সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই।

বাল্যকাল হইতে মহাত্মা শ্যামধনের বিদ্যাশিক্ষার ইচ্ছা ও অত্যন্ত অধ্যবসায় ছিল; নতুবা তাঁহার সাংসারিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল, তাহাতে তিনি কখনই লেখাপড়া শিখিয়া এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি সামান্য কিছু বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ১৩ বৎসর বয়সের সময় স্বীয় চেষ্টায় মালদহ

জেলার অন্তর্গত গিলাবাড়ী নামক গ্রামে ৺হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। ইনি সম্বন্ধে তাঁহার পিতৃব্যপুত্রের শ্বশুর হইতেন। এই মহাত্মা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিল না, তিনি শ্যামধনের প্রতি পুত্রের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক যত্নের সহিত তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

এই অধ্যাপকের নিকট শ্যামধন সারস্বত ব্যাকরণ, প্রভাবতী নামক টীকার কিয়দংশ, অমর কোষ অভিধানও তাহার টীকা রায়-মুকুটের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র, তাহাতেই তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি এই সময়েই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার অধ্যাপক অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। সাধু সংসর্গে শ্যামধনের মন অতি পবিত্র হইয়াছিল।

শৈশবাবস্থা হইতেই বিষয় কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ আসক্তি ছিল না। তিনি পাঠস্থান হইতে যে সময় বাটীতে আসিতেন, সেই সময় তাঁহার ভ্রাতৃগণ "সাংসারিক কোন কার্য্য করা নাই কেবল নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলেই কি চলিবে?" এইরূপে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের সহিত বাঙ্নিষ্পত্তিও করিতেন না।

তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় অধ্যাপকের মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি গঙ্গাতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি কার্য্যের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

অধ্যাপকের মৃত্যুর পর তিনি বাটীতে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া ২১ বৎসর বয়সের সময় দিনাজপুর জেলায় জাহাঙ্গীরপুর গ্রামে শ্রীধর পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন জন্য গমন করেন। তথায় বাস করিবার ও আহারের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল, তাহাতে পড়া শুনা কিছুই হইত না। এই স্থানে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, আত্মীয় ব্যক্তি কেহই নিকটে ছিল না। ভগবানের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া তথায় পাঠের সুবিধা না হওয়ায় তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

২২ বৎসর বয়সের সময় তিনি দুই আনা মাত্র পয়সা সম্বল করিয়া বগুড়া জেলার বোরাই গ্রামে ৺রামমোহন ভট্টাচার্য্যের নিকট অধ্যয়নার্থে গমন করেন। এই সময় রেলপথ ছিল না। বাটী হইতে ৫।৬ দিবসের পথ বোরাই গ্রামে তিনি পদব্রজেই গমন করিয়া ছিলেন। এই স্থানে তিনি ব্যাকরণের পরিশিষ্ট ও কিছু ন্যাসটীকা অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রথম অধ্যাপক হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় বৈয়াকরণ তিনি এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর করেন নাই। রামমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেন, "তোমার যেরূপ অধ্যয়নের প্রতি আসক্তি ও তুমি যেরূপ ভাবে অধ্যয়ন করিতেছ, আমার পড়াই তাদৃশ নয়।" যদিও ইহার নিকট অধ্যয়ন খুব ভাল না হউক, তথাপি নিজবুদ্ধিবলেও অধ্যাপকের সাহায্যে তিনি ন্যাস টীকাও পরিশিষ্ট পড়িয়া ছিলেন। এই স্থানে তিনি ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত হইলে তিনি কৌমুদী নামক সারস্বত ব্যাকরণের নবটীকা, কারিকামালা, কলাপ, পানিণীয়, রত্নমালা, সুপদ্ম, সংক্ষিপ্তসার, হরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থের কিছু কিছু নিজেই দেখিয়াছিলেন।

২৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে মহামহোপাধ্যায় ৺শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আগমন করেন এবং রঘুনন্দনী তিথিতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কীর্ত্তিকমলবিভাকর নামক একখানি কাব্য ও কুলজ্ঞদিগের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কুলশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করেন। তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ সমাধা না হইতেই অন্যান্য ছাত্রদিগের পূর্ব্বেই তিনি নিমন্ত্রণ পত্রাদি পাইতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদ্বারা অনেক ব্যক্তিই পুরাণাদি পাঠ করাইতে লাগিলেন। দেশীয় ছাত্রদিগের পূর্ব্বেই ঈদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সহাধ্যায়ী ছাত্রদিগের ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল, এবং কি প্রকারে তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারা যায়, তাঁহারা তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এক দিবস তাঁহার অধ্যাপক মহাশয় কোনও সভাতে ভ্রম বশতঃ একটী অব্যবস্থা দিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থাটী ইহাকে দেখান হইলে ইনি, ভুল হইয়াছে বলিয়া অন্যান্য ব্যক্তির সমক্ষে তাহা প্রকাশ করেন, তাহাতে অধ্যাপক মহাশয় কিছু অপ্রতিভ এবং অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গুরুকোপই তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কতার কারণ হইল কি না বলা যায় না। এই সময় রাজসাহী জেলার মুক্তাপুর দীঘা নিবাসী ৺শত্রুঘ্ন রুণী মহাশয় স্বীয় ভ্রাতুষ্দুহিতার সহিত ইহার বিবাহ দিয়া ইহাকে গৃহ জামাতা রাখেন। তখনও তাঁহার পাঠ শেষ হয় নাই। ছাত্রগণ সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে কোনও শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেও সকলে হয় নাই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত; তাহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত, এবং তিনি তাহার উত্তর চিন্তা করিতেন। এইরূপ নানা প্রকারে তাঁহাকে উৎপীড়িত করিলে অতিরিক্ত চিন্তায় তাঁহার মানসিক গতি ক্রমেই খারাপ হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপ অত্যাচার করিলেও তাঁহার অধ্যাপক নিষেধ করিতেন না এবং প্রশ্রয়ও দিতেন না। বাস্তবিক তাঁহার মস্তিষ্ক এত খারাপ হইবে, এরূপ বিশ্বাস অধ্যাপকের ছিল না। ছাত্রদিগের মনোগত ভাব জানিতে পারিলে বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাদিগকে কখনই এরূপ করিতে দিতেন না। তিনি শ্যামধনকে আন্তরিক অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যাহা হউক, এই সময় হইতেই তাঁহার মনোবিকার আরম্ভ হয়, এবং ইহার পরে দায়ভাগ প্রভৃতি যে সকল দুরূহগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তাহাতে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ক্রমে পাঠে নানা প্রকার অসুবিধা হওয়ায় অগত্যা তিনি পাঠে বিরত হন এবং শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। তিনি স্বীয় হস্তে যথেষ্ট পুস্তক

লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অনেক ব্যক্তিই সেই সমস্ত পুস্তক লইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ২১১ খানি মাত্র পুস্তক আছে। সম্প্রতি নাটোরের ছোট তরফের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন ও মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাই এক্ষণে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। তাঁহার মস্তিষ্ক যেরূপ বিকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে; কিন্তু শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। এক্ষণে তিনি রাজসাহী জেলায় মৃজাপুর দীঘাতে বাস করিতেছেন। তিনি অন্ধ হইয়াছেন; নাটোরের রাজা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষুর কোন উপকার হয় নাই। তাঁহার সত্যবাদিতা ও ধর্ম্মনিষ্টা এখনও প্রবল আছে। এই বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনি ৩ প্রহর পর্য্যন্ত জপাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্র বর্ত্তমান আছেন।

পণ্ডিত শ্যামধন বিদ্যালঙ্কারের বিদ্যাবত্তা, নির্লোভতা এবং সরলতা বা বিষয়বুদ্ধি বিহীনতার পরিচায়ক অনেক ঘটনা রাজসাহীর প্রায় সকলেই জানেন; আমরা নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম। পাঠক মনে রাখিবেন, এগুলি উপন্যাস নহে, এ সব প্রকৃত জীবনের সত্য ঘটনা।

বিদ্যাবত্তা। স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পোষ্যপুত্রের উপনয়ন, তারপর নানা দূরদেশ হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভামণ্ডপে উপস্থিত। এসকল সভায় যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপ হইল, চারিদিকে দলে দলে পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। কেবল একটি দলে তখনও বিচার চলিতেছিল। এই দলের এক পক্ষে নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং অন্য পক্ষে আর কয়েক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিচার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ব্রজবিদ্যারত্ন জয়-লাভ করেন এমন সময়ে "রণং দেহি" বলিয়া শ্যামধন অগ্রসর হইলেন। শ্যামধনের বিচার দেখিবার জন্য সেই বিশাল লোকারণ্য চারিদিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। শ্যামধন সহজে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার লোক নহেন; কিন্তু বিচারের গোলটা একবার যদি তাঁহার মনে উঠে, তবে আর রক্ষা নাই। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কেবল বিচার্য্য বিষয় ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার মনে থাকে না, পরিধেয় বস্ত্র এবং নিজের শরীর পর্য্যন্ত তিনি ভুলিয়া যান। তাঁহার চিন্তা এবং বক্তৃতা উভয়ই অতি দ্রুত। প্রতিপক্ষ আমতা আমতা করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর অর্দ্ধেকটা বলিতে না বলিতেই তিনি তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করেন, এবং তাহার উত্তর দিয়া বিগত-প্রমাণ স্থানে অগ্রসর হন। এই জন্য শ্যামধনের সঙ্গে প্রতিপক্ষতা করা বড় কঠিন। বিচার চলিতেছে, প্রতিপক্ষের বাক্য ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, জয়োন্মুখ ব্রজবিদ্যারত্ন এখন পরাজয়োন্মুখ, এমন সময়ে সেই লোকারণ্যের মধ্য হইতে একটা বদ-রসিক লোক বলিয়া উঠিল "ভাদুড়ীর লোক উপস্থিত।"

এই কথা শুনিবামাত্র শ্যামধন বিচার ছাড়িয়া উঠিলেন, পৈতায় হাত দিয়া গায়ত্রী

জপ এবং মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর অসম্বদ্ধ প্রলাপে ভাদুড়ীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন, সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহজেই জয়-লাভ হইল। পূর্ব্বে যে মানসিক বিকৃতির কথা বলা হইয়াছে, পাঠক এস্থলে তাহার পরিচয় পাইলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বিশ্বাস, ভাদুড়ীর লোকেরা নিয়ত তাঁহার প্রাণ লইবার চেষ্টায় ফিরিতেছে, কেবল গায়ত্রী এবং হুঙ্কারের বলে তিনি আত্ম-রক্ষণে সমর্থ হইতেছেন। এই ভাদুড়ী কে, তাঁহার মনে এ সংস্কার কেন জন্মিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

নির্লোভতা। এক দিন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎ সুন্দরী দেবীর কাচারীতে যাইয়া তাঁহার অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্তবাবু আনন্দমোহন সরকার মহাশয়কে বলিলেন, "আমার উত্তরীয় বস্ত্র নাই, আমাকে এক খানি উত্তরীয় বস্ত্র দিতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, সরকার মহাশয় তাঁহাকে অতি সমাদরে বসাইয়া তখনই দোকান হইতে তাঁহার জন্য এক যোড়া কাপড় আনাইলেন; কিন্তু বিদ্যালঙ্কার কেবল চাদর খানিই লইলেন, কিছুতেই তাঁহাকে দিয়া ধুতি খানি গ্রহণ করান গেল না। ধুতি খানি লইবার জন্য সকলেই তাঁহাকে বলিল, তাঁহার নামে কাপড় আসিয়াছে, সুতরাং তিনি তাহা না লইলে মহারাণী অসন্তুষ্ট হইবেন, একথাও বলা হইল; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা লইলেন না, "আমার উত্তরীয় নাই, তাই উত্তরীয় চাহিয়াছিলাম, আমার পরিধেয় বস্ত্র আছে, সুতরাং তাহা লইব না," এই বলিয়া, সেই মলিন পরিধেয়ের উপরে নূতন উত্তরীয় খানি গাত্রে দিয়া সানন্দে চলিয়া গেলেন।

সরলতা বা বিষয়-বুদ্ধি-বিহীনতা। জ্যৈষ্ঠ মাসে এক দিন নাটোরে নিমন্ত্রণ ছিল; শ্যামধন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিমন্ত্রণ খাইয়া একটি টাকা দক্ষিণা পাইয়াছেন, এবং নাটোর বাজারের ভিতর দিয়া বাড়ী চলিয়াছেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে আম বিক্রেতা সকল বসিয়াছে। নাটোরে আমও খুব সস্তা, সময়ে সময়ে দুই এক আনা করিয়া মূল্যেও এত শত আম পাওয়া যায়। যাহারা বিদ্যালঙ্কারের বিষয় বুদ্ধির সংবাদ রাখে, তাহারা তাঁহার হাতে টাকা পয়সা দেয় না। সে দিনের টাকাটি তাঁহার নিকটেই ছিল, তাই তাঁহার মনে আম কিনিবার সখ হইল,—বুঝি বা মনে করিলেন, বাড়ীতে আম লইয়া গেলে ব্রাহ্মণী ভারি খুসী হইবেন! তদনুসারে একটা আম বিক্রেতার হাতে টাকাটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এক টাকার ভাল আম্র দেও দেখি।" (পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত নামই ব্যবহার করেন, যথা উত্তরীয়, আম্র, ইত্যাদি।) টাকাটি দিয়াই কোঁচ পাতিলেন। আম বিক্রেতা "আজ্ঞে আপনাকে কি মন্দ জিনিষ দিতে পারি" বলিয়া কোঁচে আম দিতে লাগিল, কিন্তু দুই চারি গণ্ডা আম দিলেই কোঁচ ভারি হইয়া পড়িল। তখন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বিব্রত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আর না, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে, এক টাকার আর কত আম্র [illegible]?" এই বলিয়া তিনি সেই কয়েক গণ্ডা আম লইয়াই চলিলেন, বিক্রেতাও এস্থলে তাহার

কোন অপরাধ নাই দেখিয়া ধীরে ধীরে টাকাটি সামলাইল!

বিদ্যালঙ্কার নগর ছাড়িয়া মাঠে পড়িলেন। সেখানে রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক গুলি গোরু চরিতেছিল, তন্মধ্যে একটি গাভী তাঁহারদিকে চাহিয়া রহিল। বিদ্যালঙ্কার বুঝিলেন, গাভী তাঁহার নিকট আম চাহিতেছে। তিনি গাভীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি, আম্র খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে? এই নেও।" এই বলিয়া একটি আম তাহাকে দিলেন। সরল লোকের নিস্তার পশুর হাতেও নাই! গাভী আমের লোভ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিল। পশ্চাতে ফিরিয়া গাভীকে দেখিয়া বলিলেন, "কি, তৃপ্তি হয় নাই? আচ্ছা, এই ধর আর একটি লও।" এই বলিয়া আর একটি আম তাহাকে দিলেন। কিন্তু গাভী তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আবার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, এবং অবশেষে কোঁচে মুখ দিয়া অত্যধিক লোভ দেখাইতে লাগিল। তখন তিনি আর কি করেন? বলিলেন, "আহা! আম্র-ভক্ষণ কখনত ঘটে না! এই লও।" এই বলিয়া সকল গুলি আম গাভীকে দিয়া শূন্যহস্তে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন! বাড়ীতে ব্রাহ্মণী কিরূপ খুসী হইয়াছিলেন, লেখক সে সংবাদ রাখেন না।

ইহাই বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীগ্রামের একজন অজ্ঞাতনামা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঔজ্জ্বল্যবিহীন নীরব জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নিবিড় বন-জাত পুষ্প-তরুর ইতিহাস সংগ্রহ করা যেমন কঠিন, এই সকল জীবনী সংগ্রহ করাও সেইরূপ কঠিন। দুঃখের বিষয়, সাধারণের নিকটে এই সকল জীবনের তেমন আদর নাই, অথচ আমাদের জাতীয় মহত্বের অবশেষ যদি কিছু থাকে, তবে এই সকল দেব-চরিত্র মহাত্মার চরিত্রেই তাহা আছে। অনেক সময়ে রাজর্ষি মহর্ষি শব্দের অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই দারুণ কলিকালে ঐ সকল শব্দের বাচ্য যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি এই শ্যামধন বিদ্যালঙ্কারের মত লোক। এই বিদ্যাচর্চ্চার সময়ে এমন সকল লোক বর্ত্তমান থাকিতেও যে তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয় না, ইহা দেশের নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। দেশের প্রকৃত জীবন—আমাদের প্রকৃত জাতীয় জীবন এখনও এই সকল পল্লীগ্রামেই আছে; আমরা সহর-বাজারে যে সকল চাকচিক্যময় জীবনের আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা বিদেশীয় সভ্যতার বিকৃত ছায়ামাত্র।

লক্ষ্মীর কথা।

(২)

ধান্যং, সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলা রজতোপমা।
অন্নং চৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং। ৩।

যে গৃহে ধান্যকে স্বর্ণতুল্য, চাউলকে রূপার সমান দেখা হয়, এবং যে সংসারে অন্নে তুষ থাকে না, হে কৃষ্ণ! আমি সেই সংসারে বাস করি। ৩।

একটী সামান্য ধান্যের প্রতি অযত্ন হইতে ক্রমে বহুমূল্য বস্তুর প্রতিও অযত্নের অভ্যাস হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ শত স্থানে শতটী ধান্য পড়িয়া নষ্ট হইলে প্রতি স্থানে এক একটী ধান্য দেখায় বটে, কিন্তু তাহা একত্র করিলে অনেক গুলি হয়, এইরূপ প্রতিদিন নষ্ট হইলে গৃহস্থের ক্ষতি নিতান্ত অল্প হয় না। অতএব বস্তু সামান্য হইলেও অযত্ন করা বা অকারণে নষ্ট হইতে দেওয়া সংসারীর কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্ব-জন-প্রয়োজনীয় বলিয়া ধান ও চাউলের রক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, সকল বস্তুর প্রতিই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

"অন্ন তুষ বর্জ্জিত"—এই কথা গৃহিণীর কর্ত্তব্যজ্ঞান, নিপুণতা ও মনোযোগিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। গৃহিণীর যদি এই সকল গুণ না থাকে, তাহা হইলে অন্নে তুষই থাকুক বা চুলই থাকুক তাহা সে দেখিবে না, পাক করিয়া দিয়া দায় সারিবে। এরূপ হইলে গৃহী ও গৃহিণীতে যত সদ্ভাব থাকিতে পারে, অন্য ভোক্তাগণ যত সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অন্যের মনস্তুষ্টির প্রতিও উদাসীনতা বিশেষতঃ আহার বিষয়ে কর্ত্তব্য নহে। আহারের জন্য অর্থব্যয়, শ্রম, সময় ব্যয় সমুদয় করিয়াও যদি গৃহিণীর অবহেলায় তাহাদের উদর পূর্ণ হইলেও তৃপ্তি লাভ না ঘটে, তাহা হইলে সমুদয়ই নষ্ট হইল বলিতে হইবে। কর্ত্তার সমুদয় বস্তুই গৃহিণীর অবহেলায় নষ্ট হইলে কর্ত্তাও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কর্ত্তার প্রতি এরূপ আচরণ ত আরও ভয়ানক অনিষ্টকর।

নিপুণতা যদি গৃহিণীর না থাকে তাহা হইলেও তুষাদি দ্বারা অপবিত্র অন্ন ভোক্তৃবর্গের সম্মুখে আনীত হইয়া থাকে।

আর অমোনোযোগিতা বা অবহেলা হইতেও ঐরূপ হইতে পারে। এই তিনটী দোষ যে সংসারে গৃহিণীর নাই, অর্থাৎ যে গৃহিণী কর্ত্তব্য-পরায়ণা, নিপুণা ও মনোযোগিনী সেই সংসারে লক্ষ্মী বাস করেন।

যাহার বুদ্ধি অল্প, সে মনে করিতে পারে, সামান্য তুষ বা চুল ২।১ টা অন্নের মধ্যে থাকিলে দোষ কি? আর কোন দোষ না থাকুক, ভোক্তাকে অসন্তুষ্ট করা যাইতে পারে, তাহার শরীরে রোগ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং লোকের নিকট নিন্দাভাজন হওয়া যাইতে পারে।

তদ্ভিন্ন গৃহিণী রোগে জীর্ণ বা দুর্ব্বল হইলেও কর্ত্তব্যে অবহেলা, অমনোযোগ ও অনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। যে কারণই থাকুক, কর্ত্তব্য যথাবিধি পালিত না হইলে সে সংসারের অধঃপতন কত দিন নিবারিত থাকিতে পারে? কর্ত্তব্যে ব্যতিক্রম ঘটাইবার কারণ গৃহিণীর রোগ বা অজ্ঞতা যাহাই কেন বিদ্যমান থাকুক না, অচিরে তাহা দূর করা কর্ত্তব্য। গৃহিণীই প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারে লক্ষ্মী, তাঁহার অসামর্থ্য বা অজ্ঞতা যে বিষময় ফল উৎপাদন করিতে পারে তাহা দূরদর্শী মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

অনেক রমণীকে সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখা যায়, কিন্তু সকলেই যে, আত্ম-কর্ত্তব্যে সুশিক্ষিতা বা অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিবার মত বুদ্ধিমতী অথবা সৎকুলজাতা এরূপ নহে; কিন্তু হিন্দুর সংসারে যাঁহারা গৃহিণী বলিয়া আখ্যা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি, বিবেচনা ও সকল প্রকার কর্ত্তব্য-পালনে তৎপরতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

সংসারে কার্য্য করিতে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অনেকেই সুবিধা পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃত গৃহ-লক্ষ্মী গৃহিণী হইতে সকলে পারেন না।

উপরি উক্ত গুণ স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই থাকা উচিত, তবে সংসার সম্বন্ধে রমণীর এইরূপ গুণ থাকা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। পুরুষের এ গুণ স্পৃহনীয় হইলেও সংসারে তাঁহার কর্ত্তব্যের মহত্ত্ব নিবন্ধন সেরূপ বাঞ্ছনীয় নহে। একটী ধান্য বা তণ্ডুল রক্ষা করিতে যে সময় ব্যয়িত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র ধান্য তণ্ডুল-প্রাপ্তির উপায় করিবার শক্তি পুরুষের থাকে। সুতরাং পুরুষের ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ আপাততঃ মঙ্গলজনক হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতি কর। এই জন্য আমাদের দেশে ক্ষুদ্র বিষয়ে পুরুষের দৃষ্টি দরিদ্রতার হেতু বলিয়া গৃহিণী সমাজে কথিত হইয়া থাকে। সংসারে দ্রব্যের রক্ষা মিতব্যয়িতা, প্রভৃতি রমণীতে থাকিলে যেমন উপকার, পুরুষে থাকিলে সেরূপ নহে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জ্ঞানই মুখ্য, ব্যবসায় গৌণ উদ্দেশ্য; কিন্তু বিশেষ বিদ্যালয়ে ব্যবসায়ই মুখ্য, জ্ঞান গৌণ উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডে বিশেষ বিদ্যালয়ের পত্তন এখন ও বাকী আছে; আর উপরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যে রূপ বর্ণিত হইল, ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়দ্বারা তাহা পূর্ণ হইতেছে না। তাহা না হইলেও জর্ম্মণীর ন্যায় ইংলণ্ডেও বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, এবং উচ্চবিদ্যালয় গুলির সঙ্গে তাহাদের যোগ রহিয়াছে। অতএব এই সঙ্গে প্রুসীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলির একটা বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা উচিত বোধ হইতেছে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়াতে ছয়টি সম্পূর্ণ বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব, ভৈষজ্য-তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্বের অধ্যাপন হইত; আর দুইটি অপূর্ণ বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেবল ধর্ম্ম-তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্বের অধ্যাপন হইত। বার্লিন, বন্, ব্রেস্লা, গ্রিফ্স্ওয়াল্ড্, হেল্ এবং কোনিগ্স্বর্গে সম্পূর্ণ বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল; আর মন্ষ্টার্ এবং ব্রনস্বর্গে অসম্পূর্ণ বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল। শেষোক্ত দুই স্থানেই ধর্ম্ম-তত্ত্ব-বিভাগ ক্যাথলিক মতানুযায়ী।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই আটটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা ৬, ৩৬২ এবং অধ্যাপক সংখ্যা ৬০০ ছিল। কিন্তু ইহাই প্রুসিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-শীল ছাত্রের পূর্ণ সংখ্যা নহে; কারণ, প্রুসিয়ার অনেক ছাত্র বাহিরে যাইয়া হিডেল্বর্গ, পটিঞ্জেন্, লিপ্জিগ্ ও জেনা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে। জর্ম্মন্ ছাত্রেরা মাতৃভূমির যেখানে সেখানে যাইয়া অবাধে তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে; সুতরাং কোন বিশেষ প্রদেশের কত ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহা জানিতে হইলে কেবল সেই প্রদেশের সংখ্যা ধরিলে হইবে না। কিন্তু সমগ্র জর্ম্মন্ অধিবাসীর তুলনায় সমগ্র জর্ম্মন্ ছাত্র-সংখ্যা কত, তাহাই ধরিতে হইবে। তাহা না করিলে দেখা যায় প্রুসিয়াতে ২৮০০ জন অধিবাসীর মধ্যে ১জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে, কিন্তু বেডেন্, উইমার, কোবর্গ এবং আল্টেন্বর্গ প্রদেশে ১১০০ অধিবাসীর মধ্যে ১জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে; কিন্তু বাস্তবিক এসকল দেশের ছাত্র-সংখ্যা প্রুসিয়া অপেক্ষা অধিক নহে, তবে এই সকল প্রদেশে অবস্থিত হিডেল্বর্গ এবং জেনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রুসিয়ার অনেক ছাত্র পড়িতে যায়। অতএব অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভূত তিনটি জর্ম্মন্ প্রদেশ বাদ দিলে দেখা যায়, ২, ৬০০ জন জর্ম্মন্ অধিবাসীর মধ্যে ১জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে; নিজ প্রুসিয়া এবং অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে এই সংখ্যাই বোধ হয় অনেকটা ঠিক। ইংলণ্ডে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৫,৪০০ অধিবাসীর মধ্যে একটি।

জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও মূলতঃ তাহাদের প্রকৃতি এবং নিয়মাদি এক। এ স্থলে প্রুসীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলিই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইবে; তবে ইংরাজ পাঠক বুঝিয়া লইবেন, প্রুসীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ স্থানে যাহা উক্ত হইতেছে, সমগ্র জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষেই তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

জর্ম্মন্ বিশ্ববিদ্যালয় গুলি রাজকীয় সংস্থিতি; ইহাদের নিজের আয় খরচ হইয়া যাহা অকুলান পড়ে, সরকার হইতে তাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজের আয় বিদ্যাত্র সম্পত্তির লাভ এবং ছাত্রদত্ত বেতন। বার্লিন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১,৬০০ এবং বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১,০০০; এই দুইটিই প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়, এবং ইহারা উভয়েই বর্ত্তমান শতাব্দীতে স্থাপিত; কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিদ্যাত্র সম্পত্তি প্রায়ই তেমন বড় দেখা যায় না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয় ছিল ১৯৬,৭৮৭ থেলার বা ২৯,৫১৮ পৌণ্ড; ইহার মধ্যে বিদ্যাত্র সম্পত্তির মোট আয় ১৬১ থেলার, ছাত্র-দত্ত বেতন ৭,৫৫৭ থেলার, আর অবশিষ্ট রাজকীয় সাহায্য ১৮৯,০৬৯ থেলার্ (প্রায় ২৮,৮৪২ পৌণ্ড)। যে রাজ্যে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই সাহায্য, মনে রাখিতে হইবে যে, সেই রাজ্য ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মিতব্যয়ী এবং ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যসভা অধ্যাপক মনোনীত করিলে শিক্ষা-সচিব তাঁহার নিয়োগ মঞ্জুর করেন। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা-সচিবের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকেন, তাঁহাকে কিউরেটর্ বলে; তিনিই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রাজকীয় প্রতিনিধি, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মাদি যথোচিত রূপে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার কার্য্য। দৃষ্টান্ত যথা, পূর্ণ অধ্যাপক দিগকে ছয় মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন ছাত্রদিগের নিকট হইতে উপদান গ্রহণ না করিয়া অধ্যাপন করিতে হয়; যদি তিনি উপদান লইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাতে বাধা দেওয়া কিউরেটারের কার্য্য। আর রাজকীয় সভা এবং শিক্ষা-সচিবের সম্মতি ব্যতীত সদস্য-সভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধে নিয়মাদিতে ও কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। কিন্তু তথাপি ইংলণ্ডের ন্যায় জর্ম্মনীতেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যেরা তাঁহাদের আপন আপন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালন করেন; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃত তত্ত্বাবধান তাঁহাদেরই হাতে, ফরাসী দেশের ন্যায় সচিবের হাতে নহে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কে কে, এখন তাহাই বর্ণিত হইতেছে। প্রথমেই রেক্টর্ বা প্রধান সদস্য; কিন্তু হেল্ এবং জেনা প্রভৃতি যে সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্বয়ং রাজা এই পদদ্বারা সম্মানিত, সে সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রোরেক্টর্ বা সহকারী সদস্যই প্রধান্। ইংলণ্ডের ভাইস্ চান্সেলরের অনুরূপ পদে ইনি প্রতিষ্ঠিত; প্রভেদ এই, ইনি চারিবৎসরের পরিবর্ত্তে একবৎসরের জন্য মনোনীত হন। সম্পূর্ণ অধ্যাপকেরা ইঁহাকে নির্ব্বাচিত করেন। প্রধান সদস্য অথবা সহকারী সদস্যই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শাসন কার্য্য ইঁহারই হাতে। ইংলণ্ডের ভাইস্ চান্সেলরের ন্যায় ইঁহারও একজন বিচারক সহকারী আছেন; যখন কাহারও জরিমানা করিবার প্রয়োজন হয়, অথবা অর্থী প্রত্যর্থীর মধ্যে কোন পক্ষ যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাহিরের

লোক হয়, তবে এই সহকারীকে লইয়া ইনি বিচার করিতে বইসেন। সিনেট্‌সভার সভ্যদিগকে ও সম্পূর্ণ অধ্যাপকেরাই নির্ব্বাচিত করেন ; ইহার ও নির্ব্বাচন বার্ষিক। বর্ত্তমান বর্ষের প্রধান সদস্য বা সহকারী সদস্য, অতীত বর্ষের প্রধান বা সহকারী সদস্য, এবং প্রত্যেক বিভাগের একজন করিয়া সম্পূর্ণ অধ্যাপক এই সিনেট্ সভায় সভ্য। কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অধ্যাপক মাত্রেই ইহার সভ্য। প্রধান সদস্য এই সভার সভা-পতি ; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারই ইহাদ্বারা নিয়মিত এবং মীমাংসিত হইয়া থাকে।

তাহার পরে ফেকল্‌টি বা বিভাগাধ্যক্ষগণ। প্রায় সমস্ত জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়েই ধর্ম্ম-তত্ত্ব, ব্যবহার-তত্ত্ব, ভৈষজ্য-তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব,এই চারিটি বিভাগ আছে। দুই একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অর্থ-নীতির একটা স্বতন্ত্র বিভাগও আছে ; কিন্তু সচরাচর ইহাকে মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলিয়াই ধরা হয়। গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং ভাষা-তত্ত্বকে মনস্তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে। বিভাগীয় অধ্যক্ষ-সভায় তত্তদ্বিভাগীয় সম্পূর্ণ অধ্যাপকেরা থাকেন। এবং তাঁহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে এক জন ডীন্ বা সভাপতি এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত করেন। যে ছাত্র যে বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছে, সে সেই বিভাগে পড়ার সময়ে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হয় কি না তাহা দেখা, যাহারা কর্ত্তব্য-বিমুখ তাহাদিগকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করা এবং উচিত বোধ হইলে কিছু জরিমানা করা, ইহাই বিভাগীয় অধ্যক্ষ-সভার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিম্নতম অধ্যক্ষ বা কর্ম্মচারী কেরাণী বিশেষ। ছাত্র-বেতন আদায় করা, অধ্যাপকদিগকে মাহিয়ানা দেওয়া, এবং উহা হইতে নিজের মাহিয়ানা ও বিদ্যালয়ের তহবিলের জন্য কিছু কিছু করিয়া জমা করা, ইহাই তাঁহার কার্য্য।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান-কার্য্য ছাড়িয়া এখন তাহার শিক্ষা-কার্য্যের আলোচনা করা যাউক। শিক্ষা-বিষয়ে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়িনী সভা বা ফেকল্‌টির কর্ত্তব্য অতীব বিস্তৃত। এই সভাই প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা-বিধায়িনী ; সমস্ত সম্পূর্ণ অধ্যাপক, এবং অপূর্ণ অধ্যাপক ইহার সভ্য। ষাণ্মাসিক পড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উক্ত ষণ্মাসে কে কি পড়াইবেন, বিভাগীয় সভা-পতি স্থির করিয়া লন। কে কি পড়াইবেন, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে অধ্যাপকদিগের স্বাধীনতা আছে ; কিন্তু তাঁহারা আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এমনি ভাবে বিষয় গুলি বিভাগ করিয়া লন যে কিছুই ফাঁক যায় না। তাহার পরে সভাপতির আদেশে সম্পূর্ণ অধ্যাপকেরা একটি তত্ত্বাবধায়িকা সভা গঠন করেন, এবং কে কি পড়াইবেন, সভা-পতির নিকটে তাহা অবগত হইয়া তদনুসারে নিয়মাদি অবধারিত এবং বিজ্ঞাপিত করেন।

প্রত্যেক সম্পূর্ণ অধ্যাপককে আপন আপন বিভাগে ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকে বিভাগীয় এক

একটি বিষয় পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দুই দিন ছাত্রের নিকট হইতে উপদান গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদিগকে পড়াইতে হয়। ইঁহারা রাজ-কোষ হইতে বার্ষিক ৩৫০ হইতে ৪০০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন পরীক্ষা করিয়া কিছু কিছু পান, এবং নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক দিনের অতিরিক্ত কালে পড়াইলেও তাহার জন্য উপদান লইতে পারেন। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে, সম্পূর্ণ অধ্যাপকদিগের সংখ্যা সীমা-বদ্ধ; কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ বিখ্যাত লোককে কোন বিভাগে সম্পূর্ণ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন; এরূপ অধ্যাপকেরাও রাজ-কোষ হইতে অন্যান্য সম্পূর্ণ অধ্যাপকের তুল্য বেতন পাইয়া থাকেন। পদের গৌরব এবং বেতনের পরিমাণ ধরিতে গেলে সম্পূর্ণ অধ্যাপকের পদ জর্ম্মনীর শিক্ষা বিভাগে বিশেষ স্পৃহনীয়; ইঁহাদের পদের সঙ্গে কোন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদের তুলনা হইতে পারে না। গ্রন্থকার শুনিয়াছেন, হিডেল্‌বর্গে কোন কোন অধ্যাপকের বেতন ও উপদানে বার্ষিক আয় ১,০০০ পৌণ্ড, এবং তথাকার এক জনের বার্ষিক আয় ১,৫০০ পৌণ্ড।

সহকারী অধ্যাপকদিগের নিয়োগ ও রাজকীয়, কিন্তু ইঁহাদের সকলের নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই। তাঁহাদের নিকট যে সকল ছাত্র পড়ে, তাহাদের প্রদত্ত উপদানই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য। যে সকল অপূর্ণ অধ্যাপক বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারাই এই পদে নির্ব্বাচিত হন, এবং অবশেষে তাঁহারা সম্পূর্ণ অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইয়া থাকেন।

ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও সম্পূর্ণ অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক আছেন; কিন্তু অপূর্ণ অধ্যাপকের পদটি জর্ম্মনীর নিজের, এবং ইহাই তত্রত্য উচ্চশিক্ষা-বিধানে বিশেষ শক্তি এবং চির-নবীনত্বের মূল। তিনি গৃহ-শিক্ষকের কার্য্যও করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার প্রধান কার্য্য নহে। গৃহ-শিক্ষকের নীরস কার্য্য হইতে তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অপূর্ণ অধ্যাপক অন্যান্য অধ্যাপকের সহকারী স্বরূপ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপন-গৃহ যখন খালি থাকে, তখন তিনি অধ্যাপন করিতে পারেন, এবং তাঁহার অধ্যাপনও অন্যান্য অধ্যাপকের অধ্যাপনের ন্যায় গণ্য হইয়া থাকে। তাঁহার নিয়োগের প্রণালী এইরূপ—কোন বিখ্যাত ছাত্র প্রথমে কোন বিভাগের অপূর্ণ অধ্যাপক হইবার জন্য প্রর্থনা করে। উক্ত বিভাগের দুই জন অধ্যাপক তাহার পরীক্ষার্থ মনোনীত হন। প্রার্থনাকারী কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রশংসা পত্র তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করে, এবং তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া কোন কোন বিষয় লেখে। যদি এই পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলেই তাহাকে অপূর্ণ অধ্যাপক বলিয়া গণ্য করা হয়। অবশ্য এ বিষয়ে শিক্ষা-সচিবের সম্মতির প্রয়োজন; কিন্তু পরীক্ষকেরা মনোনীত করিলে সচিবের সম্মতি পাইতে কোন কষ্ট হয় না। তখন হইতে সে তাহার অধীত বিভাগের যে কোন বিষয়ে অধ্যাপন করিতে পারে। সে তখন শিক্ষানবিশের অবস্থায় থাকে, তাহার কোন

বেতন অবধারিত হয় না, তাহাকে নিজের অধ্যাপনের উপরেই নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং তাহার যত্ন-পরায়ণ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অধ্যাপকেরা পরামর্শ করিয়া অধ্যাপনের বিষয় গুলি আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লন; কিন্তু তাহা হইলেও সম্পূর্ণ অধ্যাপকেরা যে বিষয় অধ্যাপন করেন, অপূর্ণ অধ্যাপকেরা ঠিক সেই বিষয়েই অধ্যাপন করিতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এ সম্বন্ধে অসঙ্গত প্রতিযোগিতা চলিতে পারে; কিন্তু তাহার পরিহারের জন্য এইরূপ নিয়ম আছে যে, সম্পূর্ণ অধ্যাপক অধ্যাপন করিয়া ছাত্রদিগের নিকট হইতে যে পরিমাণে উপদান লইয়া থাকেন, অপূর্ণ অধ্যাপক তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ উপদান লইতে পারিবেন না। এইরূপ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অধ্যাপক এবং অসম্পূর্ণ অধ্যাপকের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব; লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পূর্ণ অধ্যাপক উদীয়মান অপূর্ণ অধ্যাপককে উৎসাহিত করেন, এবং অপূর্ণ অধ্যাপক ও গর্ব্বিত না হইয়া বিদ্যারই সেবা করেন। নিঃস্বার্থ ভাবে বিদ্যার এইরূপ সেবা জর্ম্মনীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। কিন্তু এই উদীয়মান তরুণ শিক্ষকের সান্নিধ্যবশতঃ উর্দ্ধতন অধ্যাপককে কিরূপ সতর্ক থাকিতে হয়, অলস ও নিদ্রালু না হইয়া পদ-গৌরবের জন্য কিরূপ সচকিত থাকিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নিকটে থাকাতে অপূর্ণ অধ্যাপকেরা তাঁহাদের ন্যায় হইতে চাহেন এবং সে জন্য নানা বিষয়ে সাহায্যও পান, ইহা তাঁহাদের পক্ষেও বিশেষ মঙ্গলের বিষয়।

বার্লিন নগরে মনোবিজ্ঞান-বিভাগে অর্দ্ধ-অধ্যাপক দিগের সংখ্যা পূর্ণ অধ্যাপক দিগের ঠিক সমান। তথায় ২৮ জন পূর্ণ অধ্যাপক ও ২৯ জন অর্দ্ধ অধ্যাপক আছেন। বিশেষ অধ্যাপক দিগের সংখ্যা এ উভয় অপেক্ষাই অধিক। তাঁহারা ৩৩ জন। বার্লিন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সমষ্টি ১৮৩। ১৮৬৪ সালের গনণা হইতে এই সংখ্যা গৃহীত।

এইক্ষণে ছাত্রদিগের কথা বলিব। ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্য শেষ করিতে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনবৎসর লাগে; কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়িয়া শেষ করিতে চারি অথবা পাঁচ বৎসর লাগিয়া থাকে। ছাত্রেরা সচরাচর পড়িতে পড়িতে এক বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়িয়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু এক বিষয় পড়িতে পড়িতে দুইটীর অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় কেহই যায় না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ল্যাক্‌ম্যানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইনি প্রথমতঃ ছয়মাস লিপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্‌ম্যানের নিকট অধ্যয়ন করেন; তাহার পরে গটিঞ্জেনে যাইয়া অধ্যয়ন শেষ করেন। কোন ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চাহিলে প্রথমে তাহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খাতায় এবং তৎপরে সে যে বিভাগে অধ্যয়ন করিবে সেই বিভাগের খাতায় তাহাকে নাম লেখাইতে হয়; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লিখাইবার সময়ে পূর্ব্বকথিত ছাড়্‌তি

পরীক্ষার নিদর্শন পত্র না দেখাইলে চলে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি না হইয়া, অথবা ছাড় ত্তি পরীক্ষার নিদর্শন পত্র না দেখাইয়াও যে কেহ অধ্যাপন সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারে; কিন্তু রাজ-বিধি এবং বিভাগীয় নিয়মের উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে এরূপ উপস্থিতি কোন কাযে লাগে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার উপদান প্রায় ১৮ শিলিং। প্রবেশার্থী ছাত্র এই বলিয়া একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে যে সে বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পর্কীয় রাজবিধি ও নিয়মাদি লঙ্ঘন করিবেনা। এই প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিলে প্রধান শিক্ষক সেজন্য শাস্তি দিয়া থাকেন। অপরাধ অনুসারে এই সকল শাস্তি ভৎসনা, অর্থ-দণ্ড, অনধিক একমাসের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কারাগারে বাস, অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বহিষ্করণ; বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বাহির করিয়া দিবার সময়ে কোন স্থলে ছাত্রকে অন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার অধিকার দেওয়া হয়; কোন স্থলে হয় না; শেষোক্ত অবস্থায় এই বহিষ্করণের সংবাদ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা না থাকিলে প্রত্যেক বিষয়ক উপদেশের জন্য ১৬ শিলিং হইতে ১ পাউণ্ড ১৪ শিলিং পর্য্যন্ত উপদান দিতে হয়। অন্যত্র অপেক্ষা বার্লিনে এই উপদানের পরিমাণ কিছু অধিক। চিকিৎসা-বিভাগে এই উপদানের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; সাপ্তাহিক পাঁচ ঘণ্টা হিসাবে ছয়মাস কাল এইবিষয়ে উপদেশ লইলে তজ্জন্য ১ পাউণ্ড ১৪ শিলিং পর্য্যন্ত উপদান লাগিয়া থাকে।

ধর্ম্ম-শাস্ত্র অথবা মনোবিজ্ঞানে ঐ পরিমাণ উপদেশ লইতে হইলে বার্লিন্ নগরে ছয় মাসের জন্য ১৭ শিলিং লাগিয়া থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কর্ম্মচারী এই উপদান সংগ্রহ করেন, এবং তাহা অগ্রেই প্রদান করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক অধ্যাপক বিনা বেতনে তাঁহার অধ্যাপন শুনিবার জন্য যাহাকে তাহাকে ভর্ত্তি করিতে পারেন, এবং অধ্যাপকেরা সচরাচর এরূপ করিয়াও থাকেন। আর একটী সদয় ব্যবস্থা থাকাতে দরিদ্র ছাত্রেরা ধারে অধ্যয়ন করিতে পারে; অর্থাৎ তাহাদিগের উপদান বাকী থাকে এবং ভবিষ্যতে রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহারা মাসে মাসে বেতন হইতে উহা পরিশোধ করে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রুসিয়াতে রাজ-কার্য্য ইংলণ্ডের মত নহে, এখানে শিক্ষকতা ও রাজ-কার্য্য বলিয়া পরিগণিত।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্র দিগের জন্য ১২ হইতে ৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত কতক গুলি বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বৃত্তি ৬ হইতে ৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত, সুতরাং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; কিন্তু বৃত্তিধারী দিগের সুবিধার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়েও তাহাদিগের ঐ সকল বৃত্তি চলিতে থাকে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লইতে হইলে, এবং তৎপরে রাজ-কার্য্য লাভের জন্য পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রত্যেক বিষয় যে অধীত হইয়াছে, পরীক্ষার্থীকে তাহার নিদর্শন-পত্র দাখিল করিতে হয়। যে সকল অধ্যাপক বহুছাত্রের অধ্যাপন করিয়া থাকেন

কে উপস্থিত ছিল আর কে না ছিল তাহা অবধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন, সুতরাং নিদর্শন-পত্র প্রদান সময়ে তাঁহারা তেমন সূক্ষ্মদর্শী হইতে পারেন না, একথা অনেকে বলিয়া থাকেন। যাহা হউক ইহা নিশ্চয় যে, যে ছাত্রের মনে ভবিষ্যতে উন্নতি করিবার ইচ্ছা আছে এবং যে অধ্যয়নের জন্য অধ্যাপককে উপদান দিয়াছে, সে নিয়মিত উপস্থিত হইতে বিরত থাকেনা। অবশ্য অনেক অলস ছাত্রও আছে; গ্রন্থকার শুনিয়াছিলেন জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক তৃতীয়াংশ ছাত্র কিছুই করেনা, অবশ্য ইংলণ্ডীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তুলনায় এ সংখ্যা যে বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডীয় ছাত্র অপেক্ষা জর্ম্মন্ ছাত্রের উপরে পরীক্ষা এবং নিয়মিত পাঠের জন্য পীড়াপীড়ি অনেক কম। জর্ম্মনীতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য অধ্যয়ন এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ; তথায় অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা এই বলিয়া সাবধান করেন যে, তাহারা যেন পরীক্ষা এবং রাজ-কার্য্য-লাভে কৃতকার্য্য হইবার জন্যই ব্যগ্র না হয়। গ্রন্থকারের মতে ইংলণ্ডীয় শিক্ষকদিগের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষার সংখ্যা এবং গুরুত্ব ইংলণ্ড অপেক্ষা অল্প। ইংলণ্ডের ন্যায় অস্ট্রিয়া দেশেও মনোবৃত্তির উৎকর্ষে লোকের বিশ্বাস দুর্ব্বল, সেই খানে পরীক্ষার ও খুব কড়াকড়ি। সেখানে ইংলণ্ডের ন্যায় পরীক্ষা প্রণালী যন্ত্রবৎ চলে এবং মাসে মাসে তাহা সম্পাদিত হয়, কিন্তু মানসিক উৎকর্ষ ধরিতে গেলে জর্ম্মনী অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয় অপকৃষ্ট। তবে ভিয়েনা এবং প্রেগ্ নগরের চিকিৎসা-বিদ্যালয় গুলি উৎকৃষ্ট বটে।

অনেক ফরাসী অধ্যাপক ফরাসী দেশের শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ-সাধনের জন্য বিশেষ অভিনিবেশের সহিত জর্ম্মন বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করিয়া তিনি জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, এবং কেহই তাঁহার সে প্রশংসাকে অতিরঞ্জিত মনে করেনা। গ্রন্থকার বলেন, ইংলণ্ড এবং অস্ট্রিয়ার ন্যায় যে সকল দেশে মানসিক উৎকর্ষ-সাধনে অনুরাগ এত অল্প, সে সকল দেশে পরীক্ষার এতটা কড়াকড়ি না থাকিলে হয়ত আরও অনিষ্ট হইত। তবে তিনি ইহাও বলেন যে, মানসিক উৎকর্ষ-সাধনই প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা কখনও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

জর্ম্মণীতে প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা এবং উপাধির ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডের বি, এ, পরীক্ষার ন্যায় জর্ম্মনীতেও একটী পরীক্ষা আছে। এম, এ, উপাধি কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং মনোবিজ্ঞানেই প্রদত্ত হয়, কিন্তু সচরাচর লোকে তাহার জন্য যত্ন করে না। ডাক্তার উপাধিটীই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই উপাধির জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীত প্রত্যেক বিষয়-সম্বন্ধেই নিদর্শন-পত্র, বাচনিক পরীক্ষা এবং লিখিত রচনা, এ তিনটী বিষয় অপরিহার্য্য। রচনাটী লাটিন অথবা জর্ম্মন ভাষাতে লিখিত হয় এবং সচরাচর তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। বার্লিন নগরে মনোবিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি লইতে হইলে ১৭ পাউণ্ড ব্যয় হয়;

কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইহাতে ২২ পাউণ্ড ১০ শিলিং পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়া থাকে। যদি কোন দরিদ্র বালক খুব ভাল রূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে বিনা উপদানে উপাধি প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জর্ম্মনীর কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অপরাপর বিশ্ব-বিদ্যালয় অপেক্ষা সহজেই ডাক্তার উপাধি প্রদত্ত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় জর্ম্মনীর কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়েই ডাক্তার উপাধি—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নহে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাড়তি পরীক্ষার ন্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের-পাঠের পর আর একটী পরীক্ষা আছে, তাহা খুব কঠিন; কিন্তু সে পরীক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত নহে। প্রুসিয়াতে পরীক্ষা বিদ্যার যথার্থ পরিচায়ক বলিয়া কখনই বিবেচিত হয় না; প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইয়াছে কি না তাহা অবধারণ করাই এখানকার পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং যাহার শিক্ষা সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় নাই, সে কখনই প্রাগুক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হয় না। ছাত্র যখন বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে, তখন অধ্যক্ষ তাহাকে এক খানি নিদর্শন-পত্র প্রদান করেন; সে কোন্ কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছে, এবং তাহার পড়াশুনা কিরূপ হইয়াছে, ইহাই তাহাতে উল্লিখিত থাকে। এই নিদর্শন-পত্র এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাড়তি পরীক্ষার নিদর্শন-পত্র লইয়া রাজ কার্য্য, পৌরোহিত্য, ওকালতি, অথবা ডাক্তারি প্রার্থী ছাত্র পূর্ব্ববর্ণিত শিক্ষা সমিতির নিকটে উপস্থিত হয়। তাহার পরে তিন চারি দিন কাগজে কলমে এবং সাত আট ঘণ্টা মৌখিক কথায় তাহার পরীক্ষা হয়। আইন-ব্যবসায়ী এবং ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের দুইটী করিয়া পরীক্ষার নিয়ম আছে, প্রথম পরীক্ষার তিন বৎসর পরে দ্বিতীয় পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহা জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শিক্ষকের স্বাধীনতা এবং ছাত্রের স্বাধীনতা, আর বিজ্ঞান, অর্থাৎ সুপ্রণালীতে জ্ঞানলাভ এবং তাহার প্রতি অহেতুক অনুরাগ, ইহাই জর্ম্মন্ শিক্ষা প্রণালীর মূল ভাব। ফরাশীদিগের উচ্চ শিক্ষায় রাজকীয় নিয়মাবলী অবলম্বিত হয়, এবং কেহ সাধারণের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতে হইলে তাহাকে রাজকীয় অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়, আর সে অনুমতি যে কেবল মুখের কথা তাহাও নয়; কিন্তু সেই ফরাশীরাও জর্ম্মন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ ফরাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে ইংলণ্ডে এইরূপ রাজকীয় নিয়ম এবং রাজকীয় অনুমতি প্রচলিত নাই; তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঁধা নিয়মের অধীন বটে, কিন্তু সে বাঁধা নিয়ম স্বাধীনতার অভাবজাত নহে, তাহা বিজ্ঞানের অভাব-জাত।

ইংলণ্ডকে জর্ম্মনীর নিকট হইতে বিজ্ঞান-বিষয়ে এখনও অনেক ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। ফরাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা নাই; ইংলণ্ডের বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নাই, জর্ম্মনির বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উভয়ই আছে।

—:০:—

বাধ্যকরী শিক্ষা।

বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ন্যায় জাতিগত প্রতিযোগিতা ও ভয়ঙ্কর প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জাতি এই প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, সেই জাতিই জীবিত থাকিবে, আর যাহারা ইহাতে পরাস্ত হইবে, তাহাদিগকে পরাক্রান্ত প্রবল জাতির নিষ্পেষণে প্রাণ হারাইতে হইবে। জগতের সমগ্র সভ্য জাতি এ সমস্যা বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং বুঝিয়া সুঝিয়া সে জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বড় বড় দেশের বড় বড় মাথা এই সমস্যা লইয়াই ঘুরিতেছে, এবং ইহার একটা মীমাংসায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির হইতেছেনা—নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছে না।

প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই ইহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা পরাধীন জাতি, সভ্য জগতে বন্দুক কামানের আড়ম্বর দেখিয়া মনে করি, বুঝি ইহাই জাতীয় জীবিত-লক্ষণ, বুঝি এই বন্দুক-কামানের বলেই জগতে জাতীয় প্রভাব অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু এই সকল পরাক্রান্ত জাতিদিগের মধ্যে ও যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহাদের ভাবনা স্বতন্ত্ররূপ, তাঁহারা জানেন, জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় প্রভাবের স্থায়িত্ব-বিধানে বন্দুক কামান অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং স্থায়িত্ব-বিধায়ী আরও কোন উপকরণের বিশেষ প্রয়োজন। বন্দুক কামানের শক্তি যে চিরস্থায়িনী নহে, জগতের অনেক পরাক্রান্ত জাতি তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। গ্রীস্ রোম, মিসর, পারস্য—পার্থিব শক্তিতে, অস্ত্র-শস্ত্রের পরাক্রমে কে কম ছিল? যদি কেবল অস্ত্র-পরাক্রমই জাতীয় স্থিতির একমাত্র বা প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে ঐ সকল পরাক্রান্ত জাতির নাম আজ কেবল অতীত ইতিহাসের বিষয় হইয়া থাকিত না। সভ্যজাতীয় মনীষিগণ এক্ষণে এ কথা বুঝিয়াছেন, এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই এই সমস্যার মীমাংসায় প্রায় সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিতেছেন।

জাতীয় ভাষায় জাতীয় জনসাধারণের শিক্ষা-বিধানই জাতীয় স্থায়িত্ব এবং উন্নতি সাধনের এক মাত্র উপায়। পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতি নিবহ এই উপায়ের উপাদেয়তা এবং অমোঘতা উপলব্ধি করিয়া তাহার জন্যই ব্যগ্র হইয়াছেন। যে দেশের জাতি-সাধারণ যে পরিমাণে উন্নত, সেই দেশ সেই পরিমাণে আত্ম-রক্ষায় সমর্থ, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সকলে জাতীয় শিক্ষায় মনোযোগ দিয়াছেন। নানারূপ কার্য্যে এ মনোযোগ প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ দেখা যায় সেই সকল দেশে বিদ্যাবুদ্ধিতে যিনি খুব বেশী বড় হন, তিনিই শিক্ষা-সম্বন্ধে—বালকদিগের জন্য নহে কিন্তু শিক্ষক এবং অভিভাবক দিগের জন্য

অন্ততঃ এক খানি পুস্তক লিখেন। এই সকল পুস্তকের শুভ ফল প্রত্যক্ষ না করিলে বলিয়া বুঝান যায় না। এক খানি পুস্তক বাহির হইলে লোকে, তাহা পয়সা দিয়া কিনিয়া ঘরে ঘরে পড়ে, এবং তদনুসারে শিক্ষা সম্বন্ধে লোকের মত ক্রমেই মার্জ্জিত হইতে থাকে। আবার এ সম্বন্ধে রাজগণ কি করেন, তাহাও একবার দেখুন। কোন্ দেশে কোন্ সময়ে শিক্ষা-বিষয়ে কি রীতি পরিগৃহীত হয়, পাশ্চাত্য রাজগণ সর্ব্বদা তাহার সংবাদ রাখেন, এবং উপযোগী বোধ করিলে আপন আপন রাজ্যে তাহা প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ নাবিক যেমন প্রবল ঝড়ে পড়িলে ও প্রাণান্ত পণ করিয়া হাইলটি ধরিয়া রাখে, ইঁহারাও সেই রূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ঘোরতর অশান্তির মধ্যে জাতীয় শিক্ষার হাইলটি প্রাণান্তে ছাড়েন না। বিদেশীয় বিবিধ শিক্ষা-প্রণালীর চর্চ্চা করিবার জন্য ইঁহারা বাছিয়া বাছিয়া বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান লোক নিযুক্ত করেন, এবং সে জন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করিয়া থাকেন। ফরাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রুসিয়া জয় লাভ করিল, অমনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইল, ফরাসীদেশের শিক্ষা-প্রণালী অপেক্ষা জর্ম্মনীর শিক্ষা-প্রণালী কোন্ কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহারই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, এবং যে অংশ টুকু উৎকৃষ্ট তাহা বিনা আপত্তিতে পরিগৃহীত হইল। ক্ষুদ্র সুইস্ জাতি কিরূপে প্রবল পরাক্রান্ত নেপোলিয়নের গতি-রোধ করিল, জানিবার জন্য কাহার না কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয়? অমনি সমিতি বসিল, অনুসন্ধান চলিল, সুইজর্লণ্ডের শিক্ষা-প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং পরিজ্ঞাত হইল। ইউরোপের রাজ্য-সমূহ এইরূপে উন্নত হইতেছে, এইরূপে তাঁহারা জাতীয় স্থায়িত্বের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতেছে।

যে সকল জাতি জাতীয় শিক্ষার বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কয়েকটি স্থূল এবং মূল সত্যে উপনীত হইয়াছেন। সে সকল সত্য কি, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ হইতেছে।

১। জাতীয় স্থিতি এবং উন্নতির জন্য জাতীয় ভাষায় জাতীয় জন-সাধারণের শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য্য।

জন-সাধারণের শিক্ষা বলিতে প্রাথমিক শিক্ষাই বুঝিতে হইবে, উচ্চশিক্ষা নহে প্রায় সকল দেশেই লেখা, পড়া, এবং পাটীগণিতের অঙ্ক কসা, এই ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ীভূত বলিয়া পরিগৃহীত; কেবল অষ্ট্রেলিয়াতে ভূগোল-শাস্ত্র ও ইহাদের তুল্যাসন লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে উচ্চশিক্ষা সখের সামগ্রী, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সমাজের মঙ্গলের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাথমিক শিক্ষাতে জন-সাধারণের বুদ্ধি বৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করে, সুতরাং তাঁহারা বিষয়-কার্য্যে এবং ব্যবসায়, বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া বিদেশের সঙ্গে ঐ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয়। পাশ্চাত্য সমস্ত দেশেই দেখা যাইতেছে, যে দেশে সাধারণ বা প্রাথমিক শিক্ষা যে পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত এবং পরাক্রান্ত হইতেছে। আভ্যন্তরীণ শান্তি-বিস্তারেও প্রাথমিক

শিক্ষার অশেষ প্রভাব। জন্ মর্লি বলেন, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেখিয়াছিলেন, ইংরাজ অপরাধীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন নিরক্ষর; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইলে অপরাধের পরিমাণ এবং অপরাধীর সংখ্যা অনেক কমিবার সম্ভাবনা। ফরাসী-দেশে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর পর্য্যালোচনা করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের তদানীন্তন শিক্ষা-সচিব মুসেঁ ডুরয় একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন; তাহাতে এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ডের একমাত্র বেডেন্ নগরে কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪২৬ জন; কিন্তু সাধারণ শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই সংখ্যা কমিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৩৯০ জন মাত্র হয়। এ বিষয়ে সুইজর্লণ্ডের সঙ্গে তৌলিক অঙ্ক পাত করিয়া দেখিলে ইংলণ্ডের গর্ব্ব নিশ্চয়ই খর্ব্ব হইবে। ইহার কারণ কি? মর্লি সাহেব বলেন, কেবল সাধারণ শিক্ষায় ইংলণ্ডের ব্যয়-কুণ্ঠতাই এ অগৌরবের কারণ। ইংলণ্ডে শিক্ষা-নীতির পরিচালনে যাহা ব্যয় হয়, দণ্ড-নীতি-পরিচালনের ব্যয় তাহার পাঁচগুণ; আর সুইজর্লণ্ডে দণ্ড-নীতির পরিচালনে যে ব্যয় হয়, শিক্ষা-নীতি-পরিচালনের ব্যয় তাহার শতগুণ; সুতরাং ইংলণ্ড অপেক্ষা সুইজর্লণ্ড যে অধিক পরিমাণে আভ্যন্তরীণ শান্তি লাভের অধিকারী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যে কৃষক যে পরিমাণ বীজ 'বপন' করে, সেই কৃষক সেই পরিমাণে শস্যও পাইয়া থাকে; সেইরূপ, যে রাজা প্রজার শিক্ষায় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, সেই রাজা সেই পরিমাণে শান্তি এবং সমৃদ্ধি ভোগ করিয়া থাকেন।

২। আপন আপন সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার জন্য, অভিভাবকদিগকে বাধ্য করিতে রাজার অধিকার আছে।

প্রজার শান্তিতে রাজার শান্তি, প্রজার শক্তিতে রাজার শক্তি, প্রজার উন্নতিতে রাজার উন্নতি এবং প্রজার সমৃদ্ধিতে রাজার সমৃদ্ধি; সুতরাং যাহাতে প্রজার শান্তি, শক্তি, উন্নতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে, রাজা তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকিতে পারেন না। সমগ্র প্রজা-পুঞ্জ শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিবে, প্রজা-সাধারণ এক মত হইয়া প্রত্যেকে আপন ইচ্ছায় সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবে, তেমন দিন কখনও জগতে উপস্থিত হইবে কি না সন্দেহ। অন্ততঃ যতটা দেখা যাইতেছে, তাহাতে পৃথিবীর কোন দেশে এ পর্য্যন্ত সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। প্রজাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করিবার শক্তি রাজা যত অল্প পরিচালিত করেন ততই মঙ্গল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার ন্যায় জাতীয় জীবন-মঙ্গল-বিধায়ক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্রোতোঽপেক্ষার নীতি অবলম্বন করিয়া থাকা রাজার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। সুসভ্য দেশসমূহে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এ সম্বন্ধে বিস্তর বাদানুবাদ চলিয়াছে; অবশেষে এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, প্রজার সন্তানকে শিক্ষা-লাভে বাধ্য করিতে রাজার অধিকার আছে। কেবল তাহাই নহে; প্রায় সমস্ত উন্নত দেশেই বাধ্যকরী শিক্ষা-

নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, অবশেষে ইংলণ্ড ও অবস্থায় পড়িকে এই নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৩। শিক্ষা বাধ্যকরী হইলে রাজ-ব্যয়ে তাহা সম্পাদিত হওয়া উচিত।

অনেক পিতামাতা এমন দরিদ্র যে, সন্তানকে অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করাই তাহাদের পক্ষে কঠিন। সমাজ-তত্ত্ববিৎ অনেক পণ্ডিতের মতে, তাঁহারা সন্তান উৎপাদন করিয়া সমাজের যে উপকার করিতেছে তাহাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, ইহার উপরে সন্তান শিক্ষার ভারে তাহাদিগকে পীড়িত করিতে গেলে তাহাদের উপরে অত্যাচার হইবে। দরিদ্র বালকেরা রাখালী করিয়া চিঠি পত্র বহন করিয়া, অথবা সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জনে পিতা মাতার সাহায্য করে; কিন্তু তাহাদিগকে শিক্ষার জন্য বাধ্য করিলে দরিদ্র পিতা মাতার প্রতি-কঠোরতা প্রকাশ পায়, আবার সন্তান-শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে এরূপ পিতা মাতাকে বাধ্য করিলে তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়া উঠে। সুতরাং বাধ্যকরী শিক্ষা-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে দরিদ্র-সন্তানের শিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিতে রাজা যুক্তি এবং ন্যায়ানুসারে বাধ্য। রাজা যে দিন এই ব্যয়-ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, সে দিন আমাদের দেশেও বাধ্যকরী শিক্ষা প্রথা প্রচলিত হইবে। এ বিষয়ে রাজার অধিকার এবং কর্ত্তব্য বিশেষ যুক্তি তর্কের পর মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ভারতে তাহার পুনরভিনয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই; শিক্ষা সম্বন্ধে রাজকীয় কৃপণতা আরও কিঞ্চিৎ শিথিল হইলেই ভারত ও এই সুপ্রথার শুভফল ভোগ করিবে, আমাদিগের এ আশা আছে।

এই প্রথার বিরোধিগণ একটী আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, পরের সাহায্য পাইলে লোকে আত্ম-নির্ভর হারাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। জনষ্টুয়ার্টমিল্ এ আপত্তির একটী অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, অন্য প্রকার সাহায্যে লোককে আত্ম-নির্ভর হইতে বঞ্চিত করে বটে, কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে; কেননা, শিক্ষাদ্বারা লোকে অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বনে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই শিখে। আমরা ভরসা করি, মিলের এ সদুত্তরের উপরে আর কাহারও কিছু বলিবার নাই।

—•:•—

শিক্ষা বিষয়ে ঋষিবাক্য।

(৬)

শ্রেয়ঃ সুগুরুবদ্‌ বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু চার্য্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু।
মনু ২য় অ ২০৭ শ্লোক

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে। গুরু পুত্র এবং আর্য্যেও গুরুর স্ববন্ধুর প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

শ্রেষ্ঠতা বয়স, বিদ্যা বিভবাদি নানা বিষয়ে হইতে পারে। তদ্ভিন্ন নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিতে সকলকেই পারা যায়, কারণ যে অন্যান্য বহু বিষয়ে অশ্রেষ্ঠ, কোনও না কোন বিষয়ে সেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। শ্রেষ্ঠতা আপেক্ষিক। মানুষ বিশেষ হইতে মানুষ বিশেষে শ্রেষ্ঠতা বিরল নহে। আপন হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রতি গুরুর ন্যায় সম্মানের উপদেশ হইতে ইহার তারতম্যের উপদেশ ও পাওয়া যায়। কারণ শ্রেষ্ঠতার তারতম্য আছে। অপেক্ষাকৃত অল্পই হউক বা অধিকই হউক শ্রেষ্ঠের প্রতি সম্মান করা কর্ত্তব্য। শত অশ্রেষ্ঠ যাহা করিতে না পারে, একজন শ্রেষ্ঠ তাহা অনায়াসে করিতে পারে। শ্রেষ্ঠ হইতেই জগতের উপকার হইয়া থাকে। অশ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ করিতে এবং শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে শ্রেষ্ঠই সমর্থ। শ্রেষ্ঠ যদি অসম্মানিত হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠতা আশ্রয়শূন্য হইয়া রহিবে। শ্রেষ্ঠ না হইলে ও জগতের দুঃখ দূর হইবে না। শ্রেষ্ঠকে সম্মান করাতেই জগতের উপকার করা হয়। শ্রেষ্ঠের অসম্মানে জগতের সমূহ অনিষ্ট করা হয়। অতএব শ্রেষ্ঠকে সর্ব্বদা গুরুতুল্য সম্মান করা কর্ত্তব্য।

তবে যেখানে আংশিক শ্রেষ্ঠতা আছে কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ে হীনতা দেখা যায়, সেখানে আংশিক শ্রেষ্ঠতাই তাহার সম্মান প্রাপ্তির হেতু।

একজনের শ্রেষ্ঠতা ধন-সম্পত্তিতে, অপরের শ্রেষ্ঠতা বিদ্যা-বুদ্ধিতে, অন্যের শ্রেষ্ঠতা কর্ত্তব্য-তৎপরতা প্রভৃতিতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, এরূপস্থলে পরস্পর পরস্পরের সম্মানার্হ। গুণ থাকিলেই মনুষ্য সম্মান পাইবার অধিকারী হয় বটে, কিন্তু যে নিজে গুণহীন সে অন্যকে সম্মান করিতে জানেনা—পারেনা, পরন্তু কেহ অন্যের নিকট সম্মান পাইতেছে জানিতে পারিলে ও তাহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। গর্ব্ব প্রভৃতির আধিক্যে গুণবান্ ব্যক্তিও এইরূপ নির্গুণে পরিণত হয়। তদ্ভিন্ন বিদ্যাবুদ্ধিবিহীনের ধনেশ্বরতা বা বলশালিতা ও নির্গুণতার কারণ। নির্গুণ মনুষ্য জগতের শত্রু। মনুষ্যের অনিষ্টকারী অনেক জন্তু জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা অনিষ্টকারী বলিয়া বিখ্যাত, সুতরাং সেরূপ স্থলে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনের সুবিধা আছে। আর মনুষ্য যদি হিংস্র জন্তুর জঘন্য স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার বাহ্য আকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া সে মনুষ্য সমাজে

থাকিয়া মনুষ্য সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, কাজেই সে হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর—মনুষ্য নামের অযোগ্য অমানুষ।

এই জন্য মনীষা সম্পন্ন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"অজাত-মৃত মূর্খাণাং।
বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ॥"

সন্তান হইয়া বাঁচিয়া থাকে, ইহা সকলেরই অভিপ্রেত, কিন্তু মূর্খ সন্তান হইতে সন্তান না হওয়া ও হইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল।

গুরুর পুত্র, গুরুর যাহারা শ্রেষ্ঠ, এবং গুরুর স্বরূপ অর্থাৎ অগ্রজ পিতৃব্যাদি তাঁহারাও গুরু তুল্য সম্মানের অধিকারী।

শিক্ষা-সংবাদ।

বাণিজ্যে দৃষ্টি।—দেশের দরিদ্রতা উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায়। বাণিজ্য দ্বারা এই দরিদ্রতা দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু বিনা শিক্ষায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইবার যত সম্ভাবনা, কৃতকার্য্য হইবার তত সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এ দেশে অনেকে উৎসাহের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হয়, সুতরাং তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া অন্য লোকেও সে পথে চলিতে ভয় পায়। অতএব বাণিজ্য-বিজ্ঞানে রীতিমত শিক্ষা না হইলে এ দেশে বাণিজ্যোন্নতির আশা নাই। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, মান্দ্রাজে এ বিষয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। মান্দ্রাজের কালিকট নগরে [illegible] বাণিজ্য-বিদ্যালয় আছে, [illegible] পাচিয়াপ্পা কলেজেও বাণিজ্য শ্রেণী খোলা হইয়াছে। বাঙ্গলায় কি বাণিজ্য-বিদ্যালয় কোন বন্দোবস্ত হইবে না? এরূপ বিদ্যালয়ের যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা জানি, উত্তর পাড়ার সুশিক্ষিত, সহৃদয়, স্বদেশ-হিতৈষী অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "হিউম্যানিটি" বিদ্যালয়ে একটি বাণিজ্য শ্রেণী খুলিবার পরামর্শ করিতেছিলেন। এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার শিক্ষা এবং সহৃদয়তারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমরা আশা করি, তিনি বঙ্গদেশে এই প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক হইবেন।

অদ্ভুত নৈতিকতা।—যুবকদিগের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার জন্য কয়েক বৎসর হইল উচ্চতর শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভ্যসমিতির সাহায্যে এবং বক্তৃতার প্রভাবে সুনীতি চরিত্রে সেবক-সম্মেলনের চেষ্টা হইতেছে। উক্ত সমিতি-সংসৃষ্ট একটী পুস্তকালয় আছে, সমিতির সভ্যেরা তথায় যাইয়া পাঠ করেন,

বাহিরের লোকের নাকি সে অধিকার নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশ, উক্ত পুস্তকালয়ের ভাল ভাল অধিকাংশ পুস্তকই নাকি অপহৃত হইয়াছে, কে কোথায় কি লইয়া গিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই। ইহাতে নীতিশিক্ষার যে নমুনা প্রকাশ পাইতেছে, অনেকের চক্ষেই তাহা ভাল লাগিবে না। আফ্‌-গানেরা নিমন্ত্রিত হইয়া খাইতে গেলে গৃহ-স্বামীর বাসন পত্র আত্মসাৎ করে, ইহাই নাকি তাহাদের দেশাচার। আশ্চর্য্য দেশের এই আশ্চর্য্য আচার দেখিয়া আমরা উপহাস করি। কিন্তু পুস্তকালয়ে পড়িতে যাইয়া পুস্তক পকেটস্থ করা যদি আমাদের রীতি হইয়া দাঁড়ায়, তবে আমরা কি সভ্যজগতে অধিক উপহাসাস্পদ হইব না? কেবল বক্তৃতায়, গ্রন্থ পাঠে বা অর্থব্যয়ে যে নৈতিক উন্নতি হয় না, একথা আমরা বরাবরই বলিতেছি। আমাদের জাতীয় চরিত্রের কথা যখন ভাবি, তখন আর আশা ভরসা কিছুই থাকে না, হৃদয় নৈরাশ্যে অবসন্ন হয়। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ না হইলে বুঝি এ জাতির আর উদ্ধার নাই! মিথ্যাবাদ, তস্করতা এবং প্রতারণার সাহায্যে কবে কোন দেশ উদ্ধার পাইয়াছে?

উচ্চাশার ভিত্তি হীনতা।—কোন সংবাদ-পত্রে দৃষ্ট হইল, ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলিকে গবর্ণমেন্টের শাসন-নিরপেক্ষ দেখিবার জন্য সম্পাদক বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতের বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলির এত উন্নতির কারণ, তাহাদের স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব-বোধ। সাধারণের মত তাহাদের পরিচালক, কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাহাদের উত্তেজক, সুতরাং তাহাদের উন্নতির পথ নিরাপদ এবং নিষ্কণ্টক। কিন্তু আমাদের দেশে সে সময় উপস্থিত হইয়াছে কি? প্রবলের তোষামোদ ছাড়িয়া, অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থ পদে দলিয়া, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে পরিচালিত হইবার উপযুক্ত শিক্ষা এবং চরিত্র-বল আমাদের আছে, কি? আমরা যত দিন শিক্ষা এবং চরিত্রে উন্নত না হইতেছি, তত দিন উন্নত এবং স্বাধীন জাতির উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি লাভ করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। দেশের শিক্ষিত-সমাজের আদর্শ বিশ্ব-বিদ্যালয়। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সভ্য-নির্ব্বাচনের নবলব্ধ অধিকারের যেরূপ ব্যবহার দেখা যাইতেছে, তাহাতে এমন আশা হয় না যে দুই চারি যুগের মধ্যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় গবর্ণমেন্টের শাসন-নিরপেক্ষ হইবার উপযুক্ত হইবে। যে সাধারণের মতে বিলাতের বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালিত, আমাদের দেশে সে সাধারণ কোথায়? আর যে কর্ত্তব্য-জ্ঞান স্বার্থ প্রভৃতি অবশ্য উদ্দেশ্যকে পদ-তলে দলিত করিয়া কেবল কর্ত্তব্যই পালন করে, আমাদের দেশে সে কর্ত্তব্যজ্ঞানই বা কত জনের আছে? আগে যোগ্যতা লাভ করিলে তবে অধিকারের দাবী শোভা পায়।

বিবির শিক্ষকতা।—মান্দ্রাজে রমণী-দিগকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য পদে বরণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। ভারত-বর্ষেই নাকি রমণী সর্ব্ব প্রথমে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। উপস্থিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এ সম্মানও

ভারতের রমণীই সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবেন ; ইহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখি না— আনন্দ বই নিরানন্দের কোন হেতু দেখি না। রমণীরা যখন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন এবং পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার গৌরবের সহিত কৃতকার্য্যতা দেখাইতেছেন, তখন আর পদে পদে প্রতিবাদের প্রত্যূহ উপস্থিত করিয়া সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া কেন? ভারত-রমণীর বিদ্যাবত্তা চির প্রসিদ্ধ, এখানে তাহার সম্মানও চিরাগত। যখন ভারতে মৈত্রেয়ী-অরুন্ধতী, লীলাবতীর মত রমণী জন্ম গ্রহণ করিতেন, তখনই ভারত স্বর্গ-ভূমি ছিল, স্বর্ণ-ভূমি ছিল। আবার ভারত-রমণী সেইরূপ বিদ্যা এবং সেইরূপ সম্মান লাভ না করিলে ভারত সে উন্নত অবস্থা ফিরিয়া পাইবে না।

বলরাম পুরের রাজা ও অযোধ্যার তালুকদারদিগের অর্থে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে স্ত্রী শিক্ষার জন্ত একটি কলেজ স্থাপিত হইবে। অনেক নীলকর সাহেবের বিধবা কামিনী নাকি ইহার অধ্যক্ষ হইবেন। ভারত রমণীর সুশিক্ষা-বিধানে ইংরাজ-বিবির অধ্যক্ষতা, তাহাতে আবার নীলকর-বিবির অধ্যক্ষতা! ইঁহার সহকারী অধ্যক্ষ কে হইবেন? একজন মিসনারী বিবি পাওয়া গেলেই ভারত-রমণীর উচ্চ-সুশিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হয়!

শিক্ষকের শিক্ষা।—লিউইস্ সাহেব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক। তাঁহার আগমনের সংবাদে [illegible] বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেলওয়ে ষ্টেসনে থাকিয়া সেলাম দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন; সাহেব কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, কার্য্য-ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য ছাড়িয়া সেলাম দিবার জন্ত ষ্টেসন্ পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্ত তিনি শিক্ষককে তিরস্কার করিয়াছেন। শিক্ষক মহাশয়ের ইহাতে শিক্ষা হইয়া থাকিবে। কোন্ দেবতা কিসে সন্তুষ্ট হন, তাহা জানিবার যখন উপায় নাই, তখন যথাজ্ঞান কর্ত্তব্যের পথে চলাইত ভাল?

শ্রীরণজিৎ সিংহজি।—ব্যাটবল খেলাতে ইনি বিলাতে সাহেবদিগকেও হারাইয়াছেন। ইঁহার সুখ্যাতি আর বিলাতী কাগজওয়ালা-দের মুখে ধরে না। বিলাতে এখন ব্যাটবল খেলার মরসুম পড়িয়াছে—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খেলোয়ারের দল প্রতিযোগিতা করিয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এক স্থানে তিনি খেলিতে গিয়াছিলেন—বিলাতের যত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বলনিক্ষেপকারীগণ বিপক্ষদলে খেলিতেছিলেন। তাহাদের বলের চোটে রণজিতের পক্ষের খেলোয়ারগণ একে একে পরাস্ত হইলেন,—রণজিৎসিংহ যখন ব্যাট হাতে দাঁড়াইলেন, তখন সকলে মনে করিতেছিল, তাঁহার দলের আর জয়াশা নাই। বল-নিক্ষেপকগণ বল ছুঁড়িতে লাগিলেন, রণজিৎসিংহ দেখিতে দেখিতে ৭৭ রণ করিলেন; তখনও তাঁহাকে "আউট" করিতে পারিল না। সেদিনকার মত খেলা বন্ধ হইল। দ্বিতীয় দিনে রণজিৎ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—সেদিন ২॥০ ঘণ্টার মধ্যে ১৫০ রণ করিলেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ

খেলোয়ার মার্ডক, নিউহাম, বীন প্রভৃতি, হার্মি, মার্টিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বল-নিক্ষেপকদিগের বলে সহজেই আউট হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু রণজিৎসিংহকে তাঁহাদের কেহই সহজে আউট করিতে পারিলেন না। খেলোয়ার এবং দর্শকমণ্ডলী তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। ব্যাটবল খেলার ইতিহাসে কেহ কাহাকেও এরূপ দক্ষতার সহিত খেলিতে দেখে নাই বলিয়া বিলাতের সংবাদপত্র সকলে তাঁহার প্রশংসা বাহির হইতেছে। তিনি যেমন ব্যাট হস্তে "রণ" করিতে পটু, তেমনি "বল" ছুঁড়িতেও পটু। তাঁহার বলে প্রতিপক্ষদের ৬ জন আউট হইয়াছিল।

শিক্ষা-সৌকর্য্যে দান। বেহার অঞ্চলের মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য পাটনার খাঁ বাহাদুর কাজী রেজা হোসেন সাহেবের বিধবা স্ত্রী দশ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ইংলণ্ড এবং জাপানের আনুপাতিক শিক্ষা-ব্যয়। জাপান এবং ইংলণ্ড উভয়ই দ্বীপ-রাজ্য, সুতরাং উভয়েরই নৌবল-সংরক্ষণে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু ইহাতেও উভয়ের পার্থক্য অনেক। শান্তির সময়ে জাপানের নৌ-বল-সংরক্ষণে যত ব্যয় হয়, সাধারণ-শিক্ষার ব্যয় তাহার দ্বিগুণ; কিন্তু ইংলণ্ডে শান্তির সময়ে সাধারণ-শিক্ষায় যত ব্যয় হয়, নৌ-বল-সংরক্ষণের ব্যয় তাহার দ্বিগুণেরও অধিক। জাপান অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক উন্নতি কেমন করিয়া করিল, ইহা যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা জাপানের এই শিক্ষা-নীতিটার দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

কার্লাইলের প্রতি সম্মান।—বিলাতে চেল্‌সী নগরে মহামনস্বী কার্লাইল অবস্থান করিতেন। তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, সেই গৃহটি সংপ্রতি সাধারণের অর্থে ক্রীত হইয়াছে, এবং সাধারণের সম্পত্তি হইয়া—মনস্বিগণের নিকট তীর্থীভূত হইয়া ইহা চির দিন থাকিবে। যে দেশে প্রতিভার এইরূপ পূজা হয়, সে দেশ প্রতিভার যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইবে না কেন? আমাদের দেশে ধর্ম্ম-বিষয়ে কেহ কিছু অগ্রসর হইলেই আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার করিয়া লই—মানুষকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করিয়া ফেলি; কিন্তু প্রতিভার পূজা—মনস্বিতার আদর কেমন করিয়া করিতে হয়, আমরা তাহা জানিনা।

সাহিত্য প্রবেশ।

(শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।)

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যে যে ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে অধীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত সাহিত্য প্রবেশ একখানি উৎকৃষ্ট হইলেও ইহা দোষ-শূন্য নয়। তাঁহার ব্যাকরণে অনেক অনাবশ্যক কথা আছে, বিস্তর আবশ্যক কথাও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। আমরা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য-প্রবেশের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে প্রস্তুত হইলাম, পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে যেন ক্ষমা করেন।

২য় পৃষ্ঠা ১ম টীকা—"কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ মতেই দীর্ঘ ঌকার আছে। পাণিনি প্রভৃতি ৡকার স্বীকার করেন নাই"—এটি অনাবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় যখন ঌকারের ব্যবহার নাই, তখন স্বরবর্ণের মধ্যে তাহাকে স্থান দেওয়া উচিত হয় নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় বহু বিজাতীয় শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে; তাহার লেখনার্থ বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন বর্ণের সৃষ্টি আবশ্যক। জ, ব, স প্রভৃতির নিম্নে চিহ্ন দিয়া নূতন নূতন উচ্চারণের বর্ণ সৃষ্টি করা আবশ্যক। এখন কথা হইতেছে যে, নূতন বর্ণ সৃষ্টির ভার কে গ্রহণ করিবে? বর্ণপরিচয়রচয়িতৃগণ, না ব্যাকরণকারগণ? আমার বিবেচনায় ব্যাকরণকারদের সে ভার গ্রহণ করা উচিত। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের ২য় ভাগের প্রথমে বিজাতীয় শব্দের উচ্চারণের জন্ম যে যে নূতন বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সেই বর্ণ ব্যাকরণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি বিদ্যারত্ন মহাশয় ভবিষ্যতে বর্ণের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশতের অধিক লিখিবেন। অযোগবাহ ও উষ্মবর্ণ কাহাকে বলে? কেন? ইহা বাঙ্গালী পাঠকের জানা না থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না, অতএব ৫ম পৃষ্ঠায় যে টীকাটি আছে তাহা পরিত্যাজ্য।

৫ম অবধি ১৫শ সূত্র এককালে পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক। কোন্ কোন্ বর্ণের উচ্চারণ স্থান তালু, কণ্ঠ, ও দন্ত, তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত কঠিন। সংস্কৃতে যে বর্ণ যে স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, বাঙ্গালায় যে সেই সেই বর্ণ সেই সেই স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, এমন প্রমাণ নাই, সুতরাং ৫ম অবধি ১৬শ সূত্র ব্যাকরণ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারে।

২৮শ সূত্র—ঋকারের পরে ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৠকার হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে পিতৄদ্ধি ও পিতৄণ পদের ব্যবহার হইয়াছে গ্রন্থকার সমুদায় বাঙ্গালা সাহিত্যে, পিতৄদ্ধি ও পিতৄণ প্রভৃতির ন্যায় শব্দ দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে যেন এ সূত্র ব্যাকরণ হইতে উঠাইয়া দেন।

৩৯ শ সূত্রটি রচনা না করিয়া এই মাত্র লিখিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইত যে, বিম্ব ও ওষ্ঠ পদের সন্ধি করিলে বিম্বোষ্ঠ পদ সিদ্ধ

হয়। বিবোষ্ঠ শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালায় নাই। "সমাস না হইলে হইবে না।" গ্রন্থকার দৃষ্টান্ত স্থলে ভবোষ্ঠ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, উহা কি বাঙ্গালা শব্দ? সংস্কৃত ভাষার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ। বাঙ্গালায় যাহা ব্যবহার নাই বাঙ্গালা ব্যাকরণে তাহার সূত্র রাখা অনাবশ্যক।

৪৭ সূত্র—জ কিম্বা ঝ পরে থাকিলে ন স্থানে ঞ হয়। যথা মহান্—জয় মহাঞ্জয়। আমরা ত কখনও এমন শব্দ বাঙ্গালায় দেখি নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় যদি না দেখিয়া থাকেন তবে যেন ব্যাকরণ হইতে উহা উঠাইয়াছেন।

৫৪ সূত্র—ল পরে থাকিলে ত দ ন স্থানে ল্‌ হয়। ন স্থানে লঁ হইতে গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় কোথায় দেখিয়াছেন জানিতে পারিলে সুখী হইব। আমাদের বিবেচনায় ৫৪ সূত্রের এক অংশ ও তাহার টীকা পরিবর্জ্জন করিতে পারা যায়।

৫৬ সূত্রের টীকাটি লিখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় চাপল্যের (১) পরিচয় দিয়াছেন। সংবাদ না লিখিয়া সম্বাদ লিখিলে যে ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করা হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

৬২ সূত্র—ন কিম্বা ম পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গীয় ১ম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় কোনও স্থানে তৃতীয় বর্ণ হইতে দেখি না। গ্রন্থকার তৃতীয় বর্ণ হওয়ার কথাটী যেন পরিত্যাগ করেন। আমরা জগন্নাথ ব্যতীত জগদ্‌নাথ শব্দটী বাঙ্গালায় কোন স্থানে শুনি নাই।

(১) প্রবন্ধ লেখক এস্থলে ভাষাটিকে বিন্যাসে আপত্তি-জনক করিয়াছেন। সিঃ পঃ সঃ।

৬৭ সূত্র—গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন বাঙ্গালায় মনঃশক্তি প্রভৃতি ভিন্ন মনশ্‌ শাক্তি প্রভৃতির প্রয়োগ প্রায় নাই। যদি প্রয়োগ না থাকিল, তবে সূত্রটি যেন ব্যাকরণ হইতে তুলিয়া দেন।

৮৪। সূত্র—ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, উপকারিন্‌ শব্দের ন এই সূত্রানুসারে ণ হইতে ত কোন বাধা দেখি না। বিদ্যারত্ন মহাশয় সূত্রটি পূর্ণ করিয়া দিবেন।

ণত্ব বিধান সংক্রান্ত বিশেষ বিধি হইতে থ সূত্রটি উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ওরূপ বিধান করিয়া ব্যকরণকে ভারগ্রস্ত করা উচিত নহে। তবে যে সংস্কৃত ব্যাকরণে ঐরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, লোকে নগর-বাসিণী ও নগর-বাসিনীর ভিন্ন রূপ উচ্চারণ করিত বলিয়া সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সূত্র-রচনায় বাধ্য হইয়াছিলেন; বাঙ্গালায় সে বাধ্য-বাধকতা যখন নাই, তখন সূত্রটীর এক কালেই প্রয়োজনাভাব হইয়া পড়িতেছে।

৯৪ সূত্রের টীকা—পাণিনি, কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ মতে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন নাম কি, তাহা না জানিলেও বালকদের কোন হানি দেখি না।

শব্দ ও পদ-সাধন-বিষয়ে সাহিত্য-প্রবেশের ন্যায় ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় নাই, কিন্তু ইহার পদ-পরিচয়-প্রকরণ ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের ব্যাকরণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। কালী প্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্যাকরণ-ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়াছেন, প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহা

এরূপ তেমন স্বাধীন ভাব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি যেন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুচিত অনুবৃত্তি করিয়াছেন।

১১৪ সূত্রের দ্বিতীয়াংশে লিখিত আছে, ক্লীবলিঙ্গে ইন্ ভাগান্তের ইকার দীর্ঘ হয় না। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন এ পুস্তক বালকদের উপযোগী, এই রূপ হইবে। উপযোগী হইবে না। আমাদের মতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ইন্ ভাগান্ত শব্দ দীর্ঘ-ঈকারান্ত হইবে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা কেহ শুনিবে না, কারণ বাঙ্গালা ভাষার গতি অন্য দিকে। (ক্রমশঃ)।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

ভুলি যশ অপযশ প্রাণান্তে খাটিলে।
কেন না পাইবে ফল উপযুক্ত কালে?

পরের দাসত্বে বাঁধা জীবন যাহার,
থাকিয়া সুখের মাঝে সুখ নাই তার।

মঙ্গল উর্দ্ধের পথে ধীরে ধীরে যায়,
অমঙ্গল দ্রুতপদে অধোমুখে ধায়।

জীবন নিযুক্ত যার পরার্থে কেবল,
সাধে সে অজ্ঞাতসারে আপন মঙ্গল।

কাহারো জীবনে নাই মুহূর্ত্ত সময়,
যার অপব্যবহারে কিছু ক্ষতি নয়।

প্রসন্নতা কিছু নাই যাহার বদনে,
প্রাণে তার সুখ আছে বুঝিব কেমনে?

কার্য্যের সময় মাত্র মনেতে করিয়া,
[illegible] তাহা বেড়ায় বলিয়া।

যতই উন্নত হয় চরিত্র যাহার,
দয়ার্দ্র কোমল প্রাণ ততই তাহার।

পশুত্ব দেবত্ব দুই এই প্রাণে আছে,
যার কর সেবা, ফল দিবে সেই গাছে।

আছেত আত্মীয় কত, মিত্র, বন্ধু, ভাই,
মরণের পথে কিন্তু সঙ্গী কেহ নাই।

যে জন অপরে নিন্দে সম্মুখে তোমার,
অন্যত্র তোমার নিন্দা অভ্যস্ত তাহার।

শুনিছ নিজের যেই প্রশংসার গান
সত্য মিথ্যা সাক্ষী তার আপনার প্রাণ

বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরচি যেই সুখ পায়,
খেলার কুটীর বাঁধি শিশু লভে তায়।

প্রথম দাঁড়ায়ে শিশু যে আনন্দ পায়,
তার কাছে দিগ্বিজয় লাগে বা কোথায়।

প্রথমে যে শব্দ শিশু উচ্চারণ করে,
নিখিল শব্দের বীজ তাহারি ভিতরে।

শিশুর সারল্য আর উৎসাহ যুবার,
বার্দ্ধক্যেতে রহে যার, দেবতুল্য তাহার।

সকলেই খাটে যদি শক্তি অনুসারে,
রহে না দুঃখের লেশ সংসার ভিতরে।

দোঁহের জীবন ঠিক কখন না মিলে,
বিভিন্ন রেখায় তরী সাগরেতে চলে।

যে কাযের উপযুক্ত শক্তি নাই যার,
সে কাযে উদ্যম তার বিড়ম্বনা সার।

কপর্দ্দক মূলধন হাতে নাই যার,
মাণিকের ব্যবসায় দুরাশা তাহার।

ধীর ভাবে কর কায হয়ে অচঞ্চল,
বুনিতে বুনিতে বীজ ধরে না ত ফল!

ছোট হয়ে ক্রমে বড়, এই ত নিয়ম,
একেবারে লম্ফ-দান নহে তার ক্রম।

কথায় কাযেতে কভু মিল নাই যার,
সে যদি মানুষ, তবে জন্তু কি প্রকার?

সহস্র দোষের পারি করিতে মার্জ্জনা,
বেঠিক বচন ক্ষমা করিতে পারি না।

টাকার হিসাব পত্র কাহার না থাকে?
মহৎ সে, কথার হিসাব যেই রাখে।

তামা কাঁসা ওজনেতে কে নহে পণ্ডিত?
কথার ওজন বুঝে কেহ বা কচিৎ।

শঠের মুখের কথা মুখেই মিলায়,
সতের প্রাণের কথা প্রাণে থেকে যায়।

কর্ম্মবীর বাক্য-ব্যয়ে সময় না পায়,
বাক্যবীরগণ শুধু কথা বেচে খায়।

কথা-কাযে মিল যদি সবার থাকিত,
সমাজে অর্দ্ধেক দুঃখ হ'তে না পাইত।

যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরতা।

বনবাস-কালে একদা যুধিষ্ঠির তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া ভীমসেনকে জল আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভীমসেন জলান্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া এক রমণীয় সরোবর প্রাপ্ত হইলেন। তৃষ্ণার্ত্ত ভীমসেন জল পান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বকরূপী ধর্ম্ম কহিলেন, "বীরবর! আমার প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া জল পান কর; অন্যথা বারিস্পর্শ মাত্র তোমার জীবন-লীলা শেষ হইবে।" উদ্ধত-চেতা ভীম বকের বাক্য অবহেলা করিয়া সলিলস্পর্শ করিবা মাত্র জীবন হারাইয়া জলে ভাসিতে লাগিলেন।

ভীমসেনের প্রত্যাগমনের সময় অতিবাহিত হইলে, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে জল আনিতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুনও জলানুসন্ধানে যাইয়া সেই সরোবরে ভীমসেনের ন্যায় জীবন হারাইলেন। তৎপর নকুল সহদেব এবং দ্রৌপদী জল আনিতে অনুজ্ঞাত হইয়া একে একে পূর্ব্বোক্ত রূপে

মৃত হইলেন। সর্ব্ব শেষে তৃষ্ণাতুর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যার প্রত্যাগমনে অসম্ভাবিত বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং পানীয়ের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি সেই সরোবর-তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ও পত্নী বিগত-জীবন হইয়া জলে ভাসিতে-ছেন। তখন তিনি ইঁহাদের শোকে বহু বিলাপ করিয়া আত্ম-হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে জলমগ্ন হইতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্ভাগ হইতে বকরূপী ধর্ম্ম কহিলেন," মহারাজ! তুমি অদ্বিতীয় গুণবান তোমার তুলনার স্থান নাই। তবে কেন তুমি আত্মহত্যা করিতেছ? আত্ম-ঘাতী মহাপাপী, সে কখনও স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই সংসারে ধর্ম্ম-ব্যতীত অন্য সম্বল নাই। তুমি কেন সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছ? তোমার যদি একান্তই প্রাণ-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে অগ্রে আমার চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেও; তোমার ভ্রাতৃগণ আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল-স্পর্শ করিয়াই দৈব-বশে পরলোকে গমন করিয়াছে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তোমার কি প্রশ্ন বল?" বক কহিল, (১) বার্ত্তা কি (২) আশ্চর্য্যকি, (৩) কোন পথ প্রশস্ত এবং (৪) কোন জন সুখী? যুধিষ্ঠির কহিলেন, (১) মাস ঋতু দর্ব্বী, দিবা-রাত্রি ইন্ধন, সবিতা অগ্নি, মোহ কটাহ, কাল কর্ত্তা এবং ভূত-গণকে সে পাক করে, ইহাই বার্ত্তা। (২ প্রতিনিয়ত প্রাণিগণ যম-মন্দিরে গমন করিতেছে, যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহারা মনে করে তাহাদের আর মরণ হইবে না, ইহাই আশ্চর্য্য। (৩) বেদ এবং স্মৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতে লিখিত, মুনিগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে এক এক মত প্রচার করিয়া থাকেন, ধর্ম্মের তত্ত্ব নিগূঢ়, তাহা নিরূপণ করিতে কেহই সমর্থ নহে; অতএব মহাজন-গণ যে পথে গমন করেন, তাহাই প্রশস্ত পথ। (৪) অঋণী এবং অপ্রবাসী হইয়া যদি কেহ দিবসের অষ্টম ভাগে শাকান্নও ভক্ষণ করে, তবে সেই প্রকৃত সুখী।"

যুধিষ্ঠিরের উত্তর শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম নিজরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন, "আমি ধর্ম্ম, তোমার উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর এবং তোমার একটি ভ্রাতাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া লও।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সর্ব্বদা যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, এই বর প্রদান করুন, এবং আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সহদেবকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দেন।" ধর্ম্ম কহিলেন, "রাজন্! তুমি অর্ব্বাচীনের মত কথা কহিতেছ কেন? তুমি হয় বৃকোদর না হয় অর্জ্জুনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া লও। তোমার প্রবল রিপু দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, ভীমার্জ্জুন ভিন্ন এমন অন্য কেহ নাই, অতএব ইহাদের একজনকে পুনর্জ্জীবিত কর। বিমাতৃতনয় পর, তাহাকে জীবিত করিলে কি লাভ হইবে?" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বিমাতৃতনয়কে আমি পর জ্ঞান করিনা, ইহাদিগকে আমি ভীমার্জ্জুন হইতে ও অধিকতর ভালবাসি। বিশেষতঃ আমি জীবিত থাকিলে আমার পিতৃগণ জল-পিণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। আমার মাতামহগণও আমাদ্বারা তৃপ্ত হইবেন, কিন্তু নকুলের মাতামহগণ জলপিণ্ড প্রাপ্ত হইবেন না;

তখন সহদেব পুনর্জীবিত হইলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়। যদি আমার প্রতি আপনার দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহদেবকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন।”

অতঃপর ধর্ম্ম কহিলেন, “আমি তোমার পিতা, তোমাদের ধর্ম্ম-পরীক্ষার জন্য আমিই এই মায়া-সরোবরের সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমি তোমার ন্যায়-পরায়ণতাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মে মন রাখিও, অচিরাৎ তোমার সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হইবে। তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় এবং ধর্ম্ম-পত্নী দ্রৌপদী এখনই পুনর্জীবিত হইবে।” এই বলিয়া ধর্ম্ম অন্তর্ধান হইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সকলেই পুনর্ব্বার প্রাণপ্রাপ্ত হইলেন, এবং যুধিষ্ঠির তাঁহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

—:*:*:—

শ্রী দিনকান্ত চক্রবর্ত্তী—

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

সম্বলপুর হিতৈষিণী। উৎকল ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র। ইহার বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র। এই পত্র যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া আজ ছয় বৎসর যাবৎ দেশের হিতসাধন করিতেছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল, প্রবন্ধগুলি অসার নহে, লেখকগণ বিদ্যাবত্তার সঙ্গে চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রতি সপ্তাহেই দিয়া থাকেন। সম্পাদক সঙ্কীর্ণচেতা দোকানদার নহেন, তিনি দেশের হিতের জন্য পরিশ্রম করিতে যে সুখ বোধ করেন, তাহা সম্বলপুরের বিচারালয়াদি হইতে উড়িয়া ভাষার অধিকারচ্যুতির রাজাদেশের অযৌক্তিকতা, অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন ব্যাপারে বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সুযুক্তি-পূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধ সমূহে স্বজাতিদ্রোহীগণকেও প্রকম্পিত করিয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মাতৃভাষা বিতাড়িত হইলে বা তাহার গতি প্রতিহত হইলে দেশবাসীর সর্ব্বতোমুখী অনিষ্ট হইয়া থাকে। প্রজার রঞ্জক রাজার যে নথাগ্র পরিসংখ্যেয় কয়েক জন উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর সুবিধার জন্য সহস্র সহস্র লোককে মাতৃভাষার শোকসাগরে ডুবাইবার চেষ্টা করা, উড়িয়া ভাষার পরিবর্ত্তে বিচারালয়াদিতে হিন্দী ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার চিহ্ন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সম্পাদক মহাশয় সেই জাতীয়তা-বন্ধনচ্ছেদী রাজাদেশের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রজার দীনতার সীমা উল্লঙ্ঘন না করিয়া অতি ভদ্র ভাবে আদেশ প্রত্যাহারে জন্য রাজার নিকট যে ভাবে সাদুনয় অনুরোধ করিয়াছেন তাহা তাঁহার গৌরব ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক।

উৎকল প্রদেশে বহু গুলি পত্র জাতীয় ভাষায় পরিচালিত হইতেছে, তাহার মধ্যে এই খানিই দীর্ঘজীবন।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, সম্বলপুর হিতৈষিণীর সাহায্য নিমিত্ত স্বদেশানুরাগী মান্যবর বামণ্ডাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ সুচল দেব, কে, সি, আই, ই মহোদয় বর্ষে বর্ষে পাঁচ শত করিয়া টাকা দান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। যঁ'সুখ অজ্ঞানের দুশ্ছেদ্য আবরণ উন্মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া পদোচিত কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, আপাত সুখকর অলীক এবং অনিষ্টকর কার্য্যে স্বীয় ক্ষমতার ক্ষয় করিয়া থাকে, যদিও পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বা সুশিক্ষার প্রভাবে সে আবরণ উন্মুক্ত হয়, কিন্তু সেরূপ সৌভাগ্য আমাদের অধঃপতিত দেশে কয়জনের আছে? যদি তাহা থাকিত তাহাহইলে দেশের অন্নকষ্ট ঘোর পরাধীনতাদি আয়ুঃক্ষয়ের হেতু সমূহ মাতৃভূমির বক্ষঃস্থলে অটল অক্ষয় আসন প্রাপ্ত হইত না। অনাহার-ক্লিষ্ট অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ প্রজাশ্রেণীর প্রতি কৃপা কটাক্ষপাতে কৃপণতা প্রকাশ করিয়া ছার উপাধি এবং বিষগর্ভ মধুরাভাস সম্মানের জন্ম অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট অম্বর দরিদ্রের আহার প্রার্থীর ন্যায় লালায়িত হইয়া বিশাল রসনার রসে বক্ষ আর্দ্র করিতে দেশীয় অপরিণাম দর্শী ধনবানগণ কদাচ ধাবিত হইতেন না। বামণ্ডাধিপতির জাতীয় সাহিত্যের প্রতি সর্ব্বজন-প্রশংসনীয় অনুরাগ ও মুক্ত-হস্ততা ভারতীয় ধনীমাত্রেরই অনুকরণ যোগ্য। ভগবান সেইরূপ মহানুভব মহাত্মাগণকে দীর্ঘজীবী এবং তাঁহাদের সদিচ্ছার সাহায্য করিয়া দরিদ্র দেশকে রক্ষা করুন এই আমাদের হৃদগত কামনা।

অতঃপর পাঁচ শত গ্রাহক বার্ষিক অগ্রিম মূল্য এক টাকা করিয়া দিয়া সম্বৎসর সম্বলপুর হিতৈষিণী পইবেন। বামণ্ডা ষ্টেট সম্বলপুর—এই ঠিকানায় সম্বলপুর হিতৈষিণী পাওয়া যায়।

মালা। কাব্য শ্রীগোপালচন্দ্র বক্রবর্ত্তি—প্রণীত। আকার ডিমাই ১২ পেজী ৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

মিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লেখা বড় কঠিন, ছন্দ রাখিলে অর্থ থাকে না, যথা ২০ পৃষ্ঠায়—

"খুজিয়াছি বহুদিন, পাই নাই তায়;
মনেতে করেছি স্থির খুঁজিবনা আর।"

আবার অর্থ রাখিলে ছন্দ থাকে না, যথা ২৮ পৃষ্ঠায়—

"রবি, শশী, সমীরণ,
কোথা হ'তে এত দিন," ইত্যাদি।

যাহা হউক, লেখক নবীন, যত্ন করিলে ভাল কবিতা লিখিতে পারিবেন।

শিক্ষা-পরিচয়।

৫ম ভাগ। | আশ্বিন ১৩০২ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দুখুরাম দাস।

কোন পল্লীগ্রামে নারায়ণ দাস নামে এক জন ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহার কোন সম্পত্তি ছিল না, জমিদার বাড়ীতে সামান্য চাকুরী করিয়া তিনি পরিবার পালন করিতেন।

নারায়ণের মাতা, স্ত্রী, এবং দুইটি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দুখুর বয়স ষোল বৎসর, সে গ্রামের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। কনিষ্ঠ যাদুর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র।

ভাদ্রমাসে নারায়ণের জ্বর হইল। গ্রামের কবিরাজ চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। নারায়ণের অবস্থা ক্রমে খারাপ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা মাতার অন্ধের যষ্টি, পরিবারের একমাত্র অবলম্বন নারায়ণ যান দেখিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

শেষকালে নারায়ণ দুখুকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি ত চলিলাম, তোমার আর পড়া শুনা হইল না। এখন পরিবার-পালনের ভার তোমার উপর। আমি যেমন করিয়া তোমাকে পালন করিয়াছি, তুমিও সেইরূপ ইহাদিগকে পালন করিবে। চাকুরী ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সৎপথে থাকিয়া, অন্যের অনিষ্ট না করিয়া, মনিবের হিতের জন্য সরলভাবে প্রাণপণে খাটিলেই চাকুরীতে বিপদ হইবে না। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ।" এই বলিয়া নারায়ণ নীরব হইলেন।

নারায়ণের মৃত্যু হইল, জ্ঞাতি বন্ধু মিলিয়া তাঁহাকে দাহ করিলেন, দুখু দুঃখের সাগরে ভাসিল। কিন্তু সে নিজের দুঃখ প্রকাশ করিল না, মা ও ঠাকুরমাকে সাহস এবং সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

পরদিন যাদুকে লইয়া দুখু পিতার মনিব-বাড়ীতে গেল। মনিব দুখুর গলায় কাচা দেখিয়াই সমস্ত বুঝিলেন। নারায়ণের বেতন দশ টাকা বাকী ছিল, আর পাঁচ টাকা শ্রাদ্ধের ভিক্ষা দিয়া তিনি দুখুকে পনরটি টাকা দিলেন, নারায়ণের জন্য আক্ষেপ করিলেন, এবং দুখুকে অনেকটা সাহস দিয়া বিদায় করিলেন। দুখু বুঝিল পিতার চাকুরীটা সে পাইবে।

নারায়ণের চিকিৎসার খরচ পত্র দিয়া ঘর হইতে চারিটি টাকা বাহির হইল, আর দুখু গ্রামের ভদ্রলোক দিগের নিকট ভিক্ষা

করিয়া চৌদ্দ টাকা পাইল। নারায়ণের শ্রাদ্ধের জন্য এই তেত্রিশ টাকা সংগ্রহ হইল।

নারায়ণ বড় বিশ্বাসী লোক ছিলেন, এজন্য তিনি টাকা পয়সা ধার চাহিলে লোকে বিনা দলিলে ও বিনা সাক্ষীতে তাঁহাকে ধার দিত। জীবন দাসের নিকট হইতে তিনি এইরূপ দশ টাকা ধার লইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহা দিয়া যাইতে পারেন নাই। জীবন ভাবিলেন, যখন টাকার কোন্ নিদর্শন নাই, তখন তাহা আর পাওয়া যাইবেনা, তবে দুখুকে একবার জিজ্ঞাসা করা মাত্র। দুখুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "বাবা শ্রাবণ মাসে দশ টাকা ধার করিয়াছিলেন জানি, ভাদ্র মাসে বেয়ারাম পড়াতে সে টাকা দিতে পারেন নাই। কিন্তু কাহার নিকট হইতে টাকা আনিয়াছেন তাহা জানিতাম না, তিনিও বলিয়া যান নাই। আজ দুই দিন আমি সেই কথাই ভাবিতে ছিলাম, আপনার টাকা জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু এখন আমার বিপদের সময়। দুঃখে কষ্টে তেত্রিশ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি; ইহা হইতে দশ টাকা আপনাকে দিলে বাবার শ্রাদ্ধ হয় না। কিছুদিন পরে টাকাটি লইলে আমার বড় উপকার হয়।"

দুখুর সরলতায় সন্তুষ্ট হইয়া জীবন বলিলেন, "আমি এখন টাকা চাইনা, তোমার যখন সুবিধা হয় আসল টাকাটি দিও, আমি তোমার নিকট হইতে সুদ লইব না।" জীবনের সৌজন্যে দুখু চক্ষের জল রাখিতে পারিল না।

ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন নিকটে আসিল। একদিন গ্রামের প্রধান নিধিরাম প্রামাণিক আর কয়েক জন জ্ঞাতি ও পুরোহিত সঙ্গে লইয়া দুখুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। নিধিরাম সম্পর্কে নারায়ণের জেঠা। তিনি দুখুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে দুখু, বাবার শ্রাদ্ধের কি করিলি?" এই বলিতে নিধিরামের চক্ষে জল আসিল, তিনি কাপড় দিয়া চক্ষুঃ মুছিলেন। দুখু পুরোহিত ও নিধিরামকে প্রণাম করিয়া একটি মাদুর পাতিয়া বসিতে দিল, এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া ঘরে গেল। পরে ঘর হইতে টাকা তেত্রিশটি আনিয়া নিধির সম্মুখে রাখিয়া দুখু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর দাদা, আমি দুঃখে কষ্টে এই তেত্রিশটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছি, ইহা দিয়াই বাবার শ্রাদ্ধ চালাইতে হইবে। ঘরে আর কিছু নাই। আমি আর ধারও করিতে পারিব না। আপনি দেখিতেছেন, এখন আমাকেই সংসার চালাইতে হইবে।"

নিধিরাম আবার চক্ষের জল মুছিলেন। তিনি পুরোহিতকে দশটি টাকা দিয়া বলিলেন, "আপনি সমস্ত জিনিস পত্র দিয়া শ্রাদ্ধ চালাইয়া দিবেন, তাহার মূল্য ও দক্ষিণা বাবতে আপনাকে এই দশ টাকা দিলাম, আপনি আরকিছু পাইবেন না। শ্রাদ্ধের দিন পাঁচটি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রন করিবার ভার আপনার উপরেই রহিল।"

দুখুর প্রতিবাসী গোপাল দাসের হাতে অবশিষ্ট তেইশ টাকা দিয়া নিধিরাম বলিলেন "গোপাল, এই কয়েক টাকা দিয়া নারায়ণের জ্ঞাতিভোজন হইবে। তোমরা কয়েক জনে হিসাব করিয়া একটা ফর্দ্দ ধর। যদি

আর দুই চারি টাকা লাগে, আমি দিব। দুখু ছেলে মানুষ, এসব কিছু জানে না, তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিওনা; তোমরা খাটিয়া খুটিয়া তাহার কর্ম্মটা নির্ব্বাহ করিয়া দেও।"

নিধিরাম ও পুরোহিত চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পরে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল, এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সকলে মিলিয়া সুন্দররূপে নারায়ণের শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিলেন।

নারায়ণের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দুখু আর বিদ্যালয়ে যায় না। একদিন দুখু পিতার মনিবের নিকট গিয়া নারায়ণের চাকুরীটা চাহিল, কিন্তু বালক বলিয়া দুখুকে চাকুরী দিতে তিনি অসম্মত হইলেন। দুখু ঐ চাকুরী পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, আর নিরাশ হইল।

দুখু কাহারও সঙ্গে কথা কহেনা। কোন কায নাই, কি করে। ঘরে খাইবার নাই, সর্ব্বদা এই ভাবনা। দুখু কখনও খড়ি কাটে, কখনও মাটি কাটে, কখনও বসিয়া ভাবে। দুখুর ঠাকুর মা বলিলেন, "আরে দুখু, মাটি কাটিয়া হাতে ফোস্কা তুলিস কেন? মাটি কাটিলে কি পয়সা আসিবে?" দুখু উত্তর করিল, "বসিয়া থাকিলে কে দিবে? যতক্ষণ পারি হাতে কায করি, আর মাথায় ভাবি।" কিন্তু মাটি কাটাত অভ্যাস নাই, তাহার হাতে ফোস্কা উঠিল, আর মাটি কাটিতে পারিল না।

দুখুর বাড়ীর তিন ক্রোশ দূরে বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। রাম বাবু বিদ্বান, বুদ্ধিমান, এবং দয়ালু, সকলেই বলে। তাঁহার জমিদারীতে একটি নায়েবী খালী আছে, বেতন পঁচিশ টাকা। আবেদনকারী দিগকে আপন আপন যোগ্যতার নিদর্শনপত্র সহ ১৫ই কার্ত্তিকে হাজির হইতে হইবে, দুখু খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখিল।

দুখু নিজের ধুতিখানি এবং চাদরখানি একদিন ক্ষার দিয়া কাচিয়া লইল। ১৫ই কার্ত্তিক প্রাতঃকালে স্নান ও আহার করিয়া দুখু সেই ধৌত ধুতি চাদর পরিল, এবং মা ও ঠাকুর মাকে প্রণাম করিয়া রামনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে উমেদারী করিতে চলিল। পরিধানে কেবল ধুতি ও চাদর। জামা একটি ছিল. তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ে যাইবার জুতা এবং ছাতা ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু হওয়াতে দুখু তাহা একবৎসর ব্যবহার করিবেনা।

কার্ত্তিকের রৌদ্রে খালি পায়ে তিন ক্রোশ হাটিয়া দুখু রামনারাণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রাস্তায় চলিবার সময়ে সে একটি কথাও বলে নাই, কেবল উমেদারীর চিন্তা ও অন্ন-চিন্তাতেই তাহার সে সময়টুকু কাটিয়া গিয়াছে।

দুখু যখন রামনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে পঁহুছিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। দুখু কাছারীতে যাইয়াই দেখিল, কাচারী উমেদারে পূর্ণ। উমেদারদিগকে দেখিয়া সে চাকুরীর আশা তাহার মনে আর রহিল না; সে যে একখানি আবেদন লিখিয়া আনিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, কেবল উমেদারী কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহাই দেখিবার জন্য কাছারীতে রহিল।

রামনারায়ণ বাবু একখানি চেয়ারে

বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে এক খানি টেবিলের উপরে দোয়াত, কলম, কাগজ পত্র ও কতকগুলি বই আছে, আর তাহারই এক পার্শ্বে তিনি উমেদারদিগের দরখাস্ত গুলি একে একে লইয়া একত্র করিয়া রাখিতেছেন। উমেদারেরা একে একে দরখাস্ত দিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইতেছে।

দুখু দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, সুতরাং উমেদার বলিয়া পরিচয় দিবার উপায় তাহার নাই। বিনা প্রয়োজনে কাচারীতে প্রবেশ করিতে দুখু বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া কেবল কৌতূহলের অনুরোধে সে কার্য্যে সাহস করিল। কাছারীতে প্রবেশ করিতে যাইয়া সে দেখে, দ্বারের সম্মুখে একখান কম্বল পড়িয়া রহিয়াছে, উমেদারেরা তাহার উপর দিয়া যাইতেছে, আর তাহাদের জুতার মাটিতে কম্বল খানি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুখু আস্তে আস্তে টানিয়া কম্বল খানি দ্বারের এক দিকে সরাইয়া রাখিল, পরে ঘরে প্রবেশ করিয়া বাবুকে প্রণাম করিল, এবং উমেদারেরা যে পাশে ছিল, সেই পাশে যাইয়া, অথবা তাহাদের সঙ্গে না মিশিয়া, এক কোণে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছু কাল পরে টেবিলের উপর হইতে বাতাসে এক খানি শাদা কাগজ উড়াইয়া মাটিতে ফেলিল। সেই সময়ে তিন জন নূতন উমেদার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ঐ কাগজ খানির উপর দিয়া উহারা তিন জনই চলিয়া গেল। তাহারা দরখাস্ত দিয়াও প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইল, এই অবসরে দুখু কাগজ খানি তুলিল, নিজের কাপড় দিয়া তাহার ধূলা ঝাড়িল, এবং অতি ভয়ে ভয়ে টেবিলের উপরে কাগজ খানি রাখিয়া আবার সেই কোণে যাইয়া দাঁড়াইল।

আবার কিছুকাল পরে একটি পেন্‌সিল মাটিতে পরিয়া গেল। দুখুর মনে প্রথমে বোধ হইয়া ছিল, যেন বাবু ইচ্ছা করিয়াই পেন্‌সিলটি ফেলিলেন। কিন্তু সেরূপ করিবার কোন কারণ নাই, সুতরাং আপনা হইতেই উহা পড়িয়া থাকিবে, এই মনে করিয়া দুখু পেন্‌সিলটি তুলিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া আসিয়া আবার যথা স্থানে দাঁড়াইল।

রাসনারায়ণ বাবু সমস্ত গুলি আবেদন একবার উল্টাইয়া দেখিলেন, কোন খানির বা দুই চারি ছত্র পড়িলেন, তাহার পরে দুখুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

দুখু আবার প্রণাম করিয়া যোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর, আমার নাম শ্রীসদানন্দ দাস, কিন্তু মা বাপে দুখু বলিয়া ডাকেন।"

রা। "দুখু বেশ নাম। তোমার বাড়ী কোথায়?"

দু। "আজ্ঞে আমার বাড়ী জয়কালী পুর।"

রা। "এখানে কি জন্য আসিয়াছ?"

দুখু এবার বড় বিপদে পড়িল। যদি বলে কোন প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে জমিদারের কাছারীতে প্রবেশ করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আবার যদি বলে উমেদারী

করিতে আসিয়াছে, তাহারই বা নিদর্শন কি? আবেদন ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। দুখু কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অধোবদনে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। কিন্তু রামনারায়ণ বাবু স্নিগ্ধস্বরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে দুখু আর অধিকক্ষণ নীরব থাকিতে পারিল না, সে ক্রমে ক্রমে নিজের সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে বলিল। পিতার মৃত্যু, বাড়ীর অবস্থা, নিজের পাঠ-ত্যাগ, জীবনদাসের নিকট পিতার ১০ টাকা ঋণ, পুরাতন মনিবের নিকট চাকরীতে নৈরাশ, রামনারায়ণ বাবুর নিকটে লিখিত আবেদন ছিঁড়িয়া ফেলা, এবং উমেদারী শিখিবার জন্য কাচারীতে প্রবেশ, এ সমস্ত কথাই সে অধোবদনে দাঁড়াইয়া একে একে বলিল। রামনারায়ণ বাবু বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী, বিশেষতঃ লোক-চরিত্র-পরিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি দুখুকে দেখিয়া অবধিই তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তাহার আচরণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এখন তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, বিনয়, বুদ্ধিমত্তা, সরলতা এবং দৃঢ়তা, এই চারিটি গুণই তাহার আছে। তিনি হাসিয়া দুখুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে নায়েবী দিলে তুমি কায চালাইতে পারিবে?"

দুখু। "হুজুরের কৃপা থাকিলে পরিবনা কেন? বাবা মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়াছেন, সৎপথে থাকিয়া, অন্যের অনিষ্ট না করিয়া, মনিবের হিতের জন্য সরলভাবে প্রাণপণে খাটিলেই চাকুরীতে বিপদ হইবে না।"

রামনারায়ণ বাবু তখন উমেদারমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি দুখুকেই হরিহরপুরের নায়েব নিযুক্ত করিলাম।" দেওয়ানজি বাবুর পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দুখুর নিয়োগের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার জামিন কে হইবে?" বাবু বলিলেন, "এখনকার মত তুমিও জামিন হইতে পার; যখন ইহা হইতে বড় কায দেওয়া যাইবে, তখন আমিই জামিন হইব। দেওয়ান বাবুর মনের ভাব বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না। উমেদারেরা নিরাশ হইয়া একে একে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; তন্মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান একজন অনুচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আগে এমন জানিলে কাগজ খানি এবং পেন্সিলটা আমিই তুলিয়া দিতাম।"

অনন্তর বাবু দুখুকে বলিলেন, "দুখু, আজ তুমি যাও; বাড়ীতে চাকুরীর সংবাদ দিয়া শীঘ্রই আসিবে, এবং দেওয়ানজির নিকট কায কর্ম্ম শিক্ষা করিবে। দেওয়ান যে দিন বলিবে তুমি নায়েবীর উপযুক্ত হইয়াছ, সেই দিনই তোমাকে হরিহরপুরে পাঠাইব।" দুখু ভূমিষ্ঠ হইয়া বাবুর পদবন্দনা করিল, এবং আনন্দে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী চলিল।

আজ আশ্বিন মাস, দুর্গোৎসবের সপ্তমী, বঙ্গদেশ উৎসবে পূর্ণ; কিন্তু জয়কালীপুরের এক খানি বাড়ীতে যেন সমস্ত বঙ্গদেশের আনন্দ আজ একত্রীভূত। রাশি রাশি নৈবেদ্য, রাশি রাশি অন্ন, আর রাশি রাশি দ্রব্যে মণ্ডপ পরিপূর্ণ, অন্নসত্রের জন্য লোকে প্রতিমারও স্থান হয় না! দেশের বড় দুঃখী

দরিদ্র, যত অনাথ শিশু এবং অনাথা স্ত্রীলোক, আজ সকলেই এখানে উপস্থিত—সকলেই পেট ভরিয়া খাইতেছে, আর নূতন কাপড় পরিতেছে, আজ তাহাদের কি সুখ! বাড়ীর কর্ত্তা—পরিচ্ছদ দেখিলে বোধ হয় যেন বাড়ীর চাকর—অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, অভুক্ত দেখিলেই আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন, মলিন বেশ দেখিলেই নূতন কাপড় দিতেছেন; জগজ্জননীর দ্বারে আসিয়া কেহ অন্ন-বস্ত্রের কষ্টে না থাকে, এই তাঁহার সঙ্কল্প। অন্ন এবং বস্ত্রই তাঁহার পূজার প্রধান খরচ। সমস্ত দিন তিনি অন্ন-বস্ত্র বিলাইয়া বেড়ান, আর রাত্রিতে সকলে চলিয়া গেলে মণ্ডপে বসিয়া মার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে থাকেন, এই তাঁহার পূজা। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন, ইনিই দুখুরাম দাস। দুখু নায়েবী পাইয়া প্রথমেই জীবন দাসের টাকা ১০টি পরিশোধ করেন, তাহার পরে সংসারের খরচ পত্র চালাইয়া রামনারায়ণ বাবুর পরামর্শে যাদুকে ইংরাজী পড়ান; যাদু এখন বাবু যাদবচন্দ্র দাস, জজের উকীল। উকীলের টাকা আর জালের মাছ, অভাব নাই, খরচেও দুঃখ নাই। যাদু যাহা উপার্জ্জন করেন, সে সমস্তই দুখুর হাতে দেন। দুখু হরিহরপুরে অনেক আয় বাড়াইয়াছেন। বাবু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুখু তাহাতে সম্মত হন নাই, অথচ প্রভুদের মমতা ছাড়িয়া তিনি অন্য মহালেও যাইতে পারেন নাই। যাদুর জন্য এখন তাঁহার অর্থের অভাব নাই, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু খরচ পত্র করিতে এখনও রামনারায়ণ বাবুর পরামর্শ এবং অনুমতি না হইলে চলে না।

সপ্তমীর রাত্রি আসিয়াছে, দুঃখী-দরিদ্রেরা উদর পূরিয়া খাইয়া এবং নববস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আপন আপন বাটীতে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুখুর পরিবারের মধ্যে কেহ এ পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করেন নাই। দুখুর নিয়ম, তাঁহার বাড়ীতে যে কোন ব্যাপার হউক, রামনারায়ণ বাবু তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পা না ধুইলে তিনি জল গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং বাড়ীর সকলে উপবাসী।

অনেক রাত্রি পরে রামনারায়ণ বাবুর পাল্কী আসিয়া নামিলে দুখু যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিল, "আপনিত জানেন, যে চরণ-প্রসাদে আজ জগজ্জননীর চরণদর্শন করিতেছি; এ বাড়ীতে সে চরণ প্রক্ষালিত না হইলে দুখু কোন ব্যাপারেই জল গ্রহণ করে না, তবু সে কথা ভুলিয়া থাকেন কেন?" রামনারায়ণ বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমার স্নেহ ত আছেই; কাযে কর্ম্মে একদিন আসিতে যদি বিলম্ব হয়, তবে জল খাওয়াতে দোষ কি আছে?"

দুখু দৃঢ়তার সহিত বলিল, "এক দিনও ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর এই নিয়মই চলিবে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দুখুর বংশে এমন কুবংশ কেহ কখন না জন্মে, যে আমার প্রতি আপনার কৃপার কথা মুক্তকণ্ঠে লোকের নিকট ঘোষণা করিতে গৌরব বোধ না করিয়া লজ্জিত হইবে।"

দুখুর এভাব যে দেখিত এবং এ সকল কথা যে শুনিত, তাহারই চক্ষুঃ আর্দ্র হইত, তবে রামনারায়ণ বাবুর মনে কি ভাব হইত, তাহা তিনিই জানেন ;—যে কখনও তাঁহার মত কাষ করে নাই, সে তাঁহার মনের সে ভাব কেমন করিয়া বুঝিবে ?

লক্ষ্মীর কথা।

(৩)

যঃ সম্বিভাগী প্রিয়-বাক্য-ভাষী
বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়-দর্শনশ্চ।
অল্প-প্রলাপী ন চ দীর্ঘসূত্রী
তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি॥

যে পুরুষ কার্য্য ও অকার্য্য বুঝিয়া চলে অর্থাৎ ইহা আমার কার্য্য, উহা আমার অকার্য্য, ইহা সাধন ও পরিহার করিতে হইলে আমার দাস-দাসী, আত্মীয় আশ্রিত স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির এইরূপ করা উচিত, এইরূপ করা অন্যায় ইত্যাদি সকল বিষয়ে যে নিজের এবং নিজের আশ্রিতদিগের কার্য্যাকার্য্য বিভাগ করিতে পারে; যে প্রিয় বাক্য বলে, অর্থাৎ সত্য অথচ অপ্রিয় এমন কথা বলিবার সময়েও যে বুদ্ধি-বলে অপ্রিয় সত্য, কথাকে প্রিয় করিয়া বলিতে পারে; যে বৃদ্ধের সেবা করে, অর্থাৎ যাঁহারা নিজের বহুদর্শিতা, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতিতে প্রধান ব্যক্তি, তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিয়া থাকে; আর যে প্রিয়-দর্শন, অল্প-প্রলাপী ও অদীর্ঘসূত্রী, সেই পুরুষে আমি (লক্ষ্মী) সর্ব্বদা বাস করি।

কার্য্যাকার্য্য-সম্বন্ধে নিজের এবং আশ্রিতদিগের বিষয়-ভেদে যাহা কর্ত্তব্য বা যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা বুঝিয়া যে বিভাগ করিতে জানে, তাহার অকারণে কোন বিষয়ে ক্ষতি হয় না, এবং সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে স্ব স্ব দায়িত্ব বুঝিতে পারে বলিয়া কর্ত্তব্যে ত্রুটি এবং আশ্রিতদিগের অসন্তুষ্টি হইতে পারে না। বিবাদ-বিসম্বাদ বা অন্য কোন রূপ অশান্তি তাহার সংসারের প্রবেশ করিতে পারে না। আজ কাল বঙ্গের ঘরে ঘরে ভ্রাতৃ-বিরোধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিবাহিত দুই বা ততোঽধিক ভ্রাতা যেখানে বয়ঃপ্রাপ্ত সেখানে একতার বন্ধন হয় শিথিল, না হয় ছিন্ন। সহোদরের গায়ে ধুলা লাগিলে, মুখে রৌদ্র লাগিলে যে জ্যেষ্ঠের হৃদয় গলিয়া যাইত, জ্যেষ্ঠের কষ্ট যে কনিষ্ঠ কল্পনাতেও আনিতে অধীর হইয়া উঠিত, সেই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠে বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছে, দেখিয়া কে ভ্রাতার উপর দোষারোপ করিতে সমর্থ হয়? অবলা অন্তঃপুর-চারিণী নব-বধূর পতি-সৌভাগ্যে যাঁহাদিগের গাত্র-দাহ

উপস্থিত হয়, সেই সকল মহাপুরুষগণ সর্ব্বাগ্রে বধূর স্কন্ধে সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া সর্ব্বত্র গাহিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেও আমাদের কিছু বলিতে হইত না; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের হিতকারী, অথচ নিঃস্বার্থ, তাঁহারা পর্য্যন্ত অন্যতর বধূর দোষ উল্লেখ করিয়া ভ্রাতৃ-বিরোধকে আসন প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, বধূ যদি নীচ কুলোৎপন্না, নীচসংসর্গে পালিতা, সুশিক্ষায় বঞ্চিতা,বা বুদ্ধিহীনা হয়, তাহা হইলে, তাহার কুফল পতিগৃহে ফলিয়া থাকে। কথা অসত্য না হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। নীচকুলে বধূর জন্ম হইলে তাহার মন্দতা প্রায়িক বলা যাইতে পারে; কিন্তু সে যে নীচই হইবে, তাহার কোনও হেতু নাই। তবে পিতৃগৃহে সে যেরূপ আচরণ দেখিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ ইহা বুঝিবার শক্তি সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পতি গৃহে প্রবেশ করিতে হয়; তখন লজ্জা, ভয় প্রভৃতিকে সে অবশ্য পিতৃ-গৃহে রাখিয়া আইসে না। পতি-গৃহের আচরণ রীতিনীতিতে তখন সে শিক্ষা পাইতে থাকে। নিজত্ব ত্যাগ করিয়া পতি-কুলের প্রীতিসাধনে সাধ্যানুসারে সে যত্ন করে। ইহাই রমনীর স্বভাব। কিন্তু সে যদি পতি-গৃহে পদার্পণের সঙ্গেই অবমানিত লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত হইতেথাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক বুদ্ধি তাহার থাকে না, ঐ সকল আচরণের অনুরূপ কার্য্য সে শিক্ষা করে।

পিতৃ-গৃহে অভ্যস্ত কোন দূষণীয় আচরণ পতি-গৃহে ও যদি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে নব-বধূর স্থায় অঙ্গেও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। আর পিতৃগৃহের দূষণীয় আচরণের বীজ যদি নীচ কুলোৎপন্না নববধূর হৃদয়ে উপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু শ্বশুর-কুলে প্রবেশ করিয়া যদি বৃষ্টি, বাতাস প্রভৃতি বীজোদ্ভেদানুকূল কারণনিচয়ের সাহায্য না পায়, তাহা হইলে সৎশিক্ষা বা সদাচরণের খরতাপে উপ্ত বীজ ভস্মে পরিণত হইতে কত বিলম্ব লাগে? এই জন্য আমরা বলি কুপিতা মাতার কন্যা অসৎ সংসর্গে পালিতা হইলেও সর্ব্বত্র মন্দ হইতে পারে না, যদি সে মন্দ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার শ্বশুর কুল মন্দতার জন্য প্রসিদ্ধ না হইলেও উৎকর্ষের জন্য প্রশংসনীয় নহে।

চুরি, ডাকাতী, দাঙ্গাবাজী, নরঘাতকতা-বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মও অনেকে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির জন্য করিয়া থাকে। তাহারা দুষ্কর্ম্ম করে বলিয়াই যে, নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির উন্নতি বা প্রশংসার আশা ত্যাগ করে, এমন বোধ হয় না। কুপিতামাতা কন্যার আশা মায়া, মমতা, ত্যাগ করিয়া তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া তাহাকে যে কুশিক্ষাই প্রকৃত প্রস্তাবে দিতে পারে, ইহাও বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কোন হেতু দেখা যায় না। দেশীয় রমণীগণ পিতৃগৃহে চৈতন্য পায়, পতি গৃহে আসিয়া বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইলে তাহাদের হিতাহিত বোধ জন্মে। কন্যার বিবাহ-দানের বিধির ইহাও একটী উপাদেয় ফল। বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ হইয়া গেলে—কোন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া

উঠিলে তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইয়া উঠে, বিশেষতঃ কন্যাকে কিরূপ সংসারে পতিত হইতে হইবে, তাহা জানা যায় না, কাযেই তাহাদের অনুরূপ আচরণ করিতে সে সমর্থ হইবে কিনা, সে বিষয়েও সম্পূর্ণ সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যদি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পূর্ব্বে সে পাত্রস্থা হয়, তাহা হইলে শ্বশুর-কুলের অনুরূপ জ্ঞান-লাভে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। যাহা-দিগের আশ্রয়ে জীবনকে সুখময় করিয়া লইতে হইবে, তাহাদিগের সঙ্গে যাহার মতান্তর উপস্থিত হয়, সে যেমন সুখী হইতে পায় না, সেইরূপ অন্যেও সে সংসারে সুখী হইতে পারে না। অতএব কন্যার বিবাহ-বিধি আমাদের যেমন হিতকর, সেইরূপ সে বিধি লঙ্ঘন করিলে, অর্থাৎ কন্যার জননী হইতে পারে, এরূপ বয়সে বিবাহ দিলে সে সুখে নৈরাশ্যের সম্ভাবনাই সমধিক।

বুদ্ধি-হীনতা স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই কষ্ট, অনিষ্ট, ক্ষতি এবং নিন্দার হেতু। কিন্তু সে জন্য কন্যার পিতা মাতা সর্ব্বথা দোষী নহে, তাহা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল।

বধূকে মন্দ করিতে হিংসা-দ্বেষ-পরায়ণা শ্বাশুড়ী বা তৎস্থানীয়া রমণী দিগের সুবিধা অল্প নহে, তাহারা সত্য বা মিথ্যা করিয়া অপরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া স্বার্থ-সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিয়া বধূকে প্রস্তুত করে। গম্ভীর-প্রকৃতি দুষ্টরমণীর দুরভি-সন্ধি ভেদ করা নববধূর কেন, অচিরাগত কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহারা বধূকে জালে ফেলিয়া তাহার স্বামীকে তাহাদ্বারা প্রতারিত করিয়া সংসার-সুখ নষ্ট করিয়া দেয়।

অধিকাংশ স্থলে রমণীর দোষ পুরুষের অপরিণাম-দর্শিতার জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। অজ্ঞাত-হৃদয়ে আত্ম-সমর্পণের ন্যায় ভয়ানক দোষ আর নাই। অনেক অসংযত পুরুষ স্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনা-শিক্ষা-স্বভাবাদির কোন তত্ত্ব না জানিয়াই তাহার নিকট নিজের দুঃখকাহিনী, মাতা পিতার অন্যায় আচরণ, জ্যেষ্ঠাদির বিরুদ্ধব্যবহারের উল্লেখ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিতে পারেন না যে, ইহাতে তাঁহাদের দুঃখের হ্রাস হইবে কি বৃদ্ধি হইবে। ফলে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রকারান্তরে নববধূকে অভিভাবকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইতে অভয় দান কেন, উপদেশই দেওয়া হয়। ইহা হইতে শান্তি-ভঙ্গ হয় সত্য, কিন্তু ইহাকি বধূর দোষ না পুরুষের অসম্বিভাগিতার ফল? সংসারে যিনি প্রধান, তাঁহার প্রধান গুণের অভাবেও বরং একতা রক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু তিনি প্রধান দোষের আশ্রয় হইলে সংসারে শ্মশানে অধিক দিন পার্থক্য থাকে না। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবের জন্য মনুষ্য অন্যায় আচরণ করে, এবং অধীন জনগণকে বিপথে চালায়। সুখের কর্ত্তা যিনি, হর্ত্তা ও তিনি, অন্যে সুখ দুঃখের উপলক্ষ মাত্র। অতএব সম্বিভাগশীলতা মানবমাত্রেরই সুখের হেতু। অসম্বিভাগশীলতা মূর্খত্বের একটী পরিস্ফুট চিহ্ন। গুরু-লঘু-বিচার, যোগ্যতা-বিচার, পরিণাম-চিন্তা, পরার্থপরতা ব্যতীত সম্বিভাগশীলতার অভিব্যক্তি

হইতে পারে না। বলিরাজা শত মূর্খ লইয়া স্বর্গে যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এইযে, মূর্খ-সমাবেশে স্বর্গেরও স্বর্গত্ব থাকিতে পারে না, আবার পণ্ডিত-সন্নিধানে কুস্থান ও স্বর্গ-তুল্য হইতে পারে। অতুল সুখের নিধান স্বর্গ ও যখন মূর্খ-সমাবেশে অসুখের আকর হইতে পারে, তখন মানবের সংসারেও মূর্খের নিকট সুখের আশা করা যাইতে পারে না।

মধুর-ভাষিতা লক্ষ্মীলাভের অন্যতম কারণ। একটী বড় লোক জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনায় বড় বিশ্বাস করিতেন, জ্যোতিষী পাইলেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিবার জন্য তিনি লালায়িত হইতেন। ইহার জন্য তাঁহার ব্যয় প্রচুরই হইত। তিনি যে কেবল ধন-সম্পত্তির আধিক্যের জন্য বড় লোক তাহা নহে, তাঁহার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র পর্য্যন্ত নীরোগ শরীরে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার মৃত্যু-গণনাই বৃদ্ধ বয়সে স্পৃহণীয় হইয়া উঠিয়া ছিল। একজন জ্যোতিষী বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার হস্ত দেখিয়া বলিল "আপনি বংশের একটীও থাকিতে মারা যাইবেন না।" আর একজন বলিল "আপনার বড় দুর্ভাগ্য, সমস্ত পরিবারই আপনার চক্ষুর সম্মুখে মরিবে।" ইহারা আশার অনুরূপ অর্থ পাইল না। কিন্তু একজন প্রিয়ভাষী জ্যোতিষী বলিল— "আপনার সৌভাগ্য সামান্য নহে, সর্ব্ব-বিষয়ে আপনার সৌভাগ্য। মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি এমনই আয়ুষ্মান্ যে, সমস্ত পরিবারের মধ্যে আপনার সমান আয়ু কাহারই নাই, সর্ব্বাপেক্ষা আপনি চিরজীবী।" ইহার কথায় বড় লোকটী তুষ্ট হইলেন। কথা কিন্তু সকলেরই একরূপ। মিষ্টকথায় শত্রুও বশীভূত হয়, দুর্ব্বাক্যে স্ত্রী-পুত্রও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে।

বৃদ্ধোপসেবিতা—অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা, অনেক কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ, অনেক কার্য্যে বহুদর্শিতা লাভ হইলে মানুষকে বৃদ্ধ বলা যাইতে পারে। বৃদ্ধের উপদেশ সিদ্ধমন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকর। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে গোময়ের বিষঘ্নতা বর্ণিত আছে, কিন্তু তার আড়ম্বর নাই, আস্ফালন নাই, সে কথার সত্যতা অনেকে উপলব্ধি করিয়াছেন। নব্য ডাক্তারেরা বহু আলোচনার পর ছাগ-বিষ্ঠার বিষঘ্নতা জগতে বিঘোষিত করিলেন, আবার ছয় মাস না যাইতেই তাহার পরিবর্ত্তে অন্য-বিষ্ঠার বিষঘ্নতা কীর্ত্তিত হইল। এইরূপে উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু অব্যবস্থিততা ও নবীনতার জন্য তাহার উপর নির্ভর করাও যেমন কঠিন ব্যাপার, সেইরূপ ফলের আশাও বুদ্ধিমান লোকে করিতে পারে না। তাই বলিয়া তাঁহাদের মতানুসারীর আরোগ্য-লাভ অসম্ভব এ কথা বলিতে পারি না, কারণ সম্বাদপত্রের এবং রক্তবীজ-কুলপাবনদিগের জীবন স্বরূপ বর্ত্তমান পেটেণ্ট ঔষধও অনেকের সর্ব্বনাশকর হইলেও অনেকের রোগ প্রশমন করিতেছে; অবৃদ্ধের উপদেশেও সুফল না হয় এমন নহে, কিন্তু বৃদ্ধের উপদেশে যত দূর সফলতা লাভের আশা আছে, অন্যত্র তাহা নাই।

প্রিয়-দর্শনতা—মানবের লক্ষ্মী-লাভের একটী হেতু। শত্রুও যদি প্রিয়দর্শন হয়, তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। সংযম ব্যতীত কার্ত্তিকের তুল্য পুত্র ও সৌন্দর্য্য বিহীন হইয়া উঠেন। লাবণ্য সংযমেরই ফল। আকৃতি-সৌষ্টব থাকিলেও লাবণ্য-বর্জ্জিত সৌন্দর্য্য চিত্ত কর্ষক হইতে পারে না। শিমুল ফুল বা রাঙ্গা মূলার সহিত সে সৌন্দর্য্য উপমিত হইয়া থাকে। মনও শরীরের পরস্পর অনুবিধানতা আছে, মনের পবিত্রতা না থাকিলে দেহে যথার্থ সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে পারে না। অতএব প্রিয়-দর্শিতা কেবল রূপের অন্তর্ভূত নহে, তাহা মানসিক গুণেরও দ্যোতক। যাহার মন ও শরীর পবিত্র, লক্ষ্মী-লাভ তাহারই ভাগ্যে ঘটে। সংযমশীলতা হইতে প্রিয়দর্শিতা, প্রিয়দর্শিতা হইতে লক্ষ্মী-লাভ হইয়া থাকে।

অল্প-প্রলাপিতা—অনর্থক কথা বলার নাম প্রলাপ। যত অল্প কথা বলাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহাই কর্ত্তব্য। শরীর অনিত্য, তাহার বাল্য-যৌবনাদি অবস্থা ততোধিক অনিত্য। শরীর অনিত্য হইলেও উহার দৃঢ়তাও দীর্ঘকাল-স্থায়িতা থাকিলে উহার সাহায্যে অনেক সৎকর্ম্ম সাধন এবং অনেক দীর্ঘকাল-স্থায়ী গুণ সঞ্চয় করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন শরীর দিয়া মানুষের বহুবিধ কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে। অতএব শরীরের প্রতি ঔদাসীন্য হিতকর নহে। কিন্তু তাহার আবশ্যিক ভাবের সংরক্ষণের জন্য সময় নষ্ট করা এবং বাক্য-ব্যয় করা মূঢ়তার কর্ম্ম।

যে কথায় কোন সুফলের আশা নাই, সেরূপ কথা যত অল্প ব্যবহার করা যাইতে পারে, ততই লক্ষ্মীর কৃপা-পাত্র হওয়া যায়। যে সকল কথায় স্বার্থের জন্য পরার্থ-নাশ ঘটাইতে পারে, তাহা দ্বারা অন্যকেও স্বার্থপর হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কালে অন্যে যখন সুবিধা পাইবে, তখন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পরার্থকে পদ-দলিত করিবে। নিজ ভিন্ন সকলেই পর শব্দের বাচ্য সুতরাং যিনি স্বার্থ-পরতার গুরু, তাঁহার স্বার্থ-হানিও নিশ্চয় হইবে। অনর্থক অধিক কথা যে বলে, সে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, এবং অনেক সময়ে অকারণে অন্যের মনে কষ্ট দিয়া থাকে। অথচ তাহার কোন লাভ নাই, বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহারও নিজের সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। কথা বলিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে অন্যের মনে কষ্ট হইবে কি না, এবং ইহাতে কোন স্বার্থ আছে কি না। নিজের লাভ থাকিলেও পরের মনে কষ্ট দায়ক বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কথা একবার বাহির হইয়া গেলে, তাহা আর প্রতিসংহৃত হয় না, সুতরাং বলিবার পূর্ব্বেই বাচ্যাবাচ্য স্থির করা কর্ত্তব্য।

কুঠারাঘাতে বৃক্ষাদি ছেদন করিলে তাহা পুনরায় সংরূঢ় হইতে পারে, হলদ্বারা ভূমি-কর্ষণ করিলে পুনরায় তাহার সমতা সঞ্জাত হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বাক্যরূপ তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করিলে সে ক্ষত জীবিত-কালের মধ্যে আর রূঢ় হয় না। অনর্থক বাক্য দুই প্রকার—এক প্রকার

বাক্যে পর-পীড়া দিতে পারে না, আর এক প্রকার বাক্যে পরের মর্ম্ম দগ্ধ করিয়া দেয়। এই দুই প্রকার বাক্যই প্রলাপের অন্তর্ভূত। লক্ষ্মীর কৃপাভিলাষী নর-নারীর এরূপ কথা ব্যবহার্য্য নহে।

অদীর্ঘ-সূত্রিতা—শুভ কর্ম্মে দীর্ঘ সূত্রিতার অনেক দোষ। দান করিতে হইবে, অথচ গ্রহীতাকে অনেক প্রকার কষ্ট দিতে হইবে, এরূপ দান প্রশংসনীয় নহে। পরের উপকার, নিজের হিতসাধন, দয়া ধর্ম্মাদি বিষয়ে শক্তির অনুরূপ কর্ত্তব্যে দীর্ঘসূত্রিতা বহু দোষের আকর। এই সকল মহাবাক্যের প্রাকৃত প্রবাদ বোধ হয় "দাতা হ'তে কৃপণ ভাল, তুরুক জবাব দেয়।" সৎ কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রিতা যেমন দোষাবহ, সেইরূপ অপকর্ম্মে অদীর্ঘ-সূত্রিতার দোষও অল্প নহে। ক্রোধ হইয়াছে, দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ বা অন্য কোন রূপে দোষীর অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্তি হইলে সেখানে দীর্ঘসূত্রিতা প্রশংসনীয়। মহাভারত-পাঠক জানেন, চির-কারীর পিতৃ আজ্ঞা পালনে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে সে মাতৃহত্যা মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল। তাহার পিতার ক্রোধ-শান্তি হইলেই তিনি সে আদেশ প্রত্যাহার করেন। সুতরাং পিতৃআজ্ঞায় অনাদর ও মাতৃবধ, এই দুই পাপই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—

"রাগে দ্বেষে চ কামে চ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি।
অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যে দীর্ঘসূত্রশ্চ শস্যতে॥"

রাগ, দ্বেষ, কাম, দ্রোহ, পাপকর্ম্ম ও অপ্রিয় কর্ত্তব্যে দীর্ঘসূত্রিতা প্রশস্ত। মন্দ কায বিলম্বে করিবার উপদেশ হইতে এই তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হয় যে, যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মন্দ কায করা যাইবে, বিলম্বে সেই প্রবৃত্তির দমন অসম্ভব নহে, সুতরাং মন্দ কাযের ইহা প্রতিষেধক।

মথুস্বামী।

ভারত ভূমি একে একে তাঁহার সুসন্তান গুলি হারাইতেছেন। যেমনটী যাইতেছে, তেমনটি আর হইতেছে না। এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যাঁহার নাম প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি ভারতমাতার ঐরূপ একটী সুসন্তান ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশে সুপরিচিত না থাকিতেপারেন, কিন্তু ইহাঁর গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত, ইহাঁর মহচ্চরিত্র অতি উচ্চ শিক্ষাপ্রদ। দরিদ্র সন্তান স্বীয় প্রতিভা ও উন্নত চরিত্র বলে যে কতদূর উন্নত পদলাভ করিতে পারে, অন্ধতমসাচ্ছন্ন সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে সৎসঙ্কল্প চালিত অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে যে কিরূপে তাহার উত্তুঙ্গ শিখরাগ্রে উত্থিত হইতে পারাযায়, ইহার জীবনী তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেয়। আমরা ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্ত এস্থানে প্রকটিত করিতেছি।

১৭৫৩ শাখুকাব্দার মাঘমাসে দাক্ষিণাত্য ভূভাগেস্থ তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বুচুবাদী গ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম বেঙ্কট নারায়ণ শাস্ত্রীয়ার, ইহার মাতা এক সম্পন্ন ভূস্বামীর কন্যা ছিলেন। ইনি অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে ইহাঁর পিতা চক্ষুরত্ন হইতে বঞ্চিত হন, এবং সংসার প্রতি পালনের দুর্ব্বহ ভার ইহাঁর ও ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্কন্ধে পতিত হয়।

মথুস্বামীর মাতা সামান্যা রমণী ছিলেন না। সন্তান-দ্বয় উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ভবিষ্যতে প্রতিপত্তি লাভ করে, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তাই তিনি সন্তানদ্বয়ের শিক্ষার সুবিধা হইবে ভাবিয়া তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত তিরুবরুর নগরে উঠিয়াযান। তাঁহার যত্ন ও তত্ত্বাবধানে মথুস্বামী তামিল ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া তালুকের হিসাব রক্ষকের আফিষে কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যখন ইহাঁর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন ইহাঁর পরম স্নেহময়ী মাতা পরলোক গমন করেন, এবং সংসার প্রতিপালনের সমগ্র ভার ইহাঁর উপর পতিত হয়। তখন ইহাঁকে বাধ্য হইয়া সহকারি হিসাব রক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে হয়। চাকুরি অবলম্বন করিলেও তিনি জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার মাতা কর্ত্তৃক যে শিক্ষানুরাগ ও ভবিষ্যতে প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয়, তাহার ফলে ইনি অবসর পাইলেই অধ্যয়নাদি দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতেন। সৌভাগ্য ক্রমে দুই বৎসর পরে সার হেন্‌রি মণ্টগমরি মহোদয়ের প্রিয়পাত্র মথুস্বামী নায়েব তালুকদার নিযুক্ত হইয়া আইসেন এবং মথুস্বামী আয়ারের প্রখর প্রতিভা ও শিক্ষানুরাগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তালুকদার মথুস্বামী নায়ক তখন মথুস্বামী আয়ারকে চাকুরীত্যাগ করিয়া শিক্ষোন্নতির চেষ্টা করিবার পরামর্শ দেন ও

তাঁহাকে নাগাপত্তনের মিশনস্কুলে ভর্ত্তি করেন। আয়ার এই বিদ্যালয়ে এক বৎসর কাল ইংরাজী শিখিয়া মান্দ্রাজের উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সার হেন্‌রী মণ্টগমরি আয়ারের শিক্ষোন্নতির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন ও তাঁহার শিক্ষার সাহায্য করিতেন। তাঞ্জোরের কালেক্টর মিষ্টার বিশপ, সার্ টী মাধবরাও হরিরাও প্রভৃতি মহোদয় গণও ইহাঁর পঠদশায় সময়ে সময়ে সাহায্য করিতেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজের উচ্চশ্রেণী বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হয়। সেই বৎসরেই তিনি প্রশংসার সহিত বিদ্যালয়ে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং লর্ডএলফিন্‌ষ্টোনের নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটি প্রবন্ধের জন্য যে পাঁচশত টাকার পুরস্কার প্রদত্ত হয়, তাহাও তিনি প্রাপ্ত হন। এই ইংরাজী প্রবন্ধের ফলে তাঁহার প্রতি পরীক্ষক মিঃ হল্‌ওয়ে এবং মান্দ্রাজ উচ্চশ্রেণী বিদ্যাবুলয়-সমিতির সম্পাদক মিঃ আলেক্‌জেণ্ডার আরবুথনট সাহেবের দৃষ্টি পতিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে বিলাতে গিয়া সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার পরামর্শ দেন, এবং সরকারী গেজেটে তিনি যে কোন কর্ম্মের উপযুক্তবলিয়া মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সমাজ-বন্ধন ছিন্নকরা সম্ভব নহে বিবেচনায় বিলাত যাইতে পারেন নাই, অবশেষে অবস্থা চক্রে তাঁহাকে তাঞ্জোরের কালেক্টরের অধীনে মহাফেজের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর তিনি দেড়শত টাকা বেতনের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টরের পদ প্রাপ্তহন এবং প্রশংসার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করায় ইনস্‌পেক্টর ও ডিরেক্টর প্রভৃতি উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন। ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টারের কার্য্য করিতে করিতেই তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফের পদ-লাভ করেন।

ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফের কার্য্য তিনি অতিশয় সুখ্যাতির সহিত কয়েক বর্ষ নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী এত সুন্দর ছিল যে তাহা দেখিয়া জেলার সিবিল ও সেসন জজ মিঃ বোক্যাম্প আপনা হইতেই বলিয়াছিলেন মথুস্বামী তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া সিবিল ও সেসন জজের কার্য্য করিবার উপযুক্ত। অতঃপর ইনাম কমিসন নিযুক্ত হইলে তিনি ঐ কমিসনের মিঃ জর্জ্জ নেবেল্ টেলর সাহেবের সহকারীর কার্য্য সম্পাদন করেন।

গবর্ণমেণ্ট মথুস্বামীর কার্য্য-দক্ষতায় এতদূর প্রীত হইলেন যে, অতঃপর তাঁহাকে তাঁহার নিজ জেলারই দুইটী তালুক বা মহকুমার ভার দিয়া ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন। এরূপ সম্মান ও গুরুতর কার্য্য-ভার কচিৎ কাহাকেও অর্পিত হয়। এই বিষমভারও বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বহন করিলে পর তিনি প্রধান সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হন। পরে ক্রমে ক্রমে মান্দ্রাজ সহরের প্রথম পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হন। অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁকে জেলার জজের পদে নিযুক্ত করিবার কথা উঠে। ঐ বর্ষে দেশীয় গণের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া কয়েকজনকে সিবিলসার্বিসে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। এসম্বন্ধে নিয়মাবলী

প্রকাশিত হইবা মাত্র তিনি ডিষ্ট্রীক্ট জজের পদে নিযুক্ত হন। মহারাণী ভারতেশ্বরীর উপাধি ঘোষণার সময় তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া দিল্লী দরবারে গিয়াছিলেন।

১৮৭৩ অব্দে তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজের পদে উন্নীত হন। ১৮৯১ অব্দে হাইকোর্টের চিফ্‌জষ্টিস্ বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি সেই সময়ে অল্পকালের জন্য চিফ্‌জষ্টিসের কার্য্যও সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবৎসর তিনি মহারাণীর নিকট হইতে কে, সি, আই, ই, এই উপাধি পান। দ্বাবিংশ-বৎসর মান্দ্রাজ প্রদেশের উচ্চতম বিচারালয়ের ধর্ম্মাসন এইরূপে অলঙ্কৃত করিয়া আজ মথুস্বামী কাল-শয্যায় শয়ান। মথুস্বামীর পাঞ্চভৌতিক নশ্বরদেহ আজ বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহিমা জগতে বিঘোষিত হইতেছে, ভবিষ্যতে তাঁহার স্মৃতি আবাল বৃদ্ধ সকলকেই কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করিবে।

কেবল বিদ্যা, কেবল ধন-সম্পত্তি-বলে কেহ মহিমান্বিত হইতে পারেন না। পরম জ্ঞানী নরপিশাচ হইতে পারে, মহাধনী নারকী হইতে পারে, মহাকবি ঘৃণিত চরিত্র হইতে পারে। যে সকল গুণের সমাবেশে লোকে মহিমান্বিত হইতে পারে, মথুস্বামী সেই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন। ইহাঁর মত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ব্যক্তি অতি বিরল। হাইকোর্টের জজগণের মুখে, সরকারী গেজেটে, সাধারণের মুখে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মুখে কেবলই তাঁহার চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা ঘোষিত হইতেছে। তাঁহার গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতা, বহুদর্শিতা, কষ্টসহতা, সহিষ্ণুতা অপক্ষপাত, নানাবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মভীরুতা অনভিমান, সারল্য, অমায়িকতা কি ধনী কি নির্ধন, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, সকলেরই অনুকরণীয়। ইহাঁর মত মনের বল কয়জনের আছে? ইনি হাইকোর্টে বিচারাসনে বসিয়া, ইউরোপীয় মহামতি জজগণের পার্শ্বে থাকিয়াও জুতা খুলিয়া বসিতে লজ্জিত হইতেন না, আর আমরা রেলগাড়ীতে যাইতে সাহেবী পরিচ্ছদের আশ্রয় লই; জাতীয় সমিতিতে যাইবার আগে হ্যাট্ কোট্ ক্রয় করা অত্যাবশ্যক মনে করি; প্রয়োজন বা অভ্যাস না থাকিলেও সভ্যতা ফলাইবার অনুরোধে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া ভোজনাসনে উপবিষ্ট হই! মথুস্বামী বলিতেন—"চর্ম্মসংস্পর্শে দেহ ও মনের যেন কেমন একটা অপবিত্রতা বোধ হয় এবং উহাতে আদালতেরও যেন অমর্য্যাদা হয়। ইহার পর বোধ হয় আর বলিতে হইবেনা যে, মথুস্বামী পোষাক পরিচ্ছদাদি সকল বিষয়েই দেশীয় রীতির অনুসরণ করিতেন।

মথুস্বামী যে যে গুণে সহকারী হিসাবরক্ষক বা কালেক্টরীর মহাফেজ হইতে সর্ব্বোচ্চ পদলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের শিক্ষক ও ছাত্র পাঠকগণ একবার আলোচনা করিয়া দেখেন, এই অনুরোধ করিয়া এস্থলে আমরা মথুস্বামীর এই সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তের উপসংহার করিলাম।

—:০:—

শিক্ষা-সংবাদ।

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন প্রস্তাব। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত রণদে বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় যদি কোন পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে শত করা ৪৫ সংখ্যা রাখিয়া অন্য কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্যতার জন্য উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় পরীক্ষা প্রদান করিবার সময়ে যে বিষয়ে প্রাগুক্ত সংখ্যা পাইয়াছে, সেই বিষয়ে যেন তাহাকে পরীক্ষা না দিতে হয়। এই নিয়মে যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা কোন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারিবে না। নিজের প্রস্তাব সমর্থন কালে তিনি বলিয়াছেন, ছাত্রদিগের পরিশ্রম লাঘবের জন্য এরূপ নিয়ম করা উচিত ; বোম্বে এবং অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে এ নিয়ম প্রচলিত আছে ; দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়া যাহারা অনুত্তীর্ণ হয়, এই নিয়ম থাকাতে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ জন উত্তীর্ণ হইতে পারে না ; যে কোন বিষয়ে ছাত্রের শতকরা ৪৫ সংখ্যা রাখিবার নিয়মই যথেষ্ট ; বর্ত্তমান প্রণালী ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে এবং মুখস্থ করিবার শক্তি খাটাতেই পরীক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দেয়, সুতরাং পরীক্ষা প্রণালী প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে ; কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাব গৃহীত হইলে ছাত্রদিগের শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার স্বাস্থ্যই উন্নত হইবে। শ্রীযুক্ত রণদে বাহাদুর যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সঙ্গত। ভারতের এবং ইউরোপের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এই নিয়ম প্রচলিত আছে, তবে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সাধারণ বিভাগ এ নিয়ম হইতে বঞ্চিত থাকে কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক রণদে বাহাদুর বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহার আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা আশা করি এই ন্যায়সঙ্গত এবং হিতকর প্রস্তাব ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই এক সময়ে গৃহীত হইবে।

সভ্যতার নবতরঙ্গ। বিলাতে "জগতের স্ত্রী জাতির খ্রীষ্টীয় মাদক-সেবন-নিবারিণী সভা" নামে এক সভা আছে, বিবি উইলার্ড তাহার সভাপত্নী। ইনি উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, মনুষ্য সমাজ হইতে পশু সমাজের পার্থক্য রাখিতে ইঁহার আর বাসনা নাই। ইনি নাকি একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মনুষ্য ভাষার অভিধান হইতে "জারজ সন্তান" কথাটি উঠাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ ঈশ্বরের বিধান ব্যতীত সন্তান জন্মিতে পারে না। এই "সুবুদ্ধিনী" ইংরাজ-রমণী যে সভাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন, সেই সভারই যত্নে নাকি কতকগুলি রমণী ভারতীয় নারীদিগের দুঃখের বন্ধন ঘুচাইবার জন্য ভারতে শুভাগমন করিতেছেন। ইঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ভারতের পুরুষ-রমণী সকলেই ধান্য-দূর্ব্বা এবং ফুল-চন্দন হাতে লইয়া প্রস্তুত থাকুন।

—০:০:০—

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

অষ্টম অধ্যায়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুইটী বিষয় বিশেষ চিন্তনীয়; ১ম বিদেশীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্য, এবং ২য়, এই সকল বিদ্যালয়ের স্থাপন এবং তত্ত্বাবধানের প্রণালী। সর্ব্বাগ্রে প্রথম বিষয়টীই দেখা যাউক।

রিয়েলস্কুল এবং জিমনাসিয়মের মধ্যে যে সংঘর্ষ, প্রাচীন ভাষাধ্যয়নের পক্ষপাতিগণ এবং আধুনিক প্রণালীর সমর্থকদিগের মধ্যে যে মতভেদ, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বল দ্বারাই হউক অথবা যুক্তি দ্বারাই হউক, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে পরাজিত করিয়া এখনও এ বিবাদের মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডের শিক্ষা যদিও অনেক বিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী, তথাপি এই বিবাদের প্রকৃত মীমাংসায় তাহার লাভবান্ হইবার সুযোগ উপস্থিত। গ্রন্থকার বিবেচনা করেন, উভয় পক্ষকেই একদেশদর্শিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লোকের মনে অভিনব ভাবের উদয় হইতেছে; যখন এই ভাব পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন সকল বিরোধ ঘুচিয়া যাইবে, এবং তখন উভয় পক্ষই বুঝিতে পারিবেন যে, মূলতঃ তাঁহারা সকলেই ঠিক। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন; কেহ বলেন মানুষকে উৎকৃষ্ট নাগরিক, ধার্ম্মিক অথবা ভদ্রলোক করা, কেহ বলেন তাহাকে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রস্তুত করা, কেহ বা বলেন জীবনের আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যে তাহাকে সমর্থ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য। ফলতঃ এই গুলি কিছুই নহে; আর এগুলি যে কিছুই নহে, বর্ত্তমান সময়ের লোকে তাহা ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে। এই সকলকে বড় জোর শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু আপনাকে এবং জগৎকে চিনিতে মানুষকে সমর্থ করাই শিক্ষার প্রধান এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানই কার্য্যের এক মাত্র দৃঢ় ভিত্তি, এবং এই ভিত্তি নির্ম্মাণ করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য। আপনাকে জানিতে হইলেই মানবাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং তৎসম্পাদিত কার্য্য যে কি, তাহা জানিতে হইবে; প্রাচীন শাস্ত্রের প্রধান উপযোগিতা এই যে, ইহা এতদ্ বিষয়ে আত্মাকে অপূর্ব্ব ভাবে আলোকিত এবং উত্তেজিত করে। যদি কেহ অন্যের আত্মশক্তি এবং কৃতকার্য্যতা অবগত হইয়া তাহার সাহায্যে আপনাকে জানিতে চাহে, তাহা হইলে সে সাইমনিডিসের জন্ম হইতে প্লেটোর মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সমুৎপন্ন গ্রীকসাহিত্য এবং শিল্পের আলোচনায় যত উপকার পাইবে, তত উপকার আর কিছুতেই পাইবে না। যে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রাচীন জগতের মানবাত্মা পরবর্ত্তী বংশের

অমূল্য উপদেশের জন্য শক্তি এবং কার্য্যকারী ভাবের অশেষ পরিচয় দিয়া আসিয়াছে,প্রাগুক্ত দুই শতাব্দী তাহারই কুসুমোদ্গমের কাল।

প্রাচীন শাস্ত্রের পক্ষপাতিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং এই উপলব্ধিই তাঁহাদিগকে সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় রক্ষা করিতেছে। মানবাত্মা বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যে মহাশক্তি প্রচার করিয়াছে, তাহার অবগতিই প্রকৃত জীবন্ত এবং নির্ম্মাপকজ্ঞান, কারণ তদ্দ্বারা আমাদিগের কার্য্যসাধিনী শক্তি সজীব এবং পরিপুষ্ট হয়। আর প্রাচীন রোম এবং গ্রীসের অবস্থা ভালরূপে না জানিলে সে সমস্ত অবগত হইবার অন্য উপায়ও নাই। (১) কিন্তু জগৎ, প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রাকৃতিক মানব-সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাও সজীব এবং নির্ম্মাপক। আধুনিকের দল এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা হইতে বিচ্যুত করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক মনুষ্যই কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং তাহাদেরই সাহায্যে দুইটী পথের অন্যতর অবলম্বন করিয়া জীবন্ত এবং নির্ম্মাপক জ্ঞান লাভ করে; সে দুই পথের একটী মনুষ্য এবং তাহার কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ, অপরটী প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্যের অধ্যয়ন। এই সকল শক্তিকে বুঝিয়া লওয়া এবং তাহাদিগের বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে সকল মহাত্মার এই উভয় পথে চলিবার সমগ্র শক্তি আছে, তাঁহারা অতি দুর্লভ। কিন্তু সে সকল শক্তি কি কি, তাহাদিগের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ, প্রকৃত ভাবে তাহাদের পরিকর্ষণ করিলে তাহারা সকলেই কিরূপে জীবন্ত জ্ঞান-লাভে সাহায্য করে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা এবং তাহার অনুকূল উপায় বিধান করা যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত, তবে প্রত্যেকেই উভয় পথের অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিত। যে সময়ে গ্রীক জাতি তত্ত্বান্বেষণে আশ্চর্য্য মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, সে সময় অতীত হইলে তাঁহারা মানব জাতিকে আর একটী অভিনব তত্ত্ব শিখাইলেন; আরিষ্টটল এবং আলেক্জান্দ্রিয়ার মহা মহা পণ্ডিত দিগের ন্যায় মানবের জীবনে তাঁহারা দেখাইলেন, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং তাহাদের মহত্ত্বকত, আর শিক্ষা দ্বারা এক ব্যক্তির মধ্যে ঐ সকল জ্ঞানকে কতদূর সমন্বিত করা যাইতে পারে। ইরাস্মিনিসের মত লোকের কার্য্য দেখিয়া সকলেরই চমৎকৃত হইবার কথা; কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নের সীমা যেরূপ বিস্তৃত ছিল, এবং শিক্ষার যেরূপ উদার ভিত্তির উপরে তাঁহার কার্য্যাবলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়। সাধা-

(১) বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা বিষয়ে প্রাচীনতা এবং আধুনিকতার বিরোধ ভারতবর্ষে পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হইতেছে। এই উভয়েরই কাহার প্রকৃত মূল্য কি, তাহা অবগত হইবার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত; নতুবা শিক্ষা কখনই সফল হইবে না, ভারতের কখনই মঙ্গল হইবে না। একদেশদর্শিতা অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহা অন্ধতার অতি নিকটবর্ত্তী। ইউরোপে লাটিন বা গ্রীকের যে মূল্য, ভারতে সংস্কৃতের সেই মূল্য।

অনুবাদক।

রূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, মানবাত্মার সঙ্গে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি জ্ঞানের কি সম্বন্ধ, তাহা যতই পরিস্কার রূপে বুঝা যাইবে, ততই এই শিক্ষা ছাত্রদিগের মনে, সমগ্র জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতে পারিবে, এবং ততই তাহাদের সর্ব্ববিষয়িণী অজ্ঞতা দূর হইতে থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও, সমগ্র জ্ঞান-বৃত্তের পরিধি এতই বিস্তৃত, আর মানবের শক্তি-নিচয় এতই ক্ষুদ্র যে, একটী অথবা এক জাতীয় কয়েকটী মাত্র শক্তির পরিচালনা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জীবন্ত এবং নির্ম্মাপক জ্ঞানে উপনীত হইতে হইবে, এবং সেই বিস্তীর্ণ পরিধির নির্দ্দিষ্ট বিন্দু লক্ষ্য করিয়া এই সকল শক্তিকে পরিচালিত করিলে তবে সে সমগ্র পরিধি আয়ত্ত করিবার অবস্থায় পৌছিতে পারিবে।

প্রকৃত পক্ষে দেখা যায়, প্রাচীন বা আধুনিক মতের পরিপোষক, কেহই জ্ঞানবৃত্তের সমগ্র পরিধি দেখিতে পান না, সুতরাং যিনি যাহা অধিগত করিতে অক্ষম, তিনি তাহার আদর করিতে জানেন না। প্রাচীন মতের পরিপোষক মনে করেন, কাব্য, মনোবিজ্ঞান এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহাদের সৃষ্টিতে মনুষ্য আত্মশক্তির পরিচয় দিয়াছে, সে সকলের অধ্যয়ন ব্যতীত জীবন্ত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। আধুনিক মতের পরিপোষক মনে করেন, জড়জগৎ অর্থাৎ জড় বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের প্রকৃত নিয়মাদি অবগত না হইলে জীবন্ত জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থকার বলেন, অন্যান্য অনেকের ন্যায় তিনি ও প্রাচীন মতের পরিপোষক, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত পক্ষপাত-দূষিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এই, আধুনিক মতের পরিপোষকগণ যে পর্য্যন্ত জ্ঞান-বৃত্তকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাহিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিপক্ষেরাই প্রবল রহিবে, সমগ্র মানবীয় ব্যাপার-সম্পাদনে তাঁহাদের প্রতিপক্ষগণই জয় লাভ করিবে। তাহার কারণ এই, সাহিত্য-চর্চ্চায় মানবের শক্তি, স্বাধীনতা এবং ক্রিয়াশীলতার অধ্যয়ন সম্পাদিত হয়; আবার প্রকৃতি-চর্চ্চাতে অমানুষিকশক্তি এবং মানবের নিক্রিয়তা ও শক্তি-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবের শক্তি এবং ক্রিয়াশীলতার পর্য্যালোচনায় আমাদের শক্তি এবং ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু মানবের নিক্রিতা এবং শক্তিহীনতার পর্য্যালোচনা তাহাতে বাধা দেয়। এই জন্যই, যাঁহারা প্রাচীন রীতিতে শিক্ষিত, তাঁহারা জড়জগতের সঙ্গে অপরিচিত হইলেও অনেক অসামান্য কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কারণ সেই প্রাচীন প্রণালীর শিক্ষা মানবীয় শক্তিকে তাঁহাদের অন্তঃকরণে অতি প্রবল ভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছে। সাহিত্য এইভাবে চমৎকার ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্য করে; ইহাতে রাজ-মুকুটকে উজ্জ্বল করে, রাজাকে অজেয় করে।

পক্ষান্তরে আবার প্রাচীন মতের পরিপোষকগণ প্রাকৃতিক কার্য্যাবলী ও নিয়মের অজ্ঞতা এবং মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির অভাব বশতঃ মানবীয় কার্য্যে অনেক ক্ষতি সহ্য করেন; আর বর্ত্তমান

সময়ে কেবল প্রাচীন মত লইয়া চলিলে যে ক্ষতি হয় তাহাও অত্যন্ত অধিক। এ সম্বন্ধে ইটালীয়দিগের সহিত একবাক্য হইয়া বলা যাইতে পারে, জ্ঞান-বৃক্ষের কোন অংশই সামান্য অথবা অপবিত্র নহে, কিম্বা কোন অংশই অন্য অংশের উপেক্ষা দ্বারা সেবিত হইবার যোগ্য নহে। প্রাচীন বিদ্যার অধ্যয়ন অপেক্ষা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাধ্যয়নের ফল অধিক। প্রাচীনদিগের ন্যায় আধুনিকেরা তাঁহাদিগের বিদ্যাকে এখনও শিক্ষার তেমন উপযোগী করিতে পারেন নাই, একথার অর্থ এই যে, আধুনিকেরা শিক্ষা-ব্যাপারে কেবল নূতন ব্রতী, উল্‌ক্‌ এবং বট্‌ম্যান্ প্রভৃতি প্রাচীন মতের পরিপোষকগণ আপন আপন অধীত বিষয়ের অধ্যাপনে মানসিক শক্তির যেরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ডেভিস্ এবং ফেরেডে প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেবকগণ সেরূপ করিবার সুযোগ পান নাই। বিদ্যালয়ে লাটিন গ্রীক প্রভৃতির অধ্যাপনের যেরূপ নিয়ম রহিয়াছে, যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাধ্যয়নের জন্য সেইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন তাহার জন্যও মানসিক শক্তির প্রবল প্রয়োগের অবসর উপস্থিত হইবে।

মধ্যযুগের যেসকল বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমান উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের উৎপত্তি, তৎসম্বন্ধে আবেঙ্কারি নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন "সুকুমার সাহিত্যের প্রাচীন অধ্যয়ন-প্রণালী যখন বিলুপ্ত বা অনাদৃত, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়েই বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলির আরম্ভ।" যিশু-খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী পাঁচ শতাব্দীতে খৃষ্টীয় সাহিত্য এবং বাগ্মিতার যে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, ইহাদের স্থাপন-সময়ে সে কাল অতীত হইয়া গিয়াছিল; আবিলার্ড এবং সেণ্টবার্নার্ডের প্রভাবও ইহারা লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত আরও বলেন, "যখন অধ্যয়ন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইল, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেই সময়েই সৃষ্টি।"

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কথা গুলি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৬৭০ খৃষ্টাব্দেও সে কথা গুলি খাটে। এই গ্রন্থে ইতি পূর্ব্বে যে ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে,আধুনিক বিদ্যালয়-সমূহে মধ্যযুগের সংস্কার-প্রভাব হয় প্রবেশই করে নাই, না হয় প্রবেশ করিয়াও স্থির থাকিতে পারে নাই। সময়ে সময়ে যে সকল সংস্কার ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জোড়া তাড়া মাত্র; যিনি যে বিষয়ে দক্ষ ছিলেন, তিনি সময়ে সময়ে সেই বিষয়ের অধ্যাপনে আগ্রহ এবং জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও স্ব স্ব বিষয় ব্যতীত অন্য বিভাগে দৃষ্টিপাত করেন নাই, অথবা মানবাত্মার অভাব বুঝিয়া তদনুসারে শিক্ষাকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই। এই জন্যই ইংলণ্ডের বিদ্যালয়-সমূহে এমন কোন সুনিয়ম নাই, যাহা পরিত্যাগ করিলে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে; ইংলণ্ডের বিদ্যালয়-সমূহ এক্ষণে কেবল কতক গুলি শুষ্ক নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে; কিন্তু আধুনিক মতের পরিপোষকগণ শিক্ষার যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, সে প্রণালী

উদ্ভাবিত হইলে এ সকল শুষ্ক নিয়ম নিশ্চয়ই আসন-চ্যুত হইবে।

ভাবে যতদূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে প্রাগুক্ত প্রণালী শিক্ষার বিষয় এবং উপায়ের উপরে তাহার উদ্দেশ্যের প্রাধান্য স্থাপন করিবে; ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশেষ বিশেষ শক্তির পরিস্ফুরণ দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানে অধিকার লাভ করাই সেই উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই উভয় বিধ জ্ঞানলাভের যন্ত্রবিশেষ; সাহিত্য এবং প্রত্নতত্ত্ব ও উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয় উপায় বিশেষ, কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রণালী যেমন উদ্ভাবিত করিতে হইবে, সেইরূপ বিদ্যালয়ে সাহিত্য এবং প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষা-প্রণালীও আবার নূতনভাবে উদ্ভাবিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রণালীতে ভাষা-তত্ত্বের দীর্ঘকাল ব্যাপিনী আলোচনা প্রত্নতত্ত্বের আত্যন্তিক দোষ ঘটিতে দেয় না।

এ সম্বন্ধে এল্‌বার্টস্ ম্যাগ্‌নসের কথা স্মরণ হয়; তিনি তাঁহার মনোবিজ্ঞানের ভূমিকাতে ন্যায়শাস্ত্রের এরূপ বিস্তৃত ভাবে অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহা অধ্যয়ন করিতেই এক জন ছাত্রের অধ্যয়ন-কাল কাটিয়া যায়। ভাষা-তত্ত্বের উদ্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়ন সমান ভাবে চালাইতে হইলে ছাত্রকে উল্‌ফের ন্যায় শক্তিশালী হইতে হইবে; উল্‌ফ্ শীতল জল-পূর্ণ পাত্রে পদ নিমজ্জিত করিয়া বিশ্রামের জন্য একটী চক্ষু বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং অপর চক্ষুর সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইতেন। উল্‌ফ্ এই উপায়ে বিদ্যালয়ে থাকিতেই গ্রীক এবং লাটিন্ ভাষার সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য, স্কেপুলা-প্রণীত অভিধান এবং ফেবার-কৃত শব্দ-প্রয়োগ-বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হীন্ যখন যে বিষয়ে উপদেশ দিবার উপক্রম করিতেন, তখন উল্‌ফ্ সেই বিদ্যালয়ের পুস্তকালয় হইতে তদ্বিষয়ক সমস্ত পুস্তক লইয়া গিয়া সপ্তাহের মধ্যে তাহা পড়িয়া ফিরাইয়া দিতেন। এইরূপ ছাত্র দুষ্প্রাপ্য; যে ইংলণ্ডে গ্রীক্ এবং লাটিন্ রচনায় এত অধিক সময় ব্যয় হইয়া থাকে, সেখানেও প্রত্যেক দশ জনের মধ্যে এক জন ছাত্র কদাচিৎ ভাষাতত্ত্বের দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানদিগের শক্তিও ভাবের পরিচায়ক প্রত্নতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে।

কিন্তু কেহ কেহ মনকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রত্নতত্ত্বের দ্বার স্বরূপ ভাষাতত্ত্বে অধিকার লাভ করিলেই যথেষ্ট হইল; কেহ বা মনে করেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বার স্বরূপ গণিত-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তত্ত্বজ্ঞান-লাভে মানব-বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, আর প্রকৃত পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান-লাভ, এ উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, গ্রন্থকারের বিবেচনায় এই সকল ব্যক্তি সে প্রভেদ ভালরূপে উপলব্ধি করেন না। প্রকৃত বিষয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান-লাভের উপায়-স্বরূপ যে সকল বিষয় আলোচ্য, সে সকল বিষয়ের

অনুধাবনে মানব-মনকে অতি মাত্রায় ব্যাপৃত রাখিয়া প্রকৃত বিষয়ে অবহেলা করিতে দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ভাষাতত্ত্ব এবং গণিত-শাস্ত্র-বিষয়ে কোন কোন ব্যক্তির শক্তি স্বভাব-সিদ্ধ; উক্ত ব্যক্তিগণ এই সকল শাস্ত্রের দ্বার দিয়াই জীবন্ত জ্ঞান এবং প্রকৃত বোধ-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে স্থলে একজন এই সকল পথে প্রকৃত জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে স্থলে ১০ জন সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস অথবা এক কিম্বা একাধিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভ্যন্তর দিয়া সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অবশ্য, মনের পক্ষে অবিচলিত অভ্যাসের নিতান্ত প্রয়োজন, এবং গণিত ও ব্যাকরণ এই অভ্যাসকে দৃঢ় করিবার উৎকৃষ্ট উপায়; আবার ইউরোপীয় ভাষা-সমুহে লাটিন ভাষার বিস্তৃত অংশ বিদ্যমান ত আছেই, তদ্‌ব্যতীত প্রাগুক্ত অভ্যাসের দৃঢ়ীকরণে উক্ত ভাষার ব্যাকরণের শক্তি অতি চমৎকার। প্রত্যেক ছাত্রের কিছু গণিত এবং কিছু ব্যাকরণ শিক্ষা করিবার পক্ষে এই কারণই যথেষ্ট; কিন্তু তাই বলিয়া যে প্রকৃত বিষয়কে অবহেলা করিয়া তল্লাভের উপায়কেই সর্ব্বস্ব মনে করিতে হইবে, আর সমুদায় শক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল ভাষা-শিক্ষা এবং গণিত-শিক্ষার উপযোগিতাকেই পরিপুষ্ট করিতে হইবে, এমন নহে।

প্রাগুক্ত অভ্যাস-সংগঠনের জন্য এক খানি ৩০ পৃষ্ঠার লাটিন ব্যাকরণ এবং তদনু-রূপ একখানি ক্ষুদ্র পাটীগণিত ও একখানি ক্ষুদ্র জ্যামিতি ছাত্র-সাধারণের অবশ্য-পাঠ্য করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ব্যাকরণ এবং গণিতকে এই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলে বর্ত্তমান প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে অবিচলিত অভ্যাস-লাভ-রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিঃসং-শয়ে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গেলে সকল প্রকার বিদ্যা দ্বারাই মানসিক অবিচলিত অভ্যাস জন্মিতে পারে; আর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইয়া গেলেই যে এ অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহাও নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কেবল ভাষা-তত্ত্বের প্রগাঢ় অধ্যয়ন এবং গ্রীক ও লাটিন রচনার সম্যক্ পরিচালনেই প্রত্নতত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে অধিগত হইতে পারে। তাঁহারা বলেন, কেবল ইহাদিগের সাহায্যেই প্রাচীন গ্রীক এবং লাটিন সাহিত্য প্রকৃতরূপে অব-গত হওয়া সম্ভব। কার্য্যতঃ একথা ঠিক নহে, আর এ কথার অসত্যতা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক ভাষা আর আধুনিক ফরাসী ভাষার ন্যায় কোন উৎকৃষ্ট ভাষা ভাল রূপে জানেন, এমন একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কোন্ ভাষায় তাঁহার অধিকার অধিক। তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, ফরাসী ভাষায় তাঁহার অধিক দখল, কেননা, ফরাসী ভাষাতেই তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ফরাসী ভাষায় এত গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়া যদি তিনি কেবল উক্ত ভাষার অল্প সংখ্যক গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ অধ্যয়ন করিতেন, আর তাঁহার অবশিষ্ট সময় ফরাসী ভাষার রচনা এবং

উক্ত ভাষার বৈয়াকরণিক কঠোর পর্য্যালোচনায় ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তিনি গ্রীক ভাষা যতটা জানেন, ফরাসী ভাষাও ততটাই জানিতে পারিতেন; এরূপ স্থলে তিনি ফরাসী ভাষাতে উৎকৃষ্ট পদাবলীও লিখিতে পারিতেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ফরাসী ভাষায় তাঁহার যতটা অধিকার জন্মিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক অধিকারও জন্মিতে পারিত না। মুর্সোলিটার্ যেমন ফরাসী ভাষাতত্ব এবং ফরাসী সাহিত্য জানিতেন, আর্থার্ হেলাম্ যেমন ইটালীয় ভাষা জানিতেন এবং ইটালীয় ভাষায় কবিতা লিখিতে পারিতেন, উল্‌ফ্ যেমন গ্রীক অভিধান এবং ব্যাকরণ সমায়ত্ত করিয়া সমগ্র গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেরূপ করিতে পারিলে অবশ্যই ভাল। কিন্তু সেরূপ ছাত্র অতি বিরল। ইটালীয় সাহিত্য জানা আর ইটালীয় ভাষায় কবিতা লিখিতে পারা, এ উভয়ের মধ্যে ইটালীয় সাহিত্য জানাই যেমন একজন ইংরেজের পক্ষে ভাল, সেইরূপ গ্রীক সাহিত্য জানা এবং গ্রীক ভাষায় কবিতা লিখা, এ উভয়ের মধ্যে গ্রীক সাহিত্য জানাই তাহার পক্ষে ভাল। কিন্তু গ্রীক ও লাটিন ব্যাকরণ এবং রচনা-শিক্ষায় ছাত্রদিগের এতই সময় নষ্ট হয় যে, গড়ে ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেই প্রকৃত গ্রীক এবং লাটিন সাহিত্য যে কি তাহা বুঝিতেই পারে না। জীবনের কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ছাত্রের শব্দ-গত এবং রচনাগত বিদ্যা কাযেই লাগে না, সুতরাং তখন তাহার সমস্ত গ্রীক এবং লাটিন বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া উঠে। গ্রীক এবং লাটিন সাহিত্য যে কি, সে যদি প্রকৃত ভাবে তাহা জানিত, তাহা হইলে তাহার কিছুনা কিছু চির দিনই কাযে লাগিত।

গ্রন্থকার বলেন, তিনি নিজেই প্রাচীন প্রণালীতে গ্রীক এবং লাটিন রচনায় অভ্যস্ত, সুতরাং সে প্রণালীর নিন্দা করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। সচরাচর অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গ্রীক এবং লাটিনের নিন্দা করিয়া থাকে। ইংরাজের বিদ্যালয়ে লিখিত লাটিন কবিতা দেখিয়া অধ্যাপক রিচ্‌সল্ নাকি হিংসা করিয়া থাকেন, আর লাটিন ভাষা-শিক্ষার উপকারিতা যে কি, তাহাও তিনি বুঝেন। লাটিন এবং গ্রীক ভাষায় ভাল রচনা করিতে হইলে সেই সকল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের যেরূপ অবিকল অনুকরণ করিতে হয়, তাহাতে যে কেবল শব্দ-সাধনে পরিষ্কার ব্যুৎপত্তি জন্মে এমন নহে, তদ্দ্বারা সেই সকল গ্রন্থকারের ভাব এবং শক্তিতে আমাদের অধিকার জন্মে। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ইহাই প্রকৃত ফল। লাটিন সাহিত্য অপেক্ষা গ্রীক সাহিত্য উৎকৃষ্ট হইলেও বালকদিগকে লাটিন রচনায় অধিক অভ্যস্ত করিবার ইহাই যুক্তি। কিন্তু লাটিন সাহিত্যের শক্তি যেমন চরিত্রে, গ্রীক সাহিত্যের শক্তি সেইরূপ সৌন্দর্য্যে। চরিত্র অধ্যাপিত, অধীত এবং আয়ত্তীকৃত হইতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্য সেরূপ হইতে পারে না। অতএব প্রাচীন সমাজের কথঞ্চিৎ শক্তিলাভ করিতে আমাদিগকে সক্ষম করে বলিয়াই গ্রীক এবং লাটিন রচনার এত আদর। বাল্যকাল হইতে বর্জ্জিল্ ও হোরেস্ প্রভৃতি কবির কবিতার পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন এবং

চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে অভিজাত-বর্গের নির্ম্মান এবং তাহাদের উন্নত ভাব-সংগঠনে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? প্রাচীন প্রণালী বিচার করিবার কালে এসব কথা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।

কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদা এবং উন্নতভাব লাভ করিলেই যে প্রাচীন ভাষার অধ্যয়নের সমস্ত ফল নিঃশেষ হইল, তাহা নহে। প্রথমতঃ মানসিক নমনীয়তা এবং আধ্যাত্মিক সংযতাকাঙ্ক্ষতা প্রভৃতি আর যে সকল ফল প্রাচীন ভাষার অধ্যয়ন হইতে উৎপন্ন হয়, বর্ত্তমান সময়ে সে সকলের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে তাহার বিশেষ অভাব রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও অনেকের গ্রীক্ এবং লাটিন্ ভাষায় এমন যোগ্যতা আছে যে তাঁহারা অনায়াসেই প্রত্নতত্ত্বাধ্যয়ন জনিত শক্তি ও উন্নত ভাব এবং জীবন্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, যদিও অনেকে কেবল ব্যাকরণ এবং ভাষা-তত্ত্বের সাহায্যে জীবন্ত জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি রাখেন, তথাপি কেবল ব্যাকরণ এবং ভাষা-তত্ত্বের আলোচনায় সময়াতিপাত না করিয়া জর্ম্মন ফরাসী প্রভৃতি সাহিত্যের ন্যায় গ্রীক এবং লাটিন্ সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোক সেই উন্নত ভাব এবং জীবন্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিত। অর্থাৎ গ্রীক্ এবং লাটিন্ সাহিত্যকে উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, কিম্বা সুকুমার বিদ্যার অধ্যয়ন দ্বারা যত লোক জীবন্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিত, কেবল রচনা এবং ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে তত লোক কখনই উক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। (১)

গ্রন্থকার বিশ্বাস করেন, গ্রীক্ এবং লাটিন্ ভাষায় রচনা এবং শব্দ-জ্ঞানের জন্য এখন সর্ব্বত্র যে রূপ যত্ন হইয়া থাকে, নূতন প্রণালীর প্রভাবে শীঘ্রই তাহা উচ্চ বিদ্যালয় হইতে তিরোহিত হইবে। জর্ম্মন্ প্রণালীর ন্যায় কেবল বিশেষ শক্তি-বিশিষ্ট ছাত্রদিগের জন্য ইহা ইচ্ছাধীন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিবে। ইংলণ্ডে জর্ম্মন্ এবং ফরাসী ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিবার জন্য যেমন অনুবাদের প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, গ্রীক্ এবং লাটিন্ ভাষা-সম্বন্ধে ও সাধারণ ছাত্রদিগের জন্য তাহাই অবলম্বিত হইবে; আর ক্ষুদ্র এক খানি ব্যাকরণ ভাল রূপে পড়াইলেই বড় বড় ব্যাকরণ পড়াইয়া যে ফল না পাওয়া যায় তাহা পাওয়া যাইবে।

---

(১) উপরি উক্ত কথাগুলি যখন মুদ্রিত হইতেছিল, সেই সময়ে সেন্ট্ আণ্ডরু বিদ্যালয়ের বক্তৃতায় মহাত্মা মিল্ ও এই ভাব ব্যক্ত করেন। স্থানে স্থানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে মূল বিষয়ের ঐক্য অধিকতর স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন করে। মিল্ চিন্তা দ্বারা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, গ্রন্থকার বৈদেশিক বিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বৈদেশিক লোকের মতামত শুনিয়া সেই মীমাংসাই করিয়াছেন।

ইহার কিছু কাল পরে ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন; ইহাতে দেখা যায়, ইংলণ্ডের উন্নত বিদ্যালয়-সমূহে প্রসিদ্ধ শিক্ষকদিগের মধ্যেও এই ভাব পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" যখন এই কথা আমাদের মনে হয়, তখনই আমাদের মন এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত আনন্দ-রসে আপ্লুত হইতে থাকে। তখনই মনে যে সুবিমল আনন্দের উদয় হয়, দরিদ্র অতুল ধনসম্পত্তি পাইলেও তাহার আস্বাদন করিতে পারে না; শিক্ষার্থী আশাতীত ফল-লাভ করিলেও তাহার অধিকারী হয়না; জিগীষু ব্যক্তি বিশাল দেশ মধ্যে আপনার জয়-পতাকা উড়াইলে অথবা প্রবল শত্রুর শিরশ্ছেদন করিলেও সে সুখের অনুভব করিতে পারে না। যাহাদের মনে পিতৃভক্তি আছে এবং পিতা যাহাদের চক্ষে দেবতা স্বরূপ "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ; তাহাদেরই মনে উদয় হয়। অর্থের গৌরব, পদের মর্য্যাদা প্রভুত্বের অহঙ্কার পিতৃভক্তির সহিত তুলনায় অল্প মূল্য বহন করে। ইহার নিকট যৌবন-স্বভাব-সুলভ ঔদ্ধত্য তিরোহিত হয়, ঐশ্বর্য্যের মোহ বিলীন হয়, দুঃখের লোপ পাইয়া থাকে। যাহার পিতৃ ভক্তি আছে; নীচ কুলোদ্ভব হইলেও সে এক জন সদ্বংশ সম্ভূত ব্যক্তি অপেক্ষা হীন নহে। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিলেও সে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এবং কোনরূপ উপাধিধারী না হইলেও সে "পিতৃভক্ত" এই সম্মান-বিবর্দ্ধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধির অধিকারী হয়।

যে সমস্ত গুণে মনুষ্য তির্য্যগ্ জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, পিতৃভক্তি তাহার অন্যতম। কি সভ্য কি অসভ্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকল শ্রেণীর মধ্যেই এই গুণ দেখিতে পাওয়াযায়। তবে প্রভেদ এই যে, কোন জাতির মধ্যে বহুল অমানুষিক উদাহরণ দেখা যায়। যিনি পুণ্যবান, পিতৃভক্তি তাঁহার হৃদয়ে মূর্ত্তিমতী। যেহৃদয়ে ভক্তিনাই, সে হৃদয় পাষাণময়, সে হৃদয় সাহারা মরু-প্রান্তরের মত নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে। সে হৃদয় ক্ষেত্রে পুণ্য-পাদপ জন্মেনা, শান্তি নদী প্রবাহিত হয়না, অথবা মুক্তি-পথ দেখা যায়না। অসহায় পান্থ সে ঘোর মরুভূমে আশ্রয় পায় না।

ভক্তির ভাষা নাই। পিতার প্রতি কতদূরভক্তিকরা কর্ত্তব্য; তাহার সীমানির্দ্দেশ নাই। পিতা ভক্তির পাত্র, সন্তানের ভক্তি-করা উচিৎ, কিন্তু কি পরিমাণ ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়, তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। যখন নির্ব্বিষ্ট-বিষয়-স্নেহ, আসন্ন-নির্ব্বাণ লিয়র্ নরপতি আপন কন্যাগণের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া শেষ দশার শান্তি-সুখ অনুভব করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার প্রতি কন্যাত্রয়ের কীদৃশী ভক্তি তাহা জানিতে চাহিলেন, তখন প্রথমা ও মধ্যমা কন্যা গনারিল ও রিগান্ মৌখিক

বাগাড়ম্বর দ্বারা লিয়রের মন মুগ্ধ করিল, বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিবিপ্লব বশতঃ তিনি কন্যাগণের কপট ভক্তি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিলেন। পরিশেষে তাঁহার অত্যন্ত আদরের কণীয়সী কন্যা কর্ডিলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন"বৎসে আমার প্রতি তোমার কেমন শ্রদ্ধা ভক্তি বল।" লিয়রের প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা ও কপটতা পরিশূন্যা সুতরাং তাঁহার ভক্তির ভাষা ছিল না। এবং পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। "পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি করা উচিত, সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকি। এই মাত্র বলিয়া কর্ডিলিয়া নীরব হইলেন। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ, এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া তিনি প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার বাক্যে বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ভক্তিমতী সত্যবাদিনী কর্ডিলিয়ার সরলতা-পূর্ণবাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি কনিষ্ঠ কন্যাকে এক কপর্দ্দকও না দিয়া অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ গনারিল ও রিগান্‌কে প্রদান করিলেন। ভক্তির ভাষা-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া রাজা পরিশেষে উক্ত কন্যাদ্বয়ের দ্বারা বিড়ম্বিত এবং তৎপরে সেই কনিষ্ঠ কন্যা কর্ডিলিয়ার নিকট সান্ত্বনা পাইয়া ছিলেন। ভক্তির যে ভাষা নাই, তাহাও তিনি তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।

"আজ্ঞা গুরূণাংহ্যবিচারণীয়া" এই মহা-কবি বাক্য মূল মন্ত্র করিয়া আমাদের কার্য্য করা উচিত। জনক যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতে পরিণামে সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহা প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরশুরামপিতার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর প্রতিকূলে কুঠার ধারণ করিয়া ছিলেন, (১) এবং পরমেশ্বরের অবতার রামচন্দ্র পিতৃ-সত্য পালনে কৃত সঙ্কল্প হইয়া পুত্র-বিয়োগ-কাতরা জননীর শোক-কাতর বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া রাজ্যবাস পরিত্যাগ করতঃ বনে গিয়াছিলেন।

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতি মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ'।

পিতৃ-সেবাই আমাদের স্বর্গারোহণের সোপান, পিতৃ-সেবাই আমাদের মুখ্য ধর্ম্ম, পিতার তুষ্টিসাধনই আমাদের তপঃ পিতার গুণ গানই আমাদের জপ, পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমাদের মনে আনন্দ হইয়া থাকে, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধন হইল বলিয়া জ্ঞান হয়, এবং পিতার মনোমত কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রীতি জন্মাইতে পারিলেই দেবতাগণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। আমরা যে সমস্ত কার্য্য করি, যদি তাহা পিতার অনুমোদিত হয়, তবে তৎসমুদায় কার্য্য সুখপ্রসূ ও সাধারণের তৃপ্তি-জনক হইয়া থাকে, আর যদি আমরা স্বেচ্ছাচার-রত হইয়া পূজ্যপাদ জনকের ইচ্ছা বিরুদ্ধ বেশ ভূষা বা কার্য্য দ্বারা তাঁহার বিরাগ-ভাজন হই, তাহা হইলে আমাদিগকে পিতৃ-কোপে

যাহা আমাদের মত সাধারণ মনুষ্যের অনুকরণীয় নহে, এমন দৃষ্টান্তের উল্লেখ সর্ব্বত্র সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। শিঃ পঃ সঃ।

দিন দিন হীন ও মলিন ভাবে কালাতিপাত করিতে হইবে। পিতা যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, দেবতারা কখনও তাহার প্রতি সদয় হন না, সমাজে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি হয় না, এবং চিত্ত-প্রসাদ তাহার কখনও জন্মে না। যাহার কীর্ত্তি নাই, যশঃ নাই, মানসিক সুখ নাই, তাহার দেহ ধারণ কেবল জন্ম-মরনাদি ক্লেশ সহনভিন্ন আর কিছুই নহে। মান ও কীর্ত্তি দেহ-ধারী মাত্রেরই লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত।—

যাহারা পিতৃ-ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহারা আপন আপন সুখের মুখাপেক্ষী হয় না, বিষম বিপদের সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হয় না, অথবা দুস্তর মরু প্রান্তর দেখিয়া ইষ্ট সাধনে বিরত হয় না। তাহারা দেব কল্প আরাধ্য পিতার দুঃখবিমোচন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া অগ্রসর। বেক্নর সমুদ্র-মধ্যে দুর্দ্দান্ত হাঙ্গর মুখে পতিত হইলে তদীয় পুত্র অসিমাত্র সহায় করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অকুতোভয়ে বারিধি-বক্ষে মূর্ত্তিমান কালের করাল বক্ত্র-মধ্য হইতে পিতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্কা প্রাস্কোভিয়া পিতার দুঃখ দূর করিবার জন্য বহু যোজনবিস্তৃত মরু ভূমি, তুষারাবৃত দুর্গম স্থান, হিংস্র-জন্তু-বহুল বহুবিপৎ-সমাকুল বনরাজি অতিক্রম করিয়া রুষ রাজ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবার কোন ললনা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নিরুপায় জনকের ভরণ পোষণার্থ এক ডাক্তারের নিকট বিজ্ঞাপিত অর্থ-লাভবাসনায় আপনার দন্ত পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রমণী-হৃদয় ভক্তির আধার বলিয়া তাঁহারা পিতৃদুঃখ-প্রশমন মানসে এরূপ দুরূহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপরা হইয়াছিলেন।

কাশী যাইতে হইলে যেমন কেহ বা জলযানে, কেহবা শকটারোহণে, অন্যে বা আয়াসসাধ্য পাদচারণে, অপরে বা সচ্ছন্দ-গতি বাষ্পীয়-শকটাবলম্বনে যাইয়া থাকেন, কীর্ত্তি-শৈলারোহণেরও তদনুরূপ বহুবিধ পথ আছে। কোন্ পথ প্রশস্ত অথচ দুর্গম, কোনটী বা কষ্ট-সাধ্য, আবার অন্যটী বা ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু যিনি যে পথ দিয়া যাত্রা করুন, নির্দ্দিষ্ট পথ গুলির সকল গুলির দ্বারাই কীর্ত্তি শৈলের শিখর-দেশে আরোহণ করিতে পারা যায়। বেক্নরের পুত্র ও প্রাস্কোভিয়া যে পথ দিয়া কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণ করিয়াছিল, সেই পথের নাম পিতৃভক্তি। এপথ দিয়া কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণ আমাদের দেশের পক্ষে অনেকটা সহজ-গম্য বলিয়া বোধ হয়। রামচন্দ্র প্রভৃতি নর-কুল-তিলক এই পথ দিয়া উক্ত শৈলের উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিতি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্থান অবধি পৌছিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ মানবজাতির সাধ্যাতীত, এবং তদূর্দ্ধে যে কিরূপ স্থান তাহা সাধারণের অবিদিত; এমন কি, কল্পনার রথারোহণ করিয়া কবিকুলও তথায় যাইতে সক্ষম হন না।

ইংরাজী আমাদের অর্থকরী বিদ্যা। সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, গণিত বল, সকলই আমরা শিখিতেছি বটে, কিন্তু যে শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ। অন্ন—অতি-অল্প মাত্র লোকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে, আত্মোৎকর্ষের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ভাষা দর্শনাদি শিখিয়া

থাকে বা আলোচনা করে। আমরা ইংরাজী শিখিয়া থাকি, সুতরাং ইংরাজীতে বাক্যালাপও করি, পত্রাদিও লিখি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ প্রণালী আছে। সেই বিভিন্ন জাতি আপনাদের চলিত প্রথানুরূপ পত্রাদি লিখিয়া থাকে, আপনাদের সমাজানুমোদিত শিষ্টাচারের বশবর্ত্তী হইয়া কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমাদের দেশে পাত্র-ভেদে পত্রের পাঠ ও শিরোনাম লিখিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে, কিন্তু ইংরাজী প্রথায় আমাদের দেশের মত পাঠ বা শিরোনামের ব্যবস্থা নাই। Dear Sir, Dear father অথবা My Dear father ইত্যাদি রূপ পাঠ পিতাকে এবং My Dear child বা My Dear Ram Chandra বা Dear Ram Chaudra ইত্যাদি রূপ পাঠ পুত্রকে লিখিলেই হইল। শিরোনামে পুত্র পিতাকে "বাবু" বলিয়া লিখিল এবং পিতাও পুত্রকে 'বাবু রামচন্দ্র' বলিয়া লিখিলেন। সুতরাং সকলই সমান হইল। বলিলে 'তুমি' ও হয় 'আপনি' ও বুঝায়। সেই কারণ আমাদের পিতা, পিতৃব্য অথবা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি গুরুজনকে ইংরাজীতে পত্র লেখা উচিত নয়। ইংরাজীতে পিতাকে পত্র লিখিলে বাস্তবিক পুত্রোচিত সম্মান দেখান যায় না। "পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত" অথবা "পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত" ইহার পরিবর্ত্তে কেবল 'বাবু' এই পাঠ লিখিয়া সম্মান চরিতার্থ হইতে পারে না। ইংরাজীতে পত্র লিখিলে যেন একটা কিছু অভাব রহিল বলিয়া বোধ হয়। পিতা পুত্রকে পত্র লিখিবার সময় যদি শিরোনামে 'পরম কল্যাণীয় শ্রীমান' এইরূপ পাঠ লিখেন, তাহাতে আমাদের মনে যেরূপ আমোদ হয়, শিরোনামে 'বাবু' সম্বোধনে সে আনন্দ টুকু হয় না। অধিকন্তু কি সুন্দর প্রণালীর পরিবর্ত্তে কি এক রকম বিকট প্রণালী শনৈঃশনৈঃ আমাদের সমাজে স্থানাধিকার করিতেছে দেখিয়া বড়ই কুণ্ঠিত হই, কখন বা কল্যাণকর প্রথালোপ পাইল দেখিয়া বিষাদ-সাগরে মগ্ন হই। আফিস সম্বন্ধীয় কার্য্য বা তদনুরূপ অন্য প্রকার কার্য্য ইংরাজীতে চলিতে পারে, বন্ধুকে ইংরাজীতে লেখা যাইতে পারে, সামাজিক বা দেশ-হিতকর ব্যাপার লইয়া ইংরাজীতে আন্দোলন চলিতে পারে। কিন্তু ভ্রাতায় ভ্রাতায় ও পিতা পুত্রে ইংরাজিতে পত্রাদি লেখা 'আমাদের অভিলষণীয় নহে। আমাদের পদ্ধতিক্রমে পত্র লেখা না দেখিতে পাইলে, আমরা বড়ই ব্যথা পাই'। এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, হয়ত ভারতের এমন কোন দূরতর স্থলে পিতা কিম্বা পুত্র কর্ম্ম-সূত্রে অবস্থিত, যেখানে ইংরাজীতে শিরোনাম না লিখিলে চলে না। তাহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলি, সেরূপ স্থলে শিরোনাম বাঙ্গালায় লিখিয়া ডাকের সুবিধার জন্য আর একদফা ইংরাজিতে তাহার নিম্নদেশে লিখিলে চলিতে পারে।

যাহারা ধন-মদ-মত্ত, বিষয়-বাসনায় যাহাদের মন মুগ্ধ, সিংহাসন-প্রাপ্তির আশা যাহাদের বলবতী ও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান, ভক্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাহাদের ধর্ম্ম-মন্দিরের দ্বার চিরদিন অর্গলাবদ্ধ। তাহারা আপন অভিলষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির

নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-বিমূঢ়, ন্যায়ের সংকীর্ণ পথ হইতে বিচ্যুত, এবং কর্ত্তব্যের আলম্বন-ধারণে অসমর্থ। তাহারা স্বীয় কাঙ্ক্ষিত-লাভের জন্য জঘন্য ঘৃণ্য কর্ম্মে রত হইয়া থাকে। মোগল সম্রাট আরঙ্গজীব পিতার জীবিতাবস্থাতেই সিংহাসনে বসিবার অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াই দীল্লির রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি এরূপ বিষম পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন, যে দিন তিনি রাজ-সুখাভ্যস্ত দেবোপম পিতাকে শেষ দশায় এরূপ বিষম কষ্ট দিলেন, সেই দিন হইতেই মোগল-রাজলক্ষ্মী যেন চঞ্চলা হইলেন।

বাস্তবিক যাঁহারা ভক্তিমান, পিতার প্রসন্নতা সাধন করাই যাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবেন, তাঁহারা সুখের স্রোতে ভাসিতে চাহেন না, বিলাসের মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হন না, বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অসৎ পথ অবলম্বন করিতে ভাল বাসেন না। এমন কি, পিতা মাতা কর্কশবাদী বা পক্ষপাতী হইলেও সন্তান—সুসন্তান অন্ততঃ তাঁহার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হয় না, বরং তাঁহাদের প্রমাদ বা বুদ্ধি বিপর্য্যয়-জনিত কার্য্য বা কুৎসিত বাক্য সহ্য করিয়া থাকে।

"পিতরি প্রীতি মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"।

এ বাক্য আজ কাল কয় জন মনে ভাবিয়া থাকে? যাহাদের চিত্ত-ফলকে উক্ত প্রকার ভাব স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে, তাহারা অবশ্যই গুরুজনের মতাবলম্বী হইয়া চলিয়া থাকে, শ্রমলব্ধ অর্থ লইয়া পিতার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, অশন বসন তাঁহার ইচ্ছানুরূপ লইয়া থাকে, কৌমারের ন্যায় যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থাতেও পিত্রাদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের ন্যায় অন্যায় জ্ঞান তিরোহিত হয়, খাদ্যাখাদ্য-বিচার লোপ পায়; পোষাক-পরিচ্ছদ রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও বাঞ্ছিত বলিয়া বোধ হয়, স্বোপার্জ্জিত অর্থ নিজ শোণিতাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান হয়, "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" তাহাদের মনে স্থান পায় না। যাহারা সুখের আতিশয্যে উৎফুল্ল বা দুঃখের আধিক্যে উদ্বিগ্ন না হইয়া, স্বার্থ-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া জ্ঞান-মার্গে ধাবমান হয় "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" তাহাদেরই হৃদয়ে প্রকাশমান থাকে। আর যখন আমরা মানস-চক্ষে সকলের চিত্ত-পটে এই মহা বাক্য খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইব, সেই দিন আমরা এই নশ্বর, জ্বালা-যন্ত্রণাময় পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান করিব, সেই দিন আমরা শোক-তাপ ভুলিয়া, অভাবের বৃশ্চিক-দংশন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই পৃথিবীকে সকল সুখের নিদান স্বর্গ ভুবন বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিব।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

সেবক। সমাজ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক মাসিক পত্র। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মসম্মিলনীর বিশেষ আনুকূল্যে শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। আকার ডিমাই ৮ পেজী ২॥ ফর্ম্মা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহ এক টাকা।

পত্রিকা খানির ভাষা ভাল, তবে সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে মিল থাকিবার কথা নাই। সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া যে উন্নতি আকাশে উড়িতে চায়, আমরা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাই।

সৌভাগ্য-সোপান। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এ প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। আকার ডিমাই ১২ পেজী ৩১১ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থে উদ্বোধন, আরম্ভ, প্রাতরুত্থান সময়ের ব্যবহার, ক্ষুদ্র বস্তু সমূহ, লোকে কি বলিবে? অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা, সুযোগ, আমার বাসগৃহ, জীবন-যুদ্ধ, আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম, সাহস, শৃঙ্খলা, সংসর্গ, অলসতা, বন্ধুতা, স্ত্রীজাতি, চরিত্র, আত্মসংযম, স্থির-প্রতিজ্ঞা, সাধুতা ও সত্য-নিষ্ঠা, শিষ্টাচার, নিয়ম-নিষ্ঠা, কৌশল, ক্রোধ, আশা, সন্তোষ, ধর্ম্ম, সৌভাগ্য, এই ৩০টি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। উদ্বোধনটি পড়িলেই বুঝা যায়, গ্রন্থকারের প্রাণ কি গভীর পবিত্র সঙ্কল্পে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত করিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ—জীবনারম্ভে তরুণ যুবকের সৌভাগ্য-পথ-প্রদর্শক, এরূপ পুস্তক ইংরাজীতে অনেক আছে; কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালীর হীনসম্পদ ভাষায় বোধ হয় এই শ্রেণীর পুস্তক ইহাই প্রথম। গ্রন্থখানিকে যুবকদিগের প্রকৃত হিতকারী করিবার জন্য গ্রন্থকার যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই তাহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে। আকারের তুলনায় যে মূল্য অবধারিত হইয়াছে, তাহাও অতি সামান্য; ইংরাজীতে এই শ্রেণীর যে সকল পুস্তক রহিয়াছে, তাহাদের মূল্য ইহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ। সৌভাগ্যের জন্য উৎসুক বিশেষতঃ ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বঙ্গীয় যুবকদিগকে এত সুলভ মূল্যে এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক কিনিয়া পড়িবার জন্য আমরা অনুরোধ না করিয়া থাকিতে পারি না। যাঁহারা ইংরাজীতে অভিজ্ঞ, তাঁহারাও এ পুস্তক পড়িলে অনেক উপকার পাইবেন, কারণ ইহা বাঙ্গালী যুবকের জন্যই বিশেষ ভাবে লিখিত।

মিঠেকড়া। শ্রীরাহু রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। আকার ডিমাই ১২ পেজী ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য এক আনা।

কবিবর শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাকি কড়িও কোমল (?) নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহা তাহারই বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা। বোধ হইল মূল গ্রন্থে নবরত্ন নামে কয়েকটি কবিতা আছে; সমালোচ্য পুস্তকের এক স্থলে লেখক সেই গুলি একে একে উঠাইয়াছেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া টিপ্পনী কাটিয়াছেন। আমরা নিজে কিছু না বলিয়া তাহারই কয়েকটি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম, জিনিসটা কেমন হইয়াছে পাঠকই তাহার বিচার করিবেন।

"মাগো আমার লক্ষ্মী
মনিষ্যি না পক্ষী
এই ছিলেম তরীতে
কোথায় এনু ত্বরিতে।
কাল ছিলেম খুলনায়
তাতে ত আর ভুল নাই!
কলকেতায় এসেছি সদ্য
বসে বসে লিখ্‌চি পদ্য।"—রবি

"ভেলা মোর বাপ্ আচ্ছা মদ্দ!!
'মদ্দ বড় বাছের বাছ,
ঠেস দিয়ে আমরুলের গাছ,
দেখেছেন পাঁকাটী,
লেগে গেছে দাঁত কপাটী!!'
আয় তোরা কে দেখ্‌তে যাবি,
ঠাকুর বাড়ী মস্ত কবি!!
হায়রে কপাল হায়রে অর্থ!
যার নাই তার সকল ব্যর্থ!;"—রাহু

—:*:—

"তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম।
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছি কেবল বক্ বকম্॥
আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেক্‌চে কেমন ফাঁকা ফাঁকা।
তাই খানিকটে ফোঁস ফোঁসিয়ে
বিদায় হলো রবি কাকা"—রবি

"উড়িস্‌নে রে পায়রা কবি
খোপের ভেতর থাক ঢাকা।
তোর বক্ বকম্ আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা!
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হলো
নগদ্ মূল্য একটাকা!!!"—রাহু

—:০:০:—

"জলে বাসা বেঁধেছিলাম
ডেঙ্গায় বড় কিচি মিচি।
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছি মিছি।
জানতো ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত।
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই
ভাসি দিন রাত॥"—রবি

"মাছ সেজেছ, বেশ করেছ
'জলচরের জাত।'
আর ভেসোনা আর ভেসোনা
হবে কুপো কাত॥'
কতই সাধ যাচ্ছে কবির
আহা মরে যাই!

পায়রা ছিল, মাছ হয়েছে,
মাছে উড়ো যাই।
কবি তুমি মানুষ বটে
হ'লে পায়রা মাছ।
গেলে স্থলে, শূন্যে, জলে,
বাকি কেন গাছ?"—রাহু

—০:০—

"ধার করা নাম নেবো আমি
হবে নাত সিটী।
জানই আমার সকল কাজে
ওরিজিনালিটি (originality.)" রবি

"মৌলিকতা পথের ধারে
গড়াগড়ি যায়।
ও তার অনুবাদের বিষম ঠেলায়
ব্রহ্মা লজ্জা পায়॥
চুণোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে।
বড় মুদিমালা বাংলা পড়ে
রবি ঠাকুর লেখে॥"—রাহু

—০:০:০—

"আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবুসা॥"—রবি

"ও জেলে ভাই জাল টেনে নাও
পদ্য লেখা কি সোজা।
ভাবের চোটে পাহাড় ফাটে,
যা পদ্য যা মিলে যা॥"—রাহু

—০—

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়াই সমালোচ্য পুস্তকের দোষ গুণ পাঠক বিচার করিবেন, সে সম্বন্ধে আমাদের আর কোন কথা বক্তব্য নাই। কেবল একটা কথা জানিতে কৌতূহল হয়, নব্য-যুবক-মহলের আদর্শ কবি এবং সাহিত্য-পরিষদ-সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথের লেখনী সত্য সত্যই কি এই সকল অদ্ভুত এবং অপূর্ব্ব "রত্ন" প্রসব করিয়াছেন?

—(০:০)—

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। | কার্ত্তিক ১৩০২ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

সাহিত্য।

(৫)

সাহিত্য-পরিপোষক।

"নিরাশ্রয়া ন জীবন্তি কবিতা বনিতা লতাঃ"

ইহা অতি সত্য কথা। কবিতা অর্থাৎ সাহিত্য, বনিতা অর্থাৎ স্ত্রীলোক, আর লতা, ইহারা একটা আশ্রয় না পাইলে হয় মরিয়া যায়, আর না হয় নিতান্ত মৃতবৎ হইয়া থাকে। বনিতার আশ্রয় পুরুষ, লতার আশ্রয় বৃক্ষ, আর সাহিত্যের আশ্রয় তিন জন—সাহিত্যের পরিপোষক, পাঠক, এবং লেখক বা সেবক।

সাহিত্যের পরিপোষক রাজা এবং দেশীয় ধনি-সম্প্রদায়।

আমাদের রাজা বিদেশাগত এবং বিদেশীয়। রাজা বিদেশীয় হওয়া দুর্ভাগ্যের কারণ না হইতে পারে, কিন্তু প্রজা-সাধারণের জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় সাহিত্যের প্রতি রাজার আদর এবং অনুগ্রহ না থাকা নিশ্চয়ই গভীর দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক; আমাদের ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি-রাজার আদর এবং অনুগ্রহ কতদূর।

বিশ্ব-বিদ্যালয় দেশের আদর্শ-শিক্ষা-মন্দির, কিন্তু বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর ভাষার স্থান নাই। স্বজাতি-বৎসল বাঙ্গালী মাতৃভাষার এ অধিকার টুকু পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন না। বাঙ্গালীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এমনই বিচিত্র বিধান যে, কেহ ইচ্ছা করিলে বঙ্গ-ভাষায় একটি মাত্র বর্ণ ও না শিখিয়া ইহার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। এমন যে বিশ্ব-বিদ্যালয়, তাহাকে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যাল-

য়ের শাখা বলিয়া পরিচয় দিতে দোষ ছিল কি? বাঙ্গালা যদি রাজার মাতৃভাষা হইত, তাহা হইলে এরূপ বিচিত্র বিধান কখনই হইতে পারিত না। সেরূপ হইলে রাজা অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও তাহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আসন দিতেন। দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান নাই, ভারত-বাসী ছাড়া অন্য দেশের লোকে বোধ হয় একথা কল্পনাও করিতে পারে না!

ব্যবহার-শাস্ত্রের পরিচালনাতেও দেশীয় ভাষার প্রচলন নামে আছে, কিন্তু কার্য্যে নাই। প্রতি জেলায় ন্যূনাধিক বিশলক্ষ বাঙ্গালীর মধ্যে দুই কি তিন জন মাত্র ইংরাজ, তাঁহারাও প্রজাদিগের ভাষায় অন-ভিজ্ঞ। সুতরাং বিচারাদি অর্থীপ্রত্যর্থীর ভাষায় চলে না, বিচারকদিগের ভাষাতেই চলে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথা-র্থই বলিয়াছেন, বিচার কালে "পক্ষ-সমর্থক বাদী অথবা প্রতিবাদীর স্বপক্ষে বলিতেছেন কি বিপক্ষে বলিতেছেন, তাহাদিগের পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিতেছেন কি পিণ্ডদান করিতেছেন, বাদী বা প্রতিবাদী কেহই তাহা বুঝিতে সমর্থ নহে।"

বিখ্যাত গ্রন্থকারদিগকে পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত করিয়া রাজা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহিত্যের পরিপোষণ করিতে পারেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে পুরস্কার, বৃত্তি এবং উপাধি দিয়া কোন কোন স্থলে রাজ-কীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া সাহিত্য-সেবক-দিগকে উৎসাহিত করিবার প্রথা আছে। এরূপ প্রথা প্রচলিত থাকাতে সাহিত্যের যে কত উপকার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহাতে সম্মান-লাভ এবং অর্থ-লাভ উভয়েরই সম্ভাবনা আছে, শক্তিশালী পুরুষেরা আনন্দের সহিত তাহার জন্য খাটিবে না কেন?

ইংলণ্ডের রাজ-কবি টেনিসন্ পরলোক-গমন করিলে তাঁহার সেই গৌরবাস্পদ পদ-লাভের জন্য লালায়িত কত নয়ন নিদ্রা ভুলিয়াছিল, কত রসনা আহারে স্বাদ ভুলিয়াছিল, কত ধমনী দণ্ডে দণ্ডে দ্রুত-মন্দ রক্ত-স্রোতঃ অনুভব করিয়াছিল, কত হৃদয় কল্পনার বিনোদ-ক্ষেত্রে ছটফট্ করিয়া বেড়াইতে ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে সে কথা কল্পনারও অতীত। কত মহাপুরুষ এই দুর্দ্দশার সময়েও আমাদের দেশে সাহিত্যের সেবা করিতেছেন—লক্ষ্মীর অকৃপায় নিরন্ন হইয়াও সরস্বতীর পূজা করিতেছেন, পুরস্কার বা উৎসাহের আশা না থাকিলেও মাতৃ-ভাষার ভাণ্ডারে রত্ন সঞ্চয় করিতেছেন, আমাদের রাজা সে সংবাদ রাখেন কি? পুরস্কার ত দূরের কথা!

বিস্তৃতি দ্বারা ভাষায় বলবৃদ্ধি হয়। কিন্তু আমাদের রাজা বিস্তৃতি খর্ব্ব করিয়া বঙ্গ-ভাষার বল-ক্ষয় করিয়াছেন। ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড এবং আয়র্লণ্ডের কথিত ভাষায় যত প্রভেদ, আসাম, বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যার ভাষায় তত বা তদপেক্ষা অল্পই প্রভেদ, কিন্তু তথাপি ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড এবং আয়র্ল-ণ্ডের লিখিত ভাষা এক ইংরাজী, আর আসাম, বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তিনটি লিখিত ভাষা। জাতীয় ভাষা দৃঢ় এবং উন্নত হইলে যে সকল জাতীয়

সম্পত্তি স্থিতি এবং পুষ্টি লাভ করিতে পারে, সম্ভবতঃ তাহাতে রাজার অনুরাগ নাই, কাযেই আমাদিগকে এ সকল বিড়ম্বনা দেখিতে হইতেছে।

কিন্তু দেশীয় ধনিগণ জাতীয় সাহিত্যের প্রতি উদাসীন কেন, একথা আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারিনা। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাদিগের বিদ্যা আছে, বুদ্ধিও আছে, স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগও আছে; জাতিকে মহত্বে ভূষিত করিতে জাতীয় ভাষার শক্তি যে কত, তাহাও তাঁহারা বুঝেন; আর সাহিত্য-পরিপোষণের যে প্রধান সাধন, ভগবানের অনুগ্রহে তাহাও তাঁহাদিগের আছে; তবে তাঁহাদিগের মাতৃভাষার দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না কেন? খুব সম্ভবতঃ মাতৃভাষার দরিদ্রতা, অলঙ্কারশূন্যতা এবং শক্তি-হীনতাই তাহার কারণ। কিন্তু আমরা তাহার দারিদ্র্য না ঘুচাইলে তাহাকে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য না দিলে সে এ সব কোথায় পাইবে? জননীর দরিদ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে উপহাস বা অবজ্ঞা করা কুল-প্লাবন সৎপুত্রের কায নহে, প্রাণপণে যত্ন-করিয়া তাঁহার দারিদ্র্য দূর করাই তাহার কায।

ধনিগণ! আপনারা স্বদেশের হিতেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া শত দিকে শত উপায়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, করুন; কিন্তু এই অনাথিনী, এই রাজানুগ্রহে বঞ্চিত মাতৃভাষাকে একেবারে বিস্মৃত হইবেন না। অন্য নিমন্ত্রিত আগন্তুকদিগকে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় বিবিধ উপচারে পরিতুষ্ট করুন, তাহা ত সুখেরই কথা; কিন্তু এই অভুক্তা মলিনবদনা মাতৃভাষাকে একেবারে ভুলিয়া থাকিবেন না।—সকলে একবার করিয়া হাত খানি ঝাড়িলেই তাহার পক্ষে পর্ব্বত হইবে। যদি মাতৃ-ভাষা সর্ব্বসম্পৎপ্রসূতি না হইত, যদি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের চাবি তাহার হাতে না থাকিত, যদি বিমল যশোমন্দিরে প্রবেশ করিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ কিছু দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে এ অনুরোধ করিতাম না।

সাহিত্যপাঠক।

সাহিত্যের দ্বিতীয় আশ্রয় পাঠকগণ। বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক নাই, একথা বলিতে পারি না। বঙ্গদেশের সহরে সহরে যে অনবরত শত শত মুদ্রাযন্ত্র চলিতেছে, তাহারা কি কোন কামই করিতেছে না? সেই সকল যন্ত্র হইতে অবিশ্রান্ত উৎপন্ন সাহিত্য রাশি বাঙ্গালী ভিন্ন আর কে গ্রহণ করিতেছে—কে হজম করিতেছে? বাঙ্গালায় যাহা ছিলনা, তাহা হইয়াছে; বাঙ্গালায় সাহিত্য জন্মিতেছে, মুদ্রিত হইতেছে, পঠিত হইতেছে। কিন্তু যাহা হওয়া উচিত, তাহা এখনও হয় নাই—এখনও বাঙ্গালায় ভাল গ্রন্থ অপেক্ষা মন্দ গ্রন্থের আদর অধিক, এখনও বাঙ্গালী গ্রন্থকার জীবিকার জন্য কেবল সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন না, এখনও বাঙ্গালী পাঠক অতি অল্পমূল্যের বাঙ্গালা পুস্তকও পরের নিকটে চাহিয়া লইয়া পড়িতে লজ্জা বোধ করেন না! একেবারে না পড়া অপেক্ষা পরের নিকট ধার লইয়া পড়া যে শতগুণে ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহাতে মাতৃভাষার প্রতি যথেষ্ট আদরের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা অনেক পুস্তকই কিনিয়া

পড়েন; কিন্তু বঙ্গভাষার পুস্তক কিনিয়া পড়িতে হইলেই অর্থ কার্পণ্য উপস্থিত হয়! এরূপ করিলে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের অন্নাভাব কিরূপে ঘুচিবে? যাহাও বা কিনিয়া পড়েন, তাহা সুপাঠ্য সুসাহিত্য নহে। বাঙ্গালাতে যে কয়খানি সুপাঠ্য গ্রন্থ আছে, মুখে মুখেই তাহার নাম বলিতে পারা যায়; কিন্তু পাঠকের অকৃপায় আহাদের অনেকেরই দ্বিতীয় সংস্করণ ঘটে নাই।

অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় পুস্তকের বাজারেও কাট্‌তি এবং আমদানির নিয়ম পরিচালিত। বাজারে যাহার কাট্‌তি থাকে, তাহার আমদানিও হয়, দেশে না থাকিলেও তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পর পার হইতে আইসে। বঙ্গভাষায় ভাল পুস্তক নাই বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন; কিন্তু এ জন্য দায়ী কে? আমাদের বোধ হয়, এ দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণেই পাঠকের। সচরাচর দেখা যায়, পরিবারের আহারকারিগণ ভাল হইলে রাঁধুনীও ভাল হয়; আর যাঁহাদের জন্য রন্ধন, তাঁহাদের আহারে যদি ভালমন্দ বোধ না থাকে, তাহা হইলে ভাল রাঁধুনীও তাঁহাদের হাতে পড়িয়া খারাপ হইয়া উঠে। সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা খাটে। পাঠক যদি সুলিখিত, সুপাঠ্য, চিন্তাপূর্ণ এবং হিতকর সাহিত্য পাইতে চাহেন, আর পাইলে তাহার আদর করেন, তাহা হইলে তাহা অপ্রাপ্য থাকিবার কথা নাই। ভাল সাহিত্যের আদর করুন, দেখিবেন, বাঙ্গালীর লেখনী এবং বঙ্গভাষাও ভাল জিনিস প্রসব করিতে জানে।

বাঙ্গালার স্থানে স্থানে সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রতি বৎসর বসন্তাগমে বাঙ্গালার ছাত্রেরাও উৎসাহের সহিত সারস্বত উৎসব করিয়া থাকেন; ইঁহারা সকলে সম্মিলিত ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না কি?

সাহিত্য সেবক।

সাহিত্য সেবকের সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য সম্পদ্‌বিপদ, এবং পুরস্কার-তিরস্কার কিরূপ, সাহিত্য-ব্যবসায়ে প্রলোভন এবং ভয়ের সম্ভাবনা কতটা, ইহাতে মহত্ত্ব কতদূর স্ফূর্ত্তি পায়, সময়ে সময়ে নীচতাই বা কিরূপে প্রবেশ করে, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে শিলারের জীবনীতে মহাত্মা কার্লাইল্ যাহা বলিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহারই অনুবাদ করিলাম।

"যদি জ্ঞান পাইলেই কায হইত, যদি যশস্বী হইলেই মনে শান্তি জন্মিত, যদি বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপুষ্ট এবং কল্পনাকে আদর্শ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিলেই সুখ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এ জগতে সাহিত্যসেবকের জীবন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পৃহনীয় হইত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যের ন্যায় তাহার ইচ্ছাশক্তিও অপরিবর্ত্তনীয় এবং সর্ব্বজয়ী নহে, অন্যের ন্যায় তাহার নিকটেও জানা এবং করা দুই স্বতন্ত্র জিনিস। যশে তাহার চরিত্র-গৌরব কদাচিৎ বর্দ্ধিত হয়; মনের শান্তি কখনই বর্দ্ধিত হয় না। যশের চাক্‌চিক্য কেবল বাহিরের লোকের নয়ন পরিতৃপ্ত করে; ভিতরে ইহা কেবল অশান্তির বৃদ্ধি করে, তৈলষেকের ন্যায় দুর্ব্বাসনার প্রদীপ্ত অনলশিখাকে আরও প্রজ্জ্বলিত করে। সাহিত্যসেবক কেবল আত্মদর্শী নহে, আত্মা এবং

জড়ের মিশ্রণে তাহার প্রকৃতি নির্ম্মিত; তাহার চিন্তাশক্তি মহত্বের আদর্শে শিক্ষিত এবং পরিচালিত হইলেও তাহার সুখের অনুরোধে ভাববৃত্তির পরিচালনা চাই; অন্ন-বস্ত্রের ও তাহার প্রয়োজন, নতুবা সে বাঁচেনা। উৎসাহশীল জীবন যে সকল উপায়ে কার্য্যদ্বারা আপন উৎসাহ প্রকাশ করিতে চায়, তন্মধ্যে এই সাহিত্য সেবা স্পৃহনীয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রনা এবং অমর্য্যাদায় জড়িত। গ্রন্থকারদিগের জীবনী অধ্যয়ন কর, দেখিবে, মানবেতিহাসের মধ্যে উহা অতি নিদারুণ দুঃখ জনক। গ্রন্থকারদিগের দুঃখদুর্দ্দশার কথা সাধারণের নিকট প্রবাদ-বাক্য; আবার অনেক সময়ে দেখা যায়, তাহাদের ভুলভ্রান্তি ও এই সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার অনুরূপ। এরূপ কেন হয়, তাহার কারণ বাহির করা কঠিন নহে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন বিষয়ে শক্তির আধিক্য থাকিলে হৃদয়ের অনুভাবকতা অত্যন্ত তীব্র হয়; প্রতিভার পক্ষে এই তীব্রানুভাবকতা একান্ত অপরিহার্য্য; যাহাদের হৃদয় এই রূপে গঠিত, জীবনের যে কোন অবস্থায় তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। সাহিত্য-চর্চ্চায় এই স্বাভাবিক তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়; কিন্তু যে সকল বিরক্তি এবং অশান্তি সাহিত্য-চর্চ্চার অনুসরণ করে, তাহাতে এই তীব্রতা শেষটা বিষণ্ণতায় পরিণত হয়। দুশ্চিন্তা এবং পরিশ্রম সাহিত্য-সেবকের জীবনব্যাপী কার্য্য; ইহার আনন্দ এত সূক্ষ্ম এবং ক্ষণিক যে, এই স্থূল জগতের স্থূল সুখপ্রবাহ তাহাতে কখনই পাওয়া যাইতে পারে না। যাহা অতি কঠোর মানসিক পরিশ্রমের ফল, তাহাও পাঠ করিলে অতি সামান্য সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই হইয়া থাকে, কারণ মানবের লক্ষ্য চিরদিনই তাহার শক্তির অতীত। এই পরিশ্রমের জন্য বাহিরের যে পুরস্কার, সমাজের যে সম্মান, তাহাও অতি সামান্য; যখন পুরস্কার পাওয়া যায়, তখনও বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না; আর যখন পুরস্কার মিলেনা, তখন হিংসা ও ঈর্ষ্যা প্রভৃতি ঘৃণা-কর ও কষ্টকর যে সকল বৃত্তি উত্তেজিত হইতে থাকে, তাহা বর্ণনাতীত। একে এই অনুভাবকতা অতি তীব্র, তাহাতে আবার ইহাকে পরিতৃপ্ত বা সংযত করিবার প্রায় কিছুই নাই, পক্ষান্তরে ইহাকে প্রলুব্ধ বা ক্ষুব্ধ করিবার বিস্তর আছে; এই দুইটি অবস্থা পরস্পরের এত বিরোধী যে, তাহাদের মিল রাখিবার শক্তি অনেকেরই থাকে না। এই জন্যই সাহিত্য-সেবকদিগের দুর্দ্দশা, এই জন্যই তাহাদের ভুলভ্রান্তি।

অতএব দেখা যাইতেছে, যাহারা সুখ করিয়া সাহিত্য-সেবা গ্রহণ করে; তাহাদের পক্ষেও ইহা অসন্তোষকর এবং বিপজ্জনক; কিন্তু যাহার সাংসারিক সুখ এবং পদ-মর্য্যাদা ইহার উপর নির্ভর করে, যে লিখি-বার জন্য বাঁচেনা কিন্তু বাঁচিবার জন্য লিখে, তাহার পক্ষে বিঘ্ন বিপদের অবধি নাই। এরূপ শক্তি-সম্পন্ন লোকের এরূপ দুর্ভাগ্য, যাহা সহিবার শক্তি তাহার কিছুমাত্র নাই, সেই আপৎসঙ্কুল সংসারের হট্টগোলে তাহার এরূপ লাঞ্ছনা, ইহার তুল্য হৃদয়-বিদারক দৃশ্য সংসারে অতি অল্পই আছে। মনের

মধ্যে অতি উচ্চ চিন্তা, কিন্তু বাহিরে অতি সামান্য অভাবে ব্যতিব্যস্ত; মনের মধ্যে অতি পবিত্র সাধু সঙ্কল্প, কিন্তু সংসারের জ্বালায় অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় সরল পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য; যশের জন্য ব্যগ্র, কিন্তু প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় অন্নের অভাবে কাতর; একদিকে কল্পনার দীপ্তিময় স্বর্গ রাজ্য, অপরদিকে মলিন সংসারের কঠোর মরুভূমি, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত দোদুল্যমান; অতি তীব্র যত্নেও সঙ্কুচিত এবং ব্যর্থ চেষ্ট; নিজের অতি উৎকৃষ্ট লেখার প্রতিও অসন্তুষ্ট, আপন ভাগ্য স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা বিমর্ষ, বিপদগ্রস্ত, দুঃখ-দগ্ধ হীন প্রভ, এবং কখন বা উন্মত্তবৎ হইয়া এই হতভাগ্য সাহিত্য-সেবক অনেক সময়েই অন্যের অলক্ষিত দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। এই ব্যক্তি যুগপৎ উপহাস এবং গভীর কারুণ্যের পাত্র। মনের সঙ্গে জড়ের যুদ্ধে সকলের মনই পরাজয় মানিয়াছে, কেবল এই ব্যক্তিই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপন দুর্গে দাঁড়াইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছে। অনেকটি সাধু আত্মা অঙ্কুরিত কার্য্য হইবার পূর্ব্বেই এই দুঃখের পেষণে প্রাণ হারাইয়াছে! ওটোয়ের ন্যায় কতজন খাইতে না পাইয়া, কুপারও কলিন্সের মত কত জন পাগল হইয়া মরিয়াছে; আবার চাটার্টনের ন্যায় কতজন সংসারের অনাদরে মর্ম্মাহত হইয়া এমন দুর্গের আশ্রয় লইয়াছে, যেখানে সমাজের তাচ্ছিল্য এবং শারীরিক দুঃখ-নিবহ তাহাদিগকে আর স্পর্শও করিতে পারে না।

কিন্তু আবার ইহাদিগের মধ্যেই মানবজাতির অতি উন্নত আদর্শ এবং প্রধান উপকারকের নিদর্শন অনেকে রহিয়াছেন! ইহাঁরাই আমাদিগের আত্মার কোমল বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত রাখেন; ইহাঁরাই আমাদিগকে সুখ এবং শক্তি অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য শিক্ষা দেন; ইহাঁরাই জগতে ধনের সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্বের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। মনোরাজ্যের যুদ্ধাভিযানে ইহাঁরা অগ্রযায়ী সৈন্য; ইহাঁরা মনোরাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যে সকল নূতন নূতন প্রদেশের আবিষ্কার করেন, ইহাঁদিগের সুখাবস্থ স্বজাতীয়গণ তাহাতেই তাঁহাদের চিন্তা এবং কর্ম্মঠতার নিয়োগ করেন। ইহাঁদের যে বিজয়-লব্ধ ফল অন্যের এত উপকার করে, বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহাঁরা তাহার অতি অল্পই ভোগ করিতে পান! কিন্তু আক্ষেপ বৃথা। ইহাঁরা এই কার্য্যে স্বতোব্রতী; কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে ইহাঁরা ইহার সুবিধা অসুবিধা ওজন করিয়া দেখেন; সুতরাং নিজে ইচ্ছা করিয়া যে পথ অবলম্বন করেন, তাহার ফল ভোগ করিতে অবশ্যই ইহাঁরা বাধ্য। এ পক্ষের দুঃখ কষ্ট অতি ভয়ঙ্কর হইলেও সর্ব্বত্রই যে অপরিহার্য্য, এমন নহে; যাঁহারা ঠিক ভাবে চলেন, তাঁহারা পুরস্কারও পাইয়া থাকেন। যদি কোন গ্রন্থকারের জীবন অন্যান্য অপেক্ষা অধিক দুঃখাবহ এবং অশান্তি-সঙ্কুল হয়, তিনি আপন জীবনকে অধিক উন্নত এবং উদ্দীপনাময় করিতে থাকেন; ধনের অভাব তাঁহাকে অসুখী করিতে পারে বটে, কিন্তু তিনি ঘৃণাস্পদ হইতে পারেন কেবল নিজের দোষে।

প্রতিভার ইতিহাস কেবল দুঃখময় নহে, ইহাতে সুখের কথাও আছে। অনেক প্রতিভাশালী লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা এবং অধঃপতন পাঠ করিলে হৃদয়ে আঘাত লাগে বটে; কিন্তু যাঁহারা জীবনপথে বিবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং প্রলোভনে পড়িয়াও ধৈর্য্য এবং সাধুতার মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, এবং যাঁহাদের চরিত্র এবং গ্রন্থ আমাদের স্মৃতিকে আজিও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহাদের বিবরণ পাঠ করিতে আমাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। এই সকল লোকই এই পার্থিব জগতের পুষ্প স্বরূপ; ইঁহারাই প্রকৃত পক্ষে বড় লোক বলিবার যোগ্য। তাঁহাদের কার্য্য পরম্পরার মধ্যে এমন চমৎকার মিল রহিয়াছে যে, তাহা চিন্তা করিতেও আনন্দ জন্মে। যিনি বীর-রসাত্মক কাব্য লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সমস্ত জীবনটিকে একখানি বীর-রসাত্মক কাব্য করিয়া লইতে হইবে।

মিল্টন এই কথাটি বলিয়াছিলেন; আর যে ব্যাপারটা বড়ই কঠিন, তাহাও, অর্থাৎ সেই কথার মত কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন।"

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

নিয়ত বসতি যার বারুদের ঘরে,
আগুণের ভয় সে কি ভুলিবারে পারে?

বিড়ালের অত্যাচার দূর করিবারে,
নির্ব্বোধ বাঘেরে ডাকে আপনার ঘরে।

রোগ হতে ভয় বড় ঔষধের যার,
নীরোগ হইতে গিয়া যদি প্রাণ যয়!

একা থাকি সেও ভাল, তবু নাহি সাধ,
থাকিয়া নীচের সঙ্গে করিতে বিবাদ।

অন্নহীন অন্ন চাহে, সাধ্য থাকে দাও,
ফাঁকা উপদেশে কেন পাণ্ডিত্য ফলাও?

মাতাল হয়েছি আমি, কিবা ক্ষতি কার?
যায় বুদ্ধি, ধন, প্রাণ, যাইবে আমার।

লজ্জা আর মরণেতে ভয় নাই যার,
প্রাণান্তেও যাইবে না সংস্রবে তাহার

প্রাণের বিষম সখে উঠিয়াছি গাছে,
বুঝি নাই পড়িবার সম্ভব যে আছে।

বীজ বুনিয়াই ফল চায় যেই জন,
ফল-লাভ ভাগ্যে তার ঘটে না কখন।

—

যত ভাল যে কল সে তত গৌণে ফলে,
যত ভাল কায, সিদ্ধি তত দীর্ঘ কালে।

—

যে করে যে কায তার তাহাই ভাবনা,
অলসের ভাবনায় শৃঙ্খলা থাকে না।

—

পর্ব্বতে চড়িতে হয় বলবান্ শ্রান্ত,
পঙ্গু কিন্তু ভাবে তাহা সহজ নিতান্ত।

—

শ্রমী যাহা লাভ করে প্রাণান্তে খাটিয়া,
অলস বিষণ্ণ বড় তাহা না পাইয়া!

—

সংসারের কোন কায সাধ্য নহে যার,
পর-নিন্দা পর-চর্চ্চা ব্যবসায় তার।

—

চড় দিলে যার মুখে কথা নাহি ফুটে,
তারো কণ্ঠে পর-নিন্দা-প্রস্রবণ ছুটে।

—

জীবন ভরিয়া কেহ প্রাণান্ত খাটিয়া,
কেহ তারে দুকথায় দেয় উড়াইয়া।

—

নির্ব্বোধেরা মনে করে, জিহ্বা আছে যার,
বলিতে সকল কথা তারি অধিকার।

—

স্বর্ণ-রৌপ্য-তুলা নহে কঠিন তেমন,
বড়ই কঠিন বুঝা কথার ওজন।

এরূপ বন্দোবস্ত করিলে যে সময় বাঁচিবে, তাহাতে গ্রীক্ এবং ল্যাটীন্ সাহিত্য সুন্দর রূপে এবং সমধিক পরিমাণে পড়িবার অবসর পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান বন্দোবস্তে আধুনিক ভাষা সমূহের সাহিত্য ভালরূপ অধ্যয়ন করিবার সময় পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রস্তাবিত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে গ্রীক্ এবং ল্যাটীন্ সাহিত্যের সঙ্গে ঐ সকল ভাষার সাহিত্যের ও যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যয়ন করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।

মাতৃভাষা এবং মাতৃভাষার সাহিত্য ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে এখনও স্থান পায় নাই; অন্যান্য দেশে মাতৃভাষা পাঠ্য হইয়াছে, ইংলণ্ডে এখনও তাহা করিতে বাকি আছে; কিন্তু বিদ্যালয়ে বিদেশের প্রচলিত ভাষা কেমন করিয়া পড়াইতে হইবে, তাহা ইংলণ্ডের ন্যায় অন্যান্য দেশেও এ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সাধারণ মত এই যে, ব্যবহারের সুবিধার জন্য কেবল কথা কহিবার উদ্দেশ্যেই ঐ সকল ভাষা শিখাইতে হইবে। ইহা বণিগ্-বৃত্তির মত, ইহা উদার উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত মত নহে; এই মতটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সওদাগরী মতের ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হইবে। ইংরাজী ভাষার বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক মার্শ সাহেব রাজনৈতিক ব্যাপারে জীবন কাটাইয়াছেন, এবং তিনি নিজেও একজন সাহিত্য-সেবক, এবং ভাষা-তত্ত্ববিৎ। তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন, কেবল বিদেশীয় ভাষায় কথা কহিবার অভ্যাস করিতে সাধারণতঃ মনোবৃত্তি [illegible] নিস্তেজ হয় এবং [illegible] ভিন্ন কোন গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট হইবার শক্তি থাকে না, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়াছেন। দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত আধুনিক রাজনীতিবিৎদিগের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলেন, তাঁহারা দুই কি তিন ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের আর কোন ক্ষমতা নাই। প্রাচীন কালের যুবা রাজ-দূতেরা হয়ত অন্য কিছু ত করিতেই পারিতেন না, তাঁহারা কথা বলিতেও জানিতেন না, সুতরাং বলিতে হইবে, আধুনিক যুবা রাজ-দূতেরা এ বিষয়ে লাভবান্, কিন্তু তাহা হইলেও মার্শ সাহেবের কথা অনেক পরিমাণে সত্য। তিনি বলেন যে, অনেক ভাষায় কথা কহিতে গেলে চিন্তা-শক্তি দুর্ব্বল এবং গাম্ভীর্য্য শূন্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এতদ্দ্বারা জীবন্ত জ্ঞান-লাভত দূরের কথা, বরং তাহাতে যে অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহা দূর করিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির উন্মেষ-সাধন এবং জীবন্ত জ্ঞান-লাভ।

আবার, বিদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে পারাই যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা-হইলে বিদেশীয় বিদ্যালয়ে বালককে পাঠাইয়া দিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। নিজে অশিক্ষিত অনেক ইংরাজ অভিভাবক শিক্ষার ব্যাবসায়িক সুবিধাটিই ভালরূপ বুঝেন, এবং তদনুসারে সন্তানকে বিদেশের বিদ্যালয়েই পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কোন বিশেষ দেশে বাস করিতে হইলে যেরূপ

চরিত্রের ভিত্তি এবং যেরূপ উপযোগিতার প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে হইলে কোমল নমনীয় বাল্যকাল সেই দেশে অতিবাহিত করাই কর্ত্তব্য। সলমন্ বলিয়াছেন, "যাহারা বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে বেড়ায়, তাহারা কুলায়-ত্যাগী উড্ডীয়মান পক্ষীর তুল্য।" এই সকল বালকের প্রতি তাঁহার একথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতএব এরূপ অপ্রতিবিধেয় ক্ষতি করিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহাই যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এ কথা বলা যাইতে পারে না। (১) সুতরাং বিদেশীয় ভাষায় কথা কহিবার শক্তিদ্বারা যদিও লোক ভুলাইতে পারা যায়, এবং যদিও সময়ে সময়ে ইহাতে বিশেষ লাভ হইয়া থাকে, তথাপি ইহাকে শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ভাষা শিখিতে গেলেই তাহা বলিবার অভ্যাস কতকটা জন্মে, সর্ব্বোপরি শিক্ষকের উপদেশ এবং শুদ্ধ উচ্চারণ এবিষয়ে সাহায্য করে, তবে যিনি যে ভাষা শিক্ষাদেন, সে ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, বিশেষতঃ শিক্ষিতব্য ভাষাটি শিক্ষকের মাতৃভাষা হইলে আরও ভাল। কিন্তু ইহা অন্যত্র শিখিতে হয়, এবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বিদ্যালয়ের প্রকৃত কার্য্য নহে। প্রাচীন বা আধুনিক যেকোন ভাষাই হউক তাহাকে সাহিত্য স্বরূপ অধ্যয়ন করিতে হইবে, এবং তাহাকে জ্ঞান-লাভের অভিনব পথস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। বিদেশীয় ভাষা অধ্যয়ন করিয়া এ পর্য্যন্ত যে কিছু লাভ হইয়াছে, এই ভাবে মনে রাখিলে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে।

উপরি উক্ত কথাগুলিতে কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, এখন তাহাই দেখা যাউক। আত্মজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভ করাই সাধারণ উদার শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ শক্তির সাহায্যে আমরা এই জ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য হই; অধ্যাপনের একটা প্রধান কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ শক্তি আছে, এ কথায় বিশ্বাস করা। এক জনের বিশেষ শক্তি হয় ত আত্মজ্ঞান বা মানব-তত্ত্বের দিকে, অন্য জনের বিশেষ শক্তি হয়ত প্রাকৃতিক জ্ঞান বা জড়-তত্ত্বের দিকে এই উভয়বিধ জ্ঞানই জ্ঞান-বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, আর সমগ্র জ্ঞান-বৃত্তের কিছু না কিছু অবগত হওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। আধুনিক মতের পরিপোষকগণ কর্ত্তৃক প্রাচীন-তত্ত্বের পরিত্যাগ, আর প্রাচীন মতের পরিপোষক গণ কর্ত্তৃক আধুনিক তত্ত্বের পরিত্যাগ, এ উভয়ই অজ্ঞতার পরিচায়ক। যাহার প্রকৃতির ঝোঁক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে, তাহারও কিয়ৎ পরিমাণে মানব-তত্ত্ব অবগত হওয়া উচিত; আবার যাহার প্রকৃতির ঝোঁক মানব-তত্ত্বের দিকে, তাহারও কিয়ৎপরিমাণে প্রাকৃতিক-তত্ত্ব অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উভয় দিকেই উদার শিক্ষার

(১) যাঁহারা সন্তানকে শৈশব-দোলাতেই ইংরাজী শিখাইতে চাহেন, ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া যাঁহারা বিলাতেই সন্তান জন্মান, অথবা জন্মিবামাত্রই সন্তানকে ইংরাজ-প্রকৃতি-লাভের জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেন তাঁহারা যেন এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া পড়েন। অনুবাদক।

আরম্ভ একরূপ। মাতৃভাষা, লাটিন্ (১), প্রধান প্রধান প্রচলিত ভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত জ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত ও জ্যামিতি, এই সকল শাস্ত্রের স্থূল স্থূল বিষয় উচ্চবিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে সকল ছাত্রকেই পড়ান কর্ত্তব্য। যতদিন পাঠ্য একরূপ থাকে, ততদিন বিদ্যালয়বিভাগের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই পাঠ্য শেষ হইলে বালকের শক্তি এবং লক্ষ্য অনুসারে বিদ্যালয়ও দুই শাখায় বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হয়। তখন হয় মানব-তত্ত্ব না হয় প্রাকৃতিক-তত্ত্ব বালকের প্রধান পাঠ্য হওয়া উচিত। একই বিদ্যালয়ে উক্ত দ্বিবিধ অধ্যয়নের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে খরচ পত্র সম্বন্ধেও বিশেষ সুবিধা; আর ইহাতে বালকদিগের ও অধীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য বশতঃ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হইয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা খুব কম। ফরাসী দেশে এক বিদ্যালয়েই দ্বিবিধ শিক্ষা হইত, কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। গ্রন্থকারের বিবেচনায় ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ে মানব-তত্ত্বেরই অধিক পরিমাণে অধ্যাপন হইত; অধিকতর যোগ্য শিক্ষকেরা এই বিষয়ের অধ্যাপন করিতেন, আর কেহ প্রাকৃতিক তত্ত্বের অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেও মানব-তত্ত্বের প্রভাব তাহাকে ছাড়িত না। তিনি বলেন, কোন বুদ্ধিমান বালক যদি প্রথমাবস্থায় প্রাকৃতিক-তত্ত্ব ভালরূপে পড়িতে পায়, আর সে বিষয়ে তাহার অধ্যয়ন যদি অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে মানব-তত্ত্বের দিকে তাহার রুচি স্ফুরিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার মতে, যে স্থলে নিম্নশ্রেণীতে একপ্রকার পাঠ্য থাকে এবং উচ্চ শ্রেণীতে প্রকৃতি-তত্ত্ব ও মানব-তত্ত্ব অধীত হয়, অথচ শিক্ষক ভাল থাকে এবং ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাই আদর্শ বিদ্যালয়। জর্ম্মনীর জিম্‌নাসিয়ম্‌গুলিতে মানব-তত্ত্বের বিভিন্ন শাখাগুলি এই ভাবেই অধীত হয়; তথায় যে বিষয়ে যাহার শক্তির অভাব দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ের অধ্যয়ন হইতে সে অব্যাহতি পায়, এবং আপন শক্তির অনুকূল বিষয় সে নিজে নিজেও পড়িয়া শিখিতে পারে। ছাত্রকে বিষয়-বিশেষে অনিবার্য্যভাবে বাধ্য করাতে অনেক স্থলে কুফল ফলিয়া থাকে। মানব-তত্ত্বই হউক আর প্রকৃতি-তত্ত্বই হউক, কোন বিষয়েই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের পর হইতে আত্যন্তিক বাধ্যবাধকতা শিথিল করা উচিত। ছাত্রেরা আপন আপন শক্তি এবং রুচি অনুসারে যে কোন বিষয় অধ্যয়ন করুক; যখন সুবিধা হয়, তখন সময়ে সময়ে অনুসৃত বিষয় কিছুকালের জন্য ছাড়িয়া যদি তাহারা বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইতে পারে, সে আরও মঙ্গলের কথা। জিম্‌নাসিয়ম্ এবং রিয়েল্‌স্কুল্ যদি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন দুই প্রকার বিদ্যালয় হইত, তাহা হইলে ছাত্রের পক্ষে এরূপ করিবার সুবিধা থাকিত না।

কেহ বলিতে পারেন, ছাত্রের পক্ষে এরূপ করা কেবল কাল্পনিক আদর্শমাত্র। একথা সত্য বটে; কিন্তু এইরূপ আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই আধুনিকদিগের যত্ন বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতেছে।

ইহাকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিপক্ক করিতে হইলে, প্রথমতঃ জানিতে হইবে, শিক্ষা কি করিতে পারে, এবং কি করা তাহার কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ উভয় বিষয়ের প্রত্যেক বিভাগের জন্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক চাই; যিনি যে বিভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, কেবল সেই বিভাগেই তিনি শিক্ষা দিবেন, অন্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিবেন না।

নবম অধ্যায়।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা এবং পরিচালন-সম্বন্ধে এইক্ষণে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। গ্রন্থকার ১৮৫৯ এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বহুমাসকাল স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইউরোপীয় একটি সভ্যতম জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এ অভিজ্ঞতা অতি অল্প ইংরাজেরই আছে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যে সকল ধারণা জন্মিয়াছে, অন্যান্য ইংরাজের নিকট তাহা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু গ্রন্থকারের মানসিক প্রকৃতি হইতে অন্যান্য ইংরাজের মানসিক প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া যে এরূপ ঘটে, তাহা নহে; গ্রন্থকারের ন্যায় ঐ সকল ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহাদের মনেও ঐরূপ ধারণাই জন্মিত। যাঁহার উদার মনোবৃত্তি বাঁধা কসা নিয়মে এবং কুসংস্কারে কঠিন হয় নাই, তেমন কেহ গ্রন্থকারের ন্যায় দীর্ঘকাল যথাস্থানে উপস্থিত থাকিয়া ফ্রান্স, জর্ম্মণী, ইটালী, সুইজর্লণ্ড ও হলণ্ডের রাজকীয় নাগরিক ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার ধারণা হইবে যে, ঐ সকল দেশের ব্যবস্থা-প্রণালী আধুনিক সমাজের অভাব-পরিপূরণ-মানসে ভবিষ্যদ্দৃষ্টিও উদ্দেশ্যের সহিত গঠিত হইয়াছে, ইংলণ্ডের ব্যবস্থা প্রণালীর ন্যায় কেবল সময় এবং ঘটনাবলীর সাহায্যে গঠিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে রোম এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের মিল আছে কার্ডিনাল্ এণ্টোনেলি রোমান বিদ্যালয়-সম্বন্ধে একদিন গ্রন্থকারের মত জিজ্ঞাসা করিলে গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন, ইউরোপে বেড়াইতে বেড়াইতে রোমের বিদ্যালয় দর্শন করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডের কথা তাঁহার মনে পড়ে। তাঁহার একথা বলিবার অর্থ এই যে, ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও সর্ব্বত্রই চিন্তাহীনতা এবং বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বত্রই একরূপ রাজকীয় অক্ষমতা এবং অনবধানতা, একরূপই স্বৈরাচার এবং অপব্যবহারের স্বাধীনতা, একরূপই হট্টগোল, সকলে সমবেত ভাবে এক উদ্দেশ্যে খাটিবার অভাবও একরূপই; সুতরাং ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার ন্যায় এখানেও শক্তির অপব্যবহার, অত্যাচার, এবং অভিলষিত ফলের অল্পতা একরূপই। আধুনিক কোন রাজ্যই ব্যবস্থা-কার্য্যে স্বাধীনতার প্রশ্রয় না দিয়া, সং-।

যুক্তি-সঙ্গত এবং সুবন্দ-প্রসূ ব্যবস্থা না করিয়া চলিতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ে বৈষম্য থাকিলেও অস্ট্রিয়া, রোম এবং ইংলণ্ডের একটি বিষয়ে সমতা আছে; সে-বিষয়টি এই যে, মানবীয় বিষয়-ব্যাপারে বুদ্ধি বা যুক্তির যে কোন অধিকার আছে, ঐসকল দেশের রাজকীয় বিধান-ব্যবস্থা তাহা স্বীকার করে না। রোমে ধর্ম্মের নামে, অস্ট্রিয়াতে রাজ-ভক্তির নামে, এবং ইংলণ্ডে স্বাধীনতার নামে এই অধিকারের বলি-দান হইতেছে। ধর্ম্ম, রাজভক্তি এবং স্বাধীনতা ইহারা সকলেই সম্মানের উপযুক্ত; কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ যে অনিবার্য্য নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তাহা উপেক্ষা করিলে ইহারা কেহই আপন আপন উপাসককে রক্ষা করিতে পারিবে না।

ফ্রান্স্ নূতন রাষ্ট্র-প্রণালী সংগঠন করিবার মানসে প্রাচীন ব্যবস্থা মুছিয়া ফেলিয়াছিল, অবশেষে ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব দ্বারা সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, একথা সকলেই শুনিতে পান। কিন্তু কেহ ইউরোপ-খণ্ডে যাইয়া যদি বিশেষ প্রণিধানের সহিত এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উন্নতি-মার্গগামী প্রত্যেক দেশই ফ্রান্সের অনুসরণ করিতেছে, এবং তদনুসারে আপন আপন ব্যবস্থা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছে। এই গ্রন্থ লিখনের পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্ব হইতে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সেই সকল ঘটনার সুযোগে ইটালী আপনার ব্যবস্থা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছে। [illegible] হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রুসিয়াও আপন ব্যবস্থা প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে, তৎকালীন পরাজয় এবং দুর্দ্দশায় তাহার যে শিক্ষা হইয়াছিল, তাহাই এ পরিবর্ত্তনের কারণ। কিন্তু রুষিয়াতে এখন যে পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, তাহা এতদপেক্ষাও গুরুতর। আমেরিকায় কোন প্রাচীন ব্যবস্থা প্রণালী ছিলনা, সেখানকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সামাজিক অবস্থার উপরেই গঠিত। গ্রন্থকার বলেন, যে সকল দেশে জীবন এবং উন্নতির লক্ষণ বর্ত্তমান, সে সর্ব্বত্রই আধুনিক ব্যবস্থা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে; ফ্রান্সে ত ঘটিয়াছেই,—যে সকল দেশে কোন রাষ্ট্র-বিপ্লব হয় নাই, সে সকল দেশেও এ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

ইংলণ্ডে যে জীবন এবং উন্নতি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আবার ইংলণ্ডের বর্ত্তমান গতিতে যে গোলযোগ এবং অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? ইহার কারণ, ইংলণ্ডের যে স্বাভাবিক জীবনী শক্তি আছে, তাহাতে সে প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করিতে পারে না; আবার তাহার সেই আপাদ-মস্তক প্রাচীন ব্যবস্থা দ্বারাই সে আধুনিক সমাজের প্রয়োজন সম্পাদন করিতে চাহে। মৃতবৎ থাকিয়া কেবল জীবিত বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডকেও পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিতে হইবে। যাহাহউক, কেবল শিক্ষাব্যতীত এই বিশাল পরিবর্ত্তন-ব্যাপারের আর কোন অংশে হস্তক্ষেপ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এই অংশটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়; এই অংশ যদি

[illegible] হইতে পারে, অথচ অন্যান্য অংশের সম্পাদন কঠিন এবং বিরক্তিকর না হইয়া সহজ এবং ক্রমশঃসাধ্য হইতে পারে।

[illegible] শিক্ষা-সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলিবার আছে। দেশে সাধারণ শিক্ষার অবস্থা কি, লোকে এখন তাহা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাধ্যকরী শিক্ষা-প্রণালীর কথাও এখন আলোচিত হইতেছে। (১) কিন্তু ইংলণ্ডে বাধ্যকরী শিক্ষা-প্রণালী অথবা জাতীয় শিক্ষার অন্য কোন প্রণালীতে প্রধান অন্তরায় কি? তাহা এই,—যে মুহূর্ত্তে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এই শিক্ষার প্রশ্ন উঠিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা আত্ম-সম্মানের বশবর্ত্তী হইয়া বলিবে, তাহারা অন্যান্য দেশের শ্রম-জীবীদিগের ন্যায় সাধারণ বিদ্যালয় চায়, ধর্ম্ম-যাজক, ভূস্বামী কিম্বা কুঠিয়ালের নিজের বিদ্যালয় চায় না। আবার সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার পথেই বা প্রধান অন্তরায় কি? না, দেশীয় নাগরিক ব্যবস্থার উপরে এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ফ্রান্স, জর্ম্মণী, ইটালী এবং সুইজর্লণ্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নাগরিক সভা-সমূহের অধীনে নাগরিক ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠাপিত; অন্যভাবে তথায় প্রাথমিক শিক্ষা অসম্ভব হইত। কিন্তু ইংলণ্ডে এখনও নাগরিক ব্যবস্থার অভাব রহিয়াছে; রাষ্ট্র-বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সে অথবা মধ্যযুগে সমস্ত ইউরোপে যেরূপ যাজক অথবা ভূস্বামীর [illegible] ব্যবস্থা ছিল, ইংলণ্ডে বহু বিষয়ে এখনও তাহাই চলিতেছে। ইংলণ্ডে যাঁহারা বাধ্যকরী শিক্ষা-প্রণালী বিবেকের স্বাধীনতা এবং বিদ্যালয়ের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে অনবরত আন্দোলন করেন, তাঁহারা এ সকল কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। সাধারণ শিক্ষা প্রকৃত ভাবে বিস্তার করিতে হইলে প্রথমেই প্রকৃত নাগরিক ব্যবস্থা চাই; ইতিপূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, আধুনিক সমাজের জন্য আধুনিক সময়োপযোগী ব্যবস্থা চাই, এ স্থলে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

সকলেরই এখন ধারণা হইয়াছে যে প্রাথমিক পরিচালনা রাজরই কার্য্য। অনেকের ধারণা এখনও এইযে, উচ্চশিক্ষা আপনার বিধান আপনই করিবে। পূর্ব্বকালে ইউরোপের সর্ব্বত্র এইরূপ ধারণাই ছিল, অন্ততঃ কার্য্য কালে এইরূপই হইত। ইতিপূর্ব্বে দেখাগিয়াছে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হম্বল্টের সময়ে প্রাসিয়ার উচ্চশিক্ষায় রাজা রীতিমত হস্তার্পণ-করেন; প্রাসিয়ার পক্ষে দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং ভীতিপূর্ণ, সেই বৎসরেই তিনি বার্লিন্ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গ্রন্থ-লিখনের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সুইর্জলণ্ডে সাধারণ শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, ইটালীতে সবেমাত্র ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। প্রাগুক্ত দেশ-সমূহে দেখা গিয়াছে যে, আধুনিক সমাজের উপযোগী নাগরিক ব্যবস্থা করিতে গেলেই প্রকৃষ্ট প্রণালীর নিম্ন এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, আর রাজার হস্ত-ক্ষেপন ব্যতীত তাহা চলেনা।

কোন ইংরাজ পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে

(১) গ্রন্থ-লিখন সময়ে ইংলণ্ডে এপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কেবল তাহার আলোচনা হইতেছিল মাত্র। অনুবাদক।

পারেন,ইংলণ্ডে প্রাচীন্ প্রণালীর অনুবর্ত্তনে কি ক্ষতি হইয়াছে? একথা ভরসা করা যায় যে,জর্ম্মনী কিম্বা ফ্রান্সের মধ্য এবং উচ্চশ্রেণীর ৬৮,০০০ জন ছাত্র যেরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইতেছে,ইংলণ্ডের মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর ৬৫,০০০ জন ছাত্র যে সেরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইতেছে না, অনুসন্ধানার্থ গঠিত শিক্ষা-সমিতি তাহা স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। ৬৩০০ জন প্রুসীয় ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ উৎকৃষ্ট উচ্চশিক্ষা পাইতেছে, অথবা তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ছাত্র ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ উৎকৃষ্ট উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে, ইংলণ্ডের ৬,৩০০জন ছাত্র সেরূপ উৎকৃষ্ট উচ্চশিক্ষা পাইতেছে না, কোন সমিতির অনুসন্ধানে ইহা নির্ণীত না হইয়া থাকিলেও ইংরাজ পাঠক কথাটা বিশ্বাস করিবেন, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের উচ্চশিক্ষা যেমন অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট, তত্রত্য উচ্চবিদ্যালয়গুলিও সেইরূপ অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট। অবশ্য, উৎকৃষ্ট শিক্ষা এবং উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলিতে, যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকের ভাগ্যেই পড়ে। অপকৃষ্ট বিদ্যালয় এবং অপকৃষ্ট শিক্ষা প্রধানতঃ মধ্যবৃত্ত লোকের ভাগ্যেই যুটিয়া থাকে। ইউরোপ মহাদেশের বিদ্যালয়গুলির দিকে চাহিলেই এই অসুবিধাটি চক্ষে পড়ে। এই অসুবিধার দুইটা দিক্ আছে, একদিক সামাজিক এবং অপরদিক্ মানসিক।

সামাজিক অসুবিধা এই। ইউরোপ মহাদেশে নিম্ন এবং মধ্যশ্রেণী একই ভিত্তির উপরে সম্বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে সাধারণতঃ মধ্যশ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র ভূমি। ইংলণ্ডে মধ্য এবং উচ্চশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট সীমা-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শিক্ষা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে এ সীমা স্পষ্ট ভাবেই লক্ষিত হয়। অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্ব্রিজের ন্যায় কয়েকটি বিদ্যালয়, সৈনিক ও নৌবিভাগ এবং রাজকীয় যে সকল পদ ভদ্রলোকের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য, এই সকল বিদ্যালয় এবং এই সকল পদ একরূপ শিক্ষা, সামাজিক চিহ্ন এবং মানসিক ভাব বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে, এবং যাহারা এই গুলি লাভ করে, তাহারাই উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হয়। বিশেষ কোন শক্তি বা অবস্থার যোগ না হইলে ঐ সকলের সাহায্য ব্যতীত কোন ইংরাজ এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না, কারণ যে ভাব নিচয় দ্বারা উক্ত শ্রেণীর একতা-বন্ধন সংগঠিত, সে ভাবনিচয় তাহার নাই। উচ্চশ্রেণী বা অভিজাত-বর্গের মধ্যে এই ভাব-নিচয়ই স্বাভাবিক এবং প্রধান বন্ধন। এই শ্রেণীর অধিকাংশই কর্ম্মচারি-বর্গ; এই জন্য ইংলণ্ডের ন্যায় অন্য কোন দেশেই কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে অভিজাতবর্গের ভাব প্রকাশ পায় না। ইহার ভাল দিক দেখিতে গেলে উন্নত ভাব, আত্মমর্য্যাদা এবং মহৎকার্য্যের মহত্ব বোধ পরিলক্ষিত হয়; এই সকল গুলিই শাসকের উপযুক্ত গুণ, এবং দীর্ঘকাল হইতে এই সকল গুণ ইংলণ্ডের কর্ম্মচারিবর্গে সংগৃহীত হইয়া অভিজাত-বর্গের শাসন শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। কিন্তু ইহার মন্দ দিক্ দেখিতে গেলে বিজ্ঞান অথবা প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানের জন্য অনিচ্ছা এবং অসামর্থ্য পরি-

লক্ষিত হইবে। ইউরোপ মহাদেশে কর্ম্মচারি-বর্গই বিজ্ঞান এবং প্রণালী-বদ্ধ-জ্ঞানের প্রধান আশ্রয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ ইংলণ্ডে সেরূপ নহে। ইংলণ্ডের কর্ম্মচারি-বর্গ সামাজিক ভাবে শিল্পী এবং ব্যবসায়ি-বর্গের সমাবদ্ধ হইলেও যেমন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, মহাদেশে সেরূপ হয় নাই। অতএব ইংলণ্ডের মধ্যশ্রেণী যেরূপে দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেরূপ অন্যত্র হয় নাই। ইহাদের এক ভাগ কর্ম্মচারি-বর্গ; ইহাদের উৎকৃষ্ট শাসন শক্তি আছে, কিন্তু বিজ্ঞান বোধ নাই। অপর ভাগ ব্যবসায়ি-বর্গ; সকল দেশেই সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় ইহারা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহাদের উপরেই ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, এবং সর্ব্ববিষয়েই অগ্রগামী সম্প্রদায়ে ইহারা প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে; কিন্তু ইংলণ্ডে ইহারা অভিজাত এবং কর্ম্মচারি-বর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর শাসকোচিত গুণ গুলিও ইহারা পাইতেছে না।

ইহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যদি বিজ্ঞানটা মধ্যশ্রেণীর হাতে থাকিত, তাহা হইলেও প্রবোধের কথা ছিল। সকল দেশেই বিজ্ঞানটা প্রধানতঃ মধ্যশ্রেণীর হাতে থাকা উচিত; কারণ বিলাসিতা বা কায়িক শ্রম, ইহাদের কোনটাই মধ্যশ্রেণীর পক্ষে বিজ্ঞানানুশীলনের অন্তরায় নহে। কিন্তু ইংলণ্ডে অধিকাংশ উচ্চবিদ্যালয়ের শোচনীয় অবস্থা এ বিষয়ের অন্তরায়। ইউরোপ মহাদেশে কর্ম্মচারি-বর্গ যদি অভিজাত-বর্গের ন্যায় বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন হইতেন, তাহা হইলে সুশিক্ষিত ব্যবসায়িবর্গ তাঁহাদের হাত হইতে সমাজের নেতৃত্ব কাড়িয়া লইয়া নিজেই তাহা গ্রহণ করিত। কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যবসায়ি-বর্গ সামাজিক এবং মানসিক উভয় প্রকারেই অভিজাত বা কর্ম্মচারি-বর্গ হইতে অপকৃষ্ট। ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রগণই বিজ্ঞান বা প্রণালী-বদ্ধ জ্ঞান-বিষয়ে হীন, আবার মধ্যশ্রেণীর জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সে বিষয়ে আরও হীন। এই সকল বিদ্যালয় সামাজিক বা শাসনোপযোগী গুণ ত দিতেই পারে না, আবার মানসিক শক্তিদ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণও করিতে পারে না।

একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের মধ্যশ্রেণী নিজের শিক্ষার ত্রুটি না দেখুক, ইহার অপকার উপলব্ধি না করুক, এবং বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকুক, তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে না। যে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া চলে, সে মৃত বলিয়া গণ্য হয়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম; যে এ নিয়মের অনাদর করিবে, তাহার যতই আত্ম-শক্তি-বিশ্বাস, উদ্যোগ এবং মূলধন থাকুক না কেন, সে চিরদিন মৃতই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু অপকৃষ্ট শিক্ষার জন্য যে প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত, এ বিষয়ে অন্য লোকের নিকট হইতে প্রমাণ লইতে গেলে ইংলণ্ডের ব্যবসায়িবর্গ দেখিতে পাইবেন, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য।

জীবনের সমস্ত সময়ই শিক্ষার সময়, সুতরাং এক ভাবে সমস্ত মানবজীবনকেই ছাত্রজীবন বলা যাইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরিতে গেলে বালক অথবা যুবক যে সময়ে শিক্ষকের অধীন হইয়া রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করে, কেবল তাহাকেই ছাত্র-জীবন নামে আখ্যাত করিতে হয়। ছাত্র-জীবন জীবনের সার অংশ, এই খানেই ভাবী উন্নতি অবনতির সূত্রপাত হয়, এই স্থান হইতেই জীবন হয়ত স্বর্গের পথে নয়ত নরকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

বর্ত্তমান ছাত্রসমাজের, এমনকি বহুতর বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞানী শিক্ষিত লোকদিগের মুখেও অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, যাহারা জীবনপথের প্রথম পথিক, সংসারক্ষেত্রে যাহারা প্রবিষ্ট হয় নাই, বরং যাহারা অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া সংসারপ্রাঙ্গনের লীলা-খেলা অবলোকন করিতেছে, এক কথায় বলিতে গেলে যাহারা ছাত্র, তাহাদিগের নিকট দিবারাত্রি পুস্তকপাঠ ও কৃতকার্য্যতার সহিত পরীক্ষা পাশ করা ব্যতীত আর কিছুরই আশা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ভুল। কেবল পুস্তকপাঠ, কেবল কৃত-কার্য্যতার সহিত পরীক্ষাপাশ করা ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য নহে। ছাত্র-জীবনে ইহা হইতে শত শত উচ্চতর ও মহত্তর কর্ত্তব্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আজ যাহারা বালক, কাল তাহারা যুবক, আজ যাহারা যুবক, কাল তাহারা সংসারী মানব, আজ যাহারা ছাত্র হইয়া সামান্য লেখাপড়ার কথা লইয়া অস্থির, কাল তাহারা দেশের চালক হইয়া দেশের মঙ্গলা-মঙ্গল বিধায়ক গুরুতর সমস্যা সকলের মীমাংসা করিতে সক্ষম। তাই বলি যদি কেহ স্বদেশের দুরবস্থা দূর করিতে যথার্থ ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হইবে, যে হেতু ছাত্রসমাজের উপরেই সম্পূর্ণরূপে দেশের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্যজ্ঞানের বলেই দেশ উন্নতির উচ্চতম সোপানে উন্নীত হইবে, অথবা ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্যবোধের অভাবেই দেশ অবনতির অধস্তন সোপানে নীত হইবে। অতএব ছাত্রসমাজই দেশের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। এমন যে ছাত্র, যার উপরে তার নিজের পরিবারের, আত্মীয়বন্ধুদিগের, স্বজাতির ও স্বদেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে, তাহার কর্ত্তব্য সংখ্যাতীত। মনুষ্য জীবনে যতকিছু গুরুতর দায়িত্ব আছে, মনুষ্যজীবনে যতকিছু কর্ত্তব্য আছে, তৎসমু-দয়ই ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য। পরিণত বয়সে মানুষ যাহা করিবে, ছাত্রজীবনেই তাহার সূত্রপাত করা কর্ত্তব্য। ছাত্রজীবনের বহুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে যে গুলি প্রধান, যে গুলির

বলে মানব মানব-নামের উপযুক্ত, যে গুলির বলে মানব উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম, আর যে গুলির অভাবে মানব মানব-নামের অনুপযুক্ত, সেই গুলিরই নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) চরিত্র।—সকলেই লিখা পড়ায় খুব ভাল হইবে, সকলেই আনন্দ বাবুর মত ছাত্র হইবে, সকলেই বঙ্কিম বাবুর মত লেখক হইবে, সকলেই সুরেন্দ্র বাবুর মত বক্তা হইবে, তার কোন অর্থ নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলে সকলেই চরিত্রবান্ লোক হইতে পারে। গার্‌ফিল্ড, ম্যাট্‌সিনি, উইলিয়াম টেল্, থিওডোর পার্কার, ফ্রাঙ্কলিন্ প্রভৃতির জীবনচরিত ইহার জলন্ত সাক্ষীস্বরূপ। অন্য পক্ষে একব্যক্তি বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও চরিত্রাংশে হীন ও তজ্জন্য মানব-সমাজে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইতে পারে; লর্ড বেকন্, জার্ম্মেনীর পঞ্চম লুই ও টোলেমীর জীবন ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। চরিত্র বড় গুরুতর বিষয়, মানবজীবনের সর্ব্বস্বধন। যে ব্যক্তির চরিত্র বল আছে, তাহার সমস্তই আছে, সে অতি মহান্, সে দরিদ্র হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, সে মূর্খ হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত, তাহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা নির্ম্মল বিশুদ্ধ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। সে অসাধ্য-সাধনে সমর্থ; রাম, যুধিষ্ঠির, নিউটন, আর্কিমিডিস্ ও সক্রেটিস্ তাহার সাক্ষী স্বরূপ। তাহার নিকট সংসার অবনত মস্তক, যে পাপপরায়ণ নরপিশাচ বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া সংসারবক্ষে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে, কাহাকেও ভয় করেনা, কাহাকেও গ্রাহ্য করেনা, সেও যদি কোন চরিত্রবান্ মহাপুরুষকে সম্মুখে দেখে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাহারও মস্তক তাঁহার নিকট অবনত হয়। সংসার যদি পাপ-সাগরে ডুবিয়া যায়, চন্দ্রসূর্য্য যদি কক্ষ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, জগৎ যদি নাস্তিকতার গভীর তিমির-সাগরে ডুবিয়া যায়, তথাপি সত্যের সম্মান থাকিবে। অতএব চরিত্রলাভ ছাত্র-জীবনের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য।

(২) অভ্যাস।—চরিত্র অভ্যাসের উপর সংস্থাপিত। অভ্যাস যদি ভাল হয়, যে ভাবে চলে, আপনা হইতে যে প্রণালীতে তাহার মন ও কার্য্য বিগঠিত হয়, তাহাই তাহার অভ্যাস। অভ্যাস, বিশেষতঃ অসদভ্যাস অতি সহজে গঠিত হয়, এবং একবার গঠিত হইলে সহজে আর তাহার পরিবর্ত্তন করিতে সাধ্য থাকে না। অতএব সদভ্যাস লাভকরা ছাত্রজীবনের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। ছাত্র ভালই হউক আর মন্দই হউক, সৎই হউক আর অসৎই হউক, তার পড়িবার, বেড়াইবার, খাইবার ও শুই-বার একটী না একটী অভ্যাস হইবেই হইবে। যাহাতে সে অভ্যাসটি ভাল হয়, প্রথম হইতেই সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(৩) সংসর্গ।—অভ্যাস অনেক পরি-মাণে সংসর্গের উপরে নির্ভর করে। মানব-চরিত্র ও মানব-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, মানব একাকী বাস করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহাকে লোক-জন-পরিবৃত হইয়া বাস করিবার জন্যই সৃষ্ট হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্র-সমাজে বন্ধুতা ও ভালবাসার নামে যে সমস্ত ব্যভিচার, যে সমস্ত পাপানুষ্ঠান ও যে সমস্ত অকার্য্যানুপাতের ছায়া অঙ্কিত হইতেছে,

তাহা মনে হইলে প্রাণ অস্থির হইয়া যায়, হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া আইসে। শত শত বালক নির্ম্মল চরিত্র লইয়া স্কুলেভর্ত্তি হইতেছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই অসচ্চরিত্র ছাত্রদিগের কুটিল চক্রে নিপতিত হইয়া আপনাদের দেবোপম সুন্দরচরিত্রকে দূষিত করিয়া তুলিতেছে; পরে আপনাদিগের দুরবস্থার কথা বুঝিতে পারিয়াও সেই সমস্ত কদভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। জগদ্বিখ্যাত ষ্টেন্‌লি একদা মধ্য আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য-পথেভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটী মৃগশিশুর করুণ রসাত্মক চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইয়াছিলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলেন একটি ভয়ঙ্কর সর্প একটি মৃগশিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহার চক্ষের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, মৃগশিশুও সর্পের চক্ষে চক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ চারিদিকে ঘুরিতেছে ও চীৎকার করিতেছে। মৃগশিশু ইচ্ছাকরে পলাইয়া যায়, কিন্তু সে মন্ত্রমুগ্ধ, কিছুতেই পলাইতে পারিতেছে না, বরং ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমেই সর্পের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বর্ত্তমান ছাত্রসমাজে বহুতর ছাত্রের দশা ঠিক এই মৃগশিশুর মত। মৃগশিশু যেমন সর্পের মোহে মুগ্ধ হইয়া পলায়ন করিতে পারিতেছে না, তাহারাও তেমনি দুষ্ট ছেলেদিগের কুটিল চক্রে নিপতিত হইয়া কদভ্যাস শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছে, আর শত চেষ্টা করিয়াও মুক্ত হইতে পারিতেছে না। অতএব বর্ত্তমান সময়ে এদেশের ছাত্রবৃন্দের পক্ষে বন্ধু অর্থাৎ সঙ্গী বাছিয়া লওয়া একটি অতি গুরুতর কর্ত্তব্য।

(৪) বাধ্যতা।—পিতামাতা শিক্ষক ও অন্যান্য মান্যব্যক্তিদিগের বাধ্য হওয়া ছাত্র-জীবনের আর একটী কর্ত্তব্য। অনেক সময় বহুতর ছাত্র-নামধারী ভদ্রলোককে উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ও গোঁয়ার গোবিন্দ সাজিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিতে দেখা যায়, বাস্তবিক ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

(৫) পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।—পরিশ্রমী ও অধ্যাবসায়-সম্পন্ন হওয়া ছাত্র-জীবনের আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। কারণ সংসারে যত কিছু বড়, যত কিছু মহৎ কার্য্য আছে, তৎসমুদয়ই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। ফ্রেঙ্কলিন, কীটো, ডিমস্থিনিস্, সেরিডেন, ডিজরেলি, উইলবারফোর্স ও গ্লাড্‌ষ্টোনের জীবন ইহার সাক্ষী স্বরূপ।

(৬) নিয়ম-প্রতিপালন।—প্রত্যেক ছাত্রের শারীরিকও মানসিক অবস্থার সহিত অধ্যয়ন, ব্যায়াম ও অন্যান্য কার্য্যের অনুপাত রক্ষা করিয়া এক এক খানা নিয়মাবলী প্রস্তুত করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও তদনুসারে চলা উচিত। বহুতর ছাত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়, এক দিন অনেক রাত্রি জাগরণ করিয়া পরদিন প্রাতে নিদ্রা যাইতেছে, এক দিন বক্তৃতার হুজুকে বৃথা সময় ব্যয় করতঃ পরদিন দারুণ পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিতেছে। বাস্তবিক এইরূপ অধ্যয়নে শরীর ও মন শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। নিয়মিত দুই ঘণ্টা পাঠ অনিয়মিত পাঁচঘণ্টা পাঠের সমান, কারণ যাহার পড়িবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, অথচ ঘানি বৃক্ষের মত সারাদিনই ঘেন্ ঘেন্

করিয়া পাঠ করিতেছে, তাহার মন অনেক সময় পুস্তকে না থাকিয়া নিকটস্থিত কুঞ্জ-বনে, খেলার জায়গায়, বন্ধুবান্ধবদিগের বাস-ভবনে, অথবা অন্য কোথাও সংলিপ্ত থাকে। শুধু এই কারণেই অনেক সময় স্মরণ-শক্তির তারতম্য ঘটিয়া উঠে। নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে যে সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক বেশী কায করিতে পারা যায়, তাহা আমরা মার্টিন লুথার, সেনেকা, রথার ফোর্ড, জেরেমি ইবার্ড, পিটার, পল, ও এলফ্রেডের জীবনী পাঠে বিশেষরূপে অবগত হই।

(৭) স্বাবলম্বন।—সাবলম্বন ছাত্র-জীবনের আর একটা উচ্চতর কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান ছাত্র সমাজের স্বাবলম্বনের বড়ই অভাব। অনেক সময়ে দেখা যায় ছাত্রবৃন্দ পড়ার সময়ে, সাপ্তাহিক পরীক্ষার সময়ে, এমন কি বাৎসরিক পরীক্ষা প্রভৃতির সময়েও পরস্পর সাহায্য করিয়া থাকে। বাস্তবিক ইহা বড়ই অন্যায় ব্যাপার। ইহা যেমন পাপ তেমনি উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ। ইহাতে ছাত্রকে অসার অপদার্থ করিয়া তুলে। বর্ত্তমান সময়ে ভুরি ভুরি অর্থ ও ব্যাখ্যা পুস্তক প্রচার ছাত্রবৃন্দের স্বাবলম্বন-শিক্ষার আর একটি অন্তরায়। পূর্ব্বে কোনরূপ অর্থ বা ব্যাখ্যা পুস্তক ছিল না, ছাত্রদিগকে অভিধান দেখিয়া নিজে নিজে অর্থ বাহির করিতে হইত, নিজে নিজে ব্যাখ্যা করিতে হইত, তাই—সেকালের শিক্ষা আর একালের শিক্ষাতে এত প্রভেদ। স্বাবলম্বনের অভাব বর্ত্তমান ছাত্র-সমাজের অধঃপতনের একমাত্র মূলীভূত কারণ। রাম আমা অপেক্ষা ভাল ছেলে, তাহার অর্থ এই রামের স্বাবলম্বন আছে, আমার তাহা নাই। স্বাবলম্বন বড় গুরুতর বিষয়; ইহা উন্নতির ভিত্তিভূমি এবং মনুষ্যত্বের দ্বার স্বরূপ। সংসারে ভাল বলিতে যাহা কিছু হইয়াছে, সমস্তই স্বাবলম্বনের ফল। ওয়াট, আর্করাইট, নিউটন্ ফ্রেঙ্কলিন গেলিলিও, আর্কিমিডিস্ ইহারা সকলেই স্বাবলম্বনের গুণে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজিত। স্বাবলম্বন প্রতিভার প্রসূতি। যে ব্যক্তি আপনার হৃদয়কে জগতের প্রতিকৃতি বলিয়া জানে, সে সেই অনন্ত হৃদয় সমুদ্রকে মন্থন করতঃ স্বল্পায়াসেই জ্ঞান-রত্ন লাভ করিতে পারে। পৃথিবীতে যত কিছু মূল্যবান পদার্থ আছে, যত কিছু বহুমূল্য রত্নরাজি আছে, তৎসমুদয়ই ঐ একস্থানে নিহিত রহিয়াছে; যে ঐ সমস্ত উদ্ধার করিতে জানে সে মানবরূপী দেবতা, আর যে তাহা জানেনা সে মানবরূপী পশু। বীর-পুঙ্গব ইংরেজগণ ওয়াটারলুর ভীষণ যুদ্ধে টলে নাই, প্লাসির শোণিতস্রোতঃ দর্শন করিয়া বিচলিত হয় নাই, রাজনীতির রহস্য-ধারণে অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, বরং বারিধি-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া সমগ্র পৃথিবীর প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছে, সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, বেলুচিস্থান হইতে ব্রহ্ম দেশ পর্য্যন্ত সগর্ব্বে পাদ চারণা করিয়া বেড়াইতেছে। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া তাহাদের রাজশক্তির নিকট মস্তক অবনত করি-

য়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তাহাদিগের স্বাবলম্বনই ইহার একমাত্র কারণ। অতএব প্রত্যেক ছাত্রেরই আপন শক্তিতে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করা অর্থাৎ স্বাবলম্বনরূপ ব্রত গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(৮) মিতব্যয় ও মিতাচার।—মিতব্যয় ও মিতাচার-শিক্ষা ছাত্রজীবনের আর একটী উচ্চতর কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, গরিব পিতা বহুকষ্টে পুত্রের লেখা পড়ার খরচ প্রদান করিতেছেন, আর গুণবান পুত্র জাঁক জমকে, বৃথা বাবুগিরিতে বৃদ্ধ পিতার সেই কষ্টলব্ধ অর্থরাশি বিসর্জ্জন দিতেছে, এবং নিজে লিখাপড়ায় কালিদাসের বাবা সাজিতেছে; দুঃখের বিষয়, এ গরিবদেশে এরূপ কুলাঙ্গারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আরও গভীর দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই দেবোপম ছাত্রসমাজে অমিতাচারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

(৯) শিক্ষার উদ্দেশ্য।—শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা ছাত্রজীবনের আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। অনেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে পারেনা, মনে করে শিক্ষা করিয়া চাকুরি করিবে ও তদ্দ্বারা আপনার পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করতঃ সুখ সচ্ছন্দে জীবন পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহার শতগুণে মহত্তর। মানুষের সদসৎ বিবেচনা শক্তি আছে, মানুষ সৃষ্টির রাজারূপে সৃষ্ট। যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু উদর পূরণ হইত, তবে বনান্তবিহারী পশু পক্ষী ও মানবে কিছু মাত্র প্রভেদ থাকিত না। পশু পক্ষীরাও ত আপন আপন আহারান্বেষণ করিয়া থাকে? তাই বলি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য উদর পূরণ নহে; শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরি করা ও নহে; কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য গ্রন্থ ও প্রকৃতির অধ্যয়ন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনসংগ্রামে জয় লাভ করা, শিক্ষার উদ্দেশ্য সদসৎ বিবেচনা শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি বিধান করা, শিক্ষার উদ্দেশ্য সমস্ত মানবজাতি ও সমগ্র জগতের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। অতএব এমন যে মূল্যবান্ শিক্ষা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইয়া তদনুসারে অনুষ্ঠান করা ছাত্রজীবনের একান্ত কর্ত্তব্য।

(১০) নৈতিক বল।—বহুতর ছাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াও তদনুসারে কার্য্যকরিতে পারে না; তাহারা মনে কষ্ট পায়, আপনাদের হৃদয়ের জ্বালায় আপনারাই পুড়িয়া মরে, কারণ উদ্দেশ্যানুসারে কার্য্য করিবার উপযুক্ত নৈতিক বল তাহাদের নাই। অতএব নৈতিকবল উপার্জ্জন করা ছাত্র-জীবনের আর একটি উচ্চতর কর্ত্তব্য।

(১১) স্থির প্রতিজ্ঞা।—স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়া ছাত্রজীবনের আর একটি কর্ত্তব্য। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক ছাত্র একবার মাত্র পরীক্ষায় অথবা অন্য কোনও মহদনুষ্ঠানে বিফলমনোরথ হইয়া একেবারে জীবনে নিরাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু এরূপ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। হৃদয়ে যদি জোর থাকে, মনে যদি বল থাকে, প্রতিজ্ঞা

যদি অটল হয়, তবে কর্ত্তব্য কার্য্য যত কেন দুরূহ হউক না, এক সময়ে না এক সময়ে উহা সম্পন্ন হইবে। যবাট উদ্ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

(১২) জীবনের উদ্দেশ্য।—নির্ণয় করা ছাত্রজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন মাতৃগর্ভে মানুষের উৎপত্তি ও শ্মশান ঘাটে তাহার বিনাশ; কিন্তু বাস্তবিক ইহা ভুল,—জীবন অনন্ত। এই সীমাবদ্ধ সামান্য সময়টুকু অনন্ত জীবনের বিজ্ঞাপন মাত্র। আমাদের পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারদাতা এক জন আছেন, তাহা মুক্ত কণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। শুধু আমরা যাহা করি তাহাই নহে, আমরা যাহা ভাবি তাহাও তিনি জানিতে পারেন। অতএব এমন যে দায়িত্বপূর্ণ জীবনতরী, তাহাকে সংসারসমুদ্রে যথেচ্ছা ভাসিতে দেওয়া উচিত নহে। কেননা তাহা হইলে প্রবল সামুদ্রিক ঝঞ্ঝাবাতে নৌকা মারা যাইতে পারে। জীবনের অতি প্রত্যুষ সময়েই জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। উদ্দেশ্য বিহীন জীবন পাগলের জল্পনা-কল্পনা মাত্র, তাহা কোন পথে কিরূপে চালিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যেকেরই "যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহা জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, প্রাণ যায় যাউক, তাহা সম্পাদন করিবই করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত। পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সকলেরই অতি শৈশব কালে জীবনের লক্ষ্য ঠিক ছিল। সংসারে কর্ত্তব্যের পথ, যশো-মন্দিরের পথ বহুতর; তাহার মধ্যে জীবনের প্রত্যুষ সময়ে মন যে পথে ধাবিত হয়, তাহাই অবলম্বন করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য; কেননা একজন মানুষের সমস্ত পথ অবলম্বন করা অসম্ভব। চীনদেশ যখন তাতারদিগের উপদ্রবে উপদ্রুত, যখন দলে দলে চীনগণ তাতারদিগের অসিতলে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে, তখন ত্রয়োদশ-বর্ষ বয়স্ক 'কং' প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি স্বদেশকে প্রাচীর, পরিবেষ্টিত করিয়া বিদেশীয় দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবেন। সে প্রতিজ্ঞার ফল চীনের সুবিখ্যাত প্রাচীর ও তদ্দ্বারা 'কং' এর অমরতা লাভ।

জাপান যখন অসভ্যতার গাঢ় অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, যখন জাপানের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত, নরহত্যা ডাকাতি ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে, যখন জাপানবাসী সভ্য জগতের চক্ষে হিংস্র জন্তু বিশেষ, তখন ত্রয়োদশ-শতাব্দির প্রারম্ভে জাপানের সেই গভীর অজ্ঞানতার সময়ে একটি পঞ্চদশ বয়স্ক বালক প্রতিজ্ঞা করিলেন, জাপানের দুঃখদুর্দ্দশা দূরকরিবেন। তাঁহার নাম 'মিকেডো'। তাঁহার প্রতিজ্ঞার বলে আজ জাপান 'প্রশান্তমহাসাগরের গ্রেট ব্রিটেন', তিনি আজ অমর।

কার্থেজ যখন রোমের পদানত, কার্থেজের প্রধান প্রধান বীর পুরুষগণ যখন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন নবম বর্ষীয় 'হ্যানিবল' মুমূর্ষু পিতৃসন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি রোম বিধ্বংসকরিবেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ফল কিরূপে ফলিয়াছিল,

ইতিহাস তাহার সাক্ষী। হানিবল আজ অমর।

আমেরিকা যখন অতি শিশু, তাহার হস্ত পদ যখন শক্ত হয় নাই, যখন আপন জানুর উপরে নির্ভর করিতে তাহার শক্তি জন্মে নাই, হামাগুড়ি দিয়া যখন সে মার চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল, মা যখন অত্যাচারের উপরে অত্যাচার করিয়া তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিতেছিলেন, তথন সেই দুরবস্থার সময়ে অষ্টাদশবর্ষীয় বালক 'ওয়াসিংটন' প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমেরিকার দুঃখ দূর করিবেন। তাহার ফলে আজ আমেরিকা স্বাধীন ও সভ্যজগতের শীর্ষস্থানে আসীন। ওয়াসিংটন অমর।

যখন তোতলা, অস্পষ্টভাষী, কদর্য্য ভঙ্গীমান ডিমস্থিনিস্ দেখিলেন মাসিডনের অধিপতি ফিলিপের অত্যাচারে গ্রীস্‌রাজ্য জর্জ্জরিত ও ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তথন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, বক্তৃতা দ্বারা তাহার কাহিনী দ্বারে দ্বারে বিঘোষিত করিবেন। লোকে শুনিয়া বামনের চন্দ্রাকর্ষণের ন্যায় তাঁহার কার্য্য অসম্ভব মনে করিতে লাগিল; অনেকে তাঁহাকে উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হইল না। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশানুরাগের প্রদীপ্ত অগ্নি ধাঁ ধাঁ করিয়া জ্বলিতেছিল, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে রুদ্ধগৃহে, পর্ব্বত গহ্বরে, গভীর অরণ্যে, নির্জ্জন প্রান্তরে, সমুদ্রের উপকূলে এবং নদীর পুলিনে বর্ক্তৃতা করিতে করিতে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। অবশেষে ফিলিপের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তৃতা বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ডিমস্থিনিস্ আজ সিদ্ধকাম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী।

নেপোলিয়ান যখন অতি শিশু, তাঁহার বয়স যখন দশবৎসর অতিক্রম করে নাই, তথনই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। চেষ্টার বলে তিনি ফরাসীদেশের সম্রাট্ হইলেন ও বহুতর সাম্রাজ্য জয়করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আজ নেপোলিয়ান অমর।

জার্ম্মাণি যখন শত শত ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ও পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত, তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক বিস্‌মার্ক প্রতিজ্ঞা করিলেন জর্ম্মণরাজ্যের একীকরণ সংসাধন করিবেন, নতুবা এই চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ের পর সীডানের যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার কলহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, জর্ম্মণরাজ্যের একতা সংসিদ্ধ হইল। আজ বিস্‌মার্ক সিদ্ধার্থ ও অমর।

বালক ধ্রুব পাঁচবৎসর বয়সে প্রতিজ্ঞা করিলেন হরিসাধন করিয়া জননীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবেন। অবশেষে সাধনার বলে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। হরি দর্শন পাইয়া জননীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিলেন। ধ্রুব আজ অমর। শিশু প্রহ্লাদ প্রতিজ্ঞা করিলেন, হরি সাধন দ্বারা পিতাকে মুক্ত করিবেন, দীর্ঘকালের কষ্ট যন্ত্রনার পর তাঁহার বাসনা সফল হইল। তিনি ও আজ অমর। বনবাসী শিশু রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন দুর্জ্জয়প্রতাপ লঙ্কাধিপতি রাবণকে সংহার করতঃ সীতা উদ্ধার করিবেন ও পৃথিবীকে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত

করিবেন। দীর্ঘকালের সংগ্রামের পর রাবণ সবংশে নিহত হইল। রাম আজ অমর। বনবাসী, ভিক্ষান্নজীবী, ছদ্মবেশী ও বিড়ম্বিত যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে সম্রাট হইবেন। তখন দুর্য্যোধনের রাজশক্তি অদম্য, যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা তাঁহার কাছে উপহাসের বিষয় হইল, কিন্তু মনের বলের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে; কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দুর্য্যোধনের বীর্য্যবহ্নি নিবিয়া গেল, যুধিষ্ঠির সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনিও আজ অমর। শাক্যসিংহ মানবের দুঃখকষ্টে অধীর হইয়া শৈশবেই প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহাদিগকে শান্তিসুধা বিতরণ করিবেন। প্রতিজ্ঞা পালনার্থে স্নেহশীল জনক জননী, প্রিয়তমা পত্নী সুকুমার পুত্র ও সর্ব্বপ্রকার রাজবিভব পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী সাজিলেন। দীর্ঘকালের অধ্যয়ন, জ্ঞানান্বেষণ, ও কঠোরতম তপস্যার বলে তিনি পরিশেষে সিদ্ধার্থ হইলেন। আজ চতুঃপঞ্চাশৎ কোটী লোক তাঁহার শিষ্য। বুদ্ধদেব আজ সফল মনোরথ। বৌদ্ধদিগের ঘোর প্রতাপানলে যখন হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে তখন দাক্ষিণাত্যের নাম্বুরি জাতীয় একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক প্রতিজ্ঞা করিলেন বৌদ্ধপণ্ডিত দিগকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিবেন। অচিরে তাহার চেষ্টা সফল হইল, বৌদ্ধপণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়া অবনত মস্তকে পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই বালকের নাম শঙ্করাচার্য্য তিনিও আজ অমর। বালক চৈতন্য যখন দেখিলেন সংসার নীরস ধর্ম্মভাবে পূর্ণ রহিয়াছে তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন ধরাধামে স্বর্গীয় প্রেম আনয়ন করিবেন। জননীর আর্ত্তনাদ ও পতিব্রতা পত্নীর প্রেম উপেক্ষা করিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। স্বর্গ হইতেই যেন প্রেমবারি অজস্রধারায় বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও যবন একসূত্রে ঐশপ্রেমে মত্ত হইল। সেই জন্য বঙ্গদেশ আজও সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত। চৈতন্যদেব আজ সিদ্ধার্থ ও অমর। কবিগুরু মধুসূদন প্রতিজ্ঞা করিলেন এমন কিছু করিবেন যাহাতে লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া যাবেনা। মেঘনাদ বধ কাব্য সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছে। তাই আজ মধুসূদন ও অমর।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই, পৃথিবীর ইতিহাস এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব জীবনের অতি প্রত্যুষেই পৃথিবীর ইতিহাস হইতে আপনার মনোমত একটী উচ্চতম আদর্শ বাছিয়া লওয়া প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবনের উষাকালেই লক্ষ্য স্থির করা উচিত। লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা নীচ না হইয়া অতি উচ্চ ও পবিত্র হওয়া কর্ত্তব্য। জগৎ উন্নতির পথে প্রধাবিত। সৎলোক অসৎ হইতে প্রয়াস পাইতে হবনা, সহজেই হইতে পারে, কিন্তু অসৎ লোক সৎ হইতে বহু আয়াসের প্রয়োজন। তাইবলি জীবনের একটা অতি উচ্চ ও পবিত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ণয় করা ছাত্রজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম কর্ত্তব্য।

শ্রী অম্বিকা চরণ ভট্টাচার্য্য

অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা।

এই সংসার প্রপঞ্চময়। ইহা মানবের সুখপ্রদ মনোহর দৃশ্য পূর্ণ রঙ্গমঞ্চ। কর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ হইয়া মানবগণ এই লীলা স্থলরূপী রঙ্গ-মঞ্চে অবতীর্ণ হন, এবং আপন আপন অভিনেতব্য বিষয়ের অভিনয় করিয়া চলিয়া যায়। সকলকেই অভিনয় করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেকের এক এক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, এবং তাহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের উৎকৃষ্ট দেখাইয়া ধন্যবাদার্হ হইয়া থাকে। কেহ রাজা, কেহ অমাত্য, কেহ সেনানী, কেহ সেনা, কেহ ভৃত্য' আর কেহবা দৌবারিক; আবার অন্য দিকে রাণী, সখী, সহচরী প্রভৃতি রমণী আছে। পিতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভগিনী, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ, রাজা ও প্রজা, বিজেতা ও বিজিত, প্রভৃতি ভৃত্য, ইহারা সকলেই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখাইতেছে। সকলেই স্বস্ব বিষয়ের অভিনয়ে যশস্বী হইবার প্রয়াসী হইয়া কার্য্য করে, তবে কাহারও বা যশ আর কাহারও বা অযশ হইয়া থাকে। কেহ রঙ্গ-মঞ্চে আসিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিতে না করিতেই বাহবা পড়িয়া গেল, আবার অন্য-দিকে আর একজন আসিলেই সকলে বিরক্ত হইল, কেহবা তাহাকে শ্লেষোক্তি করিতে লাগিল। এ নশ্বর জগতেও মনুষ্য-ভাগ্যে তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। কেহ কীর্ত্তিমান্ সুতরাং সাধারণের প্রশংসাভাজন, আর কেহবা অকর্ম্মা সুতরাং সাধারণের নিকট নিন্দাস্পদ। কীর্ত্তিমান্ লোক পরলোক গমন করিলে সকলেই তাহার জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, সংবাদ পত্রে তাহার শোক-গাথা প্রকাশিত হইল, তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্ত সভা বসিল এবং গ্রন্থকার জীবনী লিখিয়া তাহার অস্তিত্ব স্থায়ী করিবার জন্য লেখনী ধরিল। আর যে সামান্য, অকর্ম্মা, জন-সমাজে যাহার নাম নাই, সেই কীটানুকীট জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইয়া গেল। তাহার লোকান্তর-গমন কেহই জানিতে পারিলনা, তাহার প্রাণবায়ু নীরবে বায়ুর সহিত মিলিয়া গেল।

আমরা দেখিতে পাই, অনেকে এ জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে এবং অনেকের নাম একবারেই লোপ পাইয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী-লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, রাজাসন্ সকলকার জন্য হয়না, সবাই কালিদাস হইবেনা, সবাই সেক্সপীর হইয়া জন্মেনা, সকলে নেপোলিয়ান হইতে পারেনা, এবং সকলেই পিট্ বা কব্‌ডেন্ হয়না। গণিত-শাস্ত্র অনেকেই পড়ে, কিন্তু কয়জন নিউটন হয়? বাণিজ্য ব্যবসার জন্য অনেকেইত সমুদ্র যাত্রা করে, কিন্তু কয়জন কলম্বসের ন্যায় গৌরবা-ন্বিত? অনেকেই কাব্য নাটকাদি লিখিতেছেন কিন্তু বাণভট্ট বা কালিদাসের নাম

কে মলিন করিতে পারিল? আমরা মনে করি, যাহারা কীর্ত্তিমান্ তাহারা মহাপুরুষ, সরস্বতীর কৃপায় তাহাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু কি উপায়ে তাহারা নর-শ্রেষ্ঠ হইয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিল, কেহ সে বিষয় অনুশীলন করে না, কেবল নিশ্চেষ্ট ক্রীড়ারত ও আমোদ-প্রিয় হইয়া জীবন যাপন করে। আহার, নিদ্রা, কলহ, পর-চর্চ্চাদি তাহাদের জীবনের লক্ষ্য, পর-নিন্দা-বাদেই কাল কাটাইয়া তাহারা ইহ লোকের লীলা শেষ করিয়া থাকে। কিরূপে বংশের গৌরব রক্ষা করিতে হয়, অথবা বংশ পর-ম্পরাগত কার্য্যকলাপ বজায় করিয়া চলিতে হয়, কিংবা বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে হয়, সে বিষয়ে কিছুতেই তাহারা যত্নবান্ নহে। সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য, সকল কার্য্যেই উৎসাহ হীনতা ও হৃদয় সর্ব্বদা নিস্তেজ ভাবাপন্ন। যাহারা ধনবান্ তাহারা ঐশ্বর্য্যমত্ত হইয়া পরিণাম-বিরস ভোগ-বিলাসে কালাতিপাত করে, পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত ধন রত্নাদি অযথা ব্যয় করিয়া কাল-ক্ষয় করিয়া থাকে। আর যাহারা নির্ধন, দৈন দিন ব্যয় সংকুলান করিবার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা যাহাদের নাই, শিক্ষা করিবার ইচ্ছা এবং শক্তি বলবতী হইলেও যাহাদের উপায় নাই, দেহ-ধার লোপ যোগী পান ভোজ-নাদি সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদিগকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহারা সংসার-সাগরের দারিদ্র্যাদির তরঙ্গাভিঘাতে বিপন্ন হইয়া অতল সাগর-গর্ভে বিলীন হইয়া যায়, তাহা-দের মানস-ক্ষেত্র-জাতা আশা লতা ও সেই সঙ্গে ছিন্নমূল হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

বিস্ময় জনক নায়েগারার জলপ্রপাত, গগনভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গ, অপরিসীম অতলস্পর্শ অনন্ত সাগর, স্রোতস্বতীবিহীন উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি, এ সকল দর্শন করিলে বিশ্বকর্ত্তার সৃষ্টি-কৌশলে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অপার ক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আর মিসরের পিরামিড্, চীন দেশীয় প্রাচীর, দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন, টেম্‌সের তলবর্ত্ম, বাষ্পীয় যান, তারের সংবাদ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে আমরা মানব ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাই। আমরা চীন দেশীয় অদ্ভুত প্রাচীর পরিদর্শন করিয়া বিস্মিত হই, স্তম্ভিত হই, কিন্তু কি উপায়ে ও কি অপরিহার্য্য কারণে সেই অদ্ভুত প্রাচীর প্রস্তুত করিবার প্রস্তাবনা হইয়াছিল, সে বিষয় কয়জন চিন্তাশীল মানবের মনকে মাতাইয়া থাকে। আমরা কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিয়া কীর্ত্তিমান্ পুরুষের গুণ গান করি, তাঁহাকে মহৎ বলিয়া প্রশংসা করি, কিন্তু সে কীর্ত্তিস্তম্ভ কিরূপে গঠিত হইল? ইহার উপকরণ কি? এরূপ অচল অটল স্তম্ভের ভিত্তিইবা কেমন? কিরূপে উপকরণ সংগৃহীত হইল? এই সমস্ত প্রশ্ন কয়জন অনুসন্ধিৎসুর মনকে সমাকৃষ্ট করিয়া সেই চিন্তায় নিয়োজিত করে?

কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণ করিবার যতগুলি পথ আছে তাহার একটীও সহজগম্য নয়। এ পথে প্রায় কেহই একাকী আসিতে পারে না। অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার সহা-

অন্য ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সহজ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এ সমস্ত পথের কোথাও বহুবিস্তৃত মরুভূমি, কোথাও তুষার-ধবলিত গিরি-শৃঙ্গ, কোথাও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মহাবল দস্যুদল, আবার কোথাও বাত্যাবীচি-মালা-সমন্বিতা মহানদী, স্থানান্তরে বা বিশাল বারিধি। উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায়ের সহায়তা ব্যতীত এসব অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। ইহাদের সহায়তা সত্ত্বেও কীর্ত্তিশৈলের সন্নিকট হইতে জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্‌কে ১৫ বৎসর ও ওয়াট্ সাহেবকে ৩০ বৎসর খাটিতে হইয়াছিল।

কেবল যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ভাগ্যে কীর্ত্তিশৈলে আরোহণ ঘটে, একথা ভুল। যাহাদের অধ্যবসায় আছে, ধৈর্য্যশীলতা আছে, উদ্যমশীলতা আছে, এবং বাসনা আছে, তাহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকিলেও তাহারা সেই পুণ্যস্থানে পৌঁছিতে পারে। "চালালে চলিশ বুদ্ধি" এই প্রবাদ বাক্য নিরর্থক নহে। সাধনা করিলে সিদ্ধ হয়। যাহারা অলস, যাহারা উদাসীন, যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই কেবল দৈব মুখাপেক্ষী হইয়া অশেষ বিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে। যাহারা অন্নহীন, ধনহীন, সহায় হীন, দীন দরিদ্র, তাহাদের উন্নতি বাসনা থাকিলে, কালে তাহারা ও সফল কাম হইয়া থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যে পিতার দশা বিপর্য্যয় ঘটিলে জন্ ব্রীটন খুল্লতাতের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে, জন ব্রীটন পিতৃব্য-বিতাড়িত হইয়া অধ্যবসায়ের সাহায্যে কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণ করিলেন। সেই অধ্যবসায়ে প্রণোদিত হইয়া গ্রেগ, ভিল্ সার্প, ক্রীতদাস দলের অকাট্য দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। উদ্যোগী পুরুষের নিকট কোন কার্য্য কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কর্ত্তব্যের জন্য, যশের জন্য, স্বদেশের জন্য, পর-দুঃখ-বিমোচনের জন্য, তাঁহারা দুরূহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ভীত হয় না। কার্য্য সফলতা হইবে কিনা ভাবিয়া নিরস্ত হয় না। এ কার্য্য সম্ভব, ও কার্য্য অসম্ভব, এরূপ ধারণা তাঁহাদের নাই। বিপুল-বিক্রম নর-শার্দ্দূল নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন "অসম্ভব" এ কথা কেবল মূর্খের অভিধানে পাওয়া যায়।" যাহারা প্রকৃত বীর, পুরুষ সিংহ, তাহারা যত্নে ও পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ও উদ্যমশীলতার সাহায্যে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকে।

যেমন অনল ও অনিল, চন্দ্র ও সমুদ্র, একের আবির্ভাবে অন্যের সহানুভূতি ও পরিবৃদ্ধি দেখা যায়, কার্য্যের উৎসাহ পক্ষে অধ্যবসায়ও তদ্রূপ। কোন কার্য্য করিতে উৎসাহিত হইলে, অধ্যবসায় বিনা আমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়। অধ্যবসায় কার্য্যের সারথ্য গ্রহণ করিলে তাহার ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। অধ্যবসায়ীসহ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি না হইলে পশ্চাৎপদ হইবার উপায় নাই। তখন মায়া মোহ চলিয়া যায়, লজ্জা ভয় লোপ পায়, তখন বিলাসিতার মোহিনী মূর্ত্তি বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়, এবং ঔদাসীন্যের পরামর্শ অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তৎকালে দরিদ্রতা বাধা জন্মাইতে পারে না, অরিকুলের প্রতিকূলতা বাহুল্যতার হেতু

হয় না। তখন উৎসাহানলে সকল বাধা সকল বাসনা পুড়িয়া যায়। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যাহারা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, কোনরূপ ভয়ে তাঁহাদের মন বিচলিত হয় না, সাধারণের মতের অপেক্ষা তাহারা করে না। বৈরাগ্যের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা কাতর হয় না। তাহারা সাহসে ভর করিয়া "মহাজনো যেন গতঃ" সেই পথের অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থাকে। যদি দৈবী আপদ আসিয়া কার্য্য হানির হেতু হয়, সাহসী প্রকৃত উদ্যমশীল বীর পুরুষ আপন সাহসে সে বিঘ্ন প্রশমন করিয়া পথ পরিষ্কার করেন। সমুদ্র-পথে সীজার যে দিন বিষম বাত্যাবিতাড়িত হইয়াছিলেন, ঝড়ের হুঙ্কার, সমুদ্রের ভীষণাকার উত্তাল তরঙ্গ মালার ভ্রূভঙ্গ অবলোকন করিয়া কাপ্তেন স্বয়ং অর্ণব যান রক্ষা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া হতাশ হইয়াছিলেন, তখন বীরাগ্রণী সীজার বলিয়াছিলেন "আপনার ভীতি বা নৈরাশ্যের কারণ নাই, আপনার তরী সীজারকে লইয়া যাইতেছে।" এই সাহস পূর্ণবাক্যে কাপ্তেনের মনে দ্বিগুণ সাহস-সঞ্চার হইল এবং সাহস সংক্রামক রোগের ন্যায় সকলচিত্তে সংক্রমিত হইয়া ভয়-ব্যাকুল আরোহিগণকে সান্ত্বনা দিল।

সাধারণতঃ বিলাসিতা যেমন দরিদ্র-কুটীর পরিত্যাগ করিয়া সৌধ প্রাসাদ-শ্রেণীতে বাস করিতে ভাল বাসে, উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায় তদ্রূপ শান্তিপূর্ণ আনন্দময় কুটীর বাসে কালাতিপাত করে। বিলাসিতা, উদ্যমশীলতাকে একরূপ পাত্র মনোনীত করেনা। তাহারা কখনও একত্র থাকিতে ভাল বাসে না। প্রথমটী যেখানে গমন করে, দ্বিতীয়টী অমনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়। একটীতে লোক আমোদ প্রিয়, শ্রম-বিমুখ, ও অসংযত সৎপথ ভ্রষ্ট হইয়া কুপথের পথিক হয়। অপরটীর দ্বারা লোক কষ্টসহ ধৈর্য্যশীল ও আহ্লোদয়কর্ম্মা হইয়া সংসারে বিচরণ করে। প্রথমোক্তটী কর্ম্মক্ষেত্রের ভাবি ক্লেশের কল্পনা করিয়া লোককে কার্য্য বিরত করে, শেষোক্তটী অর্থাভাব, সামাজিক হীনাবস্থা, আত্মীয় স্বজনের প্রতিকূলতা প্রভৃতি দুরতিক্রম বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া তাহাদের পতন নিবারক হয়। এমন কি মানব বিফলমনোরথ হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইলে, উদ্যমশীলতা যথাবিধি সান্ত্বনা দিয়া তাহার নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন মনের মতি বাড়াইয়া থাকে। বাঙ্গালার নবাবসিরাজো দৌলা বিলাসিতার দ্বারা পালিত ও চালিত হইয়া পলাশী-প্রাঙ্গণে পরাজিত ও পলায়নপর, আবার অন্যদিকে উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায়ের অনুসরণ করিয়াই ক্লাইব সেই পলাশী ক্ষেত্রে লব্ধ-গৌরব। স্বপক্ষও পর পক্ষের সৈন্যবল ও বর্ত্তমান অবস্থা অনুধাবন করিয়া যখন তিনি বিষণ্ণ বদনে আম্র কাননে আসীন ছিলেন, তখন উদ্যমশীলতা ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ মানচিত্র খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। তখনই ক্লাইব উৎসাহে উল্লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়া গিয়াছেন।

ধনবান্দের পুত্র বীশক্তি-সম্পন্ন হইলেও বিলাসিতা রূপ ধাত্রীর দ্বারা লালিত ও পালিত বলিয়া প্রায়ই ধন্য হইতে পারে না, বংশগত গৌরব ভিন্ন নিজকৃত যশোলাভে চরিতার্থ হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন স্পার্টায় প্রত্যেক সপ্তম বর্ষীয় কুমারকে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হইত। সেখানে গ্রীষ্মের আতিশয্য, শীতের কঠোরতা, ক্ষুৎপিপাসা-জনিত কাতরতা সকল শ্রেণীর বালককে সমান ভাবে ভোগ করিতে হইত। ক্ষুধায় অল্প মাত্র আহার সকলের পক্ষে একরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপে তাহাদিগকে কষ্টসহ ও ধৈর্য্যশীল করা হইত। কখন কখন তাহাদিগকে উদর-পূর্ত্তির জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে বা বনস্থলীতে শীকারান্বেষণে পাঠান হইত। এখানে বিলাসিতার প্রবেশ নিষেধ ছিল বলিয়া কার্য্যকালে অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা আসিয়া স্পার্টার বালকদের সহায়তা করিত। রাজপুত কুমারগণের সংস্কার হইবার পর তাহাদের ও ধনুর্বিদ্যাদি যথাবিধি শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহারা কখনও বিলাসিতার দর্শন পাইত না। সেই কারণে প্রাচীন স্পার্টান্ ও ক্ষত্রিয় জাতি স্বদেশ-হিতকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারিয়া ছিল। এক দিকে এক দলকে দরায়ুস্, জরাক্‌সিস্ প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ, বিপুল বিক্রম আক্রমণকারী সৈন্যের সহিত স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অন্য পক্ষে আর এক দলকে মামুদমহম্মদ ঘোরী, আল্লাউদ্দীন, তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি মত্তহস্তী সহ বা মহাবল মুসলমান আক্রমণকারীর সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। স্পার্টান্ ও রাজপুত জাতির উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকায়, বিলাসিতার কুহক মন্ত্রে তাহাদের মন মুগ্ধ হয় নাই। তাহারা অতুলনীয় উদ্যম ও অধ্যবসায় সাহায্যে আপন আপন গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছে। যতদিন মারাথন, থার্ম্মপিলি ও সালামিশ থাকিবে, এবং যতদিন তিরৌরি, সোমনাথ ও হল্‌দিঘাটের নাম থাকিবে, ততদিন উভয় জাতির গৌরব-কেতন জগতী-তলে সঞ্চালিত হইবে। নিডিয়স কোরাই লেনস্, সিপিও, সীজর প্রভৃতি বীর কুল-চূড়ামণি যে রোমকে ইতি পূর্ব্বে উচ্চাসনে বসাইয়াছিলেন, বিলাসিতার কুমন্ত্রণাবলে আজ রোম সেই কাম্য আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

কীর্ত্তি শৈলে আরোহণ করিবার অনেক পথ আছে বটে, কিন্তু যিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হউন, যদি উদ্যম থাকে, উৎসাহ থাকে, কীর্ত্তি শৈলে আরোহণে বাসনা থাকে, ধৈর্য্য থাকে, তবে তিনি অবশ্য শীঘ্র অথবা বিলম্বে একদিন না একদিন সফলকাম হইবেন। যিনি যে পথ দিয়া যাত্রা করুন; তাঁহাকে সকল পথেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কখন কখন অনেককে রাজদ্বারে কারাগারে নির্ব্বাসনে যাইতে হইয়াছে। এমন কি কাহারও ভাগ্যে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত উদ্যমশীল, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি-মানসে তৎপর, তাহারা মৃত্যু

ভয়ে ভীত হন না। তাঁহারা নরক, জ্বালা যন্ত্রণাপূর্ণ অগ্নি মাংস বিনির্ম্মিত দেহের, বিনিময়ে স্থায়ী যশোদেহে জগতে বাস করিয়া থাকেন। মত্তহস্তি পদ-তল-নিক্ষিপ্ত ও অস্ত্রধারী দ্বারা বধ্যস্থানে আনীত হইয়াও, প্রহ্লাদ আপন অনুসৃত পথ হইতে নিবৃত্ত হন নাই। রসায়ন-বিদ্যানুশীলন-রত রোজার বেকন, এবং পৃথিবীর গতি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত ও সিদ্ধকাম গ্যালিলিওকে বৃদ্ধাবস্থায় কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা তৎকালে এতদূর জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আপন আপন অনুসৃত পথ হইতে নিবৃত্ত হন নাই বলিয়া আজ বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহাদের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়া থাকেন। আজ জগৎ তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত ও উন্নতি সোপানে আরূঢ় বলিয়া তাঁহাদের যশোগান করিতেছে, এবং তাঁহাদের যশোদেহ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্যোদয়ে যেমন তমোরাশি তিরোহিত হইয়া যায়, ভয়ও তদ্রূপ অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার আবির্ভাবে হৃদয় হইতে পলায়ন করে। উদ্যমশীলতা থাকিলে অন্তর সাহস পূর্ণ হয়, দুঃসাধ্য কার্য্যও সিদ্ধি-যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কার্য্য আয়াস সাধ্য হইলেও বিরক্তি জনক না হইয়া বরং আনন্দদায়ক হইয়া উঠে। অধ্যবসায়ে বুক বাঁধিলে আলস্যে সে বন্ধন শিথিল হয় না, বিলাসিতা তাহা ছিন্ন করিতে পারে না, অসৎ প্রবৃত্তি তাহা দ্বিধা করিতে শক্তি ধরে না। যিনি প্রকৃত উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী, তিনি ভীত হন না, ক্লেশ সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না, এবং সংসারের মায়া কাটাইয়া দেশান্তরে যাত্রা করিতেও কাতর হন না। অপরিচিত বা অজ্ঞাত বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে না পারিলে উপহাসাস্পদ হইবেন ভাবিয়া তিনি পশ্চাৎপদ হন না। তাই তৃণলতাদি-পরিশূন্য মরুভূমি, সিংহশার্দ্দূলাদি হিংস্র-জন্তু-সমাকুল গহন কানন, অসভ্য জাতির আবাস ভূমি পার্ব্বত্য প্রদেশ, এবং সঙ্কীর্ণ তুষারাচ্ছাদিত গিরি-পথ অতিক্রম করিয়া চীন পর্য্যাটক হিউয়েনসাং ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় নানা বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি তুষারময় পার্ব্বতীয় প্রদেশ পানভোজনোপযোগী সামগ্রী-বর্জ্জিত মরুপ্রান্তর, বিশাল-শাখা-প্রসারি-বন-পাদপ-পরিশোভিত বনস্থলী দুরতিক্রম হইলেও সাহসে ভর করিয়া, অধ্যবসায় ও উদ্যম-শীলতার সাহায্য অবলম্বন করিয়া ভারতে আসিয়া কীর্ত্তি-শৈলের শিখরদেশ আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কার্থেজনিবাসী বীরকেশরী হানিবাল যখন দ্বিতীয় রাহুর ন্যায় রোমের গৌরব রবি গ্রাস করিবার মানসে তদ্দেশে উপনীত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, রোমের সৈন্যবল, রণ-কৌশল বা দুর্গম পথের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি ভয়ে অভিভূত হন নাই, অধিকন্তু দুর্গম পথ দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহার যে আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসাযোগ্য। তিনি যে অধ্যবসায় রূপ আলম্বন অবলম্বনে পিরিনিস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রোডেনস্ (রোন) নদীপার হইয়া পরিশেষে ইয়ুরোপের অত্যুচ্চ

আল্পস্ পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া রোমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেরূপ আলম্বন না থাকিলে তিনি কখনও কেমন দুর্গম পিচ্ছিল পার্ব্বত্য পথে সসৈন্যে গমন করিতে পারিতেন না, তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দুরারোহ ও ভয়ঙ্কর হইলেও এখনও উদ্যমশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার অনুসৃত পথে ধাবমান হইতে পারিবে। তিনি অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার সাহায্যে দুরতিক্রম গিরিগাত্রে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া দুরারোহ কীর্ত্তি-শৈল-শিখরে স্থান পাইয়াছেন। বীরাগ্রগণ্য নরসিংহ নেপোলিয়ান এই পথ দিয়া কীর্ত্তি শৈলে আরোহণ করিয়াছিলেন। মামুদ এক সময় এই পথ দিয়া কীর্ত্তি শৈলে আরোহণোদ্যত হইলেও ধন-তৃষ্ণার দোষে তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি অসৎপথ চালিত হইয়া পরিশেষে কলঙ্কের কূলে উপনীত হইয়াছিলেন।

"স্বনামা পুরুষোধন্য" এই মহাপুরুষ-বাক্য স্মরণ রাখিয়া আমাদের কর্ম্মভূমিতে অবতরণ করা কর্ত্তব্য। আপন যত্নে আপন উদ্যোগে ও আপন অধ্যবসায়ে কার্য্য করিলে লোকে বাস্তবিক ধন্য হয়, এবং মহীতলে যশও কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে যে মহৎ সে পরালীঢ় বস্তু-ভোগে বাসনা করে না। সিংহ স্বয়ং সমাসাদিত পশুদ্বারা জীবন ধারণ করে বলিয়া সিংহ পশুরাজ। ভরত ভ্রাতৃ-কৌশল-লব্ধ অপ্রাপ্য রাজ্য ভোগ করিতে বিরত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি মহৎ। সাধারণের নিকট ধন্য এবং সেই কারণ তাঁহার গুণ রামায়ণে কীর্ত্তিত। কার্য্যক্ষেত্রে সকলেই উপনীত। কেহ কার্য্য করিয়া যশস্বী, কেহ নিন্দাস্পদ। এক জন অপরকে যশোলাভ করিতে দেখিয়া তাহার অনুসৃত পথে গমন করে। কেহ কেহ যাইতে যাইতে বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া গমনে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু যে পান্থ ধীর বুদ্ধিমান্, সে দীর্ঘ পথ দেখিয়া ক্লান্ত হয় না, বরং অপেক্ষাকৃত উদ্যম সহকারে চলিতে থাকে। যাহারা বেশী ধৈর্য্যশীল নহে, তাহারা বিঘ্নবিহত হইলে হতাশ হইয়া পড়ে, তাহাদের উত্তেজনা থাকে না। আমরা বুদ্ধিহীন আমাদের দ্বারা এ কার্য্য অসাধ্য এই বলিয়া তাহারা নিবৃত্ত হয়। ধৈর্য্যশীলতাই বুদ্ধি, ধৈর্য্যশীলতাই বল," এ কথার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। কিন্তু যাহারা বাস্তবিক ধীর, বাস্তবিক আফলোদয়কর্ম্মা, তাহারা অমনি মনে মনে বলিয়া উঠে—

"যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে,
বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে?
তুফানে পড়েছি কিন্তু ছাড়িবনা হা'ল,
আজ না হইতে পারে, হ'তে পারে কাল।"

এই মহা বাক্য মনে উদয় হইবামাত্র তাহাদের শরীরে বল সঞ্চার হইল, ঔদাসীন্য তিরোহিত হইল, কীর্ত্তি শৈল-গমনের পথ সম্মুখে তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই স্থান হইতে পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও পরিষ্কার। অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা সমভিব্যাহারে এখান পর্য্যন্ত আসিলে তাহাদের নেতৃত্ব সকলকার পক্ষে আবশ্যক হয় না, কারণ গমনাগমন এখন কতকটা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এখান হইতে

কীর্ত্তি শৈলের শিখরদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কীর্ত্তি শৈলে আরোহণ যে কেবল পুরুষের ভাগ্যে বা পরিণত বয়সে ঘটিয়া থাকে, এ কথা কে বলিবে? অনেক রমণী এই ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শৈলশিখর আরোহণ করিয়াছে। রমণী হৃদয় স্নেহ, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণের আধার বলিয়া অনেক সময় রমণীর দ্বারা দুঃসাধ্য কার্য্য ও সংসাধিত হইয়া থাকে; পর-দুঃখ-কাতরতা ও স্বার্থ-ত্যাগ বিষয়ে রমণী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অষ্টাদশবর্ষ দেশীয়া, দরিদ্রকুলোদ্ভবা জোয়ান অব্ আর্ক যখন স্বদেশের দুরবস্থা মানস-চক্ষে, অবলোকন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার মন দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে অধ্যবসায় তাঁহার অশ্রু মার্জ্জনা মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণী হৃদয়াশ্রয়া ভীতি তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তিনি কুসুম সুকুমার সুকোমল কলেবর সুকঠিন লৌহবর্ম্ম সমাবৃত করিয়া সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণে রণস্থলে উপনীত হইলেন। তিনি যে উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অনল সকল হৃদয়ে একবারে জ্বলিয়া উঠিল। অধ্যবসায় ও উদ্যম শীলতা তাঁহার সহচরী রূপে সহায়তা বা পরিচর্য্যার জন্য অনুগামিনী হইল। অর্লিন্সের অবরোধকালে তিনি যে বিজয় লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, অধ্যবসায় ও উদ্যম শীলতার সাহায্যে রণস্থলে যাত্রা করাই তাহার প্রধান কারণ। মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক আহম্মদ নগর আক্রান্ত হইলে তদ্দেশীয় রাজকুমারের পিতৃব্যপত্নী চাঁদ বিবি যে বীরোচিত সাহস ও অধ্যবসায়ে সেই নগর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক প্রশংসা যোগ্য। অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার নিকট বিপদের বিবরণ বিবৃত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেই তাহারা বালক বা বৃদ্ধ, পুরুষ বা স্ত্রী, ধনী বা দরিদ্র ইত্যাদিরূপ পার্থক্য গ্রাহ্য না করিয়া আনুকূল্য করিয়া থাকে। ধ্রুব বালক হইলেও তাঁহার হৃদয়ে যে অমানুষিক অধ্যবসায় ছিল, যে অপূর্ব্ব উদ্যম ছিল, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের তদনুরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মনুষ্য জাতির মধ্যে একান্ত দুর্লভ।

যাহারা পর ভাগ্যোপজীবী, যাহারা নিত্য শঙ্কিত, তাহাদের হৃদয় অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার বাসোপযোগী হয় না তাহাদের জ্বালা যন্ত্রণাময়, প্রস্তর সদৃশ হৃদয় আলস্যের আবাস ভূমি। যাহারা রোগী, তাহাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে অধ্যবসায়াদি সদ্গুণ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অনুর্ব্বর ভূমিজাত বৃক্ষ লতাদির ন্যায় নিস্তেজ ও অসার তাঁহারা পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যায়। তজ্জন্য উদ্যোগী পুরুষসিংহ হইতে হইলে, তদনুযায়ী নীরোগ ও সবল শরীর আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩০২ সাল। ৮ম সংখ্যা।

প্রতিজ্ঞা।

বাঙ্গালী কবি মনের দুঃখে অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া, স্বদেশীয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু,—সাহসে দুর্জ্জয়।
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ ॥"

কথাটা একজন ইংরেজ লেখকের প্রতিধ্বনি মাত্র। লর্ড মেকলে সরস পদ-লালিত্য বিকাশ করিয়া, অভিধান বাছিয়া, তীব্র ভৎর্সনায় বাঙ্গালীর জাতীয়-চরিত্রের যে স্বরূপ-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কবি তাহারই একটি কথা লইয়া, কবিতা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। লর্ড মেকলে বিদেশীয়, তিনি ভারত-বিজয়ী ইংরেজ-বংশধর ; সুতরাং স্বভাবতঃ সহজেই ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার কথা মানিয়া লইতে সম্মত হই না। কিন্তু ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয় যে, আমরা সত্যই "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু!"

কতকগুলি কারণে আমাদিগকে আরও এমন অদ্ভুত কল্পতরু করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কার্য চাহি না, কথা চাহি। তুমি কিছু কর বা না কর, আমি যখন তোমার দ্বারস্থ হইব, তখন "সাধ্যানুসারে আমার সাহায্য করিবে" বলিয়া আমাকে যদি আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি কর,—তবে আর তোমার রক্ষা নাই। আমরা স্পষ্ট কথা বলিতে জানি না, স্পষ্ট কথা শুনিতেও চাহি না; সেই জন্য কেহ মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিলে সহ্য করিতে পারি না। আমরা মুখের ভাল মানুষীটুকুর বড়ই কাঙ্গাল। সেই জন্য নিজেও মুখের ভাল মানুষী করি, পরের কাছেও তাহাই পাইবার প্রার্থনা করি!

কত লোক এই মুখের ভাল মানুষী দেখাইবার জন্য কত প্রতিজ্ঞা করে,—কিন্তু কৈ? কার্য্যকালে সে সকল প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হয় কি? লোকে মূল্য দিব বলিয়া সংবাদ-পত্র লয়, সম্পাদককে উৎসাহসূচক পত্র লিখিয়া পত্রিকা প্রকাশে প্রণোদিত

করে;—কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, মাসের পর মাস পত্রিকা লয়, একবার মূল্য দিবার কথা মনে করে না! লোকে প্রবন্ধ লিখিবে বলিয়া গরীব সম্পাদক বেচারাকে কত ভরসা দেয়, তাহার পর যখন একবৎসর ফুরাইয়া আর এক বৎসর আসিয়া পড়ে, তখনও কালি কলম একত্র করিতে অগ্রসর হয় না। অথবা প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু বলিয়াই এইরূপ কার্য্য-বিড়ম্বনা সংঘটিত হয়। (১)

রাণা প্রতাপ যখন গৃহ-তাড়িত বন-নির্ব্বাসিত হইয়া কাঙ্গালের মত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বীর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যেরূপেই হউক স্বরাজ্য উদ্ধার করিব, যতদিন না পারি, কখন তৃণশয্যা ছাড়িব না, পর্ণ-পাত্রে ভিন্ন ভোজন করিব না।" তিনি আমরণ সে বীরপ্রতিজ্ঞা পালন করিয়া, পুণ্যলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার স্বরাজ্য আর উদ্ধার হইল না,—তাঁহার বংশধরগণ আর স্বাধীন ভাবে স্বরাজ্যে রাজ-ছত্র বিস্তার করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। রাণা প্রতাপের বর্ত্তমান বংশধর স্বর্ণপাত্রে ভোজন করেন; কিন্তু মহারাণার বীর প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য শয্যাতলে একমুষ্টি তৃণ বিছাইয়া রাখেন, এবং ভোজন-পাত্রের নীচে এখনও কদলী-পত্র বা শাল-পত্র পাতিয়া লন! তবু ত বীরপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন!

প্রতিজ্ঞা পালন করা অভ্যাসের কায; প্রতিজ্ঞা করা বড়ই সহজ, কিন্তু পালন করা বড়ই কঠিন। কেবল অভ্যাস-গুণে সেই কঠিন ব্রত সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু অভ্যাস করিবে কে? যে জীবন্মৃত, যে মর্ম্মপীড়িত, পুত্র-কলত্র-ভারাবনত, দুর্দ্দশা-তাড়িত,—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন, সায়াহ্ন হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত আত্মচিন্তা যাহার অস্থি-মজ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, সে অভ্যাস বজায় রাখিতে পারে না। ইচ্ছা থাকে, অনুরাগ থাকে,—উৎসাহ টুকু শুকাইয়া যায়। করি করি মনে করিয়াও করিয়া উঠিতে পারে না!

প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারিলে মানুষ মানুষ নামেরই যোগ্য হয় না;—তাহা বুঝিয়াও আমরা প্রতিজ্ঞা পালন করিতে শিখি না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা প্রতিজ্ঞা করিবার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব মোটেই অনুভব করিতে শিখি না। যাহা বলিব তাহা যে করিতেই হইবে, এ শিক্ষা আমাদের মধ্যে বড়ই বিরল। আমরাও পরস্পর পরস্পরকে ইহার জন্য সাহায্য করি না। একজন চিকিৎসক একটি মুমূর্ষু লোককে বৈকালে ঔষধ দিয়া আসিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বৈকাল না আসিতেই বন্ধুবান্ধবে তাঁহাকে পাইয়া বসিলেন, তিনি এমন গুরুতর কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়াও সহজে মুক্তি পাইলেন না;—"আহা একটু বোস না, একটু পরে গেলেই ত হইবে।" এমন দৃষ্টান্ত প্রায় প্রত্যহই চক্ষে পড়িয়া থাকে। না নিজে প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে তৎপর না পরকে প্রতিজ্ঞা-পালনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত;—ইহাই আমাদের চরিত্রগত অপরাধ হইয়া উঠিয়াছে!

আমরা প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপর হই,

(১) প্রবন্ধটা সম্পাদকের লিখিত নহে। শিঃ পঃ সঃ

এমন শিক্ষা কি কেহ আমাদিগকে প্রদান করিবে না? মেকলের তীব্র ভর্ৎসনায় হইল না; কবির করুণ-বিলাপে হইল না; শিক্ষকের তীব্র কষাঘাতে কি তাহা সাধিত হইবে? শিক্ষক মহাশয়েরা এই কথাটি একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে ভাল হয়।

সাহেবের সঙ্গে কথা।

চিত্রকূট হইতে আসিতেছি। করবী ষ্টেসন হইতে মানিকপুর পর্য্যন্ত আমরা সকলে এক গাড়িতেই আসিলাম; কিন্তু মানিকপুরে আসিয়া গাড়ি পরিবর্ত্তন করিতে হইল, এবং মানিকপুর হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গাড়ি নিজস্ব (রিজার্ভ) না থাকাতে সকলকে নানা স্থানীয় হইয়া পড়িতে হইল।

সকলের সঙ্গে সকলেরই বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ অসম্ভব—আমি আর আমার একটী বন্ধু। এই অচ্ছেদ্য বন্ধনের প্রধান শৃঙ্খল তাম্রকূট। উভয়েই তাম্রকূটের সমান সেবক, তবে একটুকু উনিশ বিশ থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে। দুই জনের হাতে দুই হুকা, আর সঙ্গে তামাকের আসবাব,—অন্য সব জিনিস পত্র কোথায় কি পড়িয়া আছে, সমস্ত সঙ্গে চলিল কি কিছু হারাইল, তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমাদের দলের কর্ত্তা যাইবার সময়ে বীরানসীতে আমাদিগকে টাকা সের দরের তামাক কিনিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহারই সদ্ব্যবহার করিতেছি, আর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

তামাকের আসবাব নিয়ত সঙ্গে রাখিবার প্রধান কারণ, বন্ধুটী ভৃত্যের হাতে তামাক রাখিয়া বিশ্বাস পান না। এক বার পাচক ব্রাহ্মণ এক কলিকা তামাক সাজিয়াছিল, পরক্ষণেই দেখা গেল ভাণ্ডারের অর্দ্ধেক রত্ন হারাইয়া গিয়াছে; সেই হইতে তিনি ভয়ানক সতর্ক হইয়াছেন, ভৃত্য বা ব্রাহ্মণ তামাকের ত্রিসীমানায় গেলেই তিনি চমকিয়া উঠেন। শুনিয়াছিলাম বঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মদ্য-ভাণ্ডারের চাবিটা ভৃত্যের হাতে দিতে সাহস পাইতেন না, উহা নিজের হাতেই রাখিতেন; বন্ধুর সতর্কতা দেখিয়া আমার সেই কথা মনে পড়িল।

এক খানি গাড়ির অর্দ্ধেক প্রথম শ্রেণী, আর অর্দ্ধেক দ্বিতীয় শ্রেণী; আমরা উভয়ে যাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, কারণ সেই দিনে গত্যন্তর নাই। দাঁড়াইয়া দেখিলাম ভিতরে দুইজন সাহেব আছেন; তন্মধ্যে এক জন বসিয়া থাকিলেন, আর এক জন বাহিরে যাইয়া অবতরণ-ভূমিতে পদচারণ করিতে লাগিলেন। আমি সাহেব জাতিটাকে বড়ই বেশী ভয়-ভক্তি করি, সুতরাং তাঁহাদের সংস্রব পরিহারের চেষ্টায় বাহির হইলাম। কিন্তু বেড়াইয়া দেখিলাম, উক্ত গাড়িতে প্রবেশ না করিলে মধ্য-শ্রেণী ভিন্ন গতি নাই। অগত্যা তাহাই মনে মনে স্থির করিলাম, কারণ উচ্চ শ্রেণীর ভাড়া দিয়া ইংরাজের ভয়ে মধ্য বা নিম্ন শ্রেণীতে ভ্রমণ আমার পক্ষে নূতন নহে।

আমি চিরদিনই 'সুখ অপেক্ষা সোয়াস্তি ভাল' মনে করি। ইংরাজের সঙ্গে এক প্রকোষ্টে প্রবেশ করিয়া ভিজা মুরগীর মত জড় সড় হইয়া বসিয়া থাকা, কিম্বা অপ্রতিবিধেয় অপমান লাভ করিয়া আমরণ তাহার স্মৃতি-সুখ ভোগ করা, অথবা ফৌজদারী করিয়া ইংরাজের বিচারালয়ে ইংরাজের আইনে ইংরাজ বিচারকের নিকট হইতে সুবিচার লাভ করিয়া জীবন চরিতার্থ করা, ইহার কোনটাই আমি ভালবাসি না। হইতাম তেমন জোয়ান, তেমন সুপুরুষ, তেমন ধনশালী, তাহা হইলেও বা যাহা হউক। ইহা অপেক্ষা নির্ব্বিরোধে নির্ব্বিঘ্নে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে নিম্ন শ্রেণীতে ভ্রমণে সহস্র গুণ সুখ আছে। নিম্ন শ্রেণীতে ইতর লোকের সঙ্গে ভ্রমণে কষ্ট নাই, এমন নহে; কিন্তু সেই কষ্টটুকু ভুলিয়া শিক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। ভদ্রলোক আর ইতর লোকের মধ্যে একটা প্রভেদ এই, দশ জনের সঙ্গে মিলিত হইলে ভদ্রলোকেরা আলাপ এবং ব্যবহারে আপন আপন প্রকৃত চরিত্র অনেকটা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন; কিন্তু ইতর লোকে দশজনের সঙ্গে মিলিত হইলে কথায় এবং কার্য্যে আপন আপন স্বভাব-চরিত্রের প্রায় সমস্ত টুকুই বাহির করিয়া ফেলে। যদি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে চাও, যদি দেশের প্রকৃত অভাব বুঝিতে বাসনা থাকে, যদি জাতীয় রোগের চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা কর, তবে মধ্যে মধ্যে রেল-পথে নিম্ন শ্রেণীতে ইতর লোকের সঙ্গে বেড়াইতে ভুলিও না। আমরা যাহাদিগের জন্য এবং যাহাদিগকে লইয়া কায করিব, ঘৃণায় তাহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উড়িতে যাই, আমরাই না কি বুদ্ধিমান! ইংরাজ রাজনীতিকেরা যদি আমাদের ইতর লোকের ভাষা বুঝিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা এ দেশে রেলপথে উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর অধিক আদর করিতেন।

আমি মধ্য শ্রেণীতে যাইবার জন্য বন্ধুকে ডাকিতে গেলাম; কিন্তু যাইয়া দেখি, যে সাহেবটি বাহিরে বেড়াইতেছিলেন, তিনি প্রথম শ্রেণীতে চলিয়া গিয়াছেন, আর বন্ধুটি গাড়িতে বসিয়া তামাক সাজিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "চলুন, মধ্যম শ্রেণীতে যাইয়া একটি কামরা অধিকার করিয়া বসি, তাহা হইলে তামাকের সদ্ব্যবহার এবং আপনার সঙ্গীতের চর্চ্চা উভয়ই অবাধে চলিতে পারিবে।" তিনি বলিলেন, "সাহেব একটা প্রথম শ্রেণীতে চলিয়া গিয়াছে, আর অসুবিধা হইবে না, এখানেই বসুন।" আমি অগত্যা তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম, আমি সাহেবদিগের সঙ্গ যে রূপ ভালবাসি, বুঝি উক্ত সাহেবটিও আমাদিগের সঙ্গ সেই রূপ ভালই বাসেন, নতুবা আমাদিগের আগমনে তিনি নিজের আসন ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইবার কষ্ট এবং অতিরিক্ত ব্যয় স্বীকার করিলেন কেন? ইতি মধ্যে সেই সাহেবটী আমাদের নিকটে আসিলেন, এবং অতি ভদ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু, আমার কিছু জিনিস পত্র এই গাড়িতে রহিল, তাহাতে আপনাদের কোন অসুবিধা

হইবে না ত? আমরা বলিলাম আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না, বরং আমরা আইসাতে সাহেবের যে অসুবিধা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইয়াছে, সে জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সাহেব বলিলেন, "না বাবু, আপনারা সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। আমার গত রাত্রিতে কিছুমাত্র ঘুম হয় নাই, সেই জন্য আমি আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছি, মাণিকপুরে আসিলেই প্রথম শ্রেণীতে যাইয়া ঘুমাইব।" আমাদের জন্য যে সাহেবের অসুবিধা হয় নাই, এ কথা শুনিয়া মনের অসুখটা দূর হইল। সাহেব চলিয়া গেলেন, গাড়িও ছাড়িল।

অনেকক্ষণ পূর্ব্বে তামাকটি সাজা হইয়াছিল; এতক্ষণে তাহা মজিয়া উঠিল, তাহার সুগন্ধে কামরাটি আমোদিত হইল, সুতরাং বুঝা গেল আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে। ভদ্রতার খাতিরে উপবিষ্ট সাহেবটির অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, "আমার কোন আপত্তি নাই, তবে ধূমাটা বাহিরে ছাড়িবেন।" যেন চুরুটের গন্ধ হইতে এ গন্ধটা নিতান্তই মন্দ! যাহা হউক, আমরা সম্মতি জানাইয়া তাঁহার সম্মান রাখিলাম, কিন্তু, বলা বাহুল্য, কার্য্য-কালে সে অনুরোধ রাখিতে পারা গেল না। গাড়ির ভিতরে বসিয়া হুকা টানা, আবার প্রত্যেক টানের পর বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ধূমা ছাড়া সম্ভব কি অসম্ভব, তামাকের অনুরক্ত ভক্তগণই তাহার বিচার করিবেন।

সাহেব একটি চুরট খাইয়া শেষ করিলেন, আমাদের তামাক কিন্তু চলিতে লাগিল। শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমরা যে ইংরাজী জানি, কাহারও সে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। আমার কথা ত বলাই নিষ্প্রয়োজন, আমার বন্ধুটিও তৎকালে তদবস্থই ছিলেন,—এতক্ষণ তাঁহার জামাটি স্কন্ধে বিরাজ করিতে ছিল, গাড়িতে প্রবেশ করিবার পর হইতে তাহার সঙ্গে আর কোন সংশ্রবই নাই, কেবল কেহ জিজ্ঞাসা করিলে 'আমার' বলিবার অধিকার টুকু আছে মাত্র। কিন্তু সাহেব পূর্ব্বেই আমাদের ইংরাজী কথা শুনিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। চুরট খাওয়া শেষ করিয়া, তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?" বলা বাহুল্য, আমরা যখন যে পারিলাম, উভয়েই সাহেবের কথার উত্তর দিতে লাগিলাম। আমরা উত্তর করিলাম,—

"চিত্রকূট হইতে।"

সাহেব। "চিত্রকূটে কি জন্য গিয়াছিলেন?"

আমরা। "সেখানে তীর্থ আছে।"

সাহেব। "সেখানে কি বুদ্ধ ছিলেন?"

আমরা। "বুদ্ধ নহে, আমাদের রামচন্দ্র সেখানে কিছু দিন ছিলেন।"

সাহেব। "রাম এবং বুদ্ধ কি দুই জন?"

আমরা। "এক ভগবানেরই ইঁহারা দুই অবতার।"

সাহেব। "তবে হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম স্বতন্ত্র কেন বাবু, আমি বুঝিতে পারি না। আমাকে কথাটা বুঝাইয়া দিতে পারেন?"

আমরা। "রাম এবং বুদ্ধ এক ভগবানেরই অবতার, কিন্তু এক এক অবতারের এক এক স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। রামের অবতার হইয়াছিল অত্যাচারী রাবণের অত্যাচার হইতে হিন্দুদিগকে বাঁচাইবার জন্য—কেবল হিন্দু-জাতির উপকারের জন্য। কিন্তু বুদ্ধের অবতার হইয়াছিল হিন্দু ছাড়া অপরাপর জাতিকে ধর্ম্মভাব দিয়া পরিত্রাণ করিবার জন্য, সুতরাং রাম এবং বুদ্ধ একেরই অবতার হইলেও হিন্দু এবং বৌদ্ধ এক নহে।"

সাহেব। "আপনাদের কথা ভাল করিয়া বুঝিলাম না।"

আমরা। "এই একটী কথা মনে রাখুন, তাহা হইলেই বুঝিবেন। আহার ব্যবহার এবং জাতি-ভেদ হিন্দু-ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। যাহারা এসকল মানে না, তাহারা হিন্দু হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা এসকল মানে না, সুতরাং তাহারা হিন্দু হইতে পারে না।"

সাহেব। "হিন্দু-ধর্ম্মের এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভেদ কি ?"

আমরা। "হিন্দু-ধর্ম্মের গভীর দার্শনিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা বৌদ্ধ-ধর্ম্মে নাই, হিন্দু-ধর্ম্মের কএকটীমাত্র সহজ উপদেশ লইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গঠিত। যাহাদের জন্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সৃষ্টি, তাহারা ইহা অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব ধারণ করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মই তাহাদের উপযুক্ত।"

সাহেব। "আপনারা হিন্দুধর্ম্মকে বড়ই উচ্চে তুলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।"

আমরা। "হিন্দু-ধর্ম্ম কেবল বড়ই উচ্চ নহে, ইহা সর্ব্বোচ্চ। জড় জগতে যেমন আজ কাল আপনারা সর্ব্বোচ্চ, আধ্যাত্মিক জগতে সেইরূপ হিন্দু চিরদিন সর্ব্বোচ্চ। আপনারা খৃষ্ট ধর্ম্ম কতকটা বুঝেন, আজ কাল বৌদ্ধ ধর্ম্মও কিছু কিছু বুঝিতেছেন, কিন্তু আপনাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা আজন্ম হিন্দু-ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়াও তাহা বুঝিতে পারেন না। তাহার কারণ, তাঁহাদের প্রকৃতি অনুসারে বুদ্ধি গঠিত, সে বুদ্ধি হিন্দুদের আধ্যাত্মিক গ্রামে উঠিতে পারে না। আপনাদের খৃষ্ট-ধর্ম্ম যে হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে বাহির হইয়াছে, সে খবর রাখেন ?

সাহেব। "সে কি বাবু ?

আমরা। "রুষীয় ভ্রমণকারী নিকোলস্ নটভিটচ্ সাহেবের লিখিত যিশুর অভিনব জীবন-চরিত পড়িলেই বুঝিবেন। এই জীবন-চরিত তিব্বতে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত আছে, নটাভিটচ্ তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, যিশু বহুকাল ভারতে এবং তিব্বতে থাকিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অধ্যয়ন করেন; তাহার পরে স্বদেশে যাইয়া তাঁহার নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন।"

সাহেব। "এ কথা শুনিয়াছি বটে। বুদ্ধিমান কেহ এ কথা বিশ্বাস করে না, এটা পুস্তক বেচিবার একটা ফন্দি।"

আমরা। "এখন আপনারা তাই বলিতেছেন, কিন্তু আর কিছুদিন পরে সুর বদলাইতে হইবে।"

সাহেব। "গয়াতে কি আছে ?

আমরা। "গয়াতে আমাদের তীর্থ আছে, এতদ্ব্যতীত গয়াতে বুদ্ধদেব দেহ,

ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে জন্য উহা বুদ্ধদিগেরও মহাতীর্থ।”

সাহেব। “চিত্রল যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের মত কি ?”

আমরা। “অনেক বড় বড় সাহেব এবং ভাল ভাল সংবাদ পত্রের যে মত, অর্থাৎ এই যুদ্ধের ন্যায়পরতা এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর সকলেরই সন্দেহ।”

সাহেব। “বাবু, আপনারা বুঝিতেছেন না। যদি ডাক্তার রবার্টের সঙ্গে তাহারা অসদ্ব্যবহার না করিত, তাহা হইলে এ যুদ্ধ হইত না।”

আমরা। “আপনারা এই রকমই বুঝিবেন, কিন্তু আমরা বুঝি অন্যরূপ। আমাদের বিবেচনায় ডাক্তার রবার্টের সৈন্য সামন্ত লইয়া পরের দেশে ওভাবে যাওয়াই ঘোর অন্যায় হইয়াছিল। ভারতবাসী (এবং চিত্রলবাসীও বোধ হয়) মনে করে, রবার্টের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার করিলেও চিত্রলের নিষ্কৃতি ছিল না। ভারতের ইতিহাসে এরূপ বিশ্বাসের অনেক প্রমাণ আছে।’

সাহেব। “বাবু, রাজ্যের ভার যাহাদের হাতে, তাহাদিগকে তাহার রক্ষার জন্য অনেক সময়ে অনেক কায করিতে হয়।

আমরা। “সে কথা স্বতন্ত্র। তেমন কায করিয়া আবার ন্যায়-ধর্ম্মের জন্য বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিতে হয় না। যাহা হউক, চিত্রল অধিকার করিয়া আপনাদের লাভ হইয়াছে কি লোকসান হইয়াছে মনে করেন? লর্ড রবার্ট প্রভৃতি অনেক অভিজ্ঞ সাহেবের কিন্তু বিশ্বাস, লোকসান হইয়াছে। তাহারা মনে করেন, সীমান্ত ব্যাপারের যে সকল বিপদ চিত্রলের উপর দিয়া যাইতে পারিত, এখন তাহা নিজের ঘাড়ে লইতে হইবে। চিত্রল লইলেই তাহার মধ্য দিয়া একটা রাস্তা করিতে হইবে ত ? লর্ড রবার্ট বলিয়াছেন, এই রাস্তা দ্বারা রুষিয়ার ভারতাক্রমণ সহজ করিয়া দেওয়া হইবে।

সাহেব। “না বাবু, ফ্রান্স, রুষিয়া কি আমেরিকার পক্ষে কখনও ইংরাজের হাত হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লওয়া সম্ভব নহে।”

আমরা একথার কোন উত্তর না করিয়া নীরব রহিলাম। কিছুকাল পরে আমার বন্ধুটি বলিলেন, “সাহেব, আপনাকে দেখিয়া এ গাড়িতে উঠিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় সুখী হইলাম।”

সাহেব। “সঙ্কুচিত হইবার কি কারণ আছে বাবু ?”

আমরা। “কারণ যেখানে সেখানে দেশীয়দের সঙ্গে সাহেবদের অসদ্ব্যবহার, আর বিচারালয়ে তাহার অপ্রতিবিধান।”

সাহেব। “কেন বাবু, এইত সে দিন প্রাইভেট ষ্টিউয়ার্টের ফাঁসি হইয়া গেল, বড় লাটও তাহাকে ক্ষমা করিলেন না।

আমরা। “সাহেব, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, ষ্টিউয়ার্ট যে এক জন সাহেবে মারিয়াছিল। দেশীয়কে মারিলে তাহার কিছুই হইত না, ওহারা, হাওয়ার্ড প্রভৃতি তাহার শত সহস্র প্রমাণ আছে।”

সাহেব। “একটা কথা আপনারা বুঝেন না। খুনের অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে

দেখিতে হইবে পূর্ব্ব হইতে খুন করিবার কারণ এবং কল্পনা ছিল কি না। একজন ইংরাজ এবং একজন দেশীয়ের মধ্যে সেরূপ কারণ কখনও থাকিতে পারে না, সুতরাং কোন ইংরাজ যখন দেশীয়কে খুন করে, তখন বুঝিতে হইবে হটাৎ ভ্রম বশতঃ একার্য্য হইয়াছে।”

আমরা। “এক জন দেশীয়ের হাতে ইংরাজ মরিলেও এইরূপ বুঝিবেন কি? এখন যাহাই বলুন, সেরূপ ঘটিলে কার্য্যকালে বিপরীত আচরণ দেখাইবেন। ফল কথা এই, যে কারণেই হউক, ভারতবাসীকে খুন করিলে ইংরাজের বিচারের অভিনয় হয় বটে, কিন্তু সে দণ্ড পায় না; এই অবশ্যম্ভাবী নিষ্কৃতির আশা থাকাতে ইতর জাতীয় ইংরাজ দেশীয় লোককে খুন করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয় না। আপনাদের দেশের ইতিহাসেও এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যখন নর্ম্মানেরা ইংলণ্ড অধিকার করিল, তখন ইংরাজ খুন করিলে নর্ম্মানদের কিছুমাত্র শাস্তি হইত না, কিন্তু কোন গ্রামে একটা নর্ম্মান মারা পড়িলে সে গ্রাম শুদ্ধ নির্ম্মূল হইত।”

সাহেব। “সে সময় এখন নাই বাবু, সে সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।”

আমরা। “সময়ের পরিবর্ত্তন হইলেও অশিক্ষিত ইতর লোকের প্রকৃতি চিরদিন প্রায় তুল্যই থাকে।”

ইহার পর আনি বেশান্ত, কর্ণেল্ অল্‌কট্, থিওসফি ও আধ্যাত্মিক রাজ্যসম্বন্ধে সাহেবের সঙ্গে অনেক কথা হইল, এবং নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দুই একটি গল্পও তিনি করিলেন। পরিচয়ে জানিলাম, সাহেবটি জব্বলপুরে থাকেন এবং রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম করেন। সাহেবের সঙ্গে আমাদের শেষ কথা এই হইল যে, যে পর্য্যন্ত হিন্দু-ভাব জগতে পরিব্যাপ্ত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত পৃথিবী শান্তি পাইতেছে না।

নিজে ইংরাজ নহেন, অথচ ইংলণ্ডকে ভালবাসেন, এমন এক জন রাজ-নৈতিক পণ্ডিতকে ইটালী দেশে লৌহ-বর্ম্ম-নির্ম্মাণের সময়ে নানা দেশীয় শ্রম-জীবী লোকের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল; তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন যে, কি শিক্ষায় কি ব্যবহারে, উক্ত শ্রেণীর ইংরাজ যে অপরাপর দেশীয় তুল্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহার অর্থ এই যে, ইংরাজ শ্রমজীবীর শিক্ষা নিম্নতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুইস্ এবং জর্ম্মনেরা তাহাদের বিদ্যালয় হইতে কিরূপ উপকার লাভ করিয়াছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায়, যেখানে মূলধনের বল সমান, সেখানে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষিত সুইস্ এবং জর্ম্মনেরা ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগকে পরাস্ত করিতেছে, আর যে স্থলে ইংরাজের ধন-বল অধিক, সে স্থলেও তাহারা উন্নত শিক্ষার বলে ইংরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছে। ফরাসী শিক্ষা সচিব মুসোঁ ডুরয় ও এ কথার সমর্থন করেন; তিনি বলেন, উৎকৃষ্ট শিক্ষার গুণে সুইস্ এবং জর্ম্মন যুবকেরা ইউরোপের সর্ব্বত্রই ব্যবসায়ে যেরূপ আত্ম-প্রত্যয় এবং নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহা আর কোন দেশের যুবকেই দেখাইতে পারিতেছে না। এই আত্ম-প্রত্যয়ের ঔচিত্য সর্ব্বত্র কৃত কার্য্যতাদ্বারা প্রতিপন্ন হউক আর না হউক, ইহা নিজেই যে একটা শক্তি, আর পরিণামে যে ইহা জয়লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইংলণ্ডে কেবল ব্যবসায়ীদিগের মধ্যেই যে বিজ্ঞান এবং প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, তাহা নহে; ইংলণ্ডের সমগ্র শিক্ষা-বিভাগেই এই অভাব পরিব্যক্ত। ইউরোপের সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞানের আদর ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিতেছে এবং ক্রমেই তাহা হইতে সুফল প্রসূত হইতেছে; কিন্তু ইংরাজেরা গায়ের জোরে এত দিন নানা বিস্ময়কর কার্য্য করিয়া অভ্যস্ত, সুতরাং এখন অন্য কিছুর উপযোগিতায় বিশ্বাস করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। জর্ম্মণীতে যে কেহ বলিবে, প্রসিয়ার সর্ব্ব বিষয়ে অসাধারণ উন্নতির কারণ, যে যে বিষয়ই শিক্ষা করুক, সে সেই বিষয়েই অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রধান প্রভেদ এই যে, অন্যত্র বিজ্ঞানের যেমন আদর, ইংলণ্ডে তাহার তেমনই অনাদর; এই অনাদর এতই অধিক যে, ইংলণ্ডে অনেকে বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ পর্য্যন্ত জানে না। ইংরাজের মত এই, কোন কায করিতে করিতেই তাহা ভালরূপে করিতে পারিবে; কেমন করিয়া কায ভালরূপে করিতে হয়, তাহা আগে শিখিয়া পরে করিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য আত্যন্তিক দোষে দুষ্ট না হইলে এমতের অনুকূলে অনেক কথা বলিতে পারা যাইত। ফরাসীরা শিক্ষার বিস্তৃতি এবং গভীরতা সম্বন্ধে যদিও জর্ম্মন্‌দিগের অনেক পশ্চাদ্‌বর্ত্তী, তথাপি বিজ্ঞানের আদর সম্বন্ধে তাহারা ইহাদিগের তুল্য এবং ইংরাজ অপেক্ষা অধিক অগ্রসর।

ইহার কারণ, ফ্রান্সে এমন এক দল সুশিক্ষিত লোক আছে, যাহাদের সমগ্র শিক্ষাতে বিজ্ঞান স্থান পাইয়াছে, এবং যাহাদের সমগ্র প্রভাব বিজ্ঞানের প্রয়োগার্থ পরিচালিত হইয়াছে। ইংরাজদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক কম। হয়ত ফরাসী অপেক্ষা ইংরাজদিগের মধ্যে পাঠকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু এ সকল পাঠকের পড়া আমোদের জন্য, শিক্ষার জন্য নহে; হাল্‌কা পুস্তক পড়িলে, পড়ার পূর্ব্বে যেমন, পরেও সেইরূপ, মনটা অনিশ্চিত, অগভীর, এবং অজ্ঞ থাকিয়া যায়। প্রকৃত ভাবে যাহারা অধ্যয়ন করে, এমন লোক ইংরাজ অপেক্ষা ফরাসীর মধ্যে অধিক আছে। বিদেশীয় ভাষা হইতে যে সকল পুস্তক অনুবাদিত হয়, তাহার একটা বিবরণ দেখিলেই এ বিষয়ের সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইংরাজ পাঠক হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প বা ধর্ম্ম, যে কোন বিষয়ে জর্ম্মন্ ভাষায় এক খান বৈজ্ঞানিক পুস্তক বাহির হইলে ফরাসী ভাষায় তাহার অনুবাদিত হইবার সম্ভাবনা যত, ইংরাজী ভাষায় তাহার অনুবাদিত হইবার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অনেক কম। সাধারণের আদৃত কোন উপন্যাস বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক বাহির হইলে ইংরাজীতে যে তাহার অনুবাদ হইবে, সে একরকম নিশ্চিত, কারণ এরূপ গ্রন্থ পড়িবার অনেক লোক ইংলণ্ডে আছে; কিন্তু পুস্তক যদি এরূপ না হইয়া বৈজ্ঞানিক শ্রেণীর হয়, তাহা হইলেও তাহার অনুবাদের অন্ততঃ দুই একটা সংস্করণ কাটিতে পারে, বেশী না হইলেও এ পরিমাণ পাঠক ফরাসীদিগের মধ্যে পাওয়া যাইবে। জর্ম্মনীতে অবশ্য এই শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা আরও অধিক। শিক্ষার বিষয়গুলিতেই এ বিষয়ের বেশ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এবং তাহাতে লেখককে লজ্জিত হইতে হয়। কয়েক বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে সাধারণ শিক্ষার শিক্ষিতব্য বিষয় সম্বন্ধে লোকে আলোচনা করিতেছে। মানব দেহ-তত্ত্ব যেমন অন্য জাতীয় দেহের সঙ্গে তুলনা না করিলে জানা অসম্ভব, এ বিষয়ও সেইরূপ বিনা তুলনায় জানা অসম্ভব। অন্যান্য দেশে যখন এ প্রশ্নের আলোচনা হইতে ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার বিবরণ সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং ঐ সকল বিবরণ-গ্রন্থের দুই কি তিন সংস্করণ পড়িয়া শেষ করিবার উপযুক্ত সংখ্যক পাঠকও সে সকল দেশে ছিল। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, ইংলণ্ডে দুই শত লোক তাঁহার অথবা পেটিসন্ সাহেবের বিবরণ পাঠ করিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহার কারণ এই, এ বিষয়টা যে বৈজ্ঞানিক ভাবে অধ্যয়ণ করিবার উপযুক্ত, একথা অতি অল্প লোকেই ভাবে; সকলেই মনে করে, এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পক্ষে নিজের বুদ্ধি এবং বহুদর্শিতাই যথেষ্ট।

ইংরাজেরা যে হাতের তুড়িতে সব সারিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে, আরও হইবে। অন্যায়পূর্ব্বক দেশের ধন এবং শক্তি নষ্ট করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের দুর্ব্বলতা ঢাকিতেছেন; আর কেবল বিশুদ্ধ প্রণালীর শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের অভাব হইতেই এসব দোষ ঘটি-

তেছে। ক্যাম্‌ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন বিখ্যাত ছাত্র এবং ইংলণ্ডের একজন প্রধান গণিত-শাস্ত্র-বিশারদ এক সময়ে শিল্প এবং কল-কারখানার কাযে লিপ্ত ছিলেন, এবং ইহাতে তিনি বিশেষ খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'শিল্প-বিদ্যালয়, উৎকৃষ্ট শিক্ষা-প্রণালী, এবং বিজ্ঞানালোচনার সম্পূর্ণ অভাব থাকিলেও শিল্প এবং কল-কারখানায় আমরা আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।' তিনি উত্তর করিলেন, 'বরং আশ্চর্য্য অবনতি বলুন। এদেশের ইঞ্জিনিয়ারদের কিছুমাত্র বিজ্ঞান-বোধ নাই, তাহারা দেশের ক্ষতি করিয়া হাতের আন্দাজে যাহা কিছু শিখে। কিন্তু ইহাতে বিস্তর ভুল ভ্রান্তি এবং অর্থের শ্রাদ্ধ হয়। যাহার উপযুক্ত বিজ্ঞান-বোধ নাই, এমন লোক হয় ত একটা কঠিন সেতু-নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। সেতুটি সে তিনবার গড়িল, কিন্তু তিনবারই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িল; তখন সে বুঝিল, চতুর্থ বারে কিরূপে গড়িলে উহা ঠিক থাকিবে। কিন্তু তিন বার সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়াতে যে অর্থের শ্রাদ্ধ হইল, তাহা সরকার হইতে মিলিবে। ফ্রান্স কিম্বা সুইজর্লণ্ডে হইলে যাহারা এ বিষয় জানে তাহাদিগকে আগে নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সে প্রথম বারেই উহাতে হাত দিতে পারিত না, কারণ অন্য দেশের লোকে আমাদের মত অন্যায় খরচ করিতে নারাজ। অতএব বিদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগের যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা খুবই উচিত। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মাইল প্রতি রেলওয়ে রাস্তার যে খরচ পড়িত; তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান খরচের তুলনা করিয়া দেখুন; তখন বুঝিবেন, শিল্প-বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা না করিয়া, কেবল হাতের আন্দাজে কায করিতে যাইয়া ইঞ্জিনিয়ারেরা দেশের কত অর্থ নষ্ট করিয়াছে।'

কর্ত্তৃত্বে অসহনীয়তা এবং বিজ্ঞানে অবিশ্বাস বশতঃ ইংরাজদিগের অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও অনাদৃত। ইহার স্বাভাবিক ফল, বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে গোলযোগ। বিদ্যালয়ই মানসিক পরিকর্ষণের প্রকৃত স্থান; কিন্তু ইংরাজের প্রধান মানসিক দোষ যে বিজ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা, তাহা দূর করিবার জন্য এই সকল বিদ্যালয়ে কিছুমাত্র যত্ন হইতেছে না। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যে বর্ত্তমান যুগে নিম্নশ্রেণী এবং মধ্যশ্রেণীর কার্য্যের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িতেছে, যে বর্ত্তমান যুগে মানবীয় প্রত্যেক ব্যাপারে বিজ্ঞানের প্রভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই বর্ত্তমান যুগের অভাব দূর করিবার জন্য ইংরাজকে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী, অল্পশিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, এবং বিজ্ঞান-বর্জ্জিত শিক্ষা-প্রণালী লইয়া চলিতে হইতেছে।

সাধারণ শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রয়োজন বিবেচনায় যথেষ্ট বলা হইয়াছে। এখন বাকি উচ্চ শিক্ষা। যে সকল অসুবিধার কথা উক্ত হইল, কেবল উচ্চশিক্ষাদ্বারাই তাহার সংশোধন সম্ভব। প্রথমতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা, এবং দ্বিতীয়তঃ সমাজে এবং বিদ্যালয়ে বিস্তৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত শিক্ষক-

দিগের প্রভাব এ সকল অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ। লেখক বিভিন্ন দেশের শিক্ষার অবস্থা বিচার করিয়া ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজনীয় তাহাই বলিতেছেন। কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজনীয়, গ্রন্থকার তাঁহাই বলিতেছেন; কিরূপ ব্যবস্থা সম্ভব বা পরামর্শ-যোগ্য, তাহা বলিতেছেন না। কিন্তু সময়ের অবিরাম পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং অদ্য যাহা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে, কল্য তাহা পরামর্শ-সিদ্ধ হইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা মনোযোগ দিয়া পড়িয়া থাকিলে পাঠক বুঝিয়াছেন, বর্ত্তমান সমাজে শিক্ষা-বিষয়ে যেরূপই হউক একটা সাধারণ প্রণালীর প্রয়োজন হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে বিদ্যালয়কে কার্য্যক করিবার প্রকৃত বাসনা জন্মিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সাধারণ এবং অপসাধারণ বিদ্যালয় সম্বন্ধ মত-দ্বৈধ ঘুচিয়া যাইবে। সাধারণ বিদ্যালয়ের দায়িত্বের জন্য প্রতিভূ মিলিতে পারে, অপসাধারণ বিদ্যালয়ের জন্য তাহা মিলে না। দায়িত্বের প্রতিভূ থাকিলেই যে কায ভাল হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে অপসাধারণ বিদ্যালয়ের কোন প্রতিভূ নাই, সেও ভাল হইতে পারে; আবার যে সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রতিভূ আছে, সেও মন্দ হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে প্রতিভূ নাই, সে স্থল অপেক্ষা যে স্থলে প্রতিভূ আছে সে স্থলে যে কার্য্য ভাল হইবার সমধিক সম্ভাবনা, তাহা ইংলণ্ডের মত দেশেও লোককে বুঝাইয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

সাধারণ শিক্ষার যদি প্রয়োজন স্বীকার করা যায়, তবে একজন শিক্ষা-সচিবের প্রয়োজন ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কেবল মাত্র তত্ত্বাবধানের জন্যই একজন শিক্ষা-সচিবের পদ অনিবার্য্য। কিন্তু তত্ত্বাবধানের সুবিধা ছাড়াও শিক্ষা-সচিবের আরও উচ্চ প্রয়োজন আছে—শিক্ষা-সচিব শিক্ষা-বিভাগে দায়িত্বের কেন্দ্র-স্বরূপ। (১)

ইংলণ্ডে একেই সাধারণ শিক্ষার তেমন বিস্তার হয় নাই; তাহার উপর তথায় রাজ-নৈতিক মতামত এতই প্রবল যে, সেখানে বার্লিনের ন্যায় ছয় কি সাত জন সহকারী লইয়া একজন শিক্ষা-সচিবের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশের উপযোগী সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারা কতকটা অসম্ভব। ফ্রান্স এবং ইটালিতে একটি করিয়া ঊর্দ্ধতন শিক্ষা-সভা আছে; দেশের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষা-বিষয়ে মতামত দিবার উপযুক্ত, তাঁহাদের রাজ-নৈতিক মতামত যেরূপই হউক না কেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য; এই সভার অধিকার কেবল পরামর্শ-দানেই পর্য্যবসিত হইলেও শিক্ষা-সম্বন্ধে কেবল তত্ত্বাবধান ছাড়া আর সর্ব্ববিষয়েই শিক্ষা-সচিব এই সভার মতামত জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য। ইংলণ্ডের মত অতিমাত্রায় রাজ-নীতি-লিপ্ত দেশে একজন শিক্ষা-সচিবের সাহায্যার্থ এই রূপ একটা সভা থাকিলে দেশের অশেষ উপকার হইতে পারে।

---

(১) বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা-সমিতি, সভাপতি, সহকারী সভাপতি প্রভৃতি সমস্তই যদিও আছে, তথাপি এইরূপ একটা কেন্দ্রের সম্পূর্ণ অভাব।

এই গ্রন্থে যে দুই একটি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা এরূপ সভার বিশেষ কার্য্য হইতে পারে। সাধারণ কার্য্য-বিভাগে প্রবেশ লাভের জন্য ছাত্রদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় বাধ্য করিবার বৈধতা; সাধারণ কার্য্যে নিয়োগার্থ পরীক্ষার মাত্রা ও প্রণালীর অবধারণ, এবং এইরূপ পরীক্ষাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করা, অথবা তৎপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কার্য্যপ্রার্থীর পক্ষে অনিবার্য্য মনে করা, সে বিষয়ের নিয়মাবধারণ; বিশ্ব-বিদ্যালয়ও অপর সকল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রণালী-সংগঠন ও তাহাদের পরস্পর যোগ-সংরক্ষণ; প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সকলের যথাযথ ক্রম-সংরক্ষণ; পাঠ্য-পুস্তক-নির্দ্ধারণ, পাঠ্য-পরিমাণ, এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীর অবধারণ; ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে এরূপ সভা উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। সর্ব্বশেষোক্ত বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয়; এবিষয়ে বিশেষ বাদানুবাদ চলিতেছে, এবং শীঘ্রই একটা মীমাংসা হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। ইংলণ্ডে এরূপ সভার অতি উৎকৃষ্ট উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রকৃত রূপে গঠিত হইলে, এবং শিক্ষা-বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল শ্রেণীর মত ইহাতে স্থান পাইলে ইহার মতামতে কেবল শিক্ষা-সচিবই যে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিবেন, এমন নহে; কিন্তু রাজ-কর্ম্মচারী নহেন, এমন সকল অবৈতনিক বিখ্যাত পরামর্শদাতা তাহাতে যোগ দিলে তাহার প্রতি দেশের অপর সাধারণ সকলেরই আস্থা জন্মে, আর সেই সভার সাহায্যে বল সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা-সচিবও শিক্ষা- বিভাগে প্রয়োজনীয় সংস্কার সকল প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন।"

ইংলণ্ডে প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি-সংগঠনেরও উৎকৃষ্ট উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর ইহা জর্ম্মনদিগের ন্যায় ইংরাজদিগেরও প্রকৃতির অনুকূল; ইহা স্থানীয় কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, আর ফ্রান্সের ন্যায় একহাতে সমস্ত বিভাগ অত্যধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত করাতে যে অসুবিধা হইয়াছে, হইাতে তাহাও তিরোহিত হইতে পারে। পাঁচ কি ছয়জন মাত্র অবৈতনিক এবং একজন বেতনভোগী, এই পরিমাণ সভ্যসংখ্যা লইয়া আট কি দশটি প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি গঠন করা উচিত। কেবল তত্বাবধানই ইহার কার্য্য হইবে; মফঃস্বলে ইহা রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ রহিবে, স্থানীয় অভাব এবং প্রত্যেক বিভাগীয় বিদ্যালয়-সমূহের অবস্থা শিক্ষা-সচিবের গোচর করিবে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের খবরাখবর ইহাদ্বারা চলিবে, বিদ্যালয়-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মাদি প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে ইহার দৃষ্টি রহিবে, প্রয়োজন মত ঐ সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবে, এবং বার্ষিকপ্রধান পরীক্ষায় রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ ইহার একজন সভ্য উপস্থিত থাকিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যেরূপ বিস্তীর্ণ পরিদর্শন-প্রণালীর প্রয়োজন, উচ্চ-বিদ্যালয়ের জন্য সেরূপ প্রয়োজন নাই।

অতিরিক্ত পরিদর্শনে বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সের কোন কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গ্রন্থকারের নিকট আক্ষেপ করিয়াছিলেন; বাস্তবিকও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় উচ্চবিদ্যালয়ে পরিদর্শনের তেমন প্রয়োজন দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে প্রুসীয় প্রণালী অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট। তথায় বার্ষিক প্রধান পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের সঙ্গে রাজকীয় যোগদানে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয়। সময়ে সময়ে পরিদর্শনের যে প্রয়োজন হয়, প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি অথবা সাধারণ শিক্ষা-সভার সভ্যগণকর্ত্তৃক তাহা সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। উচ্চবিদ্যালয়-পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক দিগের পদ প্রয়োজনীয় নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শিক্ষা-সচিব, সাধারণ শিক্ষা-সভা এবং প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি যাহাদিগকে লইয়া কায করিবে; ইংলণ্ডে তেমন উচ্চ বিদ্যালয় কোথায়? গ্রন্থকার নানা দেশের অভিজ্ঞতা হইতে নিম্নে যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা হইতেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। যেখানে কোন বিদ্যাত্র সম্পত্তি আছে, সেখানেই তত্ত্বাবধানে সাধারণের অধিকার আছে, আর প্রয়োজন হইলে সেখানে সাধারণের কর্ত্তৃত্বে প্রচলিত বন্দোবস্তেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আবার যে স্থলে বিদ্যাত্র সম্পত্তি রাজা বা সরকার হইতে প্রদত্ত, সে স্থলে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান-কার্য্যে যোগ দিতে এবং তত্ত্বাবধায়কদিগের মধ্যে রাজকীয় প্রতিনিধি রাখিতে রাজার অধিকার আছে। এই দুইটি বাক্যের যৌক্তিকতা আর দশ বৎসর পরে ইংলণ্ডের লোকেও স্বীকার করিবে, এবং ইহার বলেই জাতীয় সাধারণের জন্য একটা শিক্ষা প্রণালী গঠিত হইতে পারে। সাধারণ বিদ্যাত্র সম্পত্তির শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা হইবে; আর ইংলণ্ডের একান্তবর্ত্তিতা এবং জাতীয় অভ্যাস-দোষে অপসাধারণ বিদ্যাত্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কগণ যেরূপ অসংযত ভাবে তাহার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে সহজ বুদ্ধি এবং জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে ইহাদিগকে কঠোরতর নিয়মের অধীন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বিদ্যাত্র সম্পত্তির যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে; এখন তাহা রহিত করিয়া তদ্দ্বারা কতকগুলি রাজকীয় বা সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহ সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা-বিভাগ এবং প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতির তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তত্ত্বাবধান, ছাত্র-বেতন, পাঠ্য-পুস্তক, পাঠ্য বিষয়, শিক্ষা-প্রণালী এবং পরীক্ষা-প্রণালী-সম্বন্ধে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ যে রূপ নিয়মাদির প্রবর্ত্তন সঙ্গত মনে করিবেন, সর্ব্বত্রই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই রাজকীয় তত্ত্বাবধান-প্রণালী যখন সাধারণের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে, তখন অন্যান্য বিদ্যালয়ও আপনা হইতেই এই তত্ত্বাবধানে আসিবে; আর যথাযথ রূপে এই তত্ত্বাবধান-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে পারিলে অতি শীঘ্রই যে ইহা সাধারণের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস লাভ করিতে পারিবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই রূপ কতকগুলি বিদ্যালয়

স্থাপিত হইলে মধ্যম শ্রেণীর ছাত্রেরা তাহাতে পড়িতে সম্মান বোধ করিবে; আর ইহাতে পড়া শুনা যে ভাল হইবে, সে বিষয়েও তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে। বর্ত্তমান প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই অভিনব বিদ্যালয়-সমূহের বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না, সুতরাং দীর্ঘকাল তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পথেও চলিবে না। বর্ত্তমান কয়েকটি প্রধান বিদ্যালয় রাজ-দত্ত সম্পত্তির আয়েই পরিচালিত। এইসকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষক-নিয়োগে রাজকীয় অধিকার ত বর্ত্তমানই রহিয়াছে বলিতে হইবে। আর কতকগুলি বিদ্যালয় রাজকীয় সাহায্যে পরিচালিত না হইলেও বিদ্যাত্র সম্পত্তির আয়েই তাহাদের ব্যয়-নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং এই সকল গুলিরই তত্ত্বাবধানে হস্তার্পণ করিতে সাধারণের অধিকার রহিয়াছে। সাধারণের এই অধিকার পরিচালন করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়, ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান পরীক্ষায় জর্ম্মনীর ন্যায় প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি অথবা রাজকীয় শিক্ষা-সভার যোগদান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং উচ্চতম রাজ-কার্য্য-লাভের অধিকার এই সকল পরীক্ষার উপর নির্ভর করিবে। (১) এই সকল পরীক্ষায় অপসাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও গ্রহণ করিতে হইবে। এই উপায়ে বিদ্যাত্র সম্পত্তি-পুষ্ট সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর একটি অতি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা গৃহীত হইবে, উচ্চতম কর্তৃপক্ষ দ্বারা এই পরীক্ষা উদ্ভাবিত বা অনুমোদিত হইবে, এবং গৌণ ভাবেই হউক আর মুখ্য ভাবেই হউক, পরীক্ষা-কার্য্যে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব রহিবে। ইহা দ্বারা পড়াশুনার যে নিয়ম হইবে, তাহাতে দেশের বর্ত্তমান উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়গুলিও লাভবান্ হইবে, অতি উৎকৃষ্ট ছাড়া আর সকল গুলিরই ইহাতে একরূপ পুনর্জ্জন্ম হইবে। জর্ম্মনীর ন্যায় ইংলণ্ডে ও সাধারণ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-নিয়োগে রাজকীয় অধিকার থাকুক, এরূপ প্রস্তাব করিলে প্রায় সকলেই আপত্তি করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পরীক্ষা-কার্য্যে শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রহিলে সে রূপ আপত্তি হইবে না, আর অপসাধারণ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহা দ্বারা আর একটি শুভ ফল এই হইবে যে, অপসাধারণ বিদ্যালয়ের কদর্য্য শিক্ষা এবং মুখস্থ বিদ্যা ক্রমে তিরোহিত হইবে; কারণ উৎকৃষ্ট পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে সকল বিদ্যালয়েই বাধ্য হইয়া উৎকৃষ্ট শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে বলিয়া মূর্খ অভিভাবক দিগকে প্রতারিত করা অসম্ভব হইবে; অর্থাৎ বালকেরা সাধারণ প্রণালীতে পরীক্ষা দিতে না পারিলেই অভিভাবকেরা বুঝিবে যে, বালকদিগের কিছু হইতেছে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষার কথা বলিলেই

(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিভাগের জন্য গ্রীক্ পড়াইবার প্রয়োজন নাই।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা আসিয়া পড়ে। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে ইংলণ্ডীয় শিক্ষা-বিভাগের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গলদ; সুতরাং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যখন উচ্চ বিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য সংস্রব রহিয়াছে, তখন উচ্চ বিদ্যালয় ভাল করিতে গেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার আগে চাই। প্রণালী-বদ্ধ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের অভাব ইংলণ্ডের বিশ্ব বিদ্যালয়ে যেমন, ইংরাজের জীবনেও সেইরূপ। এই অভাব দূর করিবার ভার বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই উপরে ন্যস্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে শিক্ষার্থী আপন প্রাকৃতিক বিশেষ শক্তি অনুসারে কি ভাষা এবং সাহিত্য, কি গণিত, কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও তাহার প্রয়োগ, অথবা অন্য যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহে, তাহা যাহাতে সে অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা করিতে পারে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অক্স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজ্ ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়, কিন্তু গ্রন্থকারের মতে এ সম্বন্ধে তাহারা কিছুই নহে। ঐ সকল বিশ্ব-বিদ্যালয় অতি উন্নত উচ্চ বিদ্যালয় মাত্র; কারণ যদিও এখানে উচ্চ শ্রেণীর সন্তানেরা দীর্ঘ কাল ধরিয়া ভাল শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিতে পায় এবং এ বিষয়ে অন্য দেশীয় উচ্চ শ্রেণীর সন্তানদিগের হিংসা উত্তেজিত করিতে পারে, যদি ও তাহাদের কলেজ আছে, শিক্ষক আছে, পরীক্ষা আছে, এবং উপাধি-বিতরণ আছে, তথাপি তাহাদের শিক্ষা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার ন্যায় সাধারণ শিক্ষা মাত্র। ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর পড়িলে যে পরীক্ষা হয়, জর্ম্মণী এবং ফ্রান্সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময়েই সে পরীক্ষা হইয়া যায়, তাহার পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃত পড়া আরম্ভ হয়। কিন্তু সকলেই জানেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ উপাধির জন্য অক্স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজে পরীক্ষাই হয় না, আর হইলেও তাহা নাম মাত্র; সুতরাং এই সকল উপাধির উপযোগী পড়া হয় না, অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃত পড়াই হয় না। এইরূপ পড়ার যন্ত্র ইংরাজদিগের হাতে আছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা সে যন্ত্র ব্যবহার করেন না।

লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার আরও গুরুতর একটী প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। ইহাকে একটী পরীক্ষক-সমিতি বলিলেই হয়। ইহা কোন বিষয়েই শিক্ষা দান করে না, কিন্তু সকল বিষয়েই পরীক্ষা লয় এবং উপাধি দেয়। ইহাতে প্রকৃত পরীক্ষা আছে, কিন্তু অক্স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজে তাহা নাই; আবার স্বতন্ত্র পরীক্ষক-সমিতি দ্বারা ইহার পরীক্ষা গৃহীত হয়, কলেজের শিক্ষকদিগের কর্ত্তৃক নহে। ইহা অতি উত্তম নিয়ম; কিন্তু প্রকৃত অভাব-দূরীকরণে ইহা নিতান্ত অক্ষম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার অর্থই এই যে, সেখানে যে ছাত্রেরা কেবল আপন আপন শক্তির অনুরূপ বিষয় অধ্যয়ন করিবে, তাহা নহে, কিন্তু সেই সকল বিষয়ে যাহাতে তাহারা অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত থাকিবে।

শিক্ষা-সংবাদ।

বিদ্যালয়ে পুলিশের প্রবেশ।—রামপুর বোয়ালিয়ার ষ্টীমার-ঘাটে না কি ষ্টীমারের লোকের সঙ্গে রাজসাহী—কলেজের ছাত্রদিগের বিবাদ হয়, এই কথা স্থানীয় সংবাদপত্র হিন্দু-রঞ্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টীমারের অধ্যক্ষ কয়েকটি ছাত্রের নামে অভিযোগ আনিয়াছেন, স্থানীয় বিচারালয়ে তাহার বিচার ও চলিতেছে; যথাকালে ইহার ফলাফল সংবাদ-পত্রের পাঠকগণ অবশ্যই জানিতে পারিবেন, তৎ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু এই উপলক্ষে পুলিস কলেজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি ছাত্রকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লিভিংষ্টোন্-সাহেব নিজের সম্মান বা কলেজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, বরং ছাত্রদিগকে অপ্রকৃত কথা বলিয়া এবং অন্যায় ভয়-প্রদর্শন করিয়া তিনি নিজের অজ্ঞতা এবং অপদার্থতারই পরিচয় দিয়াছেন। লিভিংষ্টোন বলিয়াছেন, "ইহা এক গুরুতর সরকারী-মোকদ্দমা।" তাঁহার একথা প্রকৃত নহে—উহা সরকারী মোকদ্দমা নহে। স্বয়ং ভারতেশ্বরী বাদী না হইলে যে মোকদ্দমা সরকারী হইতে পারে না, কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সে দিকে জ্ঞান নাই; ইহাই তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয়। তাহার পরে বলিলেন, "যদি তোমরা আপনার স্থান হইতে উঠ, গার্ড (পুলিস) সাহেব বলিতেছেন, তবে তিনি 'কলেজের ফটক বন্ধ করিয়া তোমাদিগকে গুলি করিয়া মারিবেন।" এই এক কথাতে সাহেবের সমস্ত গুণেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যদিও নির্দ্দোষ লোকের উপরে গুলি চালাইবার অভ্যাসটা রাজসাহীর পুলিসের বিশেষরূপেই আছে, তথাপি ছাত্রেরা আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেই তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবেন, ধর্ম্মাবতার পুলিসের এমন কি অধিকার আছে, বিদ্যাবুদ্ধির সাগর অধ্যক্ষ মহাত্মা একবার একথাটা জিজ্ঞাসা ত করিতে পারিতেন? ইহা কোন খুনের বা রাজ-দ্রোহের মোকদ্দমা নহে, বিশেষতঃ সশস্ত্র পুলিস যখন কলেজ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, তখন ছাত্রদিগের পলায়ন করিবার ও কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ অবস্থায় অধ্যাপন-কার্য্যে ব্যাঘাত না করিয়া ছুটির পরে অপরাধী ছাত্রদিগকে চিনিয়া ধরিবার কথা পুলিসকে বলিলেই নিজের পদোচিত কার্য্য হইত, অথবা নিজের বুদ্ধিতে ততটা না কুলাইলে শিক্ষা-বিভাগের বিচক্ষণ সর্ব্বাধ্যক্ষ মহোদয় কিম্বা স্বয়ং বঙ্গেশ্বরের নিকট তারে সংবাদ দিয়া অনুমতির প্রার্থনায় অপেক্ষা করিলেও চলিত।

বিদ্যা-মন্দির এবং ধর্ম্ম-মন্দির অতি পবিত্র স্থান, এখানে পুলিসের পদার্পণ না হওয়াই প্রার্থনীয়। আমাদের জন্য বলিতেছি না, আমাদের সমস্তই সহিতেছে এবং

সহিবে;—আমরা কাল নদীর ভীষণ সৈকত-ভূমে জাতীয় মহাশ্মশানে জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনে নিযুক্ত আছি, আমাদের আত্মবিসর্জ্জনের দিনও অধিক দূরবর্ত্তী নহে, সুতরাং মুমূর্ষুর পক্ষে এত ভাল মন্দ বিচার না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু বিদ্যা-মন্দিরের সম্মান এবং ধর্ম্ম-মন্দিরের পবিত্রতা-রক্ষায় রাজ-পুরুষদিগেরই মঙ্গল। এই জন্য এ কথাটা বলিতেছি। ইংরাজেরা স্মরণ রাখিবেন, ভারতে তাঁহারা জাতীয় চরিত্রে যে বীজ বপন করিতেছেন, কালে তাহাই ইংলণ্ডের সমাজে বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া তিক্তফল প্রসব করিবে। যাহারা বিড়াল-কুকুরের উপরে নির্দ্দয় বা অন্যায় ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত এবং শিক্ষিত হয়, তাহারা যথাকালে ভ্রাতা-ভগিনীর শোণিত-পানেও সঙ্কুচিত হয় না।

মূক-বিদ্যালয়।—অনেক বালক জন্মাবধি বধির এবং বোবা হয়। বোধ হয় বধিরতাই তাহাদের বোবা হইবার কারণ; যে জন্মাবধি অন্যের কথা শুনিল না, সে নিজে কথা কহিবে কিরূপে? ইউরোপে এই সকল বালককে লেখা পড়া শিখাইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তথায় স্থানে স্থানে এইজন্য বিদ্যালয় ও স্থাপিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল কলিকাতাতে ঐরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে কেহ ঐ প্রণালী সাক্ষাৎ ভাবে শিক্ষা না করাতে শিক্ষা দানে অসুবিধা হয়, এই জন্য বাবু যামিনীনাথ বন্দোপাধ্যায় উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে আমেরিকার কোন মূক-বিদ্যালয়ের, অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে খরচ পত্র দিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছেন; তিনি তথায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমেরিকার লোকেরা আমাদের দেশের শিক্ষার জন্য অর্থ-ব্যয় করিতে প্রস্তুত, আমরা নিজে কিন্তু শিক্ষা-ব্যয়টাকে কতকটা অপব্যয়ই মনে করি।

চীনে শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা।—

বিপদে না পড়িলে মানুষ আত্ম-বল বুঝিতে পারে না। চীন এতদিন ঘরে বসিয়া ধরাখানিকে শরাখানি মনে করিতেন, বিস্তীর্ণ রাজ্য এবং অগণ্য লোক-সংখ্যার দিকে চাহিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতেন, কিন্তু যাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পদে পদে পরাজিত হইয়া চীনের সে ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে, নব্য জাতি-নিবহের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইলে আধুনিক প্রণালীর বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক শিক্ষার যে বিশেষ প্রয়োজন, বৃদ্ধ চীন এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া ইউরোপীয় প্রণালীতে সামরিক শিক্ষা লাভ করিবার জন্য দলে দলে চীন যুবককে ইউরোপে পাঠাইয়াছেন। চোর না পলাইতেই যে চীন জাগিলেন, ইহাই সুখের বিষয়।

মেডিকেল কলেজের নূতন ব্যবস্থা।—

সংপ্রতি নাকি বঙ্গেশ্বর ব্যবস্থা করিয়াছেন, মেডিকেল কলেজের যে কোন পরীক্ষার কোন ছাত্র দুইবার অনুত্তীর্ণ হইলে তাহাকে

আর সে কালেজে পড়িতে দেওয়া হইবে না। জর্ম্মনীতে নিয়ম আছে, কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুইবার অকৃত-কার্য্য হইলে আর তাহার উক্ত পরীক্ষা লওয়া হয় না। এ নিয়মের যুক্তি এই,—যে দুইবার পরীক্ষা দিয়া ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার উপযুক্ত নহে, সুতরাং জীবনের প্রাতঃকালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিলে, সে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির উপযোগী একটা ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায় করিতে পারে। এই নিয়মটা যে কেবল ছাত্রদিগের মঙ্গলের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গেশ্বরের অনুমোদিত নিয়মে কোন্ পক্ষের যে কি উপকার হইল, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। মেডিকেলকলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সময়ে প্রায় ছাত্রই জীবনের মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হয়; এই সময়ে তাহাদিগকে শেষ পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত করিলে তাহারা দাঁড়ায় কোথায়? ছাত্রের স্বার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলে এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত না। কেহ ক্রমাগত সাতবার অনুত্তীর্ণ হইলেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে, আর মেডিকেল কলেজে কোন বার্ষিক পরীক্ষায় দুইবার মাত্র অনুত্তীর্ণ হইলেই জাতি যাইবে, এ বড় বিচিত্র নিয়ম। কিন্তু এ নিয়মের যে একটা অনিবার্য্য শুভফল আছে, বঙ্গেশ্বর তাহা দেখিয়াছেন কি না জানি না। এই নিয়মের জোরে যাহারা মেডিকেল কলেজ হইতে তাড়িত হইবে, তাহারা এক্ষণ হইতে বৈদ্যক-শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে। এখনই দেখা যায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর দিকে লোকের শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতেছে; ইহার পরে যখন বুদ্ধিমান ছাত্রগণ মেডিকেল কলেজে অস্থি-তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব এবং শব-ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা করিয়া ধনন্তরি-কল্প আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক দিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবে, তখন ইহাদের প্রতিযোগিতায় ডাক্তারি নিস্তেজ হইবে না কি? বিদেশের চিকিৎসা-প্রণালী যে এ দেশের উপযোগী নহে, ইহারা সেই বিদেশীয় প্রণালীর ভিতর হইতেই তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া ডাক্তারি চিকিৎসার অপকারিতা লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে।

৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

শিরোনামাঙ্কিত মহাত্মার পরলোক গমন হইতে এ পর্য্যন্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রে কত কি বাহির হইয়াছে ও বাহির হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমিও তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা কহিব। আমি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করি, ১৮৬৬ অব্দে ভূদেব বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। আমি যেস্থলের জিলাস্কুলে তৃতীয় শিক্ষক ছিলাম, তত্রত্য নর্ম্মালস্কুলে তাঁহার সহিত আমার ও আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত ভূদেব বাবুর প্রথম আলাপ হয়, তখন তিনি পাঠশালা সমূহের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন; আমাদের ইনস্পেক্টর ছিলেন, আর, এল, মার্টিন। আমার বয়ঃক্রম ছিল তখন ২৩ বৎসর মাত্র। ভূদেব বাবুর বিশাল প্রশান্ত গম্ভীর মধুময় আকার দেখিয়াই মনে প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল; তদীয় পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলাম (বলা অনাবশ্যক যে পদে ধূলির নাম গন্ধ ও ছিল না)। তিনি বসিতে বলিলেন, একপ্রান্তে বসিলাম। গৃহটী ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ। আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছিলেন শিক্ষা বিভাগের একটী অত্যুজ্জল রত্ন, ভূদেব, অভিজ্ঞ রত্নজীবী। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। ডিপুটী ইনস্পেক্টর, নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গেই তাঁহার কথা হইতে লাগিল, আমরা অবশিষ্ট সকলেই শ্রোতা। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে আমি একটি কথাও কহি নাই। অথচ কে জানে, কি জন্য, আমার প্রতি ভূদেবের সেই দিনই স্নেহ জন্মিল, একথা পরদিন আমাদিগের প্রধান শিক্ষকের কথায় বুঝিলাম। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, আমি দশটার সময় স্কুলে যাইয়া; তাঁহার গৃহে অপেক্ষা করিতাম। যে দিনের কথা কহিতেছি, সেইদিন তদীয় গৃহে যাইয়া দেখিলাম তিনি আহারকরিতেছেন, আহার করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি কাল চলিয়া গেলে ভূদেব বাবু তোমার নাম ধাম ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন তাহাতে যেন বোধ হইল তোমাকে একটুক সদয় চক্ষে দেখিয়াছেন। আমার অনুরোধে তিনি অদ্য আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিবেন। যদিও তোমার উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে, তথাপি সাবধান করিয়া দিতেছি, তিনি যাতে তোমার কায কর্ম্ম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যান, তাহা করিবে। কেননা, তোমার শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং স্কুলে প্রবেশ মাত্রই, সম্মুখে পড়িবে।" বেশী কথা বলা আমার কখনও অভ্যাস নাই এবং চিরকালই বিশ্বাস আছে যে, কথা আর কাযে দাত্রকুষ্মাণ্ড সম্বন্ধ; একটী বেশী হইলে আর একটীর মাত্রা কম হয়। সুতরাং

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ বাক্যের মৌখিক উত্তর না দিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কায করিতে লাগিলাম। ৩ টার সময় স্বর্গগত মহাত্মা স্কুলে আমার শ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, আমিও ছাত্রবৃন্দ গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিলাম। তখন ভূদেব বাবু ছাত্রদিগকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং শিক্ষকের আসন পরিগ্রহ করিলেন, আমি দণ্ডায়মান রহিলাম। তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শিক্ষকের দণ্ড আমার পরিদর্শনের উদ্দেশ্য নহে।" সেখানে অন্য চেয়ার ছিল না, সুতরাং ভূদেব বাবুর বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া আমি ছাত্রদিগের বেঞ্চের এক পার্শ্বেই বসিলাম। ইংরাজী তৃতীয় ভাগ পদ্যগ্রন্থ ছাত্রেরা পাঠ করিতেছিল, তাহাতেই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। "সুখীজীবন' প্রবন্ধের একটী বাক্যের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসিত হইলে, সমস্ত শ্রেণীর বালকেরা একরূপ অর্থ করিল; ভূদেব বাবু আমার মুখপানে তাকাইলেন। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েন নাই; সুতরাং ঐ বাক্যের যে ব্যাখ্যা আমি অভিধানের সাহায্যে বুঝিয়া ছিলাম, তাহা বলিলাম। এবং আমার নিকট যে দুই চারিটি ছাত্র ছিল, আমার ব্যাখ্যা তাহাদিগের খাতায় ও লেখা আছে, তাহা ও দেখাইলাম। তখন তিনি একটুক চমৎকৃত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ছেলেরা ওরূপ মানে করিল কেন?" আমি ছাত্রদিগের নিকট হইতে মুদ্রিত অর্থপুস্তক আনিয়া দেখাইলাম, উহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা ঐ অর্থ পুস্তকে আছে। তখন ভূদেব বাবু আমাকে বলিলেন, "অতঃপর ছেলেদের কাছে অর্থপুস্তক দেখিলে আপনি ছিঁড়িয়া ফেলিবেন, তাহাতে ছেলেরা অসন্তুষ্ট হইলেও অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট হইবে।" এবং শিক্ষকের প্রতি ও তদীয় শিক্ষার প্রতি আস্থা না থাকিলে, প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না, এই বিষয়ে ছাত্রদিগকে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা উপদেশ দিয়া পরিদর্শন সমাপ্ত করিলেন। এই পরিদর্শনের পর ছয় মাস মধ্যে ভূদেব বাবুর অনুরোধে উড্সাহেব আমাকে দ্বিতীয় শিক্ষকতা প্রদান করেন। এই সময় হইতে ১৮৮৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের যথেষ্ট নিদর্শন পাইয়াছি। উপরে যাহা লিখা হইল, তাহা পাঠ করিয়া পল্লবগ্রাহী পাঠকেরা হয়ত মনে করিবেন প্রবন্ধলিখক ভূদেব বাবুকে উপলক্ষ করিয়া নিজের এক মস্ত সার্টিফিকেট দিলেন, কিন্তু চাকুরির সন্ধ্যা বেলা লেখকের কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই; ইহাতে ভূদেব বাবুর কোন গুণবত্তা প্রকাশ যদি না পাইয়া থাকে, তবে তাহা লেখার দোষ—লেখকের ইচ্ছার দোষ নহে।

পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার দুই এক বৎসর পর ভূদেব বাবু আবার পরিদর্শনে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে আছেন; অপরাহ্নে আমাদিগের হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। এমন সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর এক জন ইউরেসিয়ান ছাত্র (নাম mends) এক খানি জ্যামিতি বগলে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমি তখন প্রথম তিন শ্রেণীতে গণিত ও প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাস

ভূগোল শিক্ষা দেই। ঐ ছাত্রটী গণিতে বড়ই মূর্খ, হাজার চেষ্টা করিয়া ও জ্যামিতির মূল সূত্রগুলি উহার মস্তকে প্রবেশ করাইতে পারি নাই। ভূদেব বাবু সকলের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিয়া, ঐ ছাত্রের পড়াশুনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, সে গণিতে বিশেষতঃ জ্যামিতিতে অনভিজ্ঞ। তখন তাহাকে জ্যামিতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ৪৷৷০ ঘটিকার সময়, অধ্যাপনা আরম্ভ, ৬৷৷০ টার সময় সমাপ্ত। ছাত্রটী যাইবার সময় বলিয়া গেল, "এখন অবধি জ্যামিতিতে আমাকে আর কেহ ঠকাইতে পারিবে না।" বাস্তবিক তাহাই দেখা গেল। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ প্রফেসর দিগের নিকট যে ভাবে গণিত শিখিয়া ছিলাম, তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল; এবং শিক্ষা বিভাগের যে কয়জনা কর্ম্মচারী ছিলাম, সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল ভূদেব গণিত শিক্ষার এক নূতন পন্থা দেখাইলেন

অন্য একবার আমাদিগের হেডমাষ্টর মহাশয় ভূদেব বাবুকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, প্রত্যেক বিষয়ে ভূদেব বাবু এমন এক একটি উত্তর দিতে লাগিলেন যে, তাহাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ সকল বিষয় পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া তাহার সদুত্তর ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সে সকল জটিল ও গভীর প্রশ্নের মৌলিকতাপূর্ণ চোস্ত উত্তর, কেবল ভূদেবের ন্যায় মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ হইলে চলিলাম তেমন তীক্ষ্ণধী আর একটি দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিলাম না। আমার তিনটী প্রশ্নোত্তর এখনও স্মরণ আছে, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

১। আমাদিগের হেডমাষ্টর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খৃষ্ট-ধর্ম্মের বহুল প্রচার এদেশের উপকার না অপকার মনে করেন?" ভূদেব বাবু বলিলেন "আমাদের স্বধর্ম্মেই আমাদিগকে মেষপাল করিয়াছে, খৃষ্টধর্ম্ম অধিকতর মেষীকরণ-ধর্ম্ম, সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে ভেড়ার দল আরো ভেড়া হবে, দেশ রসাতলে যাবে। দেশের যে সর্ব্বনাশের দশা উপস্থিত, তাহাতে বরং মুসলমান ধর্ম্মের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে এ মৃতদেহে শক্তি সঞ্চার হইতে পারে—এ ভস্মে অগ্নি জ্বলিতে পারে।" এই কথাগুলি বলিবার সময় দেখিয়াছিলাম, ভূদেবের বিশাল নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে।

২। আমাদিগের হেডমাষ্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাল্যবিবাহ এদেশের পক্ষে ভাল না মন্দ মনে করেন?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "খুব ভাল মনে করি। যে দেশে "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী" "প্রভৃতি বচনানুসারে বালিকাদিগের বাল্যকালে বিবাহ দিতেই হইবে, সে দেশে ত্রিশবৎসরের এক ঢেঙ্গা মিন্‌ষের সহিত দশবৎসরের মেয়ের বিবাহ কি আপনি শ্রেয়ঃ বোধ করেন? আমি ত মনে করি, উহাতে হিতে বিপরীত হইবে—বিশেষ অনর্থ ঘটিবে।" এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি সংক্ষেপে দিয়াছিলেন, ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনা আছে সুতরাং তাহা এস্থলে বিবৃত করিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না।

৩। আমাদিগের হেড মাষ্টর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচরণ সরকার মহাশয় যে সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন তুলিয়াছেন, উহার সম্বন্ধে আপনার মত কি?" ভূদেব বাবু উত্তর করিলেন "প্যারী বাবুর উপর আমার খুব শ্রদ্ধা ভক্তি আছে; কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান আন্দোলনের সহিত আমার সহানুভূতি থাকা দূরে থাকুক, আমি বুঝিতে পারিনা অত বড় প্রবীণ ব্যক্তি এরূপ বালকবৎ আন্দোলনে কেন প্রবৃত্ত হইলেন। আপনারা কি কখন শুনিয়াছেন' বা গ্রন্থে পড়িয়াছেন, যে উপদেশ দ্বারা কেহ কখনও কাহাকে গুরুতর পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছে? যদি এরূপ বিশ্বাস আপনাদের থাকে তবে তাহা ভুল। আমি মনেকরি ক্ষুদ্র পাপ উপদেশে দূর হইতে পারে, কিন্তু সুরাপানের মত গুরুতর একটা পাপ মৌখিক বা লিখিত উপদেশে দুর হয় না। মিছামিছি শপথ করাইয়া পাপের বোঝা, আরো ভারি করা হয়। যাহার বাঁচিবার সাধ থাকে, যাহার মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার সাধ হয়, ভগবানের ইচ্ছায় সে আপনি মদ ছাড়িয়া দেয়।"

৪। আমাদিগের হেড মাষ্টর মহাশয় কহিলেন "বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করিতেছেন; উহার সম্বন্ধে আপনার মত কি।" ভূদেব বাবু উত্তর করিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয় স্থলেই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী হইয়া শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মে প্রণিধান করিলেন না, এই এক ভুল: আর এক ভুল দেশের লোকের মতি গতি লক্ষ্য করিলেন না। সকল দেশের লোক গণনায় দেখা গিয়াছে, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। সুতরাং বহু বিবাহ না হইলে যখন অনেক অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হয় না, তখন বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়া বিপদ বৃদ্ধি করা বইত নয়। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রমে দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কারণ তিনি ইহার একটীতে ও কৃতকার্য্য হইবেন না। উপস্থিত কেহ এই সময় বলিলেন, "তবেত বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যায় করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইনি এক জন কর্ত্তা ভজা দলের লোক, অর্থাৎ চাটুকার। কিন্তু ভূদেব বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে কহিলেন "বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যায় কায করিয়াছেন, এ কথা বলা ধৃষ্টতা। তাঁর ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তিনি জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, এ কথা শ্রবণেরও যোগ্য নহে।"

অতঃপর একটা ডগরের কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা জানা আছে, তাহা সময়ান্তরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। ডগরের কথাটী এই—

ভূদেব বাবু ডিপুটী ইনেস্পেক্টর ও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া হাটুবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺ গুরুদাস রায়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। ভূদেব বাবুর বিশাল কায় দেখিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেডা?" বাবুর এক জন কর্ম্মচারী বাবুকে কহিলেন "এই দেশে যত পাঠশালা আছে

ইনি তার কর্ত্তা।” বাবু ভূদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার ব্যাতন কত?” এবার ডিপুটী বাবু উত্তর করিলেন “আট শত টাকা” গুরুদাস বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন “হেল্লারে বেল্লা, আটশ টেহা !! পেরনাম বৈস।” ইহা বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, ভূদেব বাবু উপবেশন করিলেন। তৎপর গুরুদাস বাবু ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি আবার কেডা? “তিনি কহিলেন “আমি স্কুলের ডিপুটী ইনেস্পেক্টর। “বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন “যাও ও ছাতার আজ্‌রাজি ফাঙ্‌রাজি আমি কিছু বুঝি না, বাঙ্গলায় কও। তুমিও গুরু লেহাইয়া খাও নাকি।” গতিক বুঝিয়া ডিপুটী বাবু কহিলেন, “আজ্ঞা হা।” গুরুদাস বাবু “তোমার ব্যাতন কি? ডিপুটী আজ্ঞে “দেড়শ টাকা” গুরুদাস “ভেলারে আমার! তুমিও ত দেখ্‌ছি এক জন। পের্‌নাম্ বৈস।” ইঁহাকেও আর এক খানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন, ইনি তাহাতে বসিলেন। গুরুদাস বাবু নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারকে কতক জানিতেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ব্যাতন? তিনি কহিলেন “একশত টাকা।” বাবু আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন “তুমি না গুরুগিরি কর? তাতেও একশ টেহা ব্যাতন!! তুমিও ত মন্দ লও। পের্‌ণাম্ বৈস।” যে পর্য্যন্ত বেতনের পরিচয় পান নাই; সে পর্য্যন্ত গুরুদাস কাহাকেও প্রণামও করেন নাই, বসিতেও বলেন নাই। ভূদেব বাবু বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন “লোকটা খাটি জিনিস আছে, ইংরাজী শিক্ষায় নষ্ট করিতে পারে নাই।”

ভবিষ্য মানব—পরিশিষ্ট।

আষাঢ় মাসের “ধরণী” তে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় “ভবিষ্য মানব” নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের মূল কথা, ভবিষ্য মানব দন্তহীন এবং কেশ হীন হইবে। একেই এসকল কথা বিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইনের যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে চন্দ্রশেখর বাবুর সরস লেখনীর সহায়তা পাইয়াছে, সুতরাং প্রবন্ধটি যে সুপাঠ্য হইয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে “আজ কাল্‌কার হিন্দুয়ানির প্রেতাত্মার স্বনিয়োজিত মুরুব্বি” দিগের প্রতি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া হিন্দুসমাজকে অনুগৃহীত করিবার কি প্রয়োজন ছিল, আমরা কেবল এই টুকুই বুঝিতে পারি নাই।

ভবিষ্য মানব দন্তহীন হইবে কেন?

প্রাকৃতিক প্রয়োজনানুসারেই শারীরিক বিধান। অসভ্যাবস্থায় কঠিন ফল ও কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইতে হইত, তদ্ভিন্ন স্ত্রী-লাভের জন্য অন্য পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও দন্তের সাহায্য লাগিত। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন সে সব প্রয়োজন তিরোহিত হইতে চলিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে মানুষের দাঁত থাকিবার আর সম্ভাবনা কোথায়?

ভবিষ্য মানব যে কেশহীন হইবে, তাহারও যুক্তি এই রূপ কেশের একটা উপকারিতা এই যে, তদ্দ্বারা মাথায় সূর্য্যোত্তাপ কিছু কম লাগে; কিন্তু বিজ্ঞান-প্রসূত ছত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে কেশের প্রয়োজন আর থাকিবে না। কিন্তু মস্তকের কেশ এবং দাড়ি ও গোঁপের আদি এবং প্রধান উদ্দেশ্য না কি "স্ত্রী-চিত্ত কর্ষণ।" আজ সভ্য-সমাজে রূপের তেমন প্রয়োজন নাই, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বংশগৌরব প্রভৃতিই সভ্য সমাজে বিবাহের নিয়ামক হইয়াছে, সুতরা মানুষের চুল যে আর অধিক কাল থাকিবে, এমন সম্ভাবনাও নাই।

আজগুবি কোন কথা উঠিলে হিন্দুরা কিছু গোলযোগ করে, এই জন্যই বোধ হয় লেখক প্রবন্ধের ভূমিকায় হিন্দুদিগের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে ডারউইনের শিষ্যগণ কিম্বা সমস্ত মানব-জাতি কেশহীন এবং দন্তবর্জ্জিত হইলেও হিন্দুদিগের ইহাতে দুঃখিত হইবার বা আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। বরং ডারউইনের যুক্তি ধরিয়া চলিলে মানবদেহ সম্বন্ধে আর যে সকল উপপত্তি হইতে পারে, এই পরিশিষ্টে আমরা সেই গুলির ও উল্লেখ করিয়া দিতেছি।

ভবিষ্য মানব অঙ্গুলীশূন্য হইবে। অঙ্গুলীর প্রধান কার্য্য অন্নের গ্রাস ধারণ করা, কিন্তু কাঁটা চামচের সাহায্যে এখন সে কার্য্য চলিতেছে। কাঁঠা চামচু এবং লেখনী ধারণের কার্য্য কেবল তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে, সুতরাং মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, অতএব ভবিষ্য মানবের অন্ততঃ ঐ তিন অঙ্গুলী শীঘ্রই খসিয়া পড়িয়া যাইবে।

ভবিষ্যমানব লোমশূন্য হইবে। লোমের প্রধান উদ্দেশ্য শীত নিবারণ; এই জন্যই পশু পক্ষীর শরীর লোমে আবৃত। বস্ত্রাবিস্কারের পূর্ব্বে মনুষ্যও বোধ হয় তাহার পূর্ব্ব-পুরুষ বানরের ন্যায় লোমাবৃত ছিল, এখন সভ্যতার প্রসাদে বস্ত্র পাইয়াছে, কাযেই লোম কমিয়া গিয়াছে; এখন যে দুই চারি গাছি আছে, ভবিষ্যতে তাহাও থাকিবে না।

ভবিষ্য মানব পদশূন্য হইবে। পদের উদ্দেশ্য চলন। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহনও যানের ব্যবহার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পদের সাহায্যে চলিবার প্রয়োজন যে আর অধিক কাল থাকিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। যখন প্রয়োজন থাকিল না, তখন প্রয়োজনের সাধন থাকিবে কি করিয়া? কাযে কাযেই যান বাহন ব্যবহারের বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের পা দুখানিও খসিয়া পড়িবে।

অতীত দেখিয়া আমরা ভবিষ্যৎ ঠিক করি। এ সম্বন্ধে অতীতেরও নজির আছে।

ডারউইন সাহেব বিজ্ঞান চক্ষে দেখিয়াছেন, মানুষ যখন বানর ছিল, তখন তাহার লাঙ্গুল ছিল, মনুষ্য হইবার পরে লাঙ্গুল পড়িয়া গিয়াছে। আবার আক্কেল দাঁতও যায় যায় হইয়াছে। প্রয়োজনের অভাববশতঃ মানব দেহের কোন কোন অংশ যখন তিরোহিত হইয়াছে, তখন কেশ দন্ত-হস্ত-পদের এমন কি দাবী আছে যে প্রয়োজন চলিয়া গেলেও তাহারা মিছামিছি জায়গা যুড়িয়া বসিয়া থাকিবে?

সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধেও তখন মতের পরিবর্ত্তন হইবে। সেই শুভদিনে সভ্যতার সেই শেষ সীমায় কেশ-দন্ত-হস্ত-পদহীন মানবই, সৃষ্টি-কৌশল এবং সৌন্দর্য্য বোধের চরমোৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

লক্ষ্মীর কথা।

যো ধর্ম্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ
বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী।
অগর্ব্বিতো যশ্চ জনানুরাগী
তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মশীল, বিশিষ্টরূপে জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যা-বিনীত, জনগণের প্রতি অনুরাগ সম্পন্ন, এবং পর-পীড়ক ও গর্ব্বিত নহে, সেই পুরুষে আমি (লক্ষ্মী) সর্ব্বদা বাস করি।

কর্ত্তব্য জ্ঞান ও কর্ত্তব্যে তৎপরতা হইতে সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি হিতৈষিতার অভিব্যক্তি হয়। যাহার নিজের প্রকৃত হিত-বোধ ও তৎসাধনে চেষ্টা আছে, জগতের হিতসাধন তাহা দ্বারাই হইয়া থাকে, কারণ জগৎ সর্ব্বজীবেরই আধার। যিনি জগতের হিত-সাধক, জগৎ হইতে অনিষ্টা শঙ্কা তাঁহার থাকে না। আর জগতের অনিষ্ট করিয়া নিজের হিত-সাধনে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অনিষ্ট যেরূপেই হউক, অনিবার্য্য। কিন্তু স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও যদি জগতের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়, তাহা হইতে ও স্বার্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে। তবে পরার্থের সঙ্গে স্বার্থ তুল্য ভাবিয়া যাঁহারা স্বার্থ সাধনে তৎপর, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া সকলের নমস্য। হিতৈষিতা ধর্ম্মশীলতার অঙ্গ বিশেষ, যেখানে তাহা তাহা নাই, সেখানে প্রকৃত ধার্ম্মিকতা থাকিতে পারে না।

প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীত হিতাহিত নির্ণয় করা যায় না, জ্ঞানের অভাবে অহিতে হিত-বোধ এবং হিতে অহিত বোধ থাকিয়া যায়।

সুতরাং ধর্মশীলতার প্রতি জ্ঞানের কারণতা স্বীকার্য্য। এই জ্ঞান দ্বিবিধজন্ম-পরম্পরা-প্রাপ্ত—সহজ ও গুরু, পরম্পরা-প্রাপ্ত—উৎপাদ্য।

জ্ঞান ব্যতীত পর্য্যালোচন শক্তির বিকাশ হয় না, বিনা পর্য্যালোচকতায় ধার্ম্মিকতার অভিব্যক্তি হইতে দেখা যায় না। সামান্য কার্য্যে ও পর্য্যালোচকতার প্রয়োজন, কেন না কার্য্য সামান্য হইলেও তাহা অনিষ্টকর হইতে পারে।

জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকিলে ও অভ্যাসের গুণে অকালে অতি-মাত্রায় সেই সকল বিষয়ের উপভোগ হইতে নিবৃত্ত থাকা কল্যাণের হেতু। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর তাহা শেষ না হওয়ার মধ্যে, যদি কোনরূপ চিত্তাকর্ষক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির সুলভতা উপস্থিত হয়, আর আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই বিষয় উপভোগে ধাবিত হওয়া যায়, তাহা হইলে কি আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে? আবার বিষয় এমনই পদার্থ যে, তাহার উপভোগ করিয়া কামনার নিবৃত্তি হয় না, বরং উপভোগে প্রদীপ্ত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় উত্তরোত্তর ভোগ-স্পৃহার অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বাধ্যতা অমঙ্গলের হেতু। এই জন্যই বোধ হয়, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন, "জিতেন্দ্রিয়ং নানুপতন্তি রোগাঃ।" অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির রোগ হয় না। রোগ আর দুঃখ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

বিদ্যা বিনীত ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। কারণ নীতির মূল বিনয়, বিনয়ের মূল বিদ্যা। যে বিদ্বান্ এবং বিদ্যা-সম্ভূত বিনয়ে সমলঙ্কৃত, সৌভাগ্য লক্ষ্মী সেখানে স্বাভাবিক চঞ্চলতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের চেষ্টা করেন। তবে যে অনেক স্থলে পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত অনেক মহাত্মাকে দুর্ভাগ্যের অতল-স্পর্শে নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়, তাহা বিদ্যার জন্য নহে, অবিদ্যার জন্য। পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত ব্যক্তি সর্ব্বত্র এক পদার্থ নহে।

যেখানে নিরক্ষরের বা বৃথা তোষামোদ কারীর প্রাচুর্য্য, সেখানে অবিদ্বান ও বিদ্বান বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যার যে ফল তাহা সে ভোগ করিতে পারে না। বিদ্বানের অভিমান থাকে অথচ বিদ্যা থাকে না এমন পুরুষই লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত হয়। সাধুর বেশধারী দস্যুর কৃত্রিম বিনয়কে অনেকে প্রকৃত বিনয় মনে করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারেন, এই জন্যই বোধ হয় এখানে বিদ্যাবিনীত পদের প্রয়োগ। বিদ্যা-বিনীত বলাতে অবিদ্যা-বিনীতের ও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যে অবিদ্যা-বিনীত সে লক্ষ্মীর কৃপা-পাত্র নহে। তবে যে অনেক স্থলে বর্ত্তমানকালে এই বাক্যের বিপর্য্যয় দেখা যায়, তাহার কারণ সে কৃত্রিব বিনয় নহে, পূর্ব্ব-কৃত সৎকর্ম্ম। পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত সৎকর্ম্মের সুফল মানুষ ভোগ করে, বর্ত্তমান জন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম পর জন্মের সুখ দুঃখের হেতু বা অদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐহিক অচিরকাল-ব্যাপী সুখের আশায় ভবিষ্যতের সুখের যে স্বয়ং হন্তারক, সে গৌরব-স্ফীত হইলেও

তাহার মত মূর্খ আর নাই। পূর্ব্ব-কৃত-সুকৃতের ফল সৎ পথে থাকিলে চিরকাল ভোগ করা যাইত, অসৎ পথে যাইয়া সেই সুফলকে অল্প কালের মধ্যে ক্ষয় করিয়া পাপের ফল ভোগের সময়কে শীঘ্র আলিঙ্গন করিবার জন্য দুর্ম্মতিগণ কুকার্য্যে লিপ্ত হয়। কাযেই কেবল বিদ্যা-বিনীতের সৌভাগ্যের কথা বলা হইয়াছে।

যে পর-পীড়ক সে ও লক্ষ্মীর কৃপা পাত্র হইতে পারে না। পরকে যে পীড়া দিয়া থাকে, পরও তাহাকে পীড়া দিয়া থাকে, পীড়ার ঘাত প্রতিঘাতের জন্য তাহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং অন্য কোন সৎ-কার্য্যে তাহার অবসর থাকে না। তদ্ভিন্ন পীড়নাদি অসৎ কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন আত্ম-পর, দেব-মানব, সকলের প্রতিই সে পীড়ন করিতে আরম্ভ করে, এবং সর্ব্ব জীব হইতে সে অহরহ পীড়া পাইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কর্ত্তাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাহারা আয়ুর্বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও সংবাদপত্রের কল্যাণে পেটেণ্ট ঔষধের জন্য ধন্বন্তরি তুল্য। চোরের মাতৃস্নেহের ন্যায় ইহাদেরও প্রশংসাপত্র-দাতৃবর্গ সাহায্য করিয়া থাকে। ঔষধের ফল যাহাই হউক, অর্থ উপার্জ্জনই, ইহাদের প্রধান এবং এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে। দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া প্রয়োগের রীতি যেখানে নাই; সেখানে ঔষধ আর বিষে প্রভেদ কত তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এই সকল ঔষধ দিয়া যে পরপীড়ন হয়, তাহার সন্দেহ নাই কারণ যে ব্যক্তি তাহা কিনিবে, তাহার অর্থ ব্যয় ত আছেই, তাহার উপর যাহা কিনিল, তাহা বিষ কি ঔষধ হইবে, যে ব্যবহার করিবে, তাহার হিত কি অহিত করিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই জন্য চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে।

"যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণং উত্তমং ভেষজং-ভবেৎ।
ভেষজং বাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্॥

দেশ, কাল, পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে তীক্ষ্ণ বিষও উত্তম ঔষধের কার্য্য করে, আর উত্তম ঔষধও যদি রোগের অবস্থা, রোগীর শরীর, প্রকৃতি, বলাবল, বয়স প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাও তীক্ষ্ণ বিষের কার্য্য করিয়া থাকে।

পেটেণ্ট ঔষধে কিছুই দেখিবার রীতি নাই সুতরাং তাহা যে কেমন উপাদেয় পদার্থ, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ ভিন্ন কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। এই ঔষধ দিয়া দেশের ধন-জন-ক্ষয়ের জন্য যাহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে, তাহারাও নিজের জালে নিজে পড়িয়া হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াছে এবং হই-তেছে, অতএব পর-পীড়ন আত্ম-পীড়নের পূর্ব্ব রূপ মাত্র। সুতরাং পর-পীড়ক লক্ষ্মীর অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারে না।

অগর্ব্বিত ব্যক্তি লক্ষ্মীর কৃপা—পাত্র। যাহার গর্ব্ব বা দর্প আছে, লক্ষ্মী তাহাকে কৃপা করেন না। যে ব্যক্তি নিজের রূপ, বিদ্যা, বিভবাদি বিষয়ে অন্য হইতে উৎকৃষ্ট ভাবিয়া অহঙ্কার করে, এবং সেই অহঙ্কারের ফলে অন্যকে অবজ্ঞা করে, তাহাকে গর্ব্বিত বলে। যদি প্রকৃত পক্ষে অন্য হইতে নিজের

উৎকৃষ্টতা থাকে, তথাপি তাহা প্রকাশ করিয়া অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া এবং নিজের গৌরব নষ্ট করা ভিন্ন তাহাতে সুফল কিছু নাই। গর্ব্বের ফলে পরমমিত্রও শত্রু রূপে পরিণত হইতে পারে। অতএব গর্ব্ব অতি হেয়। যে ব্যক্তি জগতে থাকিয়া স্বজাতিকে পর্য্যন্ত বশীভূত রাখিতে পারে না, দেবতার অনুগ্রহ লাভ তাহার ভাগ্যে কি ঘটিতে পারে? কাযেই গর্ব্বিত লক্ষ্মীর অনুগ্রহ-ভাজন হইতে পারে না।

যে জনানুরাগী তাহার প্রতি লক্ষ্মী সদয় হইয়া থাকেন। মনুষ্যকে ভক্তি করিতে যে স্বভাবতঃ সমর্থ, তাহার সেই সুস্বভাবই কালে অপ্রত্যক্ষ দেবতাকে পর্য্যন্ত অনুরাগ-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারে। অভ্যাস সিদ্ধির একটা অঙ্গ, ভাল বিষয়ের অভ্যাসে মানুষ উন্নত হয়; মন্দ বিষয়ের অভ্যাসের জন্য মানুষকে অত্যন্ত অধোগতি-প্রাপ্ত হইতে হয়।

জনানুরক্ত হইতে হইলে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। অধীনতা মনুষ্যের স্বাভাবিক লক্ষণ, যখন যাহার অধীন থাকিবে, তখন তাহার বিরুদ্ধে চলা যেমন অন্যায়, সেইরূপ তাহার হিত-চেষ্টায় বিরত থাকাও ঘোর অন্যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যাহার অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে এরূপও কর্ত্তব্যও নহে। কৃতজ্ঞতা ও মানুষের একটী উত্তম গুণ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গয়ায় পিণ্ডদান পদ্ধতি। বিবিধ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত। গয়া সুলভ যাত্রি-নিবাসের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আকার ডিমাই ১২ পেজী ৫৬ পৃষ্ঠা; মূল্য চারি আনা—ডাক মাসুল অর্দ্ধ আনা।

এই পুস্তক খানি গয়া-গমনার্থীদিগের বিশেষ উপকারে লাগিবে। গয়া যাইবার পূর্ব্বে তথাকার রাস্তা ঘাট, খরচ পত্র, ক্রিয়া কর্ম্ম ইত্যাদি অবগত হইলে যেমন সুবিধা, সর্ব্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া একেবারে হঠাৎ যাইয়া উপস্থিত হইলে তেমনই অসুবিধা। প্রসন্ন বাবুর পুস্তকখানি আগে পড়িয়া লইলে অনভিজ্ঞতার জন্য কোন

অসুবিধা হইবে না, অনেক স্থলে নিরর্থক অর্থ ব্যয়ও লাগিবে না।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার পালের সুলভ যাত্রি-নিবাস সম্বন্ধে অনেকে কিছুই জানেন না, সুতরাং সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা উচিত মনে করি। গয়ালীরা পিতৃলোককে স্বর্গে পাঠাইলেও নিরুপায় গয়াযাত্রীকে নানারূপে লাঞ্ছিত করেন, বিবিধ উপায়ে যাত্রীর মনে: কষ্ট এবং অভক্তি জন্মাইয়া তাহাকে নরকের পথে অগ্রসর করেন, ইহা অনেকেই জানেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে সর ঘাটীর পথে গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত একটি বিপন্ন মলিনবেশ যাত্রীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া গয়ালীর প্রতি যে ভয় জন্মিয়াছিল, তাহাই এ পর্য্যন্ত গয়া যাইতে দেয় নাই ;—দশ বিশ বার গয়ার নিকট দিয়া যাতায়াত করিয়াছি, তথাপি পরম পবিত্র গয়াতীর্থ দর্শনে সাহস হয় নাই !! আজ চব্বিশ বৎসর পরে প্রসন্ন বাবুর কৃপায় নির্ভয়ে গয়া দর্শন ঘটিল, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। তাঁহার যাত্রি-নিবাসের সংবাদ না জানিলে এখনও নির্ভয়ে গয়াদর্শনঘটিত কিনা সন্দেহ। এখনও ভয়ের কারণ নাই যে, এমন নহে, এখনও দালালেরা দিনে দুই প্রহরে প্রসন্ন বাবুর বাড়ী বা যাত্রি-নিবাসে লইয়া যাইতেছে বলিয়া অন্য বাড়ীতে লইয়া যায়, অন্ততঃ সে দিন আমরা ঐ রূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম। এই রূপ প্রবঞ্চনাপূর্ণ স্থানে নিরীহ বাঙ্গালীদিগের জন্য সুলভ যাত্রি-নিবাসের ন্যায় একটা নিরাপদ স্থান থাকা নিতান্তই প্রার্থনীয়। প্রসন্ন বাবু এই শুভানুষ্ঠান দ্বারা যাত্রী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শুনিতে পাই এখন কোন কোন গয়ালীও যাত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু সে জন্যও প্রসন্ন বাবুকেই ধন্যবাদ দিতে হইবে, কারণ এ সদ্ব্যবহার তাঁহার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফল। প্রসন্ন বাবুর কৃপায় এখন অসমর্থ পক্ষে তিন টাকায় পর্য্যন্ত গয়াকৃত্য সম্পাদিত হইতে পারে, ইহা কখন ও ভাবিয়াছেন কি? অথচ ইহাতে অবৈধ বা অশাস্ত্রীয় কিছুই হয় না, প্রসন্ন বাবু শাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মঠ পুরোহিত এবং গয়ালী দ্বারাই যথাশাস্ত্র সমস্ত কার্য্য করাইয়া থাকেন। কিন্তু এই হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য প্রসন্ন বাবুকে অনেক নিগ্রহ এবং ক্ষতি সহিতে হইতেছে। কার্য্য বাহুল্যের জন্য তাঁহাকে চিকিৎসা-ব্যবসায় ত এক রূপ ছাড়িতেই হইয়াছে, আবার যাত্রীদিগের এই সুবিধা করাতে গয়ালীরাও তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া রহিয়াছেন। সর্পের মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া লইয়া বাঁচাইলে সর্পের কি অবস্থা হয়, তাহা সকলেই জানেন। এ অবস্থায় প্রসন্ন বাবুর এক মাত্র সম্বল ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আর সাধারণের সহানুভূতি। যদি তিনি সাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি না পান, তবে কাযেই তাঁহাকে এই সদনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিতে হইবে, সুতরাং দরিদ্র নিরুপায় বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে আবার সেই অত্যাচারীর করাল কবলেই পড়িতে হইবে।

ছত্রপতি শিবাজী।—আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত। আকার ডিমাই ১২ পেজী ২৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

এক এক জন মহাপুরুষ এক একটী জাতীয় সম্পত্তি। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে এ সম্পত্তির বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অতীতে সে রূপ ছিল না। ইহার মধ্যেও যাঁহারা পরম পবিত্র স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ রূপে প্রাতঃস্মরণীয় এবং পরম ধন্য। এই শ্রেণীর অগ্রগণ্য মহাপুরুষ রাজপুতনার পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপসিংহ এবং মহারাষ্ট্রের শিবাজী। ইহাদের চরিত-কীর্ত্তন পরম পুণ্যকর,—রামায়ণ এবং মহাভারত-পাঠে যে পুণ্য হয়, ইহাদের পবিত্র বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করিলেও সেইরূপ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। যে সকল পাঠক এই সমস্ত জীবনী-পাঠে কেবল শব্দ-বৈভবই খুজিয়া বেড়ান, অথবা যাঁহারা অর্থ মাত্র পরিগ্রহ করিয়া সহাস্য বদনে তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ পুণ্যের অধিকারী নহেন; কিন্তু যাঁহারা গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হন, যাঁহারা কীর্ত্তিতব্য জীবনের সঙ্গে তন্ময়ত্ব লাভ করেন, এবং যাঁহারা সেই বরণীয় চরিতের প্রত্যেক স্মৃতিকে অশ্রুপ্রবাহে পরিধৌত করেন, এ পুণ্য-সঞ্চয়ে কেবল তাঁহাদিগেরই অব্যাহত অধিকার। জানি না এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় বীরেন্দ্র-কেশরীর জন্ম তিথিতে কি জন্য ভারতের প্রতি গৃহে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত না হয়, জানি না কি জন্য তাঁহাদের তিরোভাবের দিনে প্রত্যেক ভারতবাসী শোক-বসনে আবৃত হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় অশ্রু-বিসর্জ্জনে দিন কর্ত্তন না করে!!

স্থানের দূরতা এবং ভাষার ভিন্নতা বশতঃ এতদিন বাঙ্গালী শিবাজীর পবিত্র চরিতের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু আজ পণ্ডিত সত্যচরণশাস্ত্রীর-কৃপায় সে অসুবিধা দূর হইল। এই গ্রন্থের উপকরণ-সংগ্রহে শাস্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট যত্ন, পরিশ্রম এবং অর্থ-ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের আদেশে এই পবিত্র কার্য্যে ব্রতী হন, এবং এক বৎসর কাল মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে—শিবাজীর জীবনাভিনয়ের রঙ্গ-ভূমে——স্বয়ং ভ্রমণ করিয়া এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেন; ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারেন, গ্রন্থকারের ত্যাগ-স্বীকার কত দূর। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, তাঁহার সময় এবং অর্থ-ব্যয় সার্থক হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। সমধিক আনন্দের সংবাদ এই যে, ইতি মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানির উপাদেয়তা এতদ্দ্বারাই উপলব্ধি হইবে।

স্থানে স্থানে যে সকল ত্রুটি কচিৎ দৃষ্ট হয়, প্রথম সংস্করণে তাহা অনিবার্য্য। ভরসা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এ ক্ষুদ্র ত্রুটিও থাকিবে না। কিন্তু আমাদের এ আশা সফল হইবে কি—বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবে কি? শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গ ভাষায় এই অভিনব রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেই যে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ।

আর একটা আশঙ্কা এই যে, এদেশে আসলের পরিচয় প্রচার হইতে না হইতে নকলে দেশ ছাইয়া পড়ে, লোকেও আসল অপেক্ষা নকলেরই অধিক আদর করে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই আসল জিনিসটা এখন নকলের চাপে পড়িয়া মারা না গেলেই আমরা সুখী হইব।

চিকিৎসা ও সমালোচক।—মাসিক পত্র। ডাক্তার সত্যকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯।১ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ইহার আকার ডিমাই ৮ পেজী তিন ফর্ম্মা,—২৪ পৃষ্ঠা, এবং উপহার সহ ইহার বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা। চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধাদি ইহার প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়, কাযে কাযেই এ পত্রখানি হইতে হিতের আশা করা যাইতে পারে।

দারোগার দপ্তর। আমরা এবারও দারোগার দপ্তরের তিন খানি উপহার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ সে বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি নাই। এবারকার গ্রন্থগুলিও পূর্ব্ববৎ পড়িতে আমোদ বোধ হয়। কেবল প্রিয়নাথ বাবুর লেখার সরলতার জন্যই যে পুস্তক গুলি সুখ-পাঠ্য হয় তাহা নহে, ঘটনার স্বাভাবিকতাও তাহার অন্যতর কারণ। এবার "অভয়া" ও "পঞ্চ বালিকা" এই দুই খানি প্রিয়নাথ বাবুর রচিত নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দোপাধ্যায় লিখিত "পুরাণরহস্য" নামক এক খানি সুন্দর এবং স্বদেশ-হিতৈষিতায় পূর্ণ গ্রন্থও আছে। লেখক এই গ্রন্থ লিখিতে যেমন চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার বহু গ্রন্থে দৃষ্টিরও পরিচয় দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে—ইহাতে অভিজ্ঞতারও পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসী যে চরক সংহিতা যশোদানন্দন সরকার কৃত অনুবাদ সহ প্রচার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতে যাইয়া তিনি অনুবাদের ভ্রম-পূর্ণতা বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন এবং সেই শুদ্ধ অনুবাদাংশও বঙ্গবাসীর নামে পরিচিত করিয়া নিজের মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এজন্য লেখককে অন্তরের সহিত প্রশংসা করি। এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। দারোগার দপ্তরের পরিচয় আর নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

// শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ।	পৌষ. ১৩০২ সাল।	৯ম সংখ্যা।

আমাদের উন্নতি কি হইবে ?।

অবনতির অবস্থায় কিছুতেই মনে হয় না যে আবার কখন উন্নতি হইবে। সে অবস্থায় তরঙ্গের উপর তরঙ্গের ন্যায় বিপদের উপর বিপদ আসিয়া মানুষকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, মন আপনা আপনি অবসন্ন হইয়া আইসে, হৃদয় নৈরাশ্যের পাষাণ চাপে দমিয়া যায়; মনে হয় এ পতিত অবস্থার উন্নতি বুঝি আর হইবে না, এ দুর্দ্দিন বুঝি আর ঘুচিবে না। এ অবস্থায় যে কার্য্য উন্নতিপ্রসূ হইবে বলিয়া আশা করা যায়, ঘটনাচক্রে তাহাও অবনতিপ্রসূ হইয়া উঠে। কিন্তু উত্থান ও পতন, পতন ও উত্থান, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ধীরভাবে চেষ্টা করিতে থাকিলে অবশ্যই অনুকূল পবন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে—পূর্ব্বে বিশেষ চেষ্টায় যে উন্নতি হয় নাই, এক্ষণে সামান্য চেষ্টাতেই সে উন্নতি হইতে আরম্ভ করে। চেষ্টা বই উন্নতি হয় না, সাধনা বই সিদ্ধি হয় না, ইহা স্থির; এবং ইহাও স্থির যে, যতই অধিক চেষ্টা করা যায়, ততই ত্বরিত পদে দুর্গতি তিরোহিত হয়। কিন্তু মানব-ভাগ্যে সময়ের এমন এক প্রবল প্রভাব আছে যে, অনুকূল সময়ে সাধারণ যত্নে ও সামান্য অধ্যবসায়ে যে উন্নতি লাভ করা যায়, প্রতিকূল সময়ে অসাধারণ যত্ন এবং অসামান্য অধ্যবসায় ব্যতীত তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেকস্‌পিয়র বলিয়াছেন,—"মানব-ব্যাপারে ও একটা জোয়ার ভাটা আছে, সেই জোয়ারটা ধরিতে পারিলে সৌভাগ্যে উপনীত হওয়া যায়।" এই জন্যই অবনতির অবস্থায় ঐকান্তিক চেষ্টা ও অসীম ধৈর্য্যের আবশ্যক। চেষ্টানুরূপ ফল না পাইলে যাঁহারা নিরাশ হন, তাঁহারা কখন উন্নতি করিতে পারেন না। ব্যক্তির জীবনে যেরূপ, জাতীয় জীবনেও ঠিক সেইরূপ। রোম-রাজ্য যেরূপে চরম দুর্নীতি ও দুর্গতির অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে কে আশা করিয়াছিল সে রাজ্য পুনরায় উন্নতি করিবে? "ম্যারাথন ও থার্ম্মাপিলি যখন

"শ্মশানস্থলী" হইয়াছিল, তখন কে আশা করিয়াছিল যে গ্রীস আবার নব-জীবন লাভ করিবে? শুধু রোম ও গ্রীস নহে, জগতের পতিত জাতি মাত্রই ইহার দৃষ্টান্তস্থল, এই জন্যই আশা হয়, পূর্ণ উৎসাহে চেষ্টা করিতে পারিলে এ পতিত জাতিরও আবার উন্নতি হইবে—সুখদ বসন্তের সুমন্দ বাতাসে এই শুষ্কতরু আবার মুঞ্জরিত হইবে। এক জন বিখ্যাত অধ্যাপক ও সম্পাদককে বলিতে শুনিয়াছি যে, সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতের উন্নতির আর আশা নাই, ভারতের ভারতসাগরে নিমগ্ন হওয়াই এক্ষণে শুভাদৃষ্ট; শুদ্ধ তাঁহার নহে, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই এই ধারণা। ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা এরূপ নিরাশ নহি। আমরা ভারতে অনেক উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি? ভারতে সভা ও সমিতি, কল ও কারখানা, বিদ্যালয় ও ব্যবসায় দেশীয় লোকদিগের দ্বারা চালিত হওয়ায় ভারত এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী নহে। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার আংশিক প্রচারে (১), সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষার বহুল বিস্তারে, স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাধীন ভাবের ক্রমিক বিকাশে, ভারত ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে ক্রমেই আদৃত হইতেছে—ভারতবাসী এক্ষণে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য হইতেছে, সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সম্মিলনীতে নিমন্ত্রিত হইতেছে, এবং এ সব বিষয়ে কৃতকার্য্য ও যশস্বী হইতেছে। যদিও এক্ষণে সমুদয় ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, তথাপি তাহার সুস্পষ্ট অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। অধ্যাপক সিলির গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এ কথা অস্বীকার করিবেন না। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে ও রিপন সাহেবের বিদায়-সম্মান-প্রদর্শনে ভারতবাসী যে একতা দেখাইয়াছে, কেশব-বিয়োগে যে শোক এবং সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস-গমনে ভারতবাসী যে সমবেদনা দেখাইয়াছে, সর্ব্বোপরি কংগ্রেস-স্থাপনে এবং বৎসর বৎসর তাহার অধিবেশনে ভারতবাসী যে সাহস, উৎসাহ, একতা ও সদ্ভাব দেখাইতেছে, তাহাতে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় একতার লক্ষণ স্পষ্টই অনুমিত হয়। তাই বলিতেছি, আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু হতাশ হইবার কোন কারণ না থাকিলেও ভারতের উন্নতির জন্য এক্ষণে বিশেষ সাবধানতা, চেষ্টা ও ধৈর্য্যের আবশ্যক, কারণ এক্ষণেও ভারত-ভাগ্যে অনুকূল পবন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে নাই। আমরা পূর্ব্বে যে উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে উন্নতি প্রকৃত পক্ষে আমাদের আত্মশক্তি-সম্ভূত স্থায়ী স্বাভাবিক উন্নতি নহে; ইহা কোন পরাক্রান্ত উন্নতিশীল জাতির সহিত কোন পরাজিত অবনতিশীল জাতির সংঘর্ষণে শেষোক্ত জাতির মধ্যে যে উন্নতি-বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই বিপ্লব মাত্র। স্যর হেন্‌রি মেইন বলেন,—"ভারতের এই পরিবর্ত্তন কৃত্রিম এবং বাহির হইতে বল দ্বারা প্রবিষ্ট * * * অতএব এ পর্য্যন্ত যত দূর দেখা যাইতেছে—তাহাতে ভারতের

(১) এ বিষয় কণ্টকাকীর্ণ বটে। শিঃ পঃ সঃ

পরিবর্তন উন্নতি নহে, কেবল বিপ্লব মাত্র।” এই বিপ্লবকে স্থায়ী উন্নতির অবস্থায় পরিণত করিতে হইলে প্রথমতঃ জাতির মধ্যে উপযুক্ত পরিচালক বা বীরের আবশ্যক, এবং দ্বিতীয়তঃ জাতীয় উন্নতি-কল্পে কোন বিষয়ে একটী স্থির লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য জাতীয় অবস্থা-ভেদে যে যে গুণের আবশ্যক হয়, যে যে মহাত্মা সেই সব গুণের চরম উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জন-সাধারণের নিকট এক উচ্চ আদর্শ ধরিয়া তাহাদিগকে সেই গুণের দিকে আকৃষ্ট করতঃ জাতীয় উন্নতি সাধন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পরিচালক বা বীর। যে জাতির মধ্যে যে পরিমাণে বীর পুরুষ থাকেন এবং যে পরিমাণে তাঁহাদের বীরত্ব স্বজাতীয় জন-সাধারণ কর্ত্তৃক আদৃত হয়, সেই পরিমাণে সে জাতি উন্নত হইতে থাকে, এই জন্য জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত জাতির মধ্যে কেবল মাত্র যে বীরের আবশ্যক তাহা নহে, তাঁহাদের বীরত্ব বুঝিবার উপযুক্ত শিক্ষাও জন সাধারণের মধ্যে থাকা আবশ্যক। এই সাধারণ শিক্ষার উপর বীরত্বের পূর্ণ বিকাশ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, কারণ এই শিক্ষা থাকা হেতু বীরত্ব যথাযথ রূপে আদৃত হয় এবং বীরদিগের উৎসাহ ও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন মনুষ্যের চিন্তাশক্তি বা কর্ম্ম-শক্তির দৌড় তৎসাময়িক লোকের চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে। ভারতে প্রধানতঃ বীরের অভাব, কিন্তু বীরত্ব বুঝিবার উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষার অভাব তদপেক্ষাও বেশী। এই সাধারণ শিক্ষার অভাব হেতুই, ভারত-ভাগ্যে মাঝে মাঝে যে দুই চারিটী বীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই; জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে শিক্ষা বীরের আবশ্যক। এই সাধারণ শিক্ষার উপর মনোযোগ আছে বলিয়াই আজ ইয়োরোপ এত উন্নত—এই সাধারণ শিক্ষার উপর মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়াই জাপান এত অল্প সময়ে এতদূর উন্নত হইয়াছে। এদেশে সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের প্রধান অন্তরায় শিক্ষাকে অর্থোপায়ের সেতু স্বরূপ জ্ঞান করা। যখন সংস্কৃত-শিক্ষার বিশেষ আদর ছিল, তখন এ দেশে শিক্ষার এরূপ নীচ লক্ষ্য ছিল না; সে সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিয়া পণ্ডিত হইবার অভিলাষী হইতেন, তাঁহারা কেবল আত্মোন্নতি, অধ্যাপনা ও সম্মান-লাভের জন্য ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতেন। শিক্ষা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইবেন, এ আশা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না; অর্থোপায় না করিতে পারিলে সমাজের নিকট তাঁহাদের গ্লানি ভোগ ও করিতে হইত না। যাহা উপায় করিতেন, তাহা দ্বারা নিজ বাটীতে নানা দেশীয় ছাত্র রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। এরূপও গল্প শুনা যায় যে, অনেক পণ্ডিত প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তি পাইয়াও তাহা অগ্রাহ্য করিতেন। এ দরিদ্র দেশে সাধারণ-শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে সেই প্রাচীন আদর্শানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

যদিও ভারতে এক্ষণে অর্থই ধর্ম্মপ্রকার আদর, সম্মান, যশঃ ও গৌরবের কারণ হইয়াছে—যদিও ভারত এক্ষণে স্বার্থের কিলি কিলি রবে পরিপূর্ণ, তথাপি আমরা আশা করি, ভারতে এরূপ যথেষ্ট লোক আছে যাহারা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র গ্রহণ করিয়া শিক্ষাকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত। যখন স্বচক্ষে দেখিতেছি যে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি মাত্র না রাখিয়া সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে খাটিতেছেন, তখন কেন না বিশ্বাস করিব যে শিক্ষা-প্রচারের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া প্রাণপণে খাটিবার লোক ভারতে এখনও আছে? কেবল আবশ্যক সুচারু অনুষ্ঠানের আর উপযুক্ত পরিচালকের। দ্বিতীয়তঃ ভারতে ধর্ম্মই জাতীয় উন্নতির প্রধান লক্ষ্য হইবার উপযুক্ত। ধর্ম্ম ভারতবাসীর মর্ম্মস্থান —ইহার জীবন-মরণ পরীক্ষার মূল-নাড়ী। এই ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই ভারত এক কালে বড় হইয়াছিল—এই ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই পরাক্রান্ত জাতিগণের সহিত সংঘর্ষণেও ভারত এতক জাতীয়ত্ব হারায় নাই। ভারতের সুখ স্বাধীনতা যাহা কিছু কেবল ধর্ম্মে। বার্ক বলিয়াছেন,—"স্বাধীনতা কোন একটা উপযোগী বিষয়কে অব লম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যেক জাতিই বিষয়-বিশেষকে আপনাদের সর্ব্বাধিক প্রিয় করিয়া তুলে, এবং কালে উহাই বিশেষরূপে উক্ত জাতির সুখের পরিমাপক হইয়া উঠে।" প্রত্যেক জাতিই এক একটি বিষয়কে তাহাদের স্বাধীনতার আধার বলিয়া স্থির রাখে—ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই বিষয়টি করস্থাপন, ভারতে ইহা ধর্ম্ম। এ হীনাবস্থাতেও ভারতবাসীরা যদি কোন কারণে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে স্বীকৃত হয়, তবে সে হইবে কেবল এক ধর্ম্মের জন্য। ধর্ম্ম ধরিয়াই ভারতকে উন্নত হইতে হইবে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতে এত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে, এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের এরূপ বিদ্বেষ যে, জাতীয় উন্নতি-সাধনে সকলের একমত হওয়া বড়ই দুরূহ। এ বিষয়ে পরস্পরের বিদ্বেষ-ভাব বিলুপ্ত করিয়া সদ্ভাব স্থাপন না করিতে পারিলে ভারতের উন্নতির আশা কম। এই কার্য্য সাধনের জন্য ধর্ম্মবীরের আবশ্যক। স্বস্ব ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মহান্ ভাব বীরগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইলে এ কার্য্য ভবিষ্যতে সাধিত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

ধর্ম্মবীরগণের আরও আবশ্যক, ভারত-বাসীদের বিভিন্ন ধর্ম্মমধ্যে যে সমস্ত আবর্জ্জনা জুটিয়াছে সে সমস্ত নষ্ট করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মানু-বর্ত্তিগণের মধ্যে এক নূতন সঞ্জীবনী শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য। এই নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইলে ধর্ম্মোন্নতির চরমসীমা অতীতে কল্পনা না করিয়া ভবিষ্যতে কল্পনা করা আবশ্যক। মেইন সাহেব বলেন, খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমস্ত ইয়োরোপবাসীরা সর্ব্ববিধ উন্নতির চরমসীমা অতীতে কল্পনা করিত, খ্রীষ্ট ইউরোপ বাসী-দের কল্পনায় গতি অতীত কাল হইতে

ফিরাইয়া ভবিষ্যতে নির্দ্দেশ করেন। ইহাই ইউরোপের ও সমস্ত সভ্যজগতের উন্নতির মূল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়,সমস্ত সভ্যজগৎ যাহা বুঝিয়াছে, এ পতিত জাতি এখনও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। (১) আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে উন্নতির চরমসীমা অতীতে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহাতে ভারতবাসীরা উন্নতির চরম সীমা ভবিষ্যতে কল্পনা করিতে শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা ধর্ম্মবীরগণের প্রধান কর্ত্তব্য।

আমাদের এক্ষণে দেখা আবশ্যক, বীরগণ যে ধর্ম্ম ও যে শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রচার করিবে, তাহা কোন্ আদর্শানুযায়ী হইবে? বীরত্বের পূর্ণ আদর্শ চাই। যদিও ভারতে কোনরূপ বীরত্বের আদর্শেরই অভাব নাই, রামায়ণ ও মহাভারত সর্ব্বপ্রকার বীরত্ব-কাহিনীতে পরিপূর্ণ, কিন্তু এক্ষণে সে আদর্শ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে জগতের উন্নতি স্রোতঃ যে বেগে ও যে পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, উণবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জগতের উন্নতি-স্রোতঃ তদপেক্ষা খরতর বেগে ও নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে। উণবিংশ শতাব্দীর তরুণ অরুণালোকে নবনব তত্ত্ব নবনব শিল্প আবিষ্কৃত হইয়া জগৎকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইতেছে। ভারতের প্রাচীন চিন্তা-তরঙ্গে ইংলণ্ডের মহাতেজস্বী চিন্তা-তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া এক মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। এক্ষণে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা যখন উন্নত ছিলাম, তখন ইউরোপ ঘোর অসভ্য ছিল, একথা বলিয়া অভিমান করিলে চলিবে না। গত সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারত অমাবস্থার গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। ইহার মধ্যে ইউরোপ ভারতকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রায় সমস্ত বিষয়েই উন্নতি করিয়াছে। ভারতও যে উন্নতি করিয়াছে বা করিবে বলিয়া আশা করিতেছে, তাহাও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বলে। কিন্তু তাহা বলিয়া জাতীয় আদর্শ ত্যাগ করিলে চলিবেনা। প্রত্যেক জাতির যে একটী স্বতন্ত্র ভাব আছে, সে স্বতন্ত্রভাব,সে নিজত্ব বজায় রাখিয়া আদর্শ সংগ্রহ করিতে হইবে। যে স্থলে জাতীয় আদর্শানুযায়ী সমাজ গঠন করিলে উন্নত সভ্য জাতির সঙ্গে সমতা রাখিয়া চলিতে পারা যাইবে না, সেই স্থলে নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। জাতীয় পুরাতন ভাব, জাতীয় পুরাতন আদর্শ বজায় রাখিয়া উন্নতির চেষ্টা করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম জাতীয় উন্নতির অনুকূলে দাঁড়াইবে, অন্যথা সে জাতি ক্রমে অবনত বা প্রবল জাতির কুক্ষিগত হইবে, ইহাই সম্ভব। তাই বলিতেছি; জাতীয় আদর্শের মূল রক্ষা করিয়া ইউরোপীয় জাতির আদর্শে জাতীয় জীবন গঠিত করাই ভারতবাসীর পক্ষে এক্ষণে সমীচীন ব্যবস্থা। (২) কিন্তু এ কার্য্য করিতে হইবে অতি সাবধানে। এ পর্য্যন্ত ইউরোপেও অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে উন্নতি স্থায়ী ভাব ধারণ করে নাই। কটন সাহেব বলিয়াছেন,—

(১) ইহাও অতিরিক্ত গ্রন্থ। পিঃ পঃ সং।

(২) সম্ভব কিনা সন্দেহ। পিঃ পঃ সং।

"পাশ্চাত্য দেশের প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, মানব-ব্যাপারের প্রত্যেক বিভাগেই বিষম গোলযোগ বর্ত্তমান।" কালের দুর্নিবার প্রভাবে হিন্দু-সভ্যতার মধ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার-গত যে সমস্ত স্বাস্থ্য ও নীতি-বিরুদ্ধ কুসংস্কার আসিয়া পড়িয়াছে, জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া সেই সমস্ত কুসংস্কার যাহাতে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা ধর্ম্মবীর ও শিক্ষাবীরগণের প্রধান কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে অর্থের আবশ্যক। যাহারা ধর্ম্ম-বীর হইবে, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কিরূপে? ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচার করিতে যে অর্থের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ হইবে কোথা হইতে? যাহাদের পিতা মাতা সন্তান-বর্গের শিক্ষা-ব্যয় বহন করিতে অপারগ, সে সমস্ত দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে কি উপায়ে? ইংলণ্ড বাসিগণকে ভারতের দুঃখ-কাহিনী বুঝাইবার এবং ভারতের উন্নতি সাধনে তাঁহাদিগকে যত্নশীল করাইবার জন্ত যে অর্থের আবশ্যক, তাহার সংগ্রহের উপায় কি? প্রত্যেক বৎসর যে শত শত ভারতবাসী অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্ত আবশ্যকীয় অর্থই বা পাওয়া যাইবে কোথায়? এই জন্ত দান-বীরের আবশ্যক। সমস্ত সভ্য জগতেই এরূপ দানবীর বহুল পরিমাণে আছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে যে কত সহস্র সহস্র দানবীর আছেন, তাহা বলা যায় না। যদি উপযুক্ত পরিচালক ও সুচারু অনুষ্ঠানের অভাব না হয়, তাহা হইলে অর্থের অভাবে ইংলণ্ড বা আমেরিকার কোন কার্য্য বাধিয়া থাকে না। স্বদেশের উন্নতি-সাধন-কথা দূরে থাকুক, বিদেশের জন্ত ইহাঁরা অজস্র টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। ভারতে শিক্ষা ও ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্ত ইহাঁরা কত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। আর এ দেশে—স্বার্থ, স্বার্থ, কেবল স্বার্থ। যাহা কিছু দান, তাহাও নিজের স্বার্থের জন্ত বা গবর্ণমেণ্টের নিকট "খয়ের খাঁ" হইবার জন্ত। অধিক কি বলিব, এই অল্প দিন হইল সহৃদয় ব্রাহ্মগণ-কর্ত্তৃক যে একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাহার উন্নতির জন্ত তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিতেছেন, তাহা ও অর্থাভাবে চলি-তেছে না। এই জন্তই বুঝি বিদ্যাসাগর মহা-শয় বলিয়াছিলেন 'একি মানুষের দেশ?' দান-শীলতা-বিষয়ে ভারতবাসীর ও ইংলণ্ডবাসীর প্রকৃতি ভিন্ন ভাবাপন্ন। ইংরেজেরা নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্ত যাহা কিছু ব্যয় আব-শ্যক তদ্ব্যতীত সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করে, এবং কালে কোন একটা বৃহৎ কার্য্যে প্রচুর পরি-মাণে সংগৃহীত অর্থ দান করিয়া খ্যাতনামা হয়। ভারতবাসীর যখন যেরূপ আয় তখন সেইরূপ দান। আয় অনুযায়ী দান না বাড়াইলে ভারতবাসীর পক্ষে নিন্দার কারণ হয়। এই দুই প্রকৃতির মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না; আমরা নিজের প্রকৃতি হারাইতেছি, কিন্তু ইংরাজদের প্রকৃতি পাইতেছি না। আমরা ইংরেজী শিক্ষার বিকৃত ফলে দূর আত্মীয় স্বজন এবং স্ব গ্রামের বা তন্নিকটস্থ স্থানের দরিদ্র ব্যক্তিপুঞ্জকে আশ্রয় দান

করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, কিন্তু ইংরেজদের মত কোন মহাদান করিতে শিক্ষা করিতেছি না। আশা করা যায় ধর্ম্ম ও শিক্ষার সুচারু পরিচালনে ভারতে উচ্চ দানশীলতা ক্রমেই বাড়িবে।

ভারতের দুর্গতি দূর করিবার জন্য ধর্ম্মবীর, শিক্ষাবীর ও দানবীরগণের ন্যায় দয়াবীরের ও আবশ্যক! দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য গ্রেণভিল, ক্লার্কসন ও বাক্সটন নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতায় বিসর্জ্জন দিয়া যেরূপ অদম্য উৎসাহে সাত্ত্বিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, দাস-ব্যবসায়ের রূপান্তর মাত্র কুলি-ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য এই কোটী কোটী ভারতবাসীর মধ্যে কৈ একটী লোকের ও ত সেরূপ চেষ্টা দেখিতে পাই না! হাওয়ার্ড, মিস্ ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ প্রভৃতি যেরূপ পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কৈ ভারতে একটি ও ত সেরূপ দেখি না! রামায়ণ ও মহাভারতে দয়াবীরের সহস্র সহস্র আদর্শ আছে, প্রাচীন ভারতে দয়াবীর অনেক ছিলেন; এক্ষণে পুনরায় যাহাতে এরূপ লোক অনেক পরিমাণে হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

জাতীয় উন্নতি-কল্পে শক্তিবীর বা যুদ্ধবীরের ও বিশেষ আবশ্যক। নানা কারণে ভারতবাসীরা ক্রমে হীনবীর্য্য হইতেছে। শারীরিক শক্তি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। শারীরিক অবনতির কারণ এক এক জন এক এক রূপ নির্দ্দেশ করেন। কেহ বলেন বাল্য বিবাহই ইহার মূল কারণ, কেহ বলেন প্রচুর পরিমাণে আহারের অভাবই ইহার মূল কারণ—পূর্ব্বে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহার অভাব হইয়াছে। কেহ বলেন জল, বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে, ম্যালেরিয়া দেশ ব্যাপিয়া লইয়াছে, ইহাই শারীরিক অবনতির মূল কারণ। ইহার প্রত্যেকটীই সত্য। কিন্তু শারীরিক শক্তি-চালনের অভাবও ইহার একটী কারণ। এই শারীরিক শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা শিক্ষায় অন্তর্ভূত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয় সকলেই বুঝেন, কাযেই বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিয়া ভারতবাসীদিগকে এ বিষয়ে ব্রতী করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। ভারতবাসী অবনতির স্রোতে এমনি গা ঢালিয়া দিয়াছে যে, যে কার্য্য নিজের ইষ্টপ্রদ বলিয়া বিশেষ বুঝিতে পারে, তাঁহাও তাহারা করিতে চায় না। এই জন্যই পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-কথিত সমস্ত কার্য্য করিতে হইলে বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, প্রবন্ধশেষে ও বলিতেছি, চেষ্টা বই উন্নতি হয় না, সাধনা বই সিদ্ধি হয় না। তবে অবনতির অবস্থায় চেষ্টার অনুরূপ ফল ফলে না। পূর্ণ ফলের জন্য—পূর্ণ উন্নতির জন্য অনুকূল সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। চেষ্টা করিলে উন্নতি হইবেই হইবে। অন্তরে সাহস আর উপরে ঈশ্বর, ইহারই উপরে নির্ভর করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। হাজার বাধাবিপত্তি আসুক, প্রবল নৈরাশ্যের ঝড় বহুক, যুগ—যুগান্তর কাল-সাগরে মিশিয়া যাউক,—যত দিন ভারত-ভাগ্যে

অনুকূল পবন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ না করে, ততদিন অচল অটল ভাবে স্থির করে অপেক্ষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। ভারত বাসীর এ কথাটী যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে,—

"Freedom's Battle once begun,
Begned thed from wlared Sire to son, Thongh bafflecel oft, is ead won."

আরম্ভ হইলে যুদ্ধ স্বাধীনতা তরে,
ক্লান্ত পিতা পুত্রে তাহা সমর্পণ করে,
বার বার হটিলেও জয়লাভ পরে।

শ্রীভবানী গোবিন্দ চৌধুরী।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

ঘাস খায়, দুধ দেয়, গাড়ি হাল বয়,
এমন সুবোধ গরু স্বাধীন কি হয়?

ভয়েতে অবশ যারা মরণের নামে,
তাহারাই আগে হত জাতীয় সংগ্রামে।

মরে বীর আগে শত্রু করিয়া সংহার,
কাপুরুষ পদাঘাতে যায় যম-দ্বার।

ধর্ম্ম-অর্থ-যশোলাভ পৌরুষেতে হয়,
পদাঘাতে প্রাণ-দানে পুণ্য কিছু নয়।

একজন মরে যদি মহত্ত্বের তরে,
সহস্র মহৎ লোক জন্মে তার পরে।

কি হবে দেহের বলে, বুদ্ধি বা বিদ্যায়?
সমস্ত বিফল হয় এক ভীরুতায়।

মান হেতু প্রাণ দিতে যে হয় অক্ষম,
জগতে নিন্দিত সেই ভীরু নরাধম।

সাহসের সঙ্গে কিছু বুদ্ধি যার থাকে,
বিপন্ন হইতে কভু হয় না তাহাকে।

বাল্যকালে ভয়ে জড় যাহার হৃদয়,
যৌবনে সাহসী সেই কখন কি হয়?

জন্মায় যাহারা ভয় শিশুর অন্তরে,
মিত্ররূপে তারা ঘোর শত্রুতাই করে।

বাসনা সন্তানে কুল উজ্জ্বল দেখিতে;
জান কি কেমনে হয় সন্তান পুষিতে?

বুনিয়া কণ্টক-বীজ ঢালিতেছ জল,
কি সাহসে কর আশা নারিকেল ফল?

বারেক দিলে না চাষ, বাছিলে না ঘাস,
তথাপি শস্যের আশা, কি বুদ্ধি সাবাস!

তুমি যেই সমাজের আদর্শ রতন,
সমুন্নত সে সমাজ তোমারি মতন।

মিথ্যাবাদী স্বার্থপর আদৃত যেখানে,
সে সমাজ সমুন্নত হবে কোন্ গুণে?

করিলে শোণিত-সেক সমাজের মূলে,
আজি না ধরুক ফল, ধরিবেক কালে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগুক্ত দ্বিতীয় কর্ত্তব্য অতি প্রয়োজনীয়—প্রথম কর্ত্তব্য হইতেও অধিক প্রয়োজনীয়। ছাত্রের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করা এবং অধীতব্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া লওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইংলণ্ডে এরূপ অধ্যাপনের ব্যবস্থা এতই দূরে রহিয়াছে যে, অতি প্রতিভাশালী ছাত্র না হইলে এ অভাব বুঝিতেই পারে না; এরূপ ছাত্রের অভাব ইংলণ্ডে পূর্ণ হয় না বলিয়া তাহাকে পারিস, হিডেল্‌বর্গ কিম্বা বার্লিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হইতে হয়। অনেকে তথায় যাইয়া থাকেন। গণিত শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তথায় যান নাই; তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়া ছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পরীক্ষার পরে দুই বৎসর কাল উচ্চ অঙ্কের শিক্ষা না হওয়াতে তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ আর হইল না। গ্রন্থকার বিশ্বাস করেন, তাঁহার এ ক্ষতিপূরণ হইবে, কারণ প্রকৃত প্রতিভার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু কোন বিষয়েই উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে মানসিক শিক্ষা এবং বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে এতই বিঘ্ন রহিয়াছে যে, সে অভাব বুঝিয়া লইতেও প্রতিভার প্রয়োজন হয়; ইহাতে দেশের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার পরিমাণ অবধারণ করিতে কে সমর্থ?

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যা ছিল দুই কোটি, এবং তাহার প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজার। প্রুশিয়ার লোক-সংখ্যা এক কোটী পঁচাশী লক্ষ, কিন্তু তন্মধ্যে ছয় হাজার তিন শত বাষট্টি জন ছাত্র প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ। ফ্রান্সে উচ্চ শিক্ষা-লাভে নিযুক্ত ছাত্র সংখ্যার অনুপাত ও ইহা অপেক্ষা কম হইবে না। ইংলণ্ডের বিভব এবং প্রতিপত্তি এত অধিক হইলেও লোক-সংখ্যার অনুপাতে তাহার উচ্চশিক্ষা-নিযুক্ত ছাত্রসংখ্যা ফ্রান্স এবং জর্ম্মণীর অর্দ্ধেক মাত্র। কিন্তু কেবল ছাত্র-সংখ্যাতেই যে ইংলণ্ড অপকৃষ্ট, তাহা নহে; ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অক্স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উৎকৃষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়, আর লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একটা পরীক্ষক-সমিতি মাত্র; সুতরাং এই যে সাড়ে তিন হাজার ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আছে, ইহাদের অতি অল্প সংখ্যাই প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা সমাপ্তির এই অভাব বশতঃ ইংরাজদিগকে কেবল যে সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাব অনুভব করিতে হয় তাহা নহে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত ইংরাজ জাতির মধ্যেই মানব-জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আদর ক্রমে খর্ব্ব করিয়া বিলুপ্ত করিবার উপক্রম করিতেছে, ইহাতে ইংরেজের প্রকৃতিকে নীচ করিতেছে, পার্থিব লাভের দিকে তাহাদিগের আগ্রহ বর্দ্ধিত করিতেছে, এবং অতি অল্প সংখ্যক ছাড়া সমস্ত শিক্ষককেই ঠিক ব্যবসায়ীর ন্যায় এই সকল লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী থাকিতে প্রবৃত্তি দিতেছে।

প্রকৃত উচ্চ-শিক্ষার অভাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার যে ফল প্রসব করিতেছে,

বিশেষ ভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব কার্য্যকরী বিজ্ঞান-শিক্ষায় ও সেই ফলই প্রসব করিতেছে। পারিস্, বার্লিন বা জুরিচ্ নগরে শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার যে-রূপ বিদ্যালয় রহিয়াছে, ইংলণ্ডে সেরূপ নাই। উক্ত উভয় বিষয়েই শিক্ষার প্রকৃত সমাপ্তি হয় না, উভয় বিষয়েই সেই একই অভাবের জন্য মন্দ মানসিক অভ্যাস এবং অপূর্ণ মানসিক কার্য্যের পোষণ হইতেছে। সাউথ্ কেন্‌সিংটন্ নগরের শিল্প এবং বিজ্ঞান-বিভাগ সবে মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও নিন্দার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। উক্ত বিভাগ-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, ইহার তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে তাঁহার সামান্য মাত্র পরিচয় আছে, আর এ বিষয়ে বিশেষ বিদ্যা না থাকাতে ইহার কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনেও তিনি সমর্থ নহেন। কিন্তু গ্রন্থকার একথা বলিতে বাধ্য যে, ইউরোপ মহাদেশের সর্ব্বত্রই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে লোকে ব্যগ্রভাবে এই বিভাগের সংবাদ লইতেছে, আর ইহা যে অতি প্রয়োজনীয় বিভাগ এবং ইহা দ্বারা যে, ইংলণ্ডের শ্রমশিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহাও তাহারা বুঝিয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস, আর কিছু না হউক, কেবল শ্রমশিল্পের অনুরোধেই ইংলণ্ডকে বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতি সমাধিক মনোযোগী হইতে হইবে। গ্রন্থকারও বিশ্বাস করেন, ইংলণ্ডে কতকগুলি বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হইয়াছে; কিন্তু যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থকার অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী, এমন কোন ব্যক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে এ বিষয়ের বিচার হওয়া উচিত। বিশেষ বিদ্যালয় এবং বিশেষ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা নিষ্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, কেবল এই বিবেচনাতেই এ স্থলে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ হইল।

ইংরাজদিগের মধ্যে এই বিষয়ক উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইংলণ্ডের মধ্য এবং উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায় দেখিয়া বিবেচনা করিতে গেলে অন্ততঃ ৮০০০ ছাত্রের এই বিভাগে শিক্ষা হওয়া উচিত। ছাড়তি বা প্রবেশিকা পরীক্ষা কলেজের তত্ত্বাধীন না রাখিয়া শিক্ষা-বিভাগের হাতে রাখা উচিত; এরূপ করিলে অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজে অকর্ম্মণ্য ছাত্রের আধিক্য হইতে পারিবে না। কলেজের উপাধি-পরীক্ষা অধ্যাপক দিগের হাতে না রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের মনোনীত পরীক্ষক-সমিতির হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। এরূপ করিবার কারণ পরে বলা যাইতেছে। অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজে এইরূপ পরিবর্ত্তনের অধিক আর কিছু করিতে পারা যাইবে না। চারি দিকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার এবং আয়তন-বৃদ্ধির কথা শুনা যায়, অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজেই সমস্ত কল্পনার শেষ হয়, কোন নূতন বান্দাবস্তই বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী থাকিতে পারে না। ইউরোপ মহাদেশে ভ্রমণ করিয়া গ্রন্থকার ইংলণ্ডে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার অভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বুঝিয়াছেন যে, ছাত্রেরা যে এরূপ উচ্চ শিক্ষার দ্বারে উপস্থিত হইবে, সে

আশা বৃথা, সুতরাং উচ্চ শিক্ষাকেই ছাত্র দিগের দ্বারে উপস্থিত করিতে হইবে। সকল ছাত্রই যে অক্‌সফোর্ড বা ক্যাম্‌ব্রিজে আসিয়া তিন বৎসর, দুই বৎসর, এক বৎসর, অথবা এক মাসে ও থাকিতে পারিবে, সে আশা মন হইতে একেবারে দূর করাই কর্ত্তব্য; কারণ সকলের অবস্থায় ইহা পোষায় না, আর সকলে যে শিক্ষা চায় এখানে তাহা পায়ও না। ইংলণ্ডের যে আট কি দশ স্থানে লোক-সংখ্যা খুব অধিক, সেই সকল স্থানে এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত; তাহা হইলে ছাত্রেরা বাড়ী হইতেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, অথবা সুবিধা হইলে অবস্থানের অনুরূপ বন্দোবস্ত ও করিতে পারে। এরূপ করিলে বড় বড় স্থান গুলি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ন্যায় বিদ্যা-শিক্ষারও কেন্দ্র স্বরূপ হইতে পারে। ইহার অভাবে লিভারপুল এবং লীড্‌স্ মফস্বলের জনাকীর্ণ সামান্য সহর মাত্র রহিয়াছে, আর ইহা থাকাতে লিয়ন্‌স্ এবং ষ্ট্রাস্‌বর্গ ইউরোপীয় প্রধান নগর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজের অধ্যাপক দিগকে প্রায়ই বসিয়া থাকিতে হয়; যদি কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত অধ্যাপক দিগকে মফঃস্বলের ঐ সকল বিদ্যালয়ে উপদেষ্টা স্বরূপ প্রেরণ করেন, আর তাঁহারা অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজের অধ্যাপক বলিয়া পরিচয় দিয়া তথায় অধ্যাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা নূতন এবং পুরাতনের সংমিশ্রণে অভিনব প্রণালীর অবতারণা দ্বারা জাতীয় উচ্চ শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজ কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, গণিত এবং প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয় মাত্র। ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা শ্রেণী বিশেষের পক্ষে সমধিক উপযোগী হইলেও তাহাদের অর্দ্ধেক গুলি অধ্যাপক কোন কাযেই লাগে না, সুতরাং ঐ সকল অধ্যাপককে অন্যত্র পাঠাইয়া কাযে লাগাইলে কোন ক্ষতি হয় না। অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজ আইন এবং চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার অনুপযুক্ত স্থান; সুতরাং আইন এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক দিগকে অন্যত্র প্রেরণ করিলে তাঁহারা আপন আপন বিষয়ে যথোচিত রূপে অধ্যাপন করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইতে পারেন। ভবিষ্যতে অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজের আয় দ্বারা এই প্রণালীতে মফস্বলের জন্য অধ্যাপকের বেতন এবং ছাত্রের বৃত্তি সংস্থাপন করিলে তাঁহাতে দেশের যেমন উপকার, নিজের ও সেইরূপ সুনাম হইবে। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরে যাহাতে উচ্চ শিক্ষায় জন-সাধারণের মতামত স্থান পায়, এই উদ্দেশ্যে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন এবং তাহাতে বিবিধ বিভাগের যথারীতি সংস্থাপন কর্ত্তব্য। ইহা করিতে গেলে কিংস্ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ নামক দুইটি অপরূপ নিয়মে গঠিত বিদ্যালয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের সঙ্গে একমিল করিতে হইবে। অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজের সাহায্য ছাড়া প্রয়োজনানুসারে আর ও কতক

গুলি নূতন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইবে; এরূপ করিলে পারিস এবং বার্লিনের ন্যায় লণ্ডন ও এসকল বিষয়ে উন্নত হইবে। ফলতঃ তখন বলিতে পারা যাইবে যে, লণ্ডনের ও একটা প্রকৃত বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে।

ইংলণ্ডের অন্যান্য বিষয়ে যেমন, উচ্চ শিক্ষাতেও সেইরূপ; এখানে প্রচুর উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এখন চাই কেবল তাহাদিগকে সম্মিলিত করা, আর অকর্ম্মণ্য অথবা পরস্পর বিরোধী না হইয়া যাহাতে তাহারা একই উদ্দেশ্যে সমন্বিত হইতে পারে, তাহার উপায় করা। ইংলণ্ডের অন্ততঃ দশটি স্থানে যাহাতে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়, এবং প্রথম শ্রেণীর বাছা বাছা অধ্যাপকেরা যাহাতে সেই সকল স্থানে অধ্যাপণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করাই এই প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল অধ্যাপককে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের এক এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইবে। অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজ সামান্য বিদ্যালয়ের এতই সদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ আর তাহারা এত দূর বিস্মৃত হইয়াছে যে, অধ্যাপক দিগের একটা বিভাগ ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আর কিছু না হউক, কেবল এই দোষের জন্যই উক্ত দুই বিশ্ব-বিদ্যালয় বিশেষ ভাবে নিন্দনীয়। জর্ম্মণীর পূর্ণ অধ্যাপক এবং অর্দ্ধ অধ্যাপকদিগের ন্যায় প্রত্যেক বিভাগের অধ্যাপকেরা নিদ্দিষ্ট হইয়া অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। অবশ্য লণ্ডনের মত স্থানের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান; ধর্ম্ম শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্র, এই পাঁচটি বিভাগ থাকা উচিত; কিন্তু মফস্বলের প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়েই যে এই পাঁচটি বিভাগ রাখিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। দৃষ্টান্ত যথা, ডরহামের মত স্থানে গণিত-বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র এই দুইটি মাত্র বিভাগ থাকিলেই চলিতে পারে, এবং বোধ হয় কোন রাজকীয় কমিসন এক সময়ে এই প্রস্তাবই করিয়া ছিলেন। স্থানীয় অভাব এবং সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ সম্বন্ধে কার্য্য করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত যথা যে সকল বড় সহরে সাধারণ চিকিৎসালয় এবং তাহাতে চিকিৎসিত রোগী পাইবার সুবিধা আছে, সেই সকল সহরেই চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিভাগ গুলা পরামর্শ-সিদ্ধ হইবে।

প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক বিভাগীয় সদস্যেরাই যে উপাধি দান করিতে পারিবেন, এরূপ নিয়মের অনিবার্য্য প্রয়োজন কিছু নাই, তাহাতে সুবিধাও দেখা যায় না। পরীক্ষাগুলি একরূপ হয়, এবং উপাধির মূল্য ও সর্ব্বত্র তুল্য হয়, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু পরীক্ষা-গ্রহণ এবং উপাধি-বিতরণের ভার অনেকের হাতে থাকিলে তাহা অসম্ভব হইবে। বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে উপাধি-বিতরণের ভার থাকিলে উপাধির মূল্যে যেরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে, জর্ম্মণীকে তাহা ভুগিতে হইতেছে। ইংলণ্ডে অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ দুই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আবার লণ্ডনে নূতন একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত

হইয়াছে, ইংলণ্ডে এই তিনটি ছাড়া আর কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়কে উপাধিবিতরণের অধিকার দিবার প্রয়োজন নাই। মফস্বলে যে সকল বিভাগ স্থাপিত হইবে, এই তিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতমের সঙ্গে তাহাদের সংস্রব রহিবে; অর্থাৎ হয় অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে, না হয় যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা তথায় যাইয়া শিক্ষা দিতেছেন তাহার সঙ্গে সংস্রব রহিবে। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটি করিয়া পরীক্ষক-সমিতি থাকিবে, এই সমিতিতে মফস্বলের অধ্যাপকেরাও সভ্য রূপে গৃহীত হইবেন, তদ্ব্যতীত সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা-সভার প্রতিনিধিও প্রত্যেক পরীক্ষক-সমিতিতে থাকিবেন। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে পরীক্ষক-সমিতিগুলি প্রকৃত পক্ষে অধ্যাপকদিগের দ্বারাই গঠিত হইবে। ইহা দ্বারা লণ্ডন-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-প্রণালীর স্থিরতা নাই বলিয়া যে একটা দুর্নাম আছে তাহাও ঘুচিবে, আর প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সমস্ত ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকাতে কোন কোন অধ্যাপক-শ্রেণীর হাতে উপাধি বিতরণের ভার থাকিলে কেবল তাঁহাদের ছাত্রদিগেরই যে মাহেন্দ্র যোগ হয়, সে অসুবিধাও দূর হইবে। ছাত্র দিগের প্রকৃত পড়া শুনা হইতেছে কি না, ঊর্দ্ধ শ্রেণীতে উন্নীত হইবার কে উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নহে,ইত্যাদি অবধারণ করিবার জন্য যে বার্ষিক পরীক্ষার প্রয়োজন, তাহা প্রত্যেক কেন্দ্রে অধ্যাপক দিগের হস্তেই রহিবে।

উপরে যেরূপ প্রণালীর কথা কথিত হইল, তাহা কেবল এক জন শিক্ষা-সচিব কর্ত্তৃকই গঠিত হইতে পারে; একটি উচ্চতম শিক্ষা সভা শিক্ষা-সচিবকে সাহায্য করিবেন, এবং প্রয়োজনী হইলে সাধারণ ধনাগার হইতে এবিষয়ে সাহায্য ও করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার রাজকীয় হস্ত-ক্ষেপের আরও প্রয়োজন এই জন্য যে, এ বিভাগের প্রকৃত অভাব যে কি তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝে, আর বাছা বাছা প্রধান শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার সবিশেষ সুযোগ রাজার রই আছে। হম্বল্‌টের ন্যায় এক জন মহৎ এবং মানব সাধীনতার পরিপোষক যে কেবল রাজ-সংস্রব-জনিত প্রধান্য ভোগ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থাপনে শিক্ষা-বিভাগের সাহায্য লইয়া ছিলেন, তাহা নহে। শিক্ষা সচিব থাকিলে সে সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে গভীর দায়িত্বের সহিত কার্য্য করিতে পারে, এই জন্যই শিক্ষা-বিভাগের সৃষ্টি। গ্রন্থকার বলেন, এক সময়ে কন্‌ভোভোকেশন বা পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সে জন্য তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞ আছেন; কিন্তু অধ্যাপক-নিয়োগ পণ্ডিত-মণ্ডলীর কার্য্য নহে। ইহার সভ্য-সংখ্যা বড়ই বেশী, আর ইহাতে দায়িত্ব-বোধ নিতান্তই কম। অধ্যাপক-নিয়োগের ভার কোন সমিতির হাতে থাকাও কর্ত্তব্য নহে; কারণ লোকে সমিতির সভ্য থাকিতে যে সকল অকার্য্যের অনুমোদন করিয়া থাকে, নিজের উপরে দায়িত্ব থাকিলে সেরূপ কার্য্য কখনই করিতে পারে না।

রাজা কি রাজ মন্ত্রীর হাতেও অধ্যাপক-নিয়োগের অধিকার থাকা কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাঁহারা সকল কার্য্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া থাকেন। যিনি শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ, যাঁহার কার্য্য সকলেই সমালোচন করিতে পারে, এবং যিনি সকলের নিকট নিজের দায়িত্ব অনুভব করেন, এমন ব্যক্তিকেই অধ্যাপক নিয়োগের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে; সে অধিকার তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নহে, কিন্তু দেশের সাধারণ শিক্ষার জন্য। অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজে অধ্যাপক-নিয়োগের বর্ত্তমান প্রণালী থাকিয়া গেলেও অন্যান্য স্থানের এ কার্য্য শিক্ষা-সচিবের হাতেই অর্পণ করিতে হইবে, এবং তিনিই এ জন্য দায়ী থাকিবেন। কিন্তু কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-সচিবকে অনুরোধ করিবার অধিকার প্রত্যেক বিভাগেরই থাকিবে, অন্যান্য দেশেও এ নিয়ম আছে।

অক্‌স্‌ফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ বাদদিলেও লণ্ডন-প্রমুখ অন্যান্য স্থান শিক্ষাসচিব কর্তৃক উচ্চ শিক্ষার নিয়ম-প্রবর্ত্তন এবং অধ্যাপকদিগের সাধারণ কর্ম্মচারী রূপে পরিচয় দ্বারা এতই লাভবান্ হইবে যে, ঐ সকল স্থানে উচ্চ শিক্ষার তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনের জন্য যে সকল সভা-সমিতি আছে, তাহারা সকলেই উচ্চশিক্ষার অভিনব দেশব্যাপী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তনে শিক্ষা-সচিবের সহায়তা আগ্রহের সহিত করিবে, এমন আশা করা যায়। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য-সভায় অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যে সভ্য আছেন, অভিনব প্রণালীর সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা-সভায় তাঁহাদিগকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা নিতান্ত স্বাভাবিক হইবে। প্রুসিয়াতে যেমন বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যাপার অন্তর্ব্বিভাগ এবং বহির্ব্বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে, সেই প্রথার অনুবর্ত্তন করিলে, বহির্ব্বিভাগ অর্থাৎ বিদ্যাত্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধান প্রভৃতি তত্ত্বাবধায়ক দিগের হাতে রাখিয়া, অন্তর্ব্বিভাগ অর্থাৎ বিষয়-বিভাগ-নিরূপণ এবং অধ্যাপক-নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য সাধারণ শিক্ষা-বিভাগের হাতে রাখিলেই চলিতে পারে। যে সকল নগরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বিভাগ গুলি স্থাপিত হইবে, অধিকাংশ স্থলেই সেই সকল নগরের অধিবাসিগণ আপন আপন সুবিধা এবং নগরের গুরুত্ব-বৃদ্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার গৃহাদির ব্যয় নিজেরাই প্রদান করিবে। স্থাপিত বিভাগের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য অনেকেই বার্ষিক সাহায্য করিবেন। গ্রন্থকারের বিশ্বাস, এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিভাগের অনাদর হওয়া দূরে থাকুক, এজন্য ভিন্ন ভিন্ন নগরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা লাগিয়া যাইবে। প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও শীঘ্রই যে লোকে ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিবে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথম একবার কোন রূপে উহা স্থাপন করিতে পারিলে হয়।"

"সোলমন বলিয়াছেন, যে শিক্ষাকে ঘৃণা করে, সে মৃত্যুকে ভালবাসে; কিন্তু তাঁহার এ কথা দীর্ঘকাল যাবৎ ইংলণ্ডে অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে।" এরূপ স্থলে

ঐ সকল বিভাগের যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, তাহাদিগের দ্বারা তাহাই করাইয়া লইতে হইবে। যে ব্যক্তি যে কোন প্রকার জীবিকা অবলম্বন করিতে চাহে, সে যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ পাইতে পারে, তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এইরূপ করিলেই যে, শিক্ষার্থী অবলম্বিত ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই; কিন্তু সে জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান প্রথায় পরীক্ষার উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর রহিয়াছে, কিন্তু প্রাগুক্ত উপায় পরীক্ষার প্রথা হইতেও অধিক উপকারী। সিভিল সার্ব্বিস্ বা ব্যাবহারিক বিভাগের পরীক্ষা-প্রণালী যাহাতে এই লক্ষ্যের অনুগত থাকিয়া প্রকৃত কার্য দেখাইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের পদলাভের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাড়তি পরীক্ষা; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন বিভাগীয় পরীক্ষা, অথবা কোন বিশেষ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনিবার্য্য হওয়া উচিত; যেটা হউক, একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে চাকুরি পাইবে না, এই নিয়ম বদ্ধমূল হইয়া গেলে তবে ইহার সহকারী উপায় স্বরূপ ব্যাবেহারিক বিভাগের জন্য সুনিয়মিত পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

যাঁহার হস্তে সাধারণের কোন কার্য্য-ভার ন্যস্ত হয়, এমন কোন ধর্ম্ম-যাজক, শাসক বা বিচারক, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবহারজীবী অথবা চিকিৎসক, কেহই কিছুকালের জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ না করিয়া এবং তাহার কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া আপন আপন ব্যবসায় চালাইবার অনুমতি পাইবেন না। ঔষধ-প্রস্তুতির জন্য প্রতিষ্ঠিত সভাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া এমন নিয়ম করিতে হইবে, যাহাতে এখানকার শিক্ষা এবং নিদর্শন-পত্র না পাইলে কেহ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে না পারে। শ্রমোপজীবী দিগের পক্ষেই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; ধন, জন, এবং গুরুত্ব, সকল বিষয়েই এই শ্রেণী বড়, আর ইঁহারা উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন বুঝিতে পারে না বলিয়াই ইহাদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ দরকার। ম্যাঞ্চেষ্টরের ওয়েন্স্ কলেজের ছাত্র সংখ্যা মোটে একশত, আর যাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট বিভাগে পড়ে না, তাহাদিগকেও যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র বলা যায়, তাহা হইলে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা মোটে চারি শত পঞ্চাশ; ইহা দেখিয়াই বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে শ্রমোপজীবী শ্রেণী উচ্চ শিক্ষা একবারেই পায় না। যাহা হউক, উচ্চ-শিক্ষায় শ্রমোপজীবী শ্রেণীর বর্ত্তমান অনিচ্ছা দেখিয়া এমন অনুমান করা যাইতে পারে না যে, উপযুক্ত ভাবে নিয়মিত এবং তাহাদের জীবিকার অনুরূপ ভাবে গঠিত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে তাহাদের দ্বারদেশে উপস্থিত করিলেই তাঁহারা উহা গ্রহণ করিবে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভাবি

সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এবং অন্যান্য দেশে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ইংলণ্ডীয় শিক্ষাপ্রণালীর কিরূপে সংস্কার এবং পুনর্গঠন হইতে পারে, এই গ্রন্থে তাহার একটি আভাস প্রদত্ত হইল। শিক্ষা-বিভাগ-গঠনের যে রূপ প্রস্তাব হইল, তাহা অনেকের নিকটই কল্পনার ব্যাপার বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস, ইংলণ্ড যদি প্রকৃত উন্নতির পথে চলিতে চাহে, তাহা হইলে আজ যে সকল কথা কল্পনার বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে, আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, এবং তদনুসারেই ইংলণ্ডের শিক্ষা-প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ভাবে পুনর্গঠিত হইবে। (১)

সমাপ্ত।

---

(১) গ্রন্থকার সৌভাগ্যবান্, তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছে,—বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডেরা শিক্ষাবিভাগে তাঁহার প্রদর্শিত অনেক সংস্কার গৃহীত হইয়াছে। অনুবাদক জানেন, সমগ্র বঙ্গদেশে এক ব্যক্তিও তাঁহার এ নীরস কথায় কাণ দিতেছেন কি না সন্দেহ; তবে কি আশায় এত পরিশ্রম-স্বীকার? সে আশার কথা মানুষকে না বলাই ভাল।

গ্রন্থ-শেষে গ্রন্থকার একটি পরিশিষ্ট দিয়াছেন, তাহাতে বার্লিন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১৮৬৫—৬৬ খৃষ্টাব্দে যে সকল অধ্যাপক যে সমস্ত পুস্তক পড়াইয়াছিলেন, তাহার একটা তালিকা আছে। এই তালিকাতে দেখা যায়, ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিভাগে ৩৬, আইন বা ব্যাবহার-শাস্ত্র-বিভাগে ৬২, চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিভাগে ১০০, এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিভাগে ১৭৫ খানি গ্রন্থ অধীত হইয়াছিল। সেই তালিকাটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলে পাঠক দেখিতে পাইতেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জর্ম্মন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রভেদ কত এবং কিরূপ। কিন্তু সে সাহস হইল না। নীরস শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন অনেকেই যে পড়েন না, তাহা আমরা জানি, তাহার উপরে বিশ পৃষ্ঠা যুড়িয়া সেই সকল পুস্তকের মূল বা ভাষান্তরিত নাম তুলিলে সেই সকল পাঠকের নিকট যে কিরূপ আশীর্ব্বাদ পাইব, তাহাও আমরা বুঝি, তাই সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিলাম। এরূপ নীরস ভাষায় এমন জটিল বিষয় না লিখিয়া সরল ভাষায় কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় লিখিলে যে অধিকাংশ পাঠকের সমধিক পরিতৃপ্তি, সুতরাং আমাদের শ্রম সার্থক হইত, তাহাও আমরা জানি; কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদিগকে এ পথে চলিতে হইতেছে।

অনুবাদক।

মা।

(মাতৃহীন বালক—লিখিত।)

তুমি কোথায় আছ মা? আমাকে ফাকি দিয়া, চিরদিনের জন্য আমাকে কাঁদাইয়া, তুমি কোথায় গিয়াছ মা? মা! ছেলেকে ফাকি দেওয়া কি মায়ের উচিত? তুমি ত মা দয়াময়ী, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী ছিলে। তবে কি স্বর্গে গিয়া তোমার হতভাগা পুত্রকে ভুলিয়া গিয়াছ? না মা, তুমি ভুল নাই। মা কি কখনও সন্তানকে ভুলিতে পারে? তাই বলিতেছি, ভুল নাই। আমি পাপী, নরাধম, তোমার অনুপযুক্ত পুত্র আমি মা! তাই ভাবি, তুমি আমাকে ভুলিয়াছ——তাই মায়ের পবিত্র স্নেহে দোষারোপ করি।

মা, বাল্যকালে যখন মা মা বলিয়া কাঁদিতাম, তখন তোমার সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও তুমি তাড়া তাড়ি আসিয়া আমাকে কোলে লইতে। কিছু একটু খাবার দিতে, অমনি আমি তোমার কোল হইতে নামিয়া, তোমার কথা ভুলিয়া গিয়া খেলা করিতে বসিতাম। তুমি আমাকে রাখিয়া অন্য কার্য্যে যাইতে, কিন্তু যাইবার সময়েও পিছুয়ে ফিরিয়া আমার দিকে কত বার চাহিতে। মা, তখন ত তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লইতে পারি নাই। তখন কি মা জানিতাম যে তুমি অকালে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? তখন কি মা বুঝিতাম আমি অকালে মাতৃহীন হইব? তখন কি মা কোন দিন ভাবিয়াছি আমি জীবন-নাটকের অভিনয় আরম্ভ না করিতেই তুমি চলিয়া যাইবে? তখন যদি বুঝিতাম আমার মাতৃহীন হইবার সময় অতি নিকট, তখন যদি জানিতাম আমি মাতৃ-স্নেহ হইতে অকালে বঞ্চিত হইব, তাহা হইলে কি খাবার লইয়াই তোমার কোল হইতে নামিয়া যাইতাম?

মা, তুমি জীবিত থাকিতে ত তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারি নাই। এখন যে মা তোমাকে কত বার ডাকি, কই তুমি ত তার উত্তর দাও না! তখন এক বার মা বলিয়া ডাকিলে ছুটিয়া আসিয়া কোলে লইতে; এখন যে তোমাকে কত শত বার ডাকি, এখন যে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে, তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে আত্ম-হারা হইয়া পড়ি! মা, তুমি কি তার কিছুই জানিতে পাও না? তুমি স্বর্গের দেবী, স্বর্গে গিয়াছ; সে পুণ্য-স্থানে পাপীর রোদন পঁহুছিবে কেন মা? সে রাজ্যে——সে সুখের, শান্তির রাজ্যে——আমার স্বর যাইবে কেন

মা? তাই বুঝি সহস্র বার ডাকিলেও তুমি শুনিতে পাও না।

মা, যখনই তোমার কথা মনে হয়——যখনই তোমার দয়ার, তোমার মমতার কথা মনে হয়, তখনই আমি তোমার ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়ি। তোমাতেই তখন আমার জীবন মন সমস্ত ডুবিয়া যায়। তখন আমার আমিত্ব টুকুও আমি তোমাতে মিশাইয়া দেই। মা, এ জীবনেও আর তোমার দেখা পাইবার আশা বৃথা, তাই তোমার চিন্তাই এখন আমার জীবনের সঙ্গী।

যখনই মা আমি তোমার রোগ-ক্লিষ্ট সেই মুখ খানি মনে করিতে চেষ্টা করি, তখনই আমার বুক কাঁপিয়া উঠে——মাথা ঘুরিয়া যায়। তখনই মা "আমার সিরায় সিরায় ধমনীতে ধমনীতে রক্ত প্রবাহ বহিতে থাকে।" তখনই মা "আমার চক্ষু কর্ণ দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ বাহির হয়।" আমি কি ভাবিব ভুলিয়া যাই। মা, তোমার সেই পাণ্ডুবর্ণ মুখ খানি ভাবিলেই মনে হইবে, এই ক্ষীণ আশায় প্রথমে আমি উৎসাহিত হইয়া তোমার কথা ভাবিতে বসি। যতই ভাবি, সেই ক্ষীণ আশাও ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে, তার পর এক বারেই তিরোহিত হয়। আমি তখনই নৈরাশ্যের অন্ধকার-সাগরে ডুবিয়া যাই। তার পরেও যদি ভাবিতে যাই, তাহা হইলেই চক্ষের জলে গণ্ড ভাসিয়া যায়। মা, তখন সেই অবস্থায় আমার বাল্যের ক্রীড়া-সামগ্রী সেই চীনা মাটির গাভীটী আমি বুকে রাখিয়া কতবার অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকি। হৃদয়ে যেন একটু শান্তি পাই। কিন্তু হায় সে শান্তি ক্ষণিকের তরে। আবার তখনই তোমার কথা মনে হইলেই কাঁদিয়া আকুল হই।

মা, বাল্যকালে তুমি আমাকে কত উপদেশ দিতে, কত শিক্ষা দিতে। কিন্তু এখন যে আমি সংসারের প্রবেশ-দ্বারের প্রায় নিকটে আসিয়াছি, এখন আমাকে কে উপদেশ দিবে মা? এখন আমার জীবন-তরণীকে কে চালাইবে মা?

আমি যখন শিশু ছিলাম; তুমি কত-দিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে আমাকে কোলে লইয়া চাঁদকে "আয় চাঁদ" "আয় চাঁদ" বলিয়া ডাকিয়াছ; আবার আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র হস্ত নাড়িয়া ডাকিয়াছি, "আয় চাঁদ" "আয় চাঁদ"। আমি কাঁদিলে চন্দ্রের মধ্যে বুড়ী আছে, কাঁদিলে ধরিয়া লইয়া যাইবে, এই বলিয়া তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে। তাই এখনও মা আমি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহার বুড়ী দেখি, তাই এখনও মা চন্দ্র উঠিলে তাহার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকি। কিন্তু চন্দ্র-দেবের সুমধুর হাসি দেখিলেই তোমার কথা মনে পড়ে। তখন আমি কাঁদিয়া আকুল হই।

মা, আকাশে নক্ষত্র উঠিলে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে 'বলত ও গুলি কি?' কিন্তু আমি তখন তাহার কোনই উত্তর দিতে পারিতাম না। তুমিই আমাকে বলিয়া দিতে, 'ও গুলি ফুল। যাহারা স্বর্গে যায়, তাহারা ফুল হইয়া আকাশে ফুটিয়া থাকে।' তাই মা, এখনও তারা উঠিলে আমি

অনিমিষ নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকি। তখন আমার মনে হয়, ঐ এক একটী নক্ষত্র এক একটী ফুল—যাহারা স্বর্গে গিয়াছে তাহাদের অনন্ত প্রতিমূর্ত্তি। মা, তুমিও ত স্বর্গে গিয়াছ। বলত মা, ঐ সমস্ত ফুলের মধ্যে তুমি কোনটী? তুমি চাঁদ দেখিতে বড় ভাল বাসিতে, তাই মা, আমার বোধ হয়, চাঁদের কাছে যে ফুলটী ফুটে, তুমি নিশ্চয়ই সেইটী। তাই মা চন্দ্র উঠিলেই দেখি, আমার সেই ফুলটী ফুটিয়াছে কি না। তাই মা, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি আমি এত ভাল বাসি। তাই মা, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষায়, আমি জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে জানালা খুলিয়া চাঁদের কাছে 'আমার ফুল' দেখি। একবার দেখি, দুইবার দেখি, তিনবার দেখি, কতবার দেখি; কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটে না মা। যতই দেখি, ততই যে দেখিবার পিপাসা আরও বাড়িয়া যায় মা। মা, চাঁদের কাছে সেই ফুলে যে কি মাধুরী আছে, সে ফুলে যে শান্তির কি স্নিগ্ধ ছায়া আছে, তাহা বলিতে পারি না। মা, বলিতে পার, কেন আমি সেইটি দেখিতে এত ভাল বাসি? মা—মা—ওমা—মা—তুমিই কি সেই চাঁদের কাছে ফোটা ফুল?

মা, বেড়াইতে যাই, দেখি সকলেই তাহাদের মাকে মা-মা-বলিয়া কত ডাকে। তখন যে আমার বুক ফাটিয়া যায় মা—তখন যে আমি হৃদয়ের বেগ থামাইতে পারি না। আমারও যে তখন মা ইচ্ছা হয় যে আমিও মা-মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ শীতল করি। কিন্তু ডাকিব কাহাকে মা? আমার ত মা নাই, তাই আমি সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া সেই 'চাঁদের কাছে ফোটা ফুলের' দিকে চাহিয়া প্রাণ-ভরিয়া কতবার ডাকি মা—মা—ওমা—মা। অন্য ছেলেদের মা তাহাদের ডাকে উত্তর দেয়। কিন্তু আমার কথার ত কেহ উত্তর দেয় না মা! তখন উত্তর পাইবার আশায় আমি আবারও ডাকি মা—মা—ওমা—মা। কিন্তু হায়, হতভাগার মর্ম্মভেদী আহ্বানেও সকলে নীরব থাকে। কেবল প্রতিধ্বনি গায় মা—মা—ওমা—মা। প্রতিধ্বনি শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠি। কাতরে আবার ডাকি মা—মা—মা। প্রতিধ্বনি ও আবার গায় মা—মা—মা।

শিক্ষা-সম্বাদ।

(১)

আর্য্য-বিদ্যালয়। ঢাকার পটুয়াটুলিতে কতিপয় কৃতবিদ্য ঢাকাবাসীর উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের ফলে একটী আয়ুর্ব্বেদ-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্কুলের নিয়মাবলী 'সারস্বত পত্র' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সংস্কৃত সরস্বতীর ভাণ্ডারে হিন্দুদিগের জাতীয় ধাতু, উপধাতু মণি-মুক্তা প্রভৃতি সমুদয় সামগ্রী নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র দুর্গম জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিয়া প্রতিভা-সম্পন্ন, অধ্যবসায়ী, নিরন্তরায় আর্য্য-সন্তান সেই মহারত্ন-পূর্ণ জাতীয় হিত-সুখের নিধান সংস্কৃত সরস্বতীর ভাণ্ডারে উপনীত হইয়া প্রয়োজনীয় রত্ন-রাজি আহরণ ও উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিতেন, কিন্তু কয়েক শতাব্দী হইতে হিন্দুর সৌভাগ্য-সুবিতা বিজাতীয় বিচিত্র অভ্রমালায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়া হিন্দুর সে প্রতিভা, সে অধ্যবসায়াদি সদ্‌গুণ-রাশিও নিষ্প্রভ, কাযেই সংস্কৃত সরস্বতীর ভাণ্ডারের দিকে হিন্দুর প্রাণের টান থাকিলেও যাইবার শক্তি নাই। এই কারণে অব্যবহারে সে অমূল্য-রত্ননিচয় ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় এই রত্নরাশি আহরণ করিবার কল্পনাকারীর প্রতি ও আমাদের অনুরাগের উদয় হয়! আর যাঁহারা দুরভিসন্ধিবিহীন এবং যথার্থ জহরীর কার্য্যে তৎপর, তাঁহারা দেবতার ন্যায় আমাদের সম্মান পাইবার যোগ্য।

যেমন ধাতব-অস্ত্র-নিচয়ের মধ্যে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রের দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণতা, আশুকারিতা, প্রয়োজনীয়তা যত অধিক, স্বর্ণ-পিত্তলাদি-নির্ম্মিত বস্তুর দৃশ্য শোভা থাকিলেও তাহারা লৌহজ বস্তুর সন্নিধানে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। সেইরূপ সাহিত্য-অলঙ্কারাদি সৌন্দর্য্য-ভূয়িষ্ঠ বিবিধ শাস্ত্র সংস্কৃত সরস্বতীর ভাণ্ডারে বিরাজমান রহিলেও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র লৌহ নির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র-তুল্য। অমার্জ্জনে, অব্যবহারে অন্য ধাতব পদার্থের যেরূপ ক্ষতি হইয়া থাকে, লৌহ-নির্ম্মিত পদার্থে শ্যামিকা সঞ্জাত হইলে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। শ্যামিকা অপনোদন ব্যতীত লৌহের শক্তির বিকাশ ত হইতেই পারে না, তাহার উপর তাহার বিনাশও অতি সহজেই হইতে পারে। সুতরাং ইহার পরিমার্জ্জনে ধীর, দক্ষ, প্রতিভা-সম্পন্ন, শক্তিমান শিল্পীর প্রয়োজন, নতুবা সর্ব্বনাশের আশঙ্কা তিরোহিত হয় না।

দেশের সৌভাগ্য-ফলে কৃতী শিল্পী গঙ্গাধর বঙ্গদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ-পরিমার্জ্জনের যে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ও উত্তম উপকরণ স্বদেশ-বাসীর হিতের জন্য আমরণ খাটিয়া বাহির করিয়া রাখিয়া

গিয়াছেন, তাহার বলে এবং সেই মহাপুরুষ-প্রদর্শিত জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সরস্বতীর ভাণ্ডারে উপস্থিত হইতে পারিলে কৃতকার্য্যতার আশা করা যাইতে পারে।

সুখের বিষয় আর্য্য-বিদ্যালয়ের কবিরাজ-দ্বয় গঙ্গাধর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত। স্থান ঢাকা এবং উদ্যোগী ধনী ও কৃতবিদ্যগণ ঢাকা বাসী, সুতরাং ইহার স্থায়িত্বে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

"আর্য্য বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী।

১। আর্য্য বিদ্যালয় নামে এই বিদ্যালয় অভিহিত হইবে।

২। সম্প্রতি ইহাতে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা চলিবে।

৩। ব্যাকরণ ও সাহিত্য ঢাকা সারস্বত সমাজের পাঠ্যানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। আয়ুর্ব্বেদ চারি শ্রেণীতে পঠিত হইবে।

৪। সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই ছাত্রগণ আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতে পারিবে।

৫। সাহিত্য ও ব্যাকরণের শ্রেণীতে কিছু বাঙ্গালা ও ইংরেজী পড়ান হইবে।

৬। বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে যিনি যাহা দান করেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

৭। সারস্বত-সমাজের পরীক্ষানুসারে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠী ছাত্রগণ উন্নীত হইবে।

অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন ও হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের নিকট লিখিতে হইবে।

এই বিদ্যালয়ে সম্প্রতি, আয়ুর্ব্বেদ ও সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের শিক্ষা-কার্য্য চলিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ চারি শ্রেণীতে অধীত হইবে। ব্যাকরণ সাহিত্য ঢাকা সারস্বত সমাজের পাঠ্য ব্যবস্থানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য ইংরেজী স্কুলের রীতি অনুসারে বেলা ১১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত করা হয়। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের সুবিধাজনক হইলে, এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের কোন আপত্তির কারণ নাই।"

সিণ্ডিকেটের অবিবেচনা।—সঞ্জীবনী বলেন, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে কয়েকজন পরীক্ষক ও তাঁহাদের উপরে একজন প্রধান পরীক্ষক আছেন। বিভিন্ন পরীক্ষক যাহাতে বিভিন্ন রূপে কাগজ পরীক্ষা না করিয়া একই নিয়মানুসারে পরীক্ষা করেন, তাহা দেখিবার জন্যই প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আমরা জানি, অধিকাংশ প্রধান পরীক্ষক তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়াই অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রতি-বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়, অথচ বিশেষ কোন উপকার হয় না। পরীক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ যে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য লোক আছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগ্রত রাখিবার জন্যই যে প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু দুঃখের

বিষয় এই, প্রধান পরীক্ষকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগী না হওয়াতে সিণ্ডিকেটের মহৎ উদ্দেশ্য বিফল হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম, সিণ্ডিকেট এই বৎসর হইতে এফ, এ পরীক্ষাতেও প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রধান পরীক্ষকগণ কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইলে তদ্দ্বারা যে বিশেষ উপকার হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ পরীক্ষক দুর্লভ। অথচ খামখা ৫।৬ হাজার টাকাব্যয় হইবে। আমাদের বিবেচনায় যদি কোন বিষয়ে ১০টা প্রশ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয়ের জন্য ৫ জন পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া সমুদয় পরীক্ষার্থীর ২টা প্রশ্নের উত্তর এক জনকে পরীক্ষার্থ নিযুক্ত করিলে নম্বরের সমতা রক্ষা হইতে পারে, এক জনের দোষে কাহারও সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। আমরা আশা করি, সিণ্ডিকেট এই বিষয়টা পুনরায় বিচার করিবেন। আমরা অবগত হইলাম এবার যাঁহারা এফ, এর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে প্রধান পরীক্ষকের অধীনে কার্য্য করা অপমানজনক মনে করিয়া পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন। শিক্ষাকার্য্যের সহিত যাঁহাদের কোন সংস্রব নাই, এমন লোকের সংখ্যাই সিণ্ডিকেটে বেশী; সুতরাং এখন নানা প্রকার বিভ্রাটের কথা শুনা যায়। কলেজের সহিত যাঁহাদের সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে সিণ্ডিকেটের সভ্য করা নিতান্তই অন্যায়। সিণ্ডিকেটে হাইকোর্টের উকীল-লাইব্রেরীর ক্ষুদ্র সংস্করণ করা কখনও বৈধ নহে।”

হিতবাদী বলেন—“গত শনিবার সিণ্ডিকেটে আগামী এণ্ট্রান্স, এফ, এ এবং বি, এর পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর যেমন উপযুক্ত পরীক্ষকদের নামের তালিকায় সিণ্ডিকেটের মেম্বরদিগের দুই চারিটী কুপোষ্য চাটুকারের নাম দেখিয়া সুখী হইতাম, এই বারও মেম্বরগণ আমাদিগকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করেন নাই বরং দুই একটী নাম যোগ করিয়া আমাদিগের সুখবৃদ্ধিই করিয়াছেন।”

কৃষি-তত্ত্ব-শিক্ষা। পঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগ সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন, এখন হইতে তত্রত্য সমস্ত বিদ্যালয়ে কৃষিতত্ত্ব পড়াইতে হইবে। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, এখানকার অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে কৃষিতত্ত্ব অবশ্য পাঠ্যরূপে পরিগণিত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হইতেছে না। আসামে উক্ত নিয়ম প্রচারিত করিবার জন্য বিগত আসাম-শিক্ষা-সমিতিতে শ্রীহট্ট-সম্মিলনী এ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু আসাম-গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিয়াছেন আমরা তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিনাই। শিক্ষা-সমিতির আহ্বান প্রভৃতি অনেক কার্য্য দ্বারা আসাম গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অগ্রবর্ত্তিতা প্রদর্শন করিতেছেন; সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি, বঙ্গে এ শুভকর প্রস্তাব উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আসামে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা।

শিক্ষা ও তৎপরিণাম।

এই যে বিপুল ধন-রত্নের আকর ও অনন্ত উন্নতির ক্ষেত্র, বিচিত্র কর্ম্ম-ভূমি, যাহাতে আবহন কাল অবিশ্রান্ত কোটি কোটি লোকের শ্রম ও যত্ন বিলীন হইতেছে ও যাহার চতুর্দ্দিক দিয়া অনবরত সৌভাগ্যের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। ইহার কিছুই তো হটাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, সকলকেই প্রথমতঃ শিক্ষা ও তৎপরে বহু সাধনা করিয়া আনিতে হইয়াছে। মানুষ জন্মিয়া খাইতে খাইতেই খাওয়া শিক্ষা করে, উঠিয়া পড়িয়া হাটিতে হাটিতেই হাটা অভ্যাস করে, এবং আধ আধ করিয়া কথা বলিতে বলিতেই বলা অভ্যাস করে। এইরূপ লিখন, পঠন ও চিন্তা করিয়া তত্ত্ব-নিষ্কাশন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই লোক করিতে করিতে শিক্ষা করে। এই নিয়ম ব্যক্তিগত ভাবে যেমন প্রমাণিত, সমষ্টিভাবে ও ঠিক তাহাই। ঐ যে আদিম বসন-হীন উলঙ্গ, আশ্রয় হীন সতত শীতবাতে তাড়িত, ভোজ্য হীন নিয়ত পশু পক্ষীর সঙ্গে বিবাদ করিয়া উদরপূরক মনুষ্য, যাহারা কিছুই জানিত না, শুনিত না, সেই বর্ব্বর মানুষই প্রয়োজনানুরোধে করিতে করিতে সমস্ত কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে ও অবিশ্রান্ত খাটিতে খাটিতেই এত সৌভাগ্য আনিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত করিয়াছে।

কার্পাস হইতে সূত্র-নির্ম্মাণ, গুটিপোকার মধ্য দিয়া রেশম নিষ্কাশন ও বিবিধ জন্তুর পশম ব্যবহার করিয়া এই যে সুন্দর সুন্দর পরিধেয়, বিচিত্র অঙ্গাবরণ, উৎকৃষ্ট বহু মূল্যের উত্তরীয় ও শিরস্ত্রাণ নির্ম্মাণ করিতে মানুষ সুপটু হইয়াছে, এই সমস্তই মানুষের ক্রমিক বিকাশ ও শিক্ষার উত্তর ফল।

আর এই যে শীত-তাপ প্রপীড়িত মনুষ্য সেই আদিম আবাস বৃক্ষ-কোঠর বা গর্ত্ত-তল হইতে উঠিয়া উত্তরোত্তর অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে করিতে লতাপত্রের ছায়া এবং কদর্য্য বাদা (লতা-পাতা-নির্ম্মিত আবাস) ছাড়িয়া সুন্দর সুন্দর গৃহ ও দ্বিতল ত্রিতল রম্যহর্ম্ম্যে আরূঢ় হইতে পারিল, ইহাও সেই প্রয়োজন-প্রবর্ত্তিতা পরমারাধ্যা ক্রমিক শিক্ষারই অন্যতম আশীর্ব্বাদ।

আর ঐ যে, ক্ষুৎক্ষাম, কদর্য্যাহারী, বুভুক্ষু মনুষ্য কত পরিবর্ত্তের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইতে হইতে এইক্ষণে এই নিত্য নূতন ফল-শস্য উৎপাদন ও তৎপরে সুস্বাদু, পুষ্টিজনক ও আয়ুষ্কর আহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তুষ্টি-পুষ্টিলাভ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ, ইহা ও সেই সর্ব্ব-সুখবিধায়িনী অন্ত-বিধা শিক্ষারই অত্যুৎকৃষ্টা পরিণতি।

আর ঐ যে প্রকৃতির লীলা-ভূমিতে উপস্থিত, অব্যক্ত কিচ্‌মিচ্‌শব্দকারী মানব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসরের চেষ্টা ও

কত অনুকরণের অনুকরণ করিতে করিতে শব্দোচ্চারণ, বর্ণ-প্রণয়ন ও তদ্‌যোগে সহজ সহজ মনের ভাব ব্যক্তীকরণ, তাহার পর ব্যাকরণ-প্রবর্ত্তনা দ্বারা সেই সেই বাক্যের বিশুদ্ধীকরণ ও ক্রমশঃ কাব্য-নাটক-প্রণয়ন দ্বারা অভিমত মানব-চরিত্র অঙ্কণ অথবা নিরন্তর মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে করিতে দর্শনাদি প্রণয়ন দ্বারা জাগতিক নিগূঢ় তত্ত্ব নিষ্কাশন ও জন-সমাজে তাহার প্রচারসমর্থ, এই সমস্তই ক্রমিক বিকাশ ও শিক্ষার সুপ্রসন্ন মুখের কমনীয় হাসি।

আর এই যে বিজ্ঞান-চর্চ্চা হইতে নব নব কল্যাণ অনবরত নরলোকে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে, যাঁহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য অনন্তকাল যন্দোহিত হইলে ও নিঃশেষ হইবে না, সেই সর্ব্ব পদার্থের মর্ম্মোদ্ভেদনকারিণী চর্চ্চার ক্ষেত্রেও আমরা শিক্ষারই আশ্চর্য্য মহিমা সন্দর্শন করিতেছি।

শিক্ষার অর্থ অভ্যাস। যে কোন বিষয়ে হউক, পুনঃপুনঃ একবিধ ক্রিয়ার অভ্যাস হইতেই শক্তির উৎপত্তি হয়, এবং সেই শক্তিই জন-সমাজের একমাত্র ভরসা ও অনন্ত উন্নতির কারণ।

আর একটি অতি সুখের কথা এই, যে কোন বিষয়ে হউক, খুব জমাট ভাবে একটী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা আসিলেই তাহার ফল সমস্ত জন-সমাজে বিকীর্ণ হইবার উপায় হয়। প্রত্যেক প্রদেশের লোক স্ব স্ব প্রমোৎপাদিত কল্যাণ অন্যকে প্রদান করিয়া নিয়মে কিছু গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এই কর্ম্ম-ফল-বিনিময়ই সর্ব্বোন্নতির হেতুভূত।

এই যে আজ ইংলণ্ডের এত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে, বিনিময়-প্রবর্ত্তনই তাহার মূল। ইংলণ্ড যে শীত-প্রধান দেশ, এই বর্ত্তমান জনতা, কলকারখানা ও উত্তাপ-বৃদ্ধির পূর্ব্বের কথা সকলই একবার মনে করুন। তাদৃশ অবস্থায় লোক মৃত্তিকার নীচে স্থান পরিগ্রহ করিতে বাধ্য। অনেকে হয় তো মানুষ যে মাটির তলে গর্ত্তে থাকিত, ইহা একটা উপহাসের কথা মনে করিতে পারেন। কিন্তু তৎকালীয় অবস্থার কাঠিন্য কতটা ছিল তাহা একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলে ও সময়ে অবশ্যই ইংলণ্ডের সেই মানুষ নিরবচ্ছিন্ন সেই মানুষ আর রহিল না। বিধাতা তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্যই যেন অপর দেশের কতকগুলি লোক আনিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশাইয়া দেন। সেই বিমিশ্রণ ও জাতি-সমন্বয় দ্বারা ইংলণ্ডের কি উপকার সাধিত হইল, তাহা অবশ্যই বুদ্ধিমানদিগকে বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, সেই বিমিশ্রিত জাতি তখন আর সম্পূর্ণ তদ্দেশজাত খাদ্য পরিধেয়ে সন্তৃপ্ত থাকিতে পারে না। স্বতঃই বহির্ম্মুখ হইবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তনা আসিয়াছিল, এবং প্রয়োজন অতি দক্ষতা-সহকারে সাগর পার করাইয়া বিদেশ হইতে খাদ্য পরিধেয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছিল। কালে ঐ সংগ্রাহকেরাই বিদেশ যাতায়াতের অভিজ্ঞতা দ্বারা নূতন নূতন আদর্শে ও ক্ষিপ্রহস্তে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সত্বর গমনে তাহা অন্যত্র পহুঁছিয়া তত্তদ্দেশজাত বিবিধ শিল্পোপকরণ

আবার স্বদেশীয়দের হস্তে আনিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিনিময়-জনিত লভ্যই উত্তরোত্তর ইংলণ্ডবাসীকে স্ফীত, বর্দ্ধিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিল।

পাঠক এখন মনে করুন, একটী জাতি কোন এক বিষয়ে শিক্ষিত ও সুপটু হইতে কত কিছু কার্য্য-কারণ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। সেই শীত-বাতে কম্পিত মাটির তলের মানুষই আজ পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক ও সকলের বসন-ভূষণ যোগাইতে অধিক অগ্রসর, এবং তজ্জন্যই সকল চেয়ে অধিক ধনী। ইহাকেই বলে শিক্ষা, এবং ইহারই অভ্যন্তরে সর্ব্বমঙ্গলা মহাশক্তি অথবা মহালক্ষ্মী বিরাজমানা। এই মহাশক্তির আরাধনা করিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রতিবেশী মাত্রেই বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু বাণিজ্যাধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতি ইংলণ্ডের প্রতিই অধিক অনুকূলা, সুতরাং বাণিজ্যে ইংলণ্ডেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে।

সামান্য কথা নয়, ইংরেজ জাতির ঐ মহাশক্তি-প্রভাবে আজ এক লণ্ডন নগরেই [illegible] সময়ে রোজ শতাধিক বাণিজ্য-পোত উপস্থিত, আবার অত্যন্ত গৌরবের কথা এই, ইহার অধিকাংশই ইংরেজ উপনিবেশ হইতে সমাগত। তাহার পর এক লণ্ডনেই দশটির ও অধিক রেলওয়েষ্টেশন আছে, তথা হইতে অসংখ্য লৌহ-বর্ত্ম চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত। ঐ লৌহ-পথ কোনটী মাটির উপর দিয়া, কোনটী মাটির নীচে দিয়া পরিচালিত। এই সমস্ত পথে প্রায় মিনিটে মিনিটে শকট চালিত হইয়া শশব্যস্তে ইংরেজের কমতা বহন করিয়া দিতেছে। এখন পাঠক একবার মনে করিয়া দেখুন, এইখানে এক বাণিজ্য-সূত্রেই শিক্ষার কেমন এক প্রভাব উপস্থিত।

দ্বিতীয়, অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে মানুষ কি করিতেছে, একবার অবলোকন করা যাউক। ঐ পতিত ক্ষেত্রে একদিন বল-পূর্ব্বক দলে দলে মানুষ নীত হইয়াছিল। অগ্রে ঐ শত শত মানুষের বুঝাই না পাঠাইলে এই অত্যল্পকালের মধ্যে কখনও এমেরিকার এই শ্রীবৃদ্ধি হইত না। আবার কেমন আশ্চর্য্য! যত মানুষের দরকার, তত পূরণ হইয়া গেলে এক ধমক দিয়া অবৈধরূপে মানুষ লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্য প্রয়োজনীয়, এই সূত্র ধরিয়াই প্রকৃতি এক একজন লোকের হস্তে বহুতর ভূমির চাষ ও খনিজ উত্তোলনের ভার দিয়া কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত॥ মোট বহন করিয়া দিতে ইংরেজেরা যেমন সুশিক্ষিত, পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া দিতে তেমনি এমেরিকাবাসী সিদ্ধ-শক্তি। ঐ উৎপাদন শিক্ষার আদর্শ লইয়াই আজ ইংরেজ ভারতে অসংখ্য উদ্যান সংস্থাপন ও তথা হইতে কোটি কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করিয়া লইতেছেন। এই তো গেল ভূমিগত শিক্ষা ও শক্তি-চালনার মূল সূত্র।

এইক্ষণে অগ্নি, জল ও আকাশীয় তড়িতের শক্তি লইয়া যাঁহারা অসম্ভব সম্ভব বলিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের কথা একবার মনে করা যাউক। এই শ্রেণীর শিক্ষাঅরীশেরা এখনও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক-বীজ-

অস্ত্রের বলে যে দিন মানুষকে উড়াইয়া দিবেন ও জৈবতড়িৎ শরীরে ঢুকাইয়া মরা মানুষ জীবিত করিয়া দিতে পারিবেন, তখনই তাঁহাদের কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যতা বুঝিতে হইবে। ইহাদের আধুনিক বাষ্পোপকরণ কাষ্ঠ কয়লা প্রভৃতি নিঃশেষিত হইয়া গেলে নাকি সূর্য্যরশ্মি ও বিদ্যুৎ ধরিয়া তাবৎ কল কৌশল চালিত হইবে। তাহার পর আরও সূক্ষ্ম কোন উপকরণ তাঁহাদের ব্যবহারে আসিবে কিনা সেই ঘোষণা এখন ও কল্পনাপথে আসে নাই। এতদ্বিষয়ের খুব একটু জমাট ভাবে শিক্ষা ও জাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তনা ফরাসিসদিগের মধ্যেই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ, বিদ্যা-শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার আধুনিক বার্ত্তা লইতে অগ্রে জার্ম্মণিদিগকে মনে পড়ে। জর্ম্মন-দেশের পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলারই এখন সরস্বতীর বরপুত্র। তিনি এখন কোন একটী কথা বলিলে সমস্ত পৃথিবী কাণ পাতিয়া শুনে। আর রাজবিধি দ্বারা দেশময় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়া শিক্ষার একটা প্রভাব জন্মাইয়া লইতে জর্ম্মনদেশীয়েরাই প্রথম উদ্যুক্ত। যাহা হউক, বিদ্যা-শিক্ষা-সম্বন্ধে এখন সভ্য দেশ মাত্রেই যুগান্তর উপস্থিত মনে করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষ ধর্ম্ম-শিক্ষা ও তৎ পরিণাম-সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ধর্ম্ম যেমন মধুর, তৃপ্তিকর ও শান্তিপ্রদ, এমন আর কিছুই নহে। ধর্ম্ম অবশ্যই কোন একটা স্বতন্ত্র জিনিষ নহে। ঠিক সরল ভাবে স্বভাবের অনুযায়ী হইয়া কর্ত্তব্যপালন করাই ধর্ম্ম। সত্য কথা বলা প্রিয়বাক্য বলা ধর্ম্ম, কেননা তাহাতে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়। কোন রূপ অবৈধ লাভের লোভ না থাকিলে কখনই মিথ্যা আইসে না, আর ক্রোধ বিকার না হইলে কর্কশ অপ্রিয় বচন ও বাহির হয় না। এই দুয়েরই মূলে বিকার, সুতরাং ফলটা বিষময়। আর সত্য বাক্য ও প্রিয় বচন আত্মার স্বাভাবিকতা হইতে উদ্গত, সুতরাং শ্রুতিমধুর আনন্দ দায়ক ও অত্যন্ত তৃপ্তিকর। অনুক্ষণ মনের প্রসন্নতা ও সৌম্য ভাব রক্ষা করা, সর্ব্বদা সদ্বিষয়ের চিন্তন, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মনোবিকার ধৌত করিয়া সর্ব্বভাবে প্রেম ও মৈত্র বিধান স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বভাবে আদৃত, সুতরাং ইহা প্রশস্ত ধর্ম্ম। এই রূপে নিত্য নিত্য স্নান দ্বারা শুচিত্ব বিধান, ভোজন দ্বারা শারীরিক বল ও আয়ু বৃদ্ধি করা, পরিধেয় দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া জৈবতাপ রক্ষা করা, ভোজ্য পরিধেয়ের উপকরণ উৎপাদন ও তাহার পরিচালন করিয়া জীবলোকের সাহায্য করা, ন্যায়পরতার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি রাজবিধানের পরিচালন দ্বারা সকলের ভোগাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা এই সমস্তই ধর্ম্ম ও নিত্য ভগবৎ কৃপা উপভোগ করিবার সুপ্রশস্ত দ্বার। এই সমস্তই কর্ম্ম যোগ। এর উপরে জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইতে হইলে নিত্য বিশুদ্ধ অন্ন-ভোজন, বিশুদ্ধ চিন্তাতে মনঃ সমাধান, ও বিশুদ্ধ ধারণা আনীয়া আত্মার ব্রহ্মতৎপরতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাই কর্ম্মময় জীবনের শেষ শিক্ষা ও তজ্জনিত নিত্যানন্দ উপভোগই সর্ব্ব শিক্ষার শেষ পরিণতি।

ক্ষুদ্র গল্প।

ভূপতি।

দারুণ কাল কাহার ও মুখাপেক্ষী নহে, সে পিতা-মাতার ক্রোড় হইতে এক মাত্র শিশুকে গ্রহণ করিতে যেমন পটু, শিশুর পিতা-মাতাকে লোকান্তরিত করিবার ক্ষমতা ও তাহার সেইরূপ। ভূপতি এই কালের কঠোর শাসনে শৈশবেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলকে হারাইয়া অনাথ হইয়া ছিলেন। জ্ঞাতি-বর্গের চক্রান্তে পৈতৃক গৃহাদি পর্য্যন্ত ভূপতিকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হয়।

ভূপতির বয়স প্রায় তের বৎসর, সে শোকে, তাপে, অনাহারে, অনাশ্রয়ে কেমন উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া উঠিল। দিদির বাড়ী পর্য্যন্ত সে থাকিল না, বাড়ী হইতে বাহির হইল।

রামচাঁদ বাবু অতি দয়ালু ব্যক্তি, পরের বিশেষতঃ শিশুর দুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার নিজের সংসারে অন্য কিছুর অভাব না থাকিলেও সুখ-শান্তির অভাব সম্পূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামচাঁদবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনাহার-ক্লিষ্ট বিষাদ-মলিন ভূপতি পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য জল চাহিল। রাম চাঁদ বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেনএবং তাহার আকৃতিগত মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলেন। রাম চাঁদ বাবুর বাড়ীতে সে সময় কেহ অভুক্ত নাই, কিন্তু শিশু ভূপতির পূর্ব্ব দুই দিন হইতে জল ভিন্ন তখনও কোন বস্তু উদরস্থ হয় নাই, কাযেই রামচাঁদ বাবুর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি ভূপতিকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া স্বয়ং তাহার পানাহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। ভূপতি শরীরে বল পাইল।

রামচাঁদ বাবুর বাসায় আরও ৫।৭টী পাঠার্থী ভদ্র-সন্তান থাকে। এই সকলকে রাখিয়া রামচাঁদ বাবুর হিত নাই, কিন্তু দরিদ্র-সন্তানের উপকার করিয়া বিমল আনন্দ ভোগের লোভটী তিনি ছাড়িতে পারেন না, কাযেই ইহারা রামচাঁদ বাবুর নিত্য ক্ষতি করিলে ও তিনি তাহা সহ্য করেন, কিন্তু ছাত্রগণ নিজের ক্ষতি নিজে করিতেছে এরূপ যখন বুঝিতে পারেন, তখন রামচাঁদ বাবু অতি কর্কশ ভাষায় তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। তিরস্কারে তিরস্কারে ছাত্রদের স্বভাব আরও সুন্দর হইয়াছিল, তাহারা সেটাকে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া অসুখোদর্ক সুখ ভোগ করিত।

এই সকল অপদার্থদের সঙ্গে একত্র বাসে এমন কোমল প্রকৃতি, কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান, অনাথ শিশুটী নষ্ট হইয়া যাইবে, অশ্বত্থের বীজ শক্তি হারাইবে ভাবিয়া রামচাঁদ বাবু ভূপতিকে

বাসায় স্থান দিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সে বিতর্কের অনুমোদন করিল না। দুই দিন পরেই তিনি ভূপতিকে বাসায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবার কথা বলিলেন এবং পাঠ্য পুস্তক ও বস্ত্রাদি যাহা প্রয়োজনীয়, তৎ সমুদয় ভূপতিকে দিলেন।

সেখানে ভূপতি যেন সর্ব্ব-কিঙ্কর হইয়া পড়িল, অলস ছাত্রদের ও অন্তঃপুরের অন্যায় আদেশ অম্লান বদনে ভূপতি পালন করিত। তত্রত্য ভৃত্যবর্গও ভূপতির উপর প্রভুত্ব ফলাইত, তাহাও সে সহ্য করিত। এই সমুদয় কার্য্যে ভূপতির অনেক সময় অপব্যয়িত হইয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহা সত্বে ও সে পাঠের অভ্যাসে কদাচ আলস্য করিত না। নিজের কার্য্য ও বাটীস্থ সকলের আজ্ঞাপালনই ভূপতির বাল্য-জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল।

ভূপতি ক্রমে রামচাঁদ বাবুর সংসারের সমুদয় তত্ব অবগত হইল,—বাটীর কর্ত্তার দোষ—তিনি প্রিয়-ভাষী ও মিত-ভাষী নহেন। কর্ত্রী অত্যন্ত মুখরা, নিষ্ঠুরা ও তেজস্বিনী। কর্ত্তা কর্ত্রীতে মতের ঐক্য নাই: কাযেই ভৃত্য ও পোষ্যবর্গ কেহই কাহার ও বাধ্য হইতে পারে না। ছাত্রেরা কর্ত্তার ত্রুটি কর্ত্রীর নিকট এবং কর্ত্রীর দুরুক্তি কর্ত্তার নিকট ব্যক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, তাহা স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিত। কাহারও স্নেহ আকর্ষণ করিবার জন্য যে ছাত্রগণ এরূপ করিত, তাহা নহে, কারণ অন্য আগন্তুক ব্যক্তির নিকটে ও তাহারাই সাংসারিক দুর্নয়ের প্রচার করিত। ভূপতি বুঝিয়াছিল, বুদ্ধির অল্পতা ব্যতীত ছাত্রদের এরূপ গর্হিত আচরণের আর কোন কারণ নাই।

ভূপতি সর্ব্ব-কিঙ্কর, কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না, অন্যায় এবং অনধিকার-চর্চ্চাতে ও সে যোগ দেয় না, এই জন্য নিদ্রালু কলহ-প্রিয় ছাত্রদের সে অচিরেই একটু অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া উঠিল। ভৃত্য-দিগকে কখনও সে নিজের কোন কার্য্য করিতে বলিত না, উপরন্তু কর্ত্রী বা কর্ত্তার দুর্ব্বাক্য ও তাহাদিগকে শুনাইত না, কাযেই তাহারা ভূপতিকে আপন ভাইয়ের মত স্নেহচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণীর সন্তান নাই, মরিয়া গিয়াছে, তাহার উপর স্বামী প্রতিকূল ও কর্কশভাষী, কাযেই তিনি বড় অসুখী, মিষ্ট কথার বড় কাঙ্গাল। ভূপতির মাতৃসম্বোধন তাঁহার সন্তপ্ত প্রাণে সুধাসম স্পৃহনীয় বোধ হইতে লাগিল। কাযেই ভূপতি মা পাইল।

কর্ত্তা বিনয়ীর ভক্ত, অবিনয়ীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তাহার উপর দয়ালু। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই কর্ত্তার স্নেহ ভূপতি আকর্ষণ করিয়াছিল। সর্ব্ব-কিঙ্কর ভূপতি ক্রমে সর্ব্বজন-প্রিয় হইয়া উঠিল।

ভূপতির দুঃখ ও ভবিষ্যচ্চিন্তা দূর হইল, সে এখন সর্ব্বদা পড়িতে পারে। কেহ তাহাকে আর তেমন হুকুম করে না।

চরিত্র, অভ্যাস, অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে ভূপতি বিদ্যালয়ে রত্নের ন্যায় আদর পাইত, শিক্ষকেরা সন্তানের মত স্নেহ করিতেন, সহাধ্যায়ীরা তাহাকে সকলেই অকৃত্রিম সুহৃদ ভাবিত।

বাসার সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূনবয়স্ক ভূপতির পাঠে মতি, দীনতা, বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশীলতার সুফল দেখিয়া, আলস্য-প্রিয় ছাত্রদের চৈতন্যের উদয় হইল, তাহারা উন্নতির পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিল। আন্দোলনই যে কলহানলের ঘৃতাহুতি তাহা তাহারা ভূপতির ব্যবহার দেখিয়া শিক্ষা করিল।

কর্ত্তা ও কর্ত্রীর স্নেহ এক-নিষ্ঠ হওয়াতে উভয়ের মধ্যে পুনঃ সুনয়ের অঙ্কুর দেখা দিল। সংসারের অসুখ-অশান্তি ক্রমে তিরোহিত ভূপতির হইতে লাগিল।

ভূপতি একদিন নূতন পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের ছুটীর সময় তাঁহার দিদিকে দেখিতে গেল। দিদি একমাত্র নিরুদ্দেশ সহোদরকে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার সমুদয় অবস্থা জানিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। নূতন পিতা-মাতাকে মনে মনে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিলেন। স্বামীর অনুমতি ও নব পিতা-মাতার অনুরোধে ভূপতির দিদি তাহার দুইটী পুত্র, একটী কন্যা, স্বামী ও পরিচারক-পরিচারিকাসহ পিতৃগৃহে অনুজের সঙ্গে গমন করিলেন।

নিরপত্য রামচাঁদ বাবু পুত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী পাইয়া বৃদ্ধ বয়সে বড়ই সুখী হইলেন। ভূপতির দিদির সাংসারিক অবস্থা যদিও রামচাঁদ বাবু হইতে অনেক ভাল, তথাপি তিনি স্বামীর চরিত্রের আদর্শে এমনই দীনতায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, ভূপতির পিতামাতা কন্যার চরিত্রগত দেব-ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পরিশেষে আত্মীয়বর্গ ভূপতির বিবাহ-দানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কিন্তু ভূপতি সে সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতে অধ্যয়ন-শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভূপতির অভিমত কার্য্য হইল।

ভূপতি এক দিন দিদি ও পিতা মাতার সন্নিধানে মলিনমুখে বালকের মত আবদার করিয়া একটী জেদ করিল। সে জেদ তাহার একটী দরিদ্র সহাধ্যায়ীর বিবাহ-যোগ্যা এক ভগ্নী আছে, তাহাকে পাত্রস্থা করা। কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে ধনীর সর্ব্বস্বান্ত হয়, দরিদ্র যে কি বিপদে পড়ে, তাহা সকলেই বুঝিলেন। আর তাঁহারা ভূপতির কথার অর্থ অন্য রূপ বুঝিয়া সে কন্যা দেখিয়া আসিলেন। তাহার রূপ-লাবণ্যই ভূপতির আত্মীয়বর্গকে বশীভূত করিয়াছিল, তাহার উপর ভূপতির অনুরোধ। সুতরাং অতি আনন্দের সহিত ইঁহারা সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভূপতি পুনরায় সে কথা বলিলে সকলেই ভূপতির অধ্যয়ন-শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার কথা উল্লেখ করিলেন। ভূপতি ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া জানাইল যে, আমার সেই ভগ্নীটীর বিবাহ আগে হইয়া যাক, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া আমি বিবাহ করিব।

অনন্তর আত্মীয়বর্গের ভ্রম দূর হইল। ভূপতির দিদিই সে কন্যাটীর বিবাহের সমুদয় ব্যয়-ভার বহন করিলেন।

অনন্তর ভূপতি অধ্যয়ন শেষ করিয়া রামচাঁদ বাবুর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

ভূপতিকে কৃত-বিদ্য ও কৃত-দার দেখিয়া রামচাঁদ বাবু সমস্ত সম্পত্তি ও সাংসারিক

কার্য্যাদি পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর দিয়া সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিলেন।

ভূপতির পালক পিতা রামচাঁদ বাবুর যে আয় ছিল, তাহা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা অন্য কোন ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং আয়-বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভূপতি চাকরীর প্রতি অনুরাগী ছিলেন না, তাঁহার বিশ্বাস ছিল ন্যায়-পথে থাকিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন ব্যবসায়ে আত্ম-নির্ভর করিতে পারিলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় অর্থও অন্ততঃ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। তাই তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ব্যবসায়ের মধ্যে তাঁহার অভিসন্ধি এই ছিল যে, নিজে দশ টাকা লাভ করিবেন প্রকাশ্যে, আর দেশের লোকের উপকার করিবেন অপ্রকাশ্যে। তাই তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেশজাত খাদ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন।

কিছু মূলধন লইয়া ধান্যের সময় ধান্য, রবিশস্যের সময় রবিশস্য সুবিধা দরে খরিদ করেন, আর যে সময় দর বৃদ্ধি হয়, সেই সময় সে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করেন, কিন্তু যে সকল বণিক্ বিদেশে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া ব্যবসায় করে, তাহাদিগের নিকট ভূপতি কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতেন না। ভূপতির দীনতা-পূর্ণ উদার ব্যবহারে দেশস্থ সমস্ত কৃষকই তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িল। ভূপতি যাহা ক্রয় করিয়া থাকেন, এমন কোন দ্রব্য ভূপতি ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট কৃষকগণ বিক্রয় করিত না। দেশীয় কৃষক বর্গের এইরূপ অনুরাগ-ভাজন হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অনেক চিন্তা ও শ্রমের সঙ্গে ত্যাগস্বীকার, সদ্বুদ্ধিশালিতা, অধ্যবসায়, কামলোভাদি দলন প্রভৃতি থাকিলে তপস্যার ফলের ন্যায় বহুকাল পরে জন-সাধারণের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারা যায়। সেবায় দেবতার তুষ্টি হয় দেবত্ব সম্পন্ন মনুষ্যও তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যে সকল মনুষ্য দেবত্বে বঞ্চিত, তাহারা যে কখন কিসে তুষ্ট হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা করার ন্যায় কঠিন ব্যাপার জন-পরিচর্য্যায় দ্বিতীয় নাই। ভূপতির পার্থিব সম্পদ শৈশবে অন্তর্হিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহার স্বর্গীয় সম্পদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মনুষ্য সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই যে ব্যক্তিবিশেষের সেবায় বীত-স্পৃহ হইয়াছিল। যে বিষয়ে যাহার শক্তি, তাহার সেই দিকেই প্রবৃত্তির উদয় হয়। এই জন্য সাধুগণ নিজের অন্তঃকরণকে সর্ব্বাগ্রে বশীভূত করেন, এবং সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গমন করেন না।

ভূপতির মনে নিজের অবস্থা সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিত, তাই তিনি পদ-গৌরবও অর্থ-গৌরবকে তুচ্ছ করিয়া লোক-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে কৃষকের গৃহে গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগকে মিষ্ট অথচ হিতবাক্যে তুষ্ট করিয়া বাধ্য করিতেন। দরিদ্র কৃষককে অগ্রিম অর্থ সাহায্য করিয়া বশীভূত করিতেন। গ্রামের মধ্যে যিনি দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রম-শীলতা ও পরোপকারে অগ্রণী, তাঁহার প্রতি সেই গ্রামজাত শস্য-ক্রয়ের ভার সহ আংশিক লাভ দিয়া কার্য্য সাধন করিতেন। এইরূপ পাঁচ গ্রামের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য এক

জন তদপেক্ষা উপযুক্ত লোকের উপর ভার দিতেন। পঞ্চগ্রামীর উপর কর্ত্তৃত্বের ভার আংশিক লাভ সহ অন্যকে দিতেন এবং নিজেও আংশিক লাভে নিযুক্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী বর্গের সহিত অবিরত পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার উপর কর্ম্মচারীবর্গের কৃতকার্য্যতার পুরস্কারের জন্য একটা লভ্যাংশ স্বতন্ত্র থাকিত, যিনি ভাল কর্ম্ম করিতেন, উচ্চ প্রশংসার সহিত স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশের অতিরিক্ত পুরস্কার তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যোগ্যতা প্রদর্শনের চেষ্টা সকলেরই ছিল। এই প্রণালীতে অতি বিস্তৃত দেশীয় ব্যবসায়ের পত্তন করিয়া ভূপতি দেশীয় ধনিবৃন্দের ও দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। বিদেশীয়ের গৃহে অল্প আয়ে দেশীয়ের টাকা আর গচ্ছিত থাকিত না, ভূপতির কারবারে অধিক আয়ের লোভে সকলেই টাকা দিতে আরম্ভ করিলেন। মূলধনের প্রাচুর্য্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। ক্রমে ভূপতির কারবার এত বিস্তৃত, বিশ্বস্ত ও ফলপ্রদ হইয়া উঠিল যে, রামচাঁদ বাবু সকল তীর্থেই ভূপতির সুনাম শুনিতে লাগিলেন।

তিন চারি বৎসর পর রামচাঁদ বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন—ভূপতির অধীনে সহস্র সহস্র লোক খাটিতেছে, এবং তাহার ঐশ্বর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু ভূপতি সেই নিরহঙ্কার, অনলস, পরিশ্রমী ও দয়ালুই রহিয়াছে। বিদেশে আর দেশজাত সর্ব্ব-লোক-প্রয়োজনীয় কোন বস্তু যাইতে পারে না, বিদেশীব বনিকেরা নানা কৌশলে ভূপতির প্রবর্ত্তিত একতার বিরুদ্ধে দাণ্ডায়মান হইয়া ও অকৃত কার্য্য হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে। ভূপতি দেশীয়দিগের অন্নকষ্ট ও আত্মবিচ্ছেদ বিদূরিত করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার দর্শনে রামচাঁদ বাবু যে বৃদ্ধবয়সে কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ভূপতিকে কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত।

সাহিত্য-প্রবেশ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

১৩৩ সূত্রে কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে। সে গুলির মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নক্তং, মৃষা, হন্ত, নো, তু, হি, চ, হ, ইব, বিহায়সা অব্যয়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। অন্তর, প্রাতর্ ও দিবা শব্দকে বাঙ্গালা ব্যাকরণে অব্যয়ের মধ্যে গ্রহণ করা উচিত নয়। কখন কখন এই তিনটি শব্দে বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে।

১৪২ সূত্রে আছে, "আত্ম-নিন্দা সূচিত হইলে 'ও' অব্যয়ের প্রয়োজন হয়"। দৃষ্টান্তস্থলে লিখিত হইয়াছে, "আমি যখন পতিপ্রাণা কামিনীরে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়া ও পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস আর কে আছে? এ স্থলে আত্ম-নিন্দা সূচিত হইতেছে"। যেখানে প্রলোভনের বিবধ সামগ্রী থাকিলে

ও আমি বৈরাগ্য বশতঃ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই, সেখানেও কি আত্ম-নিন্দা সূচিত হইতেছে ?

১৯০ সূত্র—সম্রাট্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। এই ব্যবস্থাটি না করাই উচিত। ভিক্‌টোরিয়া ভারত-বর্ষের সম্রাট্, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় এইরূপ প্রয়োগ বিশুদ্ধ ব্যাকরণানুমোদিত হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ প্রয়োগে অসু-বিধা আছে। যে ভিক্‌টোরিয়া স্ত্রী কি পুরুষ না জানে, সে সম্রাট্ পদটী দেখিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে না। সংরাজন্ শব্দ বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয় না, এই হেতু সম্রাট্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী শব্দের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এ ব্যবস্থা সংস্কৃত-ব্যাকরণের বিরোধিনী হইলই বা।

১৯৪ সূত্র—কোন কালে ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন, তৎকালে ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি প্রয়ো-গের প্রয়োজন ছিল, এখন আর ক্ষত্রিয়ী ও ক্ষত্রিয়া শব্দের কোন বিভিন্নতা করা উচিত হয় না। ক্ষত্রিয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষত্রিয়াণী ক্ষত্রিয়া ও ক্ষত্রিয়ী হইতে পারে, এমন বিধি-দান উচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুচিত পদানুসরণ উচিত নহে।

২০৩ সূত্র—যজ্ঞের ফল-ভাগিত্ব বুঝাইলে পতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পত্নী হয়। উদাহরণ-স্থলে বশিষ্ঠপত্নী শব্দের অর্থ বশিষ্ঠানুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলভাগিনী লিখিত হইয়াছে। টিণ্ডাল পত্নী শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। টিণ্ডাল কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন ? গৃহমেধ যজ্ঞের ফলভাগিনী, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। পতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পত্নী হয়, এইরূপ সরল ব্যবস্থা হওয়াই উচিত।

২৪০ সূত্র—সংপ্রদান কারক স্বীকার না করিলে কোন হানি নাই। যাহাকে দান করা যায়, তাহাকে কর্ম্মকারকের মধ্যে ধরিলে বোধ হয় তাহার কোন ক্ষতি হয় না। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত, প্রবন্ধের বিদ্যারত্নের ব্যাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বিশুদ্ধ। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ সর্ব্বাংশে একরূপ হইতে পারে না। পাচক-স্ত্রী ও পাচিকা স্ত্রী শব্দদ্বয় বাঙ্গালা ভাষায় এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। পাচকস্ত্রী বলিলে লোকে পাচকের স্ত্রী বুঝিয়া থাকে। অতএব ৩০৬ সূত্রটী ব্যাকরণ হইতে তুলিয়া দেওয়া উচিত। ভাষার কোন হানি না জন্মাইয়া ব্যাকরণের সুগমতা সাধন করার চেষ্টা অবশ্যই নিন্দার বিষয় নয়।

৩০৯ সূত্রের টীকায় বৈয়াকরণব্যাঘ্র ও নাড়ীজ্ঞানশূন্য লেখক শব্দ বসাইয়া লেখক আপনার গাম্ভীর্য্য-হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। উণাদি সূত্রের টীকা গুলি উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লেখকের বিশ্বাস বোধ হয় এইরূপ যে, তিনি এমন কতকগুলি কথা ব্যাকরণে বসাইতেছেন, যাহা প্রায় কেহ জানেন না। এরূপ সংস্কার না থাকিলে তিনি অত প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন না। তিনি আপনার ব্যাকরণের প্রশংসা প্রথমেই করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে কাহার ও সন্দেহ নাই, তবে কেন পাণ্ডিত্য-খ্যাপনের অত চেষ্টা !!

তরু-রোপকেরা কোন্ সময় হইতে তরুরোপণ দ্বারা নরক-পার হওয়ার আশা করিয়া আসিতেছে ? উক্ত আশা বৈদিক কালে ছিল কি না ? বৈদিক-সাহিত্যে তরু শব্দের প্রয়োগ আছে কি না ? এ সকল মীমাংসা করিয়া তরু শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখা উচিত। পরীক্ষাকালে উণাদি সূত্রের প্রশ্ন কোন সময়ে ঢাকা বিভাগের প্রশ্ন-পত্র উৎপীড়িত করিত কি না, তাহা জানি না ; এখন তো উণাদি সূত্রের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না। বিদ্যারত্ন মহাশয় উণাদি সূত্র উঠাইয়া দিতে পারেন।

ব্যাকরণখানি ভাল বলিয়া এত কথা বলিলাম। অন্য কোন ব্যাকরণ ইহার সদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। ইতি।

শ্রীঃ

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ | মাঘ, ১৩০২ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব।

(১)

জ্ঞান-লাভ যে শিক্ষার ফল; মানব মাত্রেরই যে জ্ঞান-লাভ সুতরাং শিক্ষার প্রয়োজন আছে; স্ত্রীজাতিকে সে উদ্দেশ্য-সাধন হইতে বঞ্চিত রাখিবার অধিকার যে কাহারও নাই; শিক্ষা, শক্তি এবং অধিকার যে পরস্পর সাপেক্ষ, আর ইহাদের একের উন্নতি হইলে যে অপর দ্বয়ের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক—সর্ব্ব বিষয়েই অংশ-বিশেষে পুরুষের সঙ্গে রমণীর প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও মোটের উপরে উভয়েই যে পরস্পর তুল্য—সমাজের উন্নতি-সোপানারোহণে দক্ষিণপদ এবং বামপদ মাত্র; প্রস্তাবান্তরে এ সকল কথার যথা-সাধ্য আলোচনা হইয়াছে। সময়ান্তরে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় এবং প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে, উক্ত প্রবন্ধে এরূপ প্রতিজ্ঞাও ছিল, কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারা যায় নাই। তাই এই গুরুতর বিষয়ে আজ কিছু আলোচনা করিতে অভিলাষ।

স্ত্রীশিক্ষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সংপ্রতি একটি বিশেষ প্রয়োজনও উপস্থিত। বিগত বর্ষাকালে শিলংনগরে আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি শিক্ষা-সমিতি আহূত হইয়াছিল, সেই সমিতিতে লেখককে শ্রীহট্ট-সম্মিলনীর প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে হয়। সম্মিলনীর বর্ত্তমান প্রধান আলোচ্য বিষয় স্ত্রী-শিক্ষা; সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন সমিতিতে উঠিয়াছিল, সে সমস্তই সম্মিলনীর প্রতি-নিধিকে উপস্থিত করিতে হয়। শ্রীহট্টে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীহট্ট-সম্মিলনীই মুখ-পাত্র; সুতরাং সেই শ্রীহট্ট-সম্মিলনীর প্রতিনিধিত্ব করিবার সম্মান যিনি উপভোগ করিলেন, তাঁহার যোগ্যতা-সম্বন্ধে যতদূর ত্রুটিই থাকুক না কেন, স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীহট্ট-

সম্মিলনীর আদর্শ কি—অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁহার নিজের মতামত কি, এ প্রশ্ন করিতে সাধারণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আর তাহার একটা উত্তর দিতে তিনিও বাধ্য। ইতি মধ্যেই কেহ কেহ যে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, এমনও নহে। এই প্রবন্ধে লেখকের আত্ম-মত-প্রকটনের যথাসাধ্য চেষ্টা হইবে।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে শ্রীহট্টে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইবার আর একটি গুরুতর প্রয়োজন অনুভব করা যাইতেছে। ছাত্রদিগের যত্নে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধানতঃ ছাত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত হইলেও শ্রীহট্ট-সম্মিলনী এখন ছাত্রদিগের সভা নহে। শ্রীহট্টের গণ্য মান্য এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক অনেকেই ইহার সভ্য; বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত জন-হিতৈষী অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার শুভানুধ্যায়ী; দেশীয় এবং বিদেশীয় অনেক উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ইহার সাহায্যকারী; এবং সর্ব্বোপরি আসাম প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা ইঁহার পরিপোষক। যে স্থানে সম্মিলনীর দুই এক জন সভ্য, অথবা সম্মিলনীর নির্দ্ধারিত পাঠ্যের দুই একজন পরীক্ষার্থিনী নাই, এমন সুপরিচিত ভদ্র-পল্লী শ্রীহট্টে অতি অল্পই আছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহার খাতিরও নিতান্ত সামান্য নহে—শিক্ষা-সমিতিতে প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য আহ্বানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিছু দিন পূর্ব্বে আসামের শিক্ষা-বিভাগীয় জনৈক শ্রদ্ধেয় উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী এমনও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, শ্রীহট্ট-সম্মিলনী যদি প্রাদেশিক স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত ভার লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসহ সে সমস্ত ভার তাঁহাদিগের হস্তে অর্পন করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত আছেন। যদিও নানা কারণে সম্মিলনী এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, এবং কখনও সম্মত হইবেন বলিয়াও বোধ হয় না, তথাপি গবর্ণমেণ্ট যে সম্মিলনীকে কতদূর শ্রদ্ধা করেন, এবং সম্মিলনী কর্ত্তৃক গুরুতর কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে কতদূর বিশ্বাস করেন, এই প্রস্তাবেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এই যখন অবস্থা—শ্রীহট্ট-সম্মিলনী যখন এই ভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট খাতির এবং অনুগ্রহ পাইয়া ক্রমে আপনার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছে, যখন বৎসরের পর বৎসর উচ্চ এবং উচ্চতর সংখ্যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর পরীক্ষার্থিনীগণ সম্মিলনীর নির্দ্ধারিত পাঠ্যে পরীক্ষা দিয়া শ্রীহট্টের পল্লীগ্রামস্থ ভোজনালয়ে এবং শয়নালয়ে বিদ্যার উজ্জ্বল প্রদীপ প্রবর্ত্তিত করিতেছে, তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত বিষয় এবং প্রণালী যে কি, সে বিষয়ের আলোচনা এবং মীমাংসা হওয়া উচিত,—অন্ততঃ সে বিষয়ে একটা চেষ্টা হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। শ্রীহট্টে স্ত্রীশিক্ষা এখন একটা জাতীয় অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার সুপরিচালন এবং কুপরিচালনের উপর জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি নির্ভর করিতেছে; সুতরাং যাহাতে এই স্ত্রীশিক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শে সুপরিচালিত হইয়া জাতীয় সৌভাগ্য প্রসব করিতে পারে,—যাহাতে

এই স্ত্রীশিক্ষা জাতীয় উন্নতি-পথে ক্রমোজ্জ্বল দীপ-শিখাবৎ পথ-প্রদর্শক হইয়া এই দীন পতিত জাতিকে মানবীয় চরমোৎকর্ষের দিকে অগ্রসর করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন এবং সহায়তা করা চিন্তাশীল এবং শক্তিশালী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

কি স্থিতিশীল কি উন্নতিশীল, সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই এ বিষয়ে সমান স্বার্থ, সুতরাং বিষয়টা সকলেরই চিন্তনীয়। স্থিতিশীল ব্যক্তি যদি মনে করিয়া থাকেন, তাঁহার নিজের স্ত্রী-কন্যাকে ত তিনি লেখা-পড়া শিখাইতেছেন না, সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা সুপরিচালিত হউক আর কুপরিচালিত হউক, ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত ভুল বুঝিয়াছেন। পাড়ায় আগুন লাগিলে নিজের খড়ের ঘর খানি নিরাপদ মনে করা যেমন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, সেইরূপ জাতীয় ভাবে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে তাহার সঙ্গে নিজের বা নিজ পরিবারের কোন সংস্রব নাই বলিয়া মনে করাও সুবিবেচকের কার্য্য নহে। স্ত্রীশিক্ষা যদি প্রকৃতই অনিষ্টকারী হয়, তাহার হেতু প্রদর্শন কর, তাহার যুক্তি প্রদর্শন কর, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর, তাহার অনিষ্টকারিতা স্বদেশবাসীকে বুঝাও,—তোমার স্বদেশবাসী এমন নির্ব্বোধ নহে যে, যুক্তি-দ্বারা একটা বিষয়ের অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করিলেও তাহারা অন্ধভাবে তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া আপনার অমঙ্গল আপনি আহ্বান করিবে।

বাস্তবিক সুশিক্ষায় মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই, কিন্তু কুশিক্ষার প্রচুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। যাহার যে বিষয়ে যে ভাবে শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহাকে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়াই সুশিক্ষা, তদ্বিপরীত হইলেই তাহাকে কুশিক্ষা বলা যায়। যাহাকে দুই দিন পরে একটী রাজ্য শাসন করিতে হইবে, সে যদি রাজ-নীতি ছাড়িয়া হল-চালনা প্রভৃতি কৃষকের বিদ্যা শিখিতে থাকে, তবে তাহার সে শিক্ষাকে যেমন কুশিক্ষা বলিব, কৃষকের সন্তান যদি হল-চালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া রাজোচিত ব্যবহার এবং রাজ-নীতি শিক্ষা করিতে থাকে, তবে তাহার সেই শিক্ষাকেও কুশিক্ষা বলিব। ভাবী জীবনের দিকে, প্রকৃত সংসারের দিকে, অবশ্যম্ভাবী কার্য্য-ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, ঘোর জীবন-সংগ্রামে যে শিক্ষা কোন কাযে লাগে না, বরং যে শিক্ষা পদে পদে অমঙ্গল এবং বিঘ্ন-বিপত্তি আনয়ন করে, তাহাকে কখনই সুশিক্ষা বলা যাইতে পারে না। সুখ এবং উন্নতি যেমন সুশিক্ষার, দুঃখ এবং অবনতি সেইরূপ কুশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল। সুতরাং কুশিক্ষার নিবারণ এবং সুশিক্ষার প্রবর্ত্তনে যত্ন করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীহট্টে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এখনও ইহা তেমন বিস্তৃতি লাভ করে নাই,—এখনও ইহা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এখনও ইহা জাতীয় চরিত্র-গঠনের শক্তি এবং অবসর পায় নাই; সুতরাং শ্রীহট্ট বাসীর পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য উপলব্ধি

করিবার, স্ত্রীশিক্ষার বিষয় নির্দেশ করিবার, এবং তাহার প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। স্ত্রীশিক্ষার গতি-রোধ লেখকের বিবেচনায় প্রার্থনীয় নহে, সম্ভাবনীয়ও নহে; সুতরাং যাহাতে তাহা সুপরিচালিত এবং সুব্যবস্থিত হইয়া জাতীয়তা-সংরক্ষণে, জাতীয় উন্নতি-বিধানে এবং জাতীয় মহত্ত্ব-সমুৎপাদনে সমর্থ হয়, সুবিজ্ঞ সামাজিক মহোদয়দিগের সে বিষয়ে চিন্তা এবং চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য-বিহীন যে কার্য্য, সে কার্য্যই নহে, সে অকার্য্য—অথবা তেমন কার্য্য অসম্ভব। যাহারা তাস পাশা খেলিয়া বিফলে সময় কাটায়, তাহাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য সময়-সংহার—সময়-সংহার এবং জীবন-সংহার যে এক, আলস্য এবং আত্ম-হত্যায় যে কোন প্রভেদ নাই, একথা ধারণা করিতে না পারিলেও আর তাহারা উদ্দেশ্য-বিহীন নহে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পাগল বা শিশু বিনা উদ্দেশ্যেই কায করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে;—তাহার উদ্দেশ্যে দূরতা নাই, স্থিরতা নাই, সমীচীনতা নাই, এই মাত্র।

উদ্দেশ্যের বিপরীত যে কার্য্য, তাহাই কুকার্য্য। সুখের উদ্দেশ্যে নির্ব্বোধেরা মদ খায়, গাঁজা খায়; চুরী করে, ডাকাতী করে; কিন্তু এই সকল কার্য্য সুখের বিরোধী, এই সকল কার্য্যে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ উৎপন্ন হয়, এইজন্য এই সকল কার্য্য কুকার্য্য। সুখের সঙ্গে দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়-পরতা এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যাহারা বুঝিতে পারে না, সচরাচর তাহারাই এ সকল কুকার্য্য করে। যাহারা বুঝিয়া সুঝিয়া, অপকারিতা জানিয়া শুনিয়াও এ সকল কার্য্য করে, তাহাদের এগুলিও কুকার্য্য—বরং জ্ঞানকৃত কুকার্য্যে অপরাধের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক।

যে উদ্দেশ্য যত গুরুতর, তাহার সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানে তত অধিক চিন্তা, যত্ন এবং শক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন। এক সের ওজনের একটা জিনিস স্থানান্তরিত করিতে একটা বালকেও পারে; কিন্তু শতমণ একটা বস্তু স্থানান্তরিত করিতে হইলে দড়ি চাই, গাড়ী চাই, হাতী চাই, কত কল-কৌশল চাই। একটা পক্ষি-শাবক পুষিতে হইলে তাহাকে দিনান্তে দুইটী দানা আর একটু জল দিলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু পোষার মতন করিয়া একটী মানব-শিশু পুষিতে গেলে সে জন্য ধাত্রী চাই, ভৃত্য চাই, শিক্ষক চাই, বিদ্যালয় চাই, পুস্তক চাই, কাগজ কলম চাই, কত টাকা পয়সা চাই, কত বিধান-ব্যবস্থা চাই। এইরূপ সকল কার্য্যেই দেখিতে পাইবেন, উদ্দেশ্য যত উচ্চ, যত মহৎ, যত স্থায়ী এবং যত দূর-ব্যাপী, তাহার সাধনোপযোগী অনুষ্ঠান ও তত কঠিন, সুতরাং সমধিক যত্নসাপেক্ষ।

স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যটা কি, মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয় কেন, একথাটা একবার বিশেষরূপে ভাবিয়া না দেখিলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবার

সম্ভাবনা নাই। কবি হৃদয়ের শোণিতাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

"তোরা না জাগিলে ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

কিন্তু তাঁহার এই প্রাণ-চেরা কথার ভিতরে কি আছে, তাহা কয়জনে বুঝে, আর কয় জনে ভাবে? গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়, নগরে নগরে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও যে পর্য্যন্ত ভারতের রমণীগণ প্রবুদ্ধ না হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত যে ভারতের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই, এ ক্ষুদ্র সহজ কথাটার গভীর মর্ম্ম কত জনের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে?

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, স্ত্রীশিক্ষা যে সমুচিত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না, স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণের হৃদয়ঙ্গম না হওয়াই তাহার কারণ। নতুবা প্রকৃত হিত বুঝিতে পারিলে তাহার বিপরীত পথে চলে, মানুষ এমন নির্ব্বোধ নহে,—মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও তাহার পথে প্রত্যহ উপস্থিত করে, মানব-সমাজ এমন মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত নহে।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল স্ত্রীদিগকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাবু গোছের করা, আর উপন্যাস পড়িতে, চিঠিপত্র লিখিতে এবং নানাবিধ রঙ্গে বিরসে গল্প করিতে মজবুত করা। বাস্তবিক বর্ত্তমান শিক্ষায় ইহার অধিক উৎকৃষ্টতর ফল ফলিতেছে না, সুতরাং যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার ফলের দিকে লক্ষ্য রাখেন, বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের এরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বাস্তবিক কি স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর নহে? এই অপকৃষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনের বলেই কি ভারত-রমণী ভারতকে জাগাইবেন? এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কি জগতের বড় বড় মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, মানবের ব্যক্তিগত উন্নতি-অবনতি এবং জাতিগত উত্থান-পতন রমণীর হাতে? বাস্তবিক কথাটা একবার বিশেষরূপে স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখা সকলেরই উচিত। শ্রীহট্টবাসী এবং শ্রীহট্ট সম্মিলনী আজ আমার বক্তব্যের কেবল উপলক্ষ মাত্র; কিন্তু এই উপলক্ষে আজ আমি সমগ্র বঙ্গবাসীকে, সমগ্র ভারতবাসীকে সানুনয় করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সকলেই একবারে নিবিষ্টচিত্তে গভীর ভাবে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখুন। কেননা, এই স্ত্রীশিক্ষার উপরেই ভারতের জাতীয় ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, এই স্ত্রীশিক্ষাই ভারতের জাতীয় জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য অবধারণ করিবার সময়ে অনেক গল্প, অনেক স্মৃতি, অনেক দৃষ্টান্ত মন হইতে দূর করিয়া দিয়া তবে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিতে হইবে। যদি তাহা না করেন, অনেক প্রতিকূল কথা মনে আসিয়া চিন্তার বিঘ্ন ঘটাইবে,—হয়ত ধৈর্য্যের সহিত নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিতেই দিবে না।

আমাদের স্বভাব এই—সকলের ন্যা

হইলেও অনেকেরই অভ্যাস এই, আমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে আগেই তাহার দুষ্ট, বিকৃত, কুৎসিত অংশটি আসিয়া আমাদের মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং সহস্রগুণ থাকিলেও তাহা ঢাকিয়া রাখিয়া দেয়। স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই ব্যক্তিগত দোষ, ব্যক্তিগত ভ্রম, ব্যক্তিগত ত্রুটি এবং ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাই আগে আসিয়া আমাদের মনে উদিত হয়। কোথায় কোন্ স্ত্রীলোকটি লেখা পড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অরক্ষিত অবস্থায় প্রবল প্রবৃত্তির স্রোতে পড়িয়া অধঃপাতে গিয়াছে; কোথায় কে লেখা পড়া শিখিয়াই মাতৃবধে উদ্যত হইয়াছে—আপন জাতি, আপন ধর্ম্ম, এবং আপন সমাজকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য শাণিত অসি উত্তোলন করিয়াছে; কোথায় কোন্ যুবতী লেখা পড়া শিখিয়া শ্বশুরের অবাধ্য হইয়াছে, শাশুড়ীর সঙ্গে কোন্দল করিয়াছে, গৃহ-কার্য্য উপেক্ষা করিয়া কেবল নাটক-নবন্যাস পড়িয়াই দিন অতিবাহিত করিয়া দিতেছে, আর ভাল বস্ত্র, ভাল অলঙ্কার, ভাল সুগন্ধি গোলাপী নারিকেল তৈল পাইল না বলিয়া নিরন্ন স্বামীর পূজায় ঝাঁটার ব্যবস্থা করিতেছে;—স্ত্রীশিক্ষার প্রস্তাব উঠিলে এই সকল দৃষ্টান্তই আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু কত শিক্ষিতা রমণীর গুণে যে মানব-গৃহে স্বর্গীয় দৃশ্যের অভিনয় হয়, কত গৃহের শিক্ষিতা গৃহ-লক্ষ্মী যে নিজের স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সদাচার, সংযম, স্বার্থ-ত্যাগ এবং পাতিব্রত্য দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে সীতা-সাবিত্রীর কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, কত শাশুড়ী যে শিক্ষিতা পুত্র-বধূর গুণে মুগ্ধ হইয়া আপনার পুত্র-কন্যার উপরে পর্য্যন্ত স্নেহের টান শিথিল করিয়া দিতেছেন, সে সকল কথা আমাদের মনে উপস্থিত হয় কি? নিন্দার কথা যেমন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, রসনায় রসনায় নাচিয়া বেড়ায়, প্রশংসার কথা তেমন করিয়া বেড়াইতে পায় কি? একটুকু দুর্গন্ধ নাকে লাগিলেই আমাদিগকে যেমন অস্থির করিয়া তুলে—যতটা অসুখ দেয়, সহস্র সুগন্ধ আমাদিগকে সেই পরিমাণে সুখ দিতে পারে কি? বরং অনেক সময়ে নাকে যে সকল সুগন্ধ উপস্থিত হয়, মনে তাহাদের অনেকেরই খবর পর্য্যন্ত পৌঁছে না। ফল কথা, স্ত্রী-শিক্ষার কুফলের সংবাদ আমরা যতটা রাখি, সুফলের সংবাদ ততটা রাখি না বা পাই না;—কুফলের সংবাদ নির্লজ্জ গণিকার ন্যায় পথে ঘাটে স্বৈরগতিতে বেড়ায়, কিন্তু সুফলের সংবাদ কুসুম-কোরকের ন্যায় আপনাকে আপনার আবরণেই ঢাকিয়া রাখে, লজ্জাশীলা হিন্দু-রমণীর ন্যায় অন্তঃপুরস্থ গৃহ-প্রাচীরের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে।

শিক্ষারগুণে মানব-সমাজ দেব-সমাজের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে বটে, কিন্তু শিক্ষা পাইলে মানবমাত্রেই যে দেবত্ব লাভ করিবে, একথা স্বীকার করি না; কেন না, মানবের ইতিহাসে কিম্বা নিজের অভিজ্ঞতায় তাহার প্রমাণ পাই না। পণ্ডিতেরা চিরদিনই মানব সমাজকে জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিতেছেন,—চিরদিনই তাঁহারা পৃথিবীকে স্বর্গের দিকে অগ্রসর করিতে-

ছেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন দিন যে অধঃপতন ঘটে নাই, এ কথা বলিতে পারি না। ইউরোপের যে মহাপণ্ডিত তদানীন্তন পাশ্চাত্য-সমাজে অপরিজ্ঞাত সমারোহ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ইউরোপীয় ন্যায়-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ আরিষ্টটল্‌কে বহুশতাব্দ-ব্যাপী একাধিপত্যের পর সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন, এবং ইউরোপের চিন্তা-শক্তিকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া অভিনব স্বাধীন জীবন্ত বিজ্ঞানের পথে প্রবাহিত করিয়াছেন, বলিতে লজ্জা হয়, সেই মহাপণ্ডিতও ঘৃণিত উৎকোচ-গ্রহণ দ্বারা হস্তকে অপবিত্র করিয়াছিলেন, জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে রাজকীয় উচ্চপদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইউরোপে শিক্ষার স্রোতঃ বন্ধ হইয়াছে, না এক পণ্ডিতের অধঃপতন দেখিয়া আর কেহ পণ্ডিত হইতেছে না? বরং ইহাই কি সত্য নহে যে, ক্রমোন্নত শিক্ষার বলেই ক্ষুদ্র ইউরোপ সমস্ত পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করিতেছে? বরং ইহাই কি সত্য নহে যে, নৈতিক অধঃপতনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সেই কলঙ্কিত পণ্ডিতেরই প্রদর্শিত অভিনব প্রণালী এবং 'নবম্ অর্গেনম্' নামক গ্রন্থের সমাদর দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে?

বাস্তবিক ব্যক্তি-বিশেষের অধঃপতনে শ্রেণী-বিশেষ অধঃপতিত হয় না, ব্যক্তি-বিশেষের দোষে শ্রেণী-বিশেষ অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আজ যে সকল পুরুষ-পুঙ্গব তারস্বরে স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের জ্ঞান-লাভের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন হইত! অনুসন্ধান করিলে চুরি, জোয়াচুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কদাচার, ব্যভিচার, এ সকল অপরাধ শিক্ষিত পুরুষের চরিত্রে পাওয়া যায় না কি? সংবাদ-পত্র এবং আইন আদালতের বিবরণ যাঁহারা পড়িয়া থাকেন, একথা আমি তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি।

এস্থলে আমার একথার উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, পুরুষ যদি অপরাধ করিতেছে, তবে স্ত্রীও অপরাধ করুক। অতিমাত্রায় অগ্রসর কোন কোন সংস্কারকের যুক্তি এই প্রণালীরই বটে। দৃষ্টান্ত যথা, বিপত্নীক পুরুষ যদি একটা বিবাহ করে, তবে বিধবা রমণী যতটা ইচ্ছা ততটা করিতে পারিবে না কেন? ইহাঁদের অনেক যুক্তি এই শ্রেণীর। কিন্তু এই প্রকার যুক্তির অনুসরণ করিলে যে সকল অসঙ্গত উপপত্তিতে উপনীত হইতে হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যুক্তির এই প্রণালী ধরিয়া চলিলে রমণী অনায়াসে পুরুষকে বলিতে পারেন, "তুমি যদি মিথ্যা কথা বল, তবে আমিও মিথ্যা কথা বলিব; তুমি যদি চুরি কর, তবে আমি চুরি করিব ডাকাতী করিব; তুমি যদি মদ খাও, তবে আমি মদ খাইব, গাঁজা খাইব, আফিং খাইব।" এখন বলুন দেখি, পুরুষের অপরাধ ক্ষমা না করিয়া, পথ-ভ্রান্ত পুরুষকে প্রকৃত পথে না আনিয়া, রমণী যদি এই

তারে পুরুষের কুকার্য্যের প্রতিশোধ লইতে থাকেন, তবে এ অধঃপতিত জাতির দশা কি হইবে? আমরা—পুরুষেরা ত অনেক দিন হইল জাতিত্ব হারাইয়াছি, মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এখনও আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাতিত্ব এবং মনুষ্যত্ব যাহা কিছু আছে, তাহা এই অন্তঃপুর-চারিণী, মাতৃরূপিণী এবং শক্তি-রূপিণী রমণীর হাতেই আছে; সেই রমণীকে যদি প্রতিশোধের উত্তেজনায় ক্ষেপাইয়া তুল, তবে আর কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? স্বয়ং চিকিৎসকের শরীরে যদি রোগের ছটফটী ধরাইয়া দেও, তবে আর কে চিকিৎসা করিবে? যে সর্ষপ ভূত ছাড়াইবে, তাহাতে ভূত লাগাইয়া দিলে ভূত ছাড়াইবে কিসে? জলের গায়ে অগ্নি-সংযোগ করিলে প্রদীপ্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে কি দিয়া? এই জন্য যে যুক্তি ক্ষমার পরিবর্ত্তে রমণীর হৃদয়ে প্রতিশোধের অগ্নি উদ্দীপিত করে, আমি তাহাকে মনে স্থান দিতে পারি না। এস্থলে শিক্ষিত পুরুষের অপরাধের উল্লেখ করিয়া রমণী-হৃদয়ে প্রতিশোধ উত্তেজিত করা আমার অভিপ্রেত নহে; আমার এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই দেবত্ব লাভ করে না, শিক্ষিত-সমাজেও অপরাধীর একটা সংখ্যা থাকিয়াই যায়। তথাপি পুরুষের শিক্ষায় আমাদের যত্ন আছে; কেননা, আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষার গতি উন্নতির দিকে—দুই এক স্থলে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও মোটের উপর শিক্ষার গুণে মানুষ ভালই হয়। পুরুষের বেলায় যাহা করি, রমণীর বেলায় তাহা করিনা কেন? মোটের উপর শিক্ষার গুণে পুরুষ ভাল হয়, এ কথা যদি বিশ্বাস করি, তবে মোটের উপরে শিক্ষার গুণে রমণীও ভাল হয়, এ বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি?

জীবনের সকল বিভাগেই দেখা যায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি যে কার্য্য যেরূপে করে, শিক্ষিত ব্যক্তি সেই কার্য্যই তদপেক্ষা ভাল-রূপে করে। ইহা সকলেরই জীবনের নিত্য-প্রত্যক্ষ বিষয়, সুতরাং এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৃষি-কার্য্য না শিখিয়া যদি কেহ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তবে প্রথম দুই চারি বৎসর নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে; কিছু দিন হাতে কলমে খাটিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, অর্থাৎ কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করিলে তবেই তাহার লাভের সম্ভাবনা। মানবীয় সকল কার্য্যই এই-রূপ। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, রমণীগণ অশিক্ষিত হইয়াও যদি আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আমাদের জাতিত্ব মনুষ্যত্ব কথঞ্চিৎরূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন, তবে তাঁহারা শিক্ষিত হইলে সেই পবিত্র কার্য্য আরও শতগুণ সহস্র-গুণ ভালরূপে করিতে পারিবেন না কেন?

বিনাশিক্ষায় রমণী নিজের কর্ত্তব্য যেমন উৎকৃষ্টরূপে করিতেছেন, শিক্ষিত হইলে সেই কর্ত্তব্য তিনি তেমন উৎকৃষ্টরূপে করিতে পারিবেন না,—শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি এবং কার্য্য-ক্ষমতা সমস্তই বিলুপ্ত হইবে, প্রত্যক্ষ প্রমান দ্বারা এমন অদ্ভুত যুক্তির সমর্থন করিতে না পারিলে স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রকৃত পক্ষে বলিবার কিছু থাকিতেছে না।

এস্থলেও হয়ত সেই একমাত্র আপত্তিই উপস্থিত হইবে—রমণীরা লেখা পড়া শিখিলেই কেবল উপন্যাস পড়ে আর বাবুগিরি করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিষ-বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া অমৃত-ফলের আশা করা যদি সঙ্গত না হয়, তবে রমণীর কুশিক্ষার বিধান করিয়া সুশিক্ষার ফল পাইবার আশা কর কোন্ যুক্তিতে ? রমণীকে শিখাইয়াছ উপন্যাস পড়িতে, সে কি এখন ভাগবত পড়িবে ? যাহাকে আগা গোড়া বাবুগিরি করিতেই শিক্ষা দিয়াছ, সে কি এখন গায়ে মাটি আর কাপড়ে ছাই লাগাইয়া তোমাকে সুন্দর গৃহিণীপণা দেখাইবে ?

স্ত্রী-শিক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছ যে তাহা হইতে সুফল পাইবে ? বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রমণীরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহা যে সর্ব্বত্র সুশিক্ষাই হইতেছে, একথা বোধ হয় জোর করিয়া কেহই বলিতে পারিবেন না,—রমণীদিগের বর্ণ-জ্ঞান-লাভ হইতেছে, এই মাত্রই বলিতে পারিবেন। কিন্তু বর্ণ-জ্ঞান এক, আর শিক্ষা অন্য জিনিস ; বর্ণ-জ্ঞান-ব্যতীতও শিক্ষা হইতে পারে, তবে বর্ণ-জ্ঞান তাহার সাহায্য করিয়া থাকে, এই মাত্র। কিন্তু স্ত্রীদিগের বর্ণ-জ্ঞান-লাভেই বা আমরা কতটা সাহায্য করিতেছি,—তাহার ব্যবস্থাই বা কিরূপ করিয়াছি ? এই বর্ণ-জ্ঞান মাত্র লাভ করিবার সময়ে কত রমণী কত কষ্ট পাইয়া থাকেন, কত অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাঁহারা কখন দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। আমি একজন শ্রদ্ধেয়া রমণীর কথা জানি, তাঁহার সংস্কৃত চৈতন্য-চরিতামৃত পড়িতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি পড়িতে জানেন না। বিদ্যার প্রারম্ভে বর্ণ-মালার যে বিষম প্রত্যূহ, তাহা অতিক্রম করাই তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তাঁহার স্বামী একজন জমিদার, সুতরাং বিষয়-কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া তিনি যে অবসর টুকু পাইতেন, তাহার মুহূর্ত্ত স্ত্রীর শিক্ষকতায় অতিবাহিত না করিয়া বিশ্রাম-সুখে সমস্তটুকু ব্যয় করাই পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন। অবশেষে স্ত্রীর অনুরোধে তিনি এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, তিনি একখানি করিয়া পত্র স্ত্রীর সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া একবার পড়িবেন, আর পড়া শেষ হইলে পত্র খানি স্ত্রীর নিকট রাখিয়া দিবেন। রমণী মনোযোগ দিয়া স্বামীর পঠিত পত্রের কথাগুলি স্মরণ করিয়া রাখিতেন, আর স্বামীর অনুপস্থিতি-কালে পত্রের সঙ্গে সেই সকল কথা মিলাইয়া অক্ষর চিনিতেন। এই উপায়ে বর্ণ-জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া এখন তিনি সংস্কৃতে কেবল চৈতন্য-চরিতামৃত নহে, কিন্তু আরও অনেক অমৃতই পান করিতেছেন। আর একজন পূজনীয়া রমণীর অবস্থা জানি, তিনি রামায়ণ এবং মহাভারত পড়িবার জন্য বর্ণ-জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, কিন্তু কোন সুযোগ পান না; তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া কয়েকটি বালক বিদ্যালয়ে পড়িত, অবশেষে তাহাদের তোষামোদ করিয়া তিনি মনোরথ-সিদ্ধি লাভ করেন। এখন সেই রমণী নিঃসন্তান বিধবা, সেই রামায়ণ এবং মহাভারতই এখন তাঁহার জীবনের অবলম্বন, তিনি স্নান, পূজা এবং হবিষ্য করিয়া যে

সময় টুকু পান, তাহা রামায়ণ এবং মহাভারত-পাঠেই অতিবাহিত করেন। অনেক রমণীর শিক্ষা কেবল বর্ণ-জ্ঞান-লাভ মাত্র; আর সেই বর্ণ-জ্ঞান-লাভেও অনেক গৃহে অনেক রমণী পুরুষের নিকট এইরূপ সাহায্যই পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন। তথাপি আমরা ধন্য, কেননা স্ত্রী-শিক্ষার এইরূপ সাহায্য করিয়াও নিঃস্বার্থ-ভাবে তাহার সমালোচনা করিতে আমরা ছাড়িনা, এবং সে জন্য লজ্জা বোধও করি না।

বর্ণ-জ্ঞান-লাভই শিক্ষা নহে, ইহা শিক্ষার উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য অনুসারে সে শিক্ষা সুশিক্ষাও হইতে পারে, কুশিক্ষাও হইতে পারে—শিক্ষার সু এবং কু অবধারণ করিবার একমাত্র উপায় উদ্দেশ্য। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধু তাহাকে সুশিক্ষা বলিব, আর যে শিক্ষার উদ্দেশ্য অসাধু তাহাকে কুশিক্ষা বলিব। শিক্ষা এবং প্রণালী দুই স্বতন্ত্র জিনিস। চৌর্য্য-শিক্ষা অতি সুন্দর প্রণালীতে সাধিত হইলে তাহাকে সুশিক্ষা বলিতে পারিব না; আবার সাধুতা-শিক্ষা অতি কদর্য্য প্রণালীতে সম্পন্ন হইলেও তাহাকে কুশিক্ষা বলিতে পারিব না। যাহার উদ্দেশ্য ভাল, সে চিরদিনই সুশিক্ষা থাকিবে যাহার উদ্দেশ্য মন্দ সে চিরকালই কুশিক্ষা বলিয়া গণ্য হইবে। এরূপ বলি কেন? না, যাহার উদ্দেশ্য সাধু, প্রণালীর দোষে তাহার শিক্ষার হাজার বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হউক, তথাপি পরিণামে সে সাধুই হইবে; আর-যাহার উদ্দেশ্যই অসাধু, তাহার শিক্ষায় হাজার সুপ্রণালী অবলম্বিত হইলেও সে অসাধুই হইবে,—চৌর্য্য-বৃত্তির অবলম্বন যে মনে মনে উদ্দেশ্য করিয়া রাখিয়াছে, সে পুণ্যময় তপোবনে ঋষিকুমারদিগের সহবাসে থাকিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও পরিণামে চোরই হইবে। যদি দৈবানুগ্রহে ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে, এবং সৎসঙ্গের প্রভাবে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, তবে তাহার উদ্দেশ্যেরও অবশ্যই পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য সাধু না হইবে, সে পর্য্যন্ত সে সুশিক্ষার অধিকারী হইতে পারিবে না।

যাহার উদ্দেশ্য সাধু, সেই শিক্ষাই সুশিক্ষা; আর যে প্রণালী সেই শিক্ষা সমাপনের অথবা সেই উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল, তাহাই সুপ্রণালী। সুশিক্ষার সঙ্গে যদি সুপ্রণালী মিলিত হয়, তবে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইল; আর যদি ভাল উদ্দেশ্যে শিক্ষা হইলেও তাহার প্রণালী মন্দ হয়, তবে শিক্ষার ফলে—উদ্দেশ্য-সাধনে বিঘ্ন ঘটে।—কিন্তু সে পরের কথা।

এখন বোধ হয় অনেকটা বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য অবধারণ করাই প্রধান কথা। সকলের মনেই যে সে উদ্দেশ্য সমান ভাবে স্থান পাইবে, এমন বোধ হয় না; যিনি যে ভাবে স্ত্রীকে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার মনে উদ্দেশ্যও সেই ভাবেই স্থান পাইবে। যাহারা স্ত্রী-প্রকৃতিতে পুরুষত্বের বিকাশ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যই স্থির রাখিবেন, এবং সেই প্রণালীতেই শিক্ষা দিবেন; তবে তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে, তাঁহাদের সে যত্ন মিষ্ট ফল, কি তিক্ত

ফল প্রসব করিবে, সে স্বতন্ত্র কথা। সার্দ্ধদ্বি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো রমণীদিগকে ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং স্বামি-পুত্র ও বাস-স্থানের সঙ্গে পরিচয়শূন্য ও স্নেহ-বর্জ্জিত হইয়া যুদ্ধ-বিদ্যা শিখিতে এবং নিঃস্বার্থ ভাবে ও নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধাদি কার্য্যে পুরুষের সহায়তা করিতে উপদেশ দিয়া ছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে, প্লেটোর প্রতি ইউরোপের শ্রদ্ধাও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কিন্তু নারী-জাতির শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার এ উপদেশ কেহ পালন করে নাই, কখন করিবে বলিয়াও বোধ হয় না। স্বাধীনতার স্বর্গীয় উন্মাদক রস যে জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে, সে জাতির রমণীগণ প্রয়োজন হইলে জাতি, ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতার জন্য পুরুষোচিত বীরত্ব প্রকাশ করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে;—রাজপুত প্রভৃতি যে সকল বীরজাতি কখনও প্লেটোর নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, সেই সকল জাতির মধ্যেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। কিন্তু রমণী স্বামী, পুত্র এবং গৃহ-বাসের পরিচয় পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া বীরপুরুষদিগের ন্যায় কেবল যুদ্ধ-বিদ্যা শিখিয়া এবং মল্লাগিরি করিয়া বেড়াইবে, প্লেটোর এ উপদেশ অতিমাত্রায় উপাদেয় হইলেও আজি পর্য্যন্ত কোন সভ্য দেশে কেহ তাহার অনুবর্ত্তন করে নাই। তিনি স্ত্রী-প্রকৃতি না বুঝিতে পারিয়াই এ উপদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্যই কেহ সে উপদেশের অনুবর্ত্তন করিতে পারে নাই, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত কি?

যাহা হউক, স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইরূপই বলিব। এ বিষয়ে আমি যে অভ্রান্ত, সে বিশ্বাস আমার নাই; তবে এ বিষয়ের অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য, এ দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা। বিষয়টা যখন এত প্রয়োজনীয়,—যখন ইহার উপরেই স্ত্রী-শিক্ষার সুফল কুফল, সমাজের উন্নতি অবনতি, এবং মানব-জাতির সুখ দুঃখ এত অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তখন এ বিষয়ে নিজের কোট বজায় রাখিবার জন্য জেদ করিয়া কিছু বলা ঘোর মূর্খতা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিতেছি; সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল মহাত্মাগণও কথাটা একবার ভাবুন, এবং আপনাদের গভীর ভাবনার সুমীমাংসিত ফল-নিচয় জগৎ-সমক্ষে প্রচার করুন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্ষীণ কণ্ঠের অস্ফুট চিৎকার সমাজের বিরাট কর্ণ-কুহরে কখনও প্রবেশ করিবে না, এরূপ সহস্র প্রাণীর সমবেত যত্নেও সমাজের এক গাছি কেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যাঁহাদের বিদ্যমানতায় সমাজ সৌভাগ্যান্বিত, যাঁহাদের নামে সমাজ উৎসাহিত, যাঁহাদের শক্তিতে সমাজ সঞ্জীবিত, এবং যাঁহাদের ইঙ্গিতে সমাজ পরিচালিত, মস্তিষ্কশালী এবং প্রভাব-সম্পন্ন সেই সকল সমাজ-পতি অগ্রসর হইয়া এ সমস্যার সত্যাবধারণ করুন। স্ত্রী-শিক্ষার মত একটা প্রয়োজনীয় বিষয় চিরদিন অনুকূল এবং প্রতিকূল মতামতের তরঙ্গাঘাতে অভিহত হইয়া বেড়াউক, ইহা কখনও

প্রার্থনীয় নহে। আসুন, সকলে নিবিষ্ট-চিত্তে এ বিষয়ে সত্যাবধারণ করুন। যদি স্ত্রী-শিক্ষা বাস্তবিকই অমঙ্গলের কারণ হয়, যদি ইহা বাস্তবিকই দুর্নীতির প্রসূতি হয়, তবে ইহাকে সমাজে প্রবেশ করিতে দিব কেন? যাহাতে সমাজের অকল্যাণ হয়, সমাজ তাহা সহ্য করিবে কেন? স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিব, নিজে না পারি রাজার সাহায্য লইব, এবং বাক্য-বলে, বাহু-বলে বা অস্ত্র বলে, যেরূপেই পারি, স্ত্রী-শিক্ষাকে অচিরে চিরদিনের জন্য দেশান্তরিত করিব। কিন্তু যদি তাহা না হয়, যদি স্ত্রী-শিক্ষা অমঙ্গলের প্রসূতি না হইয়া মঙ্গলেরই প্রসূতি হয়, তবে ইহাকে প্রস্তরময় সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে,—যাহাতে মতামতের তরঙ্গাভিঘাতে পড়িয়া চিরদিন ইহা হাবুডুবু না খায়, যাহাতে ইহা অচল অটল ভাবে দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিয়া সামাজিক মঙ্গল-সাধনে সহায়তা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা প্রত্যেক অভিভাবককেই বালিকার হাতে বর্ণ-পরিচয় দিবার পূর্ব্বে একবার এই চিন্তায় দোলায়মান-চিত্ত হইতে হইবে, স্ত্রী-শিক্ষার ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য লইয়া তর্ক-জালে জড়িত হইতে হইবে, আর অনুকূল এবং প্রতিকূল মতামতের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে, ইহাতে বড় জ্বালা। যদি সমাজের চিন্তাশীল পরিচালক-দিগের অনুগ্রহে একবার এবিষয়ের সত্য-নির্দ্ধারণ হইয়া যায়, তবে আর নিরর্থক এ দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইবে না, এখন যেমন বালকদিগের শিক্ষার ইতিকর্ত্তব্যতা বিচার করিতে হয় না, তখন বালিকা দিগের শিক্ষার বেলায়ও কেহ তাহা করিবে না।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য, সাংসারিক শৃঙ্খলা-বিধান। ইহাকে গৃহ কার্য্য-নিপুণতা বলুন, গৃহিনীপনা বলুন, অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করুন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সেই একই সাংসারিক শৃঙ্খলা। রমণী উচ্চকুল-জাতা হউন আর নীচকুল-জাতা হউন, ধনী হউন আর দরিদ্র হউন, শিক্ষিতা হউন আর অশিক্ষিতা হউন, সন্তানবতী হউন আর নিঃসন্তান হউন, তাঁহাকে পুরুষের সঙ্গে একত্র সংসার-ধর্ম্ম করিতেই হইবে। যখন পুরুষের সঙ্গে মিলিয়াই সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইবে, তখন স্ত্রী এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, সে দাসীর ন্যায় মহাকষ্টের স্থান অন্তঃ-পুরে থাকিয়া অতি ক্লেশে অপবিত্র ঘর সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, আর পুরুষ কোন্ সুকৃতির বলে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, মাঠে খাটিয়া, পথে চলিয়া, নানা আকস্মিক বিপদে আক্রান্ত হইয়া, এবং জীবন্ত স্বর্গের ছবি দাসত্ব-মন্দিরে প্রভুর ভ্রূকুটি, কটূক্তি এবং পদাঘাত লাভ করিয়া, সপ্ত-জন্ম এবং চতুর্দ্দশ-পুরুষ কৃতার্থ হইল ভাবিয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিবেন—দুর্লভ মানব-জন্মের এহেন দুর্লভ সুখটুকু একাই উপভোগ করিবেন? এমন প্রশ্ন যদি কেহ করেন,—এমন অত্যাগ্রসর উৎকট চিন্তাশীল বিকট সংস্কারক যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রশ্নে আমি নিরুত্তর রহিব; কারণ তাঁহাকে উচিত মত বুঝাইতে পারেন,

এমন লোকের অসদ্ভাব সমাজে না থাকিলেও আমি সে কার্য্যের উপযুক্ত নহি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এরূপ উচ্চ-মস্তিষ্ক সংস্কারকের সৃষ্টি আজিও বিধাতা এদেশে করেন নাই।

স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, স্বামীর সুসঙ্গিনী হওয়া। যে সংসারে স্বামী চলেন এক পথে, স্ত্রী চলেন আর এক পথে, স্বামী যাহা গড়েন স্ত্রী তাহা ভাঙ্গেন, স্বামী যাহা ভাল বলেন স্ত্রী তাহা মন্দ বলেন,—এক কথায়, যে সংসারে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথার মিল নাই, ভাবের মিল নাই, রুচির মিল নাই, বিশ্বাসের মিল নাই, কার্য্যের মিল নাই, উদ্দেশ্যের মিল নাই, সে সংসারে ধন-রত্ন থাকিতে পারে, মান-সম্ভ্রম থাকিতে পারে, পদগৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সুখ থাকিতে পারে না, শান্তি থাকিতে পারে না, লক্ষ্মী থাকিতে পারে না। দুর্ভাগ্য-ক্রমে যে সংসারে এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটে, সে সংসারে সুখ-শান্তি-সংস্থাপনের উপায় নাই। যদি দুইজন পরস্পরের বিপরীত পথে চলিবার জন্য জোর করিতে থাকেন, তাহা হইলে উভয়ের প্রেম-ডোর—সংসারের বন্ধনরজ্জু নিশ্চয়ই ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ এ রোগের চিকিৎসা আছে, এ অকল্যাণের অবস্থ দূরে রাখিবার উপায় রহিয়াছে। ইহাঁদের দুই জনের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, অল্পশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ, তিনি যদি স্বাতন্ত্র্য এবং প্রাধান্যের জন্য জেদ না করিয়া অপরের পথে এবং মতে চলেন, অপরের সুখ-দুঃখ, মতামত এবং অস্তিত্বের সঙ্গে আপনার সুখ-দুঃখ, মতামত এবং অস্তিত্ব একেবারে মিশাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সংসারে অপ্রীতি, কলহ, এবং দুঃখ-যন্ত্রণা কখনই স্থান পাইতে পারে না। এমন সংসারে ধনের অভাব, বিদ্যার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব থাকিতে পারে, কারণ এ সকল জিনিস সকল সংসারেই থাকেনা; কিন্তু তেমন সংসারে সুখ, শান্তি, এবং প্রণয়ের অভাব কখনও হয় না। জায়া এবং পতি, এই দুইটি শব্দ পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়া যেমন দম্পতী, এই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র একটি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ একজন স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে আপন অস্তিত্ব মিশাইয়া দিলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এক অপূর্ব্ব একত্ব নিষ্পাদিত হইয়া উঠে। যিনি এরূপ নিঃশেষভাবে আত্ম-সমর্পণ করেন, তিনি যে বিনিময়ে কিছুই পান না, তাহা নহে,—প্রত্যুত যাহা দান করেন, তাহার শতগুণে তাঁহার লাভ হইয়া থাকে, ইহাই প্রেম রাজ্যের নিয়ম, প্রেমময়ের বিধান। হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীর প্রতি পতিপ্রাণা হইয়া স্বামীর ছায়ার ন্যায় জীবন ধারণ করিবার বিধান আছে; ফলতঃ একজন অপরের ছায়ারূপে পরিণত না হইলে যে দুই জনে একাত্ম হইবার সম্ভাবনা নাই, দাম্পত্য জীবনে সম্পূর্ণরূপে শান্তিলাভ করিবার আশা নাই, হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ তাহা বিলক্ষণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তবে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কে কাহার ছায়া হইলে অধিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, স্ত্রীকে পতিব্রতা হইবার উপদেশ দিয়া শাস্ত্রকারেরা ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, স্ত্রী-পুরুষের

পরস্পর পদ-বিনিময় করিয়া স্বামীকে পত্নী-ব্রত হইবার উপদেশ দিলে সমাজের মঙ্গল হইত কি অমঙ্গল হইত, সমাজের চিন্তাশীল মহাত্মারা সে কথার বিচার করিবেন, আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হইব না।

স্ত্রী-শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য যথাবিহিত রূপে গর্ভ-ধারণ। আমি বুঝিতেছি, একথা শুনিয়া অনেকের মুখেই তিরস্কার-ব্যঞ্জক হাস্য প্রকটিত হইবে। অনেকেই বলিবেন, এ বিদ্যা আর শিক্ষা করিতে হয় না, এ উদ্দেশ্য বিনা শিক্ষাতেই সিদ্ধ হয়, অজ্ঞান পশু পক্ষীও ইহা জানে। সত্য, কিন্তু এ জানা পশু-পক্ষীর মত জানা, মানুষের মত জানা নহে। অজ্ঞান পশু-ত্বেরই লক্ষণ; পশু-পক্ষী কিছু না জানিয়া না শুনিয়া গর্ভ-ধারণ করে, সুতরাং তাহাদের গর্ভে পশু-পক্ষীই জন্মে। মনুষ্য জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং দেবত্বের অধিকারী; যদি সে ভাল মন্দ জানিয়া শুনিয়া গর্ভ-ধারণ করে, তবে সে গর্ভে দেব-তুল্য মনুষ্যের উদ্ভব হইতে পারে, আর অজ্ঞানপূর্ব্বক গর্ভ-ধারণ করিলে, অজ্ঞানের যে ফল, সে গর্ভে তাহাই ফলিবে—মানবাকার পশু-পক্ষীই জন্মিবে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রাহ্মণ জাতিই যে ভারতের মূল শক্তি, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই যে ভারতে প্রধান গৌরব, একথা আজকাল সকলেই বুঝিয়াছেন; এইজন্য, যাঁহারা ভারতকে অবাধে পদ-তলে দলিত করিতে চাহেন, যাঁহারা ইহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া নামান্তরিত, রূপান্তরিত এবং দেশান্তরিত করিতে চাহেন, তাঁহারা এই ব্রাহ্মণ জাতি এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিতেছেন। যাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান দেখিয়া চিন্তিত এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত, তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলেন, ভারতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকিলে সমাজের এত দুর্দ্দশা হইত না। ব্রাহ্মণের অত্যন্ত অভাব না ঘটিলেও অভাব যে ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ আসিবে কোথা হইতে—ব্রাহ্মণ প্রসব করিবে কে? ধর্ম্ম বই অধর্ম্ম জানে না, শান্তি বই অশান্তির দৃশ্য দেখেন না, স্বামী বই অন্য পুরুষের মূর্ত্তি ভাবেন না, জ্ঞান বই অজ্ঞানের আলোচনা করেন না, এমন মা কই—এমন ব্রাহ্মণী কই, যে আদর্শ ব্রাহ্মণকে জন্ম দিয়া স্বজাতিকে ধন্য করিবে? ক্ষেত্রের দোষে যে উৎকৃষ্ট বীজও নষ্ট হইয়া যায়, বরং যে ফল যত উৎকৃষ্ট, তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে যে তত অধিক যত্নের প্রয়োজন, একথা নিরক্ষর কৃষকেরাও বুঝে, আর আমরা সমাজের বুদ্ধিমান রক্ষক, পরিচালক এবং সংস্কারক হইয়াও একথা বুঝি না, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা, বড়ই লজ্জার কথা। বীর কিম্বা ব্রাহ্মণ প্রসব করা সুবেশিনী, বাগ্‌বান-বর্ষিণী, জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিরোধিনী বিলাসিনীর কার্য্য নহে, এ কার্য্য আত্ম-দৃষ্টি-পরায়ণা, ভোগ বিলাস-বিরক্তা, জ্ঞান-ধর্ম্মানুরাগিনী, পতিব্রতা তপস্বিনীর। যে দরিদ্রা ব্রাহ্মণ-পত্নী শঙ্খের অভাবে সধবার চিহ্ন-স্বরূপ একগাছি লাল সূতা হাতে বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং ইহাকে লক্ষ্য করিয়া অপর

রমণী বিদ্রূপ করিলে স্বামীর পাণ্ডিত্য গৌরবে যে গৌরবিনী দর্প করিয়া বলিতেন, "তোদের লজ্জা নাই, তাই আমার দরিদ্রতায় তোরা উপহাস করিতেছিস্; তোরা জানিস্ না যে তোদের স্বর্ণালঙ্কার হইতে আমার এই লালসূতাগাছির মূল্য এবং সম্মান কত অধিক; তোরা জানিয়া রাখ, এই লাল সূতাগাছির উপরেই নবদ্বীপের সমস্ত গৌরব প্রতিষ্ঠিত"—যে দেবী এই একটি কথায় আপনার আদর্শ-চিত্র অনন্ত-কালের জন্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই দেবী, সেই মহর্ষি-পত্নী, সেই ব্রাহ্মণ-জননী আজ কোথায়? যে পর্য্যন্ত না তিনি আবার ভারতকে অনুগৃহীত করিবেন, সে পর্য্যন্ত ভারতে প্রকৃত ব্রাহ্মণোদ্ভব এবং বীরোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রী-শিক্ষার চতুর্থ উদ্দেশ্য সন্তান-পালন। সন্তান প্রসব করিলেই পালন করিতে হয়, এবং সকলেই তাহা করিয়া থাকে; কিন্তু এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা চাই, শিক্ষার অভাবে সন্তান-পালন যথোচিতরূপে হয় না। অনেকে মনে করেন, সন্তান ক্ষুধায় আহার, শীতে বস্ত্র, এবং রোগে ঔষধ পাইয়া বাঁচিয়া থাকিলেই সন্তান-পালন হইল। বাঁচিয়া থাকা এক কথা, আর মানুষ হওয়া আর এক কথা। সন্তানকে খাইতে পরিতে দিয়া বাঁচাইয়া রাখিলেই তাহাকে যথোচিতরূপে পালন করা হইল না। যাহাতে সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর যন্ত্র অবাধে এবং যথোচিতরূপে পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত, বিকাশিত এবং কার্য্যক্ষম হয়—যাহাতে সন্তানের নিকট তাহার নিজের দেহ ভার-স্বরূপ না হইয়া জীবনে মহৎকার্য্য-সাধনের সহায়-স্বরূপ হইতে পারে, সেইরূপে সন্তানকে প্রস্তুত করাই তাহার পালন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে ভাবে সন্তান-পালন হয়, তাহার সঙ্গে পশু-পালনের বিশেষ কোন পার্থক্য আছে কি?

স্ত্রী-শিক্ষার পঞ্চম উদ্দেশ্য সন্তান-শিক্ষা। সাম্যবাদের একটা রোগ, স্ত্রীদিগের অনেক কর্ত্তব্য পুরুষের ঘাড়ে চাপাইতে চায়, অথবা স্ত্রীর কর্ত্তব্য পুরুষকে দিয়াও সমান ভাবে চালাইতে চায়, আর স্ত্রীকে দিয়া পুরুষের কায করাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু সাম্য-বাদ যতই ভেদ-বিধ্বংশী, যতই উগ্র, যতই বিকট-মূর্ত্তি হউক না কেন, গর্ভ-ধারণ, সন্তান-পালন এবং সন্তান-শিক্ষা যে জননীরই বিধি-নিয়োজিত কর্ত্তব্য, ইহা সেই সাম্য-বাদেরও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুরুষ যে ইচ্ছা করিলেও গর্ভধারণ করিতে পারে না, ইহা বোধ হয় পাগলেও বুঝে; আর জননীর অভাবে কেবল পিতা দ্বারা যে সন্তানের প্রকৃত লালন-পালন এবং শিক্ষা হইতে পারে না, এ কথাটা একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। পালন কি আর হয় না, শিক্ষা কি আর হয় না—শৈশবে মাতৃহীন হইলে সকল শিশুই কি মরিয়া যায়? তাহা নহে; তবে মাতার যত্নে যেমনটি হইতে পারিত, অন্যের যত্নে তেমনটি হইতে পারে না, অন্যে হাজার যত্ন করিলেও মাতৃ-যত্নের অভাব-জনিত অপূর্ণতা টুকু থাকিয়াই যায়। দেশের

আপামর সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এ কথাটি এত অধিক রূপে জানে যে,—

"চিড়া বল, পিটাবল, ভাতের সমান নয়,
মাসী বল, পিসী বল, মায়ের সমান নয়।"

এই সত্য-মূলক কবিতাটি প্রায় সকলেরই কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। শিশুকালে মাতৃবিয়োগ হইলে পিতা যে সন্তানের যত্ন করেন না, অথবা মাতৃ-স্নেহ অপেক্ষা পিতৃস্নেহ যে সর্ব্বত্রই কম, এমনও নহে; বরং মাতার অভাবে পিতৃস্নেহ যে শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, সচরাচর ইহাই দেখা যায়; কিন্তু তথাপি মাতৃ-বিরহে সন্তানের যে অভাবটুকু ঘটে, পিতার হাজার যত্নেও তাহা পূরণ করিতে পারে না। বড়লোকদিগের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জেম্স্ মিল্ যেরূপ যত্নের সহিত পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষা-বিধান করিয়াছিলেন, সেরূপ অতি অল্প বালকের ভাগ্যেই ঘটে। পুত্রের সুখে, পুত্রের কল্যাণে, এবং পুত্রের শিক্ষায় বৃদ্ধ মিল্ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি যেমন খাটিয়াছিলেন, সেইরূপ ফলও পাইয়াছেন। যুবক মিলের ন্যায় মার্জ্জিত-বুদ্ধি, স্বাধীনচেতাঃ স্পষ্ট ও মিষ্টভাষী, এবং গভীর জ্ঞানানুরাগী পণ্ডিত ইংলণ্ডে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। তিনি যখন যেটি ধরিয়াছেন, তাহার একটা চরম না দেখিয়া একটা শেষ মীমাংসায় উপনীত না হইয়া ছাড়েন নাই। নিজের পরিবুদ্ধ এবং মীমাংসিত বিষয় যত কেন দুরূহ হউক না, যত কেন দুর্জ্ঞেয় হউক না, যত কেন ভ্রান্তিসঙ্কুল হউক না, মিল্ যেমন করিয়া তাহা সরল এবং বিশদ ভাষায় পাঠকের বোধ রাজ্যে পঁহুছাইয়া দিতে পারিতেন, এক হার্বার্ট স্পেন্সর ছাড়া আর কোন ইংরাজ তেমন্ পারেন কি না সন্দেহ। বৃদ্ধমিল্ও পণ্ডিত ছিলেন, আর পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই পুত্রের এরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষা সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাতে বুদ্ধির যে তেজ, জ্ঞানের যে আলোক বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল, পুত্র মিলের ধী-শক্তি রূপ আতসী প্রস্তরে তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়া যেন এক দীপ্তিময় প্রখর অগ্নি-শিখা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। বৃদ্ধ মিল্ও পণ্ডিত ছিলেন বটে, বৃদ্ধ মিল্ও গ্রন্থকার ছিলেন বটে; কিন্তু যশোমন্দিরে যদি তিনি কখনও স্থান পান, তবে সেখানে তাঁহাকে পুত্রের পশ্চাদ্গামী হইয়া, পুত্রের করাঙ্গুলী ধরিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা না হইলে আজ তাঁহার নাম কত লোকে জানিত, বলিতে পারি না। এমন যে মহাপণ্ডিত মিল্, যাহার শিক্ষায় পিতার এমন জীবনোৎসর্গী যত্ন, তাঁহারই শিক্ষা কি পূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছিল! অভিনিবেশ সহকারে মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে অনুভব করা যায়. বাল্যাবধি স্নেহময়ী মাতার অপার্থিব প্রভাবে বঞ্চিত হওয়াতে তাঁহার আত্মপ্রকৃতির একটা দিক্ যেন অনালোকিত রহিয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবন-রাজ্যের একটা বিস্তীর্ণ সমুর্ব্বর প্রদেশ যেন অকৃষ্ট রহিয়া গিয়াছে, তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের একটা সুন্দর সুসজ্জিত, রত্ন-খচিত প্রকোষ্ঠ যেন অনুদ্ভাসিত

রহিয়া গিয়াছে;—অনুভব করা যায়, কেন মাতৃ স্নেহের পরিসিঞ্চনাভাবে হৃদয়-নিকুঞ্জের ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর প্রভৃতি সুকোমল কুসুম-লতিকা গুলি অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছে! এমন যে মহাপণ্ডিত মিল্, এত পিতৃ-যত্নে যাঁহার লালন-পালন এবং শিক্ষা, মাতৃযত্নের অভাবে তাঁহার শিক্ষাও যদি অপূর্ণ-রহিয়া গেল, তখন আর অন্যের কথা কি বলিব ? তাইবলিতে ছিলাম, কেবল মাতৃযত্নের অভাবে অন্য শতসহস্র যত্নেও যখন শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না— মাতৃযত্নের অভাব অন্য শত সহস্র যত্নেও যখন পূরণ করিতে পারে না, তখন সন্তানের শিক্ষা-দান স্ত্রী-শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

স্ত্রী-শিক্ষার ষষ্ঠ উদ্দেশ্য গৃহে শান্তি-বিধান। সংসারে ধনজন যাহা কিছু, শিক্ষা দীক্ষা যাহা কিছু, প্রভাব প্রতিপত্তি যাহা কিছু, সমস্তই শান্তির জন্য। পুরুষ বাহিরের আতপ-তাপে ঘুরে, প্রাণ পণে পরিশ্রম করে, সংসারের যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কিন্তু ঘরে আসিয়া একটুকু শান্তির আশা করে। এই আশাটুকু আছে বলিয়াই, জ্বালা-দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবার জন্য গৃহের শান্তি-কুম্ভে শান্তি-বারি আছে ভাবিয়াই, মরুময় দূর পথ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কল্প-পাদপের শীতল ছায়া মিলিবে মনে করিয়াই পুরুষ দিনান্তে সংসার-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ হইয়া গৃহে ফিরে। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া বহু আশার সেই স্বর্গীয় অমৃতটুকু যদি সে না পায়, যদি গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র সেই শান্তি-কুম্ভ হইতে তাহার উপরে অনল-বৃষ্টি হইতে থাকে, তবে আর সে হতভাগার গৃহে যাইয়া ফল কি ? তবে আর তাহার অরণ্যে প্রবেশ করিতে আপত্তি কি ? তবে আর শ্মশানে চলিয়া যাইতে তাহাকে ধরিয়া রাখে কে ? কেবল স্বামীকে শান্তি দিতে হইবে, আর পরিবারের অন্য পুরুষ গুলিকে ভাজিয়া পুড়িয়া খাইতে হইবে, বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার ফল কতকটা এই প্রকৃতির হইয়া দাঁড়াইলেও তাহা ঠিক নহে। কেবল স্বামীই যে সংসার-জ্বালায় দগ্ধ হন, আর পরিবারের অন্য পুরুষেরা কুসুম-শয্যায় শুইয়া থাকে,—কেবল স্বামীই যে শান্তির অমৃত ভালবাসেন, আর অন্যেরা গরল খাইলে হাতে স্বর্গ পায়, তাহা নহে ; শান্তি সকলেই চায়, শান্তিতে সকলের প্রাণই শীতল হয়। সত্য বটে পুরুষের মধ্যে অলস, কৃতঘ্ন, কাপুরুষ, কুলাঙ্গার অনেক আছে। কিন্তু তুমি রমণী, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; তুমি তাহাদের জন্য শান্তি-বারির বিনিময়ে কঠোর অস্ত্র ধারণ করিবে কেন,—তুমি তোমার দেবী-প্রকৃতিকে দূষিত করিয়া শান্তি-কুম্ভে গরল ঢালিবে কেন ? দুর্জ্জন-দমনের পরুষাস্ত্র পুরুষের হাতেই শোভা পায়, তোমার হাতে নহে। সকলকে সমভাবে অবিশ্রান্ত শান্তি বিতরণ করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা পান নাই, অসুরকে পর্য্যন্ত শান্তির প্রভাবে পদানত করেন নাই, এমন রমণী দেখা যায় না।

স্ত্রী শিক্ষার সপ্তম উদ্দেশ্য আত্ম-রক্ষা। যে ফুল যত সুন্দর, যত সুগন্ধ, সে ফুল তত কোমল, তত অসহ্য-স্পর্শ। রমণীর যত ধন, যত রত্ন, যত সম্পদ্ থাকিতে

পারে, তন্মধ্যে সতীত্ব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সতীত্বই রমণীর রূপগুণ, সতীত্বই রমণীর শোভা-সৌন্দর্য্য; সতীত্বই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সতীত্বই তাঁহার দেবত্ব। রমণীর এত মান-সম্ভ্রম তাঁহার সতীত্বের জন্য, এত আদর অভ্যর্থনা তাঁহার সতীত্বের জন্য; সতীত্বই তাঁহার বল, সতীত্বই তাঁহার ভূষণ। মলিন-বসনা পর্ণ-কুটীর-বাসিনী সতী রমণীর যে বল, যে প্রভাব, যে গর্ব্ব, যে আদর, যে সম্ভ্রম ও যে পূজা, রত্ন-খচিত-বসনা প্রাসাদ-বাসিনী অসতী রাজ-রাণী তাহা কল্পনায় আনিতে পারে কি? তাহার ধন-বলে লোকে নিন্দার স্থলে স্তুতি করিতে পারে, তাহার অত্যাচার-ভয়ে লোকে নীরবতা অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে অবজ্ঞার বিনিময়ে শ্রদ্ধা এবং ঘৃণার বিনিময়ে ভক্তি কখনই স্থান পায় না।

কিন্তু এই সতীত্ব-রত্ন যেমন অমূল্য, তেমনি ক্ষণ-ভঙ্গুর। অন্য রত্ন কেহ অপহরণ করিলে বাহু-বলে হউক, রাজ-সাহায্যে হউক, কিম্বা কলে কৌশলে হউক, পুনরায় তাহা হস্তগত হইতে পারে; অথবা তাহা না হইলেও অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের বলে অন্য রত্নদ্বারা তাহার স্থান-পূরণ হইতে পারে। কিন্তু সতীত্ব-রত্ন অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়া দূরে থাকুক, অপবিত্রতার হস্ত একবার তাহাকে স্পর্শ করিলে—মলিনতার বাতাস একবার তাহার গায়ে লাগিলে যে চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়, আর তাহাকে কখনও ফিরিয়া পাওয়া যায় না, অথবা আর কিছুতে তাহার ক্ষতি-পূরণও হইতে পারে না। যাহার প্রভাবে ভিখারিণীর রাজ-রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ, যাহার অভাবে রাজ-রাণীও ভিখারিণী হইতে নিকৃষ্ট, যাহা একবার গেলে পুনরায় প্রাণ দিলেও ফিরিয়া পাওয়া যায় না, এবং যাহার অভাব আর কিছুতেই পূরণ করিতে পারে না, এমন অমূল্য রত্ন রক্ষা করা স্ত্রী-শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য মনে করা উচিত।

শক্তি-সমন্বয় ও শক্তি-সংযোগ।

দশ জনের মিলিত শক্তিকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার নাম শক্তির একীকরণ বা শক্তি সমন্বয়। বিশেষ কোন প্রতিকূল শক্তি বিরুদ্ধে না থাকিলে এবং শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া শক্তি-সমন্বয় করিতে পারিলে যে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ইউরোপীয় জাতির উন্নতির এক প্রধান কারণ শক্তি-সমন্বয় এবং বাঙ্গালী জাতির অবনতির এক মূল কারণ শক্তি-সমন্বয়ের অভাব। কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাউক। প্রথমে মাসিক সংবাদ-পত্রের কথাটা ধরিয়াই দেখা যাউক, এই যে নূতন

নূতন নানা রকমের বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন এক খানিকেও স্থায়ী হইতে দেখা যাইতেছে না কেন? যদিও বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতায় যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের উন্নতির জন্য একটু মাত্রও যত্নশীল নহেন, তথাচ যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৎসর বৎসর তিন চারি শত গ্রাডুয়েট্ বাহির হইতেছে, সে দেশে যে এক খানি মাসিক পত্রিকা সুন্দর রূপে চলিতে পারে না, এরূপ বিশ্বাস করিতে বোধ হয় কেহই রাজি হইবেন না। তবে এক খানিও সুচারু ভাবে চলে না কেন? বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, প্রবাহ, নবজীবন, প্রচার, সাধনা, একে একে সকল গুলিই অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহার কারণ কি? আমরা বলি, ইহার মূল কারণ বাঙ্গালী লেখকের শক্তি-সমন্বয়ের অভাব। বাঙ্গালী লেখকেরা বার বার দেখিতেছেন যে, তাঁহাদের যে শক্তি আছে, তদ্দ্বারা পাঁচ ছয় খানা মাসিক সংবাদ-পত্র সুচারু রূপে সম্পাদিত ও সুপাঠ্য চিন্তাশীল প্রবন্ধে পরিপূরিত হইয়া স্থায়ী হইতে পারে না, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের সমবেত শক্তি-প্রয়োগে এক খানি বা দুই খানি সংবাদ পত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চেষ্টা না করিয়া নব নব মাসিক পত্রিকা প্রচার দ্বারা শক্তি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন পুরাতন সবগুলিকেই নষ্ট করিতেছেন। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি যে সমস্ত সাময়িক পত্রের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রথম খানাই অতি উচ্চ অঙ্গের হইয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী লেখকগণ যদি নূতন নূতন পত্রিকা প্রচার না করিয়া সমস্ত মানসিক শক্তি বঙ্গ-দর্শনের উন্নতি-কল্পে প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গ-দর্শন আজ বাঙ্গালীর কত গৌরবের ধন হইত, বঙ্গ-সাহিত্যে কত উচ্চ-স্থান অধিকার করিত। বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লেখক, তাঁহাদের সংখ্যা এক রূপ নির্দ্দিষ্ট; তাঁহারা যদি মিলিত হইয়া পণ করেন যে, দুই এক খানি পত্রিকা ব্যতীত তাঁহারা অন্য পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিবেন না, তাহা হইলে সে দুই এক খানি পত্রিকা সুপাঠ্য ও স্থায়ী হইতে পারে এমন আশা করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন মত হইলেই যে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, ইহার অবশ্য কোন অর্থ নাই।

ইংরাজীতে "নাইনটিনথ্ সেন্‌চুরী" "ফর্টনাইটলি রিভিউ," "মাইণ্ড" প্রভৃতি পত্রিকা কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সে সমস্ত পত্রিকার শক্তি ও আদর্শ বা কত। ইংরেজদের শক্তি বেশী, তাহারা দশখানা মাসিক পত্রিকা সুন্দররূপে চালাইতে পারে; আমাদের বাঙ্গালীর শক্তি কম, আমরা কি একখানা পত্রিকাও উক্ত কোন এক খানির অনুরূপে চালাইতে পারি না? পারি না সত্য, কিন্তু পারিনা শুধু শক্তি-সমন্বয়ের অভাবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধন বা বিশেষ অভাব-মোচন জন্য দুই একখানি পত্রিকার প্রচার শক্তি-সমন্বয়ের ব্যাঘাত-জনক নহে। এক উদ্দেশ্যের ও এক ধরণের কতকগুলি পত্রিকার প্রচার বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালীর শক্তি-সমন্বয়ের ব্যাঘাত-জনক এবং অবনতির কারণ।

শক্তি-সমন্বয়ের অন্তরায় অনেক, তন্মধ্যে হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থই প্রধান। ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে কোন দেশে কোনকালে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। শক্তি-সমন্বয়ের উপাদানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস এবং "দেশের উন্নতির সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি বিশেষ রূপে সম্বদ্ধ" এই সত্যের উপলব্ধি, এই দুইটী প্রধান। আমাদের জাতীয় জীবনে এই দুইটী উপাদানেরই অভাবে, আমরা শক্তি-সমন্বয়-জাত উন্নতি কিরূপে লাভ করিব?

এক্ষণে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপে জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় আলোচনা করিয়া শক্তি সমন্বয়ের আবশ্যকতা বুঝা যাউক। জাতীয় সম্মিলনীতে দশজনের শক্তি কতকটা একত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু সমবেত শক্তি এত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োগ হইতেছে যে, শক্তি-প্রয়োগানুযায়ী ফল হইতেছে না—অল্প শক্তি যদি বহুবিস্তীর্ণ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ইহা সাধারণ নিয়ম। সম্মিলনী সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাউক। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের যতগুলি রাজনৈতিক অভাব অনুভূত হইতেছে, সমস্ত অভাবের নিরাকরণ জন্য সম্মিলনী এক যোগে তাহার সমবেত চেষ্টা প্রয়োগ করিতেছে। ক্ষুদ্র শক্তির ব্যাপক বিষয়ে প্রয়োগ হইতেছে, ফল বিশেষ হইতেছে না—যে দুই একটী অভাবের নিরাকরণ বিশেষ আবশ্যক, সম্মিলনী যদি কেবল সেই দুই একটী অভাব দূরীকরণ জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন, আশা করা যায় এত দিন বিশেষ ফল দেখিতে পাইতেন। সম্মিলনীতে দশ জনের সমস্ত শক্তি যে প্রয়োগ হইতেছে, এ বিশ্বাসও আমাদের নাই। মনের শক্তি, দেহের শক্তি, অর্থের শক্তি, নিজের ও পরিবার বর্গের ভরণ পোষণের জন্য যে শক্তি টুকুর আবশ্যক, তাহা ছাড়া যাহার যত প্রকারের শক্তি আছে, সমস্ত দেশের কল্যাণের জন্য তাহার নিয়োগ করিতে পারিলে আমাদের রাজনৈতিক অভাব মোচন হইবার সম্ভব। দেশ-হিতৈষী মাত্রেই যে এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা কাহারই অবিদিত নাই, সে কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সম্মিলনীতে শক্তির সেরূপ প্রয়োগ কি হইতেছে? সামাজিক সম্মিলনী সম্বন্ধেও ঐ কথা। আদৌ জাতীয় রাজনৈতিক সম্মিলনীর মধ্যে সামাজিক ব্যাপার লইয়া গিয়া জাতীয় শক্তির বিভাগ করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। ভারতবাসীর মধ্যে যে জাতীয় অঙ্কুরের বিকাশ হইয়াছে, তাহা কেবল রাজনৈতিক ব্যাপারে, সামাজিক বা ধর্ম্ম-ব্যাপারে নহে। সমাজ বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জাতীয় সম্মিলনীতে আন্দোলন করিলে জাতীয় শক্তি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, এবং শক্তি-সমন্বয়ের অভাবে ইহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। সমাজের যে অভাবটী গুরুতম, কেবল সেইটীতে সামাজিক সম্মিলনী যদি সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিত, তাহা হইলে হয়তো সে অভাবটী এতদিনে অনেকটা দূর হইত; কিন্তু সম্মিলনীর ক্ষুদ্র শক্তি সমাজের সমস্ত অভাব এক যোগে

দূর করিবার চেষ্টা করিয়া কোনটাতেই আংশিক রূপেও কৃতকার্য্য হয় নাই।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত সর্ব্ববিধ যৌথ কারবারে বাঙ্গালীর অকৃতকার্য্যতা। শক্তি-সমন্বয়-জাত উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে কয়টী গুণের সমাহার এবং যে কয়টী দোষের পরিহার আবশ্যক, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না, এই জন্য বাঙ্গালী কোন কার্য্যে মিলিত হইয়াও উন্নতি করিতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক শক্তি-সংযোগ কাহাকে বলে। ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক মানসিক সর্ব্ববিধ শক্তি কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার নাম শক্তি-সংযোগ। শক্তি-সমন্বয়ের সম্বন্ধে যে যে কথা, শক্তি-সংযোগ-বিষয়েও ঠিক সেই সেই কথা। সমস্ত জাতির মহাজনদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, সে সেই কার্য্যে জীবন-মরণ পণ করিয়া, মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট হইয়াছে। দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য গ্রেন্‌ভিল্, ক্লার্ক্‌সন্, বাক্‌ষ্টন্ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আত্মহারা হইয়া জীবন-মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের একমাত্র চিন্তা, একমাত্র আশা, একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল কেবল দাস-সম্প্রদায়ের উদ্ধার। যতদিন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করিয়াছিলেন না। তাঁহারা সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন কেবল এই এক কার্য্যে। পুণ্যময়ী কুমারী ফ্লোরেন্‌স্ নাইটিঙ্গেল্ সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন করিয়া নিজের শারীরিক মানসিক সমস্ত শক্তি কেবল দরিদ্র রোগক্লিষ্ট আতুর-বর্গের শুশ্রূষার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এবং এই শক্তি-সংযোগের জন্যই তিনি ধরাতলে মূর্ত্তিমতী দয়া বলিয়া পূজিতা হইয়াছেন। এক বর্ষ নহে, দুই বর্ষ নহে, পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া কব্‌ডেন্ সাহেব ইংলণ্ডীয় শস্য আইনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত-ভাবে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা হাওয়ার্ড জীবনব্যাপী চেষ্টা ও নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া কারাগারের সামান্য মাত্র উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত দরিদ্রগণের রোগ-মুক্তি ও শান্তি-প্রদানের জন্য যে দেব-স্বভাব মহাত্মা প্রাণপণে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ও দৃষ্টান্ত সর্ব্বজন-বিদিত। শক্তি সংযোগ-জাত উন্নতির এরূপ বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষা-বিষয়েও এইরূপ; সব বিষয়ে একটু একটু জ্ঞান, কিন্তু কোন এক বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান, ইহা একটী অমৃতময়ী বাণী। ইহার মর্ম্ম এখনও আমরা বুঝি নাই, ইউরোপীয়েরা ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছে, বুঝিয়াছে বলিয়াই এত উন্নতি করিয়াছে। তাহারা এক এক জন এক একটী বিষয় আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সমস্ত শক্তির নিয়োগ করে। তাহাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলিও সেইভাবে গঠিত। আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এরূপ ভাবের যে, তাহাতে আমাদের শক্তি-সংযোগ হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের শক্তি নানা বিষয়ে

বিক্ষিপ্তই হইয়া যায়। বাঙ্গালীদের মধ্যে শক্তি-সংযোগের আবশ্যকতা পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন পুরাতত্ত্বজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা বিদ্যাসাগর। রাজেন্দ্র বাবু সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল পুরাকালের তত্ত্ব অনুসন্ধানে নিজের সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়া ছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি এমন কিছু করিয়া গিয়াছেন, যাহা কেবল বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর পক্ষে নহে; সমস্ত জগতের পক্ষে মঙ্গল-প্রদ। মহাত্মা বিদ্যাসাগরও কেবল বিধবা-বিবাহ ও শিক্ষা-প্রচলনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, নিজের সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও ধন সমস্তই ঐ দুই কার্য্যের জন্য বিসর্জ্জন করিয়া জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য তত্তৎ বিষয়ে আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, আমাদের জাতীয় শক্তি নানা কারণে এক্ষণে বড়ই কম হইয়াছে; এই ক্ষীণশক্তিটুকু সমবেত করিয়া, এক এক বিষয়ে তাহার প্রয়োগ করিয়া ক্রমে আমাদের উন্নত হওয়া আবশ্যক। আমাদের শরীর ও মন উভয়ই দুর্ব্বল হইয়াছে, আকার ক্রমে খর্ব্ব হইতেছে, "প্রজ্ঞা"ও "আকার-সদৃশী" হইয়াছে; এ অবস্থায় শক্তি-সংযোগ নিতান্ত আবশ্যক। বহুদিনের রোগ বহুদিন না হইলে সারে না; জাতীয় উন্নতি ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে বই হইবে না। সুচিকিৎসক যেমন প্রধান রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধের শক্তি সেই রোগ নিরাকরণে প্রয়োগ করে, আমাদেরও সেইরূপ প্রধান অভাব মোচনের জন্য সমবেত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। শক্তি-সমন্বয় ও শক্তি সংযোগ, এই দুই গুণ শিক্ষা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ভারতীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞান।

এইক্ষণে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই শিক্ষার উপর মানুষের খুব একটু যত্ন ও মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-শিক্ষা এবং ধর্ম্ম সংস্কারেরও খুব একটা আন্দোলন উপস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও সহজে প্রায় কেহই কাহার ধর্ম্ম লইতে চায় না। পৃথিবীর লোক একে অন্যের রাজ্য ধন, মান, সম্ভ্রম ও সুখ-স্বাধীনতা টুকু পর্য্যন্ত অকাতরে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, অথবা নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় অন্যের সাত পুরুষের উপার্জ্জিত মণি-মাণিক্যটি লইয়া আপনাদের রাজ-মুকুটে ধারণ করিবে, কিন্তু তাহার অতি পবিত্র জিনিস ধর্ম্মটুকু স্পর্শও করিবে না। বরং ভাল হউক আর মন্দ হউক, স্বীয় ধর্ম্ম ও আচার টুকু পরের মধ্যে আনিয়া ঢুকাইয়া-দিতেই নিতান্ত ব্যগ্র। মন্দ নয়, ইহাও এক

অপূর্ব্ব রহস্য। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, হিন্দুর এ পথ্ নাই, হিন্দুর ধর্ম্ম সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জিনিস। হিন্দুর জাতি-প্রবর্ত্তনা, আশ্রম-বিভাগ, উপাস্য দেবতা ও সাধন-প্রণালী অপর কোন ধর্ম্ম-মণ্ডলীর সঙ্গেই মিলে না। কেন মিলে না, সেই কথা পরে বেদিতব্য।

কেহ কেহ হয় তো বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর একজন আছেন, কিন্তু তিনি আমাদের ধারণার অতীত। আর তাহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের পরিত্রাণের পথ-প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বর এক জনকে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। এইরূপ বিশ্বাস করা এককথা, আর বিজ্ঞান সাহায্যে যুক্তি-তর্কের সহিত সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়া সত্য ধারণ করা অন্য কথা।

রুষিয়ান বল, প্রুসিয়ান বল, আর ফরাসিস বল, সকলই আপন আপন আবাস-ভূমির উপর রাজকীয় রেখাপাত করিয়া এক এক জাতি—অথবা অন্যের উৎপাত ঘটাইবার জন্য এক এক শক্তি। আর হিন্দু আচার, নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম-নীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর এক জাতি।

অন্যেরা এক মায়ার ক্ষেত্রে থাকিয়াই লালিত, পালিত, শিক্ষিত, ও যথেচ্ছ ভোগ-বিলাস লইয়া সংসারী এবং এক পরিত্রাণ-কর্ত্তার উপরে নির্ভর দিয়াই পরিণামধন্য ও নিশ্চিন্ত। আর স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগী হিন্দু জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে প্রবেশ করাইয়া কোথাও জ্ঞান, কোথাও সর্ব্ব-ভূতের অপীড়ন করিয়া ধন জন উপার্জ্জন, কোথাও নিষ্কাম ধর্ম্ম-সাধন, কোথাও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া মোক্ষ সাধন করিতে অভ্যস্ত। সুতরাং মূল ভিত্তি-স্থাপনেই হিন্দুর আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

অন্যান্য দেশের লোক হয়তো ধর্ম্মের গোঁড়ামীতে পরের আঘাতে ভগ্নদন্ত কিংবা এক বারেই পরের হাতে জীবন বলি দিয়া ধন্য ও তজ্জন্যই ঈশ্বর-প্রতিনিধিত্বের পরিচয়ে সিদ্ধকাম, এমন কোন মৃত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের বাক্যানুসরণ করিতে করিতেই ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিতে আশান্বিত। আর হিন্দু চির-বিদ্যমান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করুণাবাহী অগ্নি-জল-বায়ু-সূর্য্য-চন্দ্র-দ্যাবা-পৃথিবী ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া (সঘৃত ঔষধি নিচয় আহুতি) উপস্থিত করিয়া কল্যাণ সম্ভোগ করিতে করিতে কৃতজ্ঞতা-ভরে ঈশ্বরের চরণ তলে যাইয়া উপবেশন করিতে আশান্বিত। হিন্দু (শুধু প্রেয়ারের বলে নয়) যজ্ঞরূপ মহা বিজ্ঞান দ্বারা দেবগণকে প্রসন্ন অর্থাৎ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট করিয়া নিত্য নিত্য শরীর হইতে মনে ও মন হইতে আত্মাতে নিয়া কল্যাণ উপস্থিত করেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, যে স্থানে নিত্য নিত্য যজ্ঞীয় হবি গন্ধ পরিব্যাপ্ত ও ধূমরূপে ঔষধিসার উত্থিত হইয়া বায়ু, বরুণ, আকাশ ও তড়িৎ মিশ্রিত তৈজস কিরণ গুলিকে বিশোধিত করে, তৎস্থানীয় লোকের উত্তম স্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ আয়ু, মনে প্রফুল্লতা এবং আত্মাতে নির্ম্মল ধর্ম্ম-চিন্তা ও পরম পদার্থের সহিত যোগ-ধারণা না আসিয়াই পারে না। একজন কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া শুধু বিশ্বাস-বলে যদি মৃত মনুষ্য বিশেষকে ডাকিয়া

উত্তম স্বাস্থ্য, প্রশংসিত দীর্ঘ জীবন ও উন্নত ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রার্থনা করেন, তবে তাহা সিদ্ধ হইবে বলিয়া কোন জ্ঞানী লোক কখনও প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কিন্তু বেদের ঠিক ঠিক বিজ্ঞান রক্ষা করিয়া তথায় নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে অর্চ্চনা করিলে তত্তৎফললাভ না হইয়াই পারে না। জ্ঞানী পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ক্রিয়া-সেই হিন্দুর অদৃষ্ট রচনা করে এবং সেই অদৃষ্ট বা দেবানুগ্রহই হিন্দুকে উর্দ্ধগতিতে লইয়া যায় ও ব্রহ্ম সান্নিধ্যে নিয়া উপস্থিত করে।

এই সমস্ত কথার পরেও যদি কেহ বলিতে আসেন যে, এই সকল কথা সত্য হইলে ও জগতের আসল ত্রাণকর্ত্তা একজন, যিনি জগতের জন্য প্রাণ দিয়া গিয়াছেন; তবে তাঁহার এই কথার বৈজ্ঞানিক রস-পান-চতুর হিন্দু বলিবেন, আপনার একমাত্র দেবতা, তিনিও পরের কশাঘাতে বলি প্রাপ্ত ও জীবন লীলা শেষ করিয়া ধন্য। কিন্তু আমার অনন্ত দেবতা স্বপ্রবৃত্ত হইয়া জীব-রাজ্যের চিরবলি রূপে উপস্থিতই আছেন, এবং জীব-নিচয়কে ঈশ্বরের নিগূঢ় প্রেম বিলাইতে বিলাইতে স্বর্গরাজ্যে লইয়া পহুঁছাইয়া দিতেছেন। অন্যের কথা যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিক হিন্দু এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করুণাবাহী পরিত্রাণের সহায় জীবন্ত দেবতা প্রকৃতি-পুঞ্জ ছাড়িয়া একটী কবরের উদ্ধৃত মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও জীবনের পরিত্রাণ-পথের সহায় করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু। হিন্দু ঐ নিত্যোপকারী এবং চিরসহায় প্রকৃতি গণের মধ্যেই ভগবানের সুপ্রসন্ন আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অনন্য ভাবে প্রণিপাত করিতে ভালবাসেন। হিন্দুর ভক্তি শাস্ত্রের উক্তি এই :—

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটী, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, জীবনিচয়, দিক, দ্রুমাদি সরিৎ, সমুদ্র এবং অপর যাহা কিছু জাত-বস্তু, সকলই হরির শরীর, অর্থাৎ বহিরাবরণ; অতএব অনন্য জ্ঞানে প্রণাম করিবে।" (ভাগবত)

এই যে অন্তরীক্ষ রূপ মহাভাণ্ডার হইতে সুসূক্ষ্ম জীবনোপকরণ আহরণ করিয়া জীব মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তশ্চর ব্যান বায়ু প্রতিশ্বাসে অলক্ষ্যভাবে কল্যাণ আনিয়া দিয়া যাইতেছে; এই যে তৈজস কিরণ অদৃশ্য বৈজবতাড়িত আনিয়া চক্ষুর পলকে পলকে জীবদেহে রাখিয়া যাইতেছে; এই যে বারি-নিচয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শুষ্ক কণ্ঠের পিপাসা দূর করিয়া যাইতেছে; এই যে ধরিত্রীর দেহোৎপন্ন সুস্বাদু অন্ন ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তুষ্টিপুষ্টি বিধান করিয়া যাইতেছে,— ইত্যাদি সর্ব্বত্রই বহিরাবরণ টুকু উঠাইয়া চাহিয়া দেখ, সেই এক দেবতা বিশ্বপালক হরিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং যে দিকে অভিমুখী হইয়া প্রণাম করিবে, তাহাই শ্রীহরিতে প্রযুক্ত হইবে। হরি সহস্র চক্ষু-দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, সহস্র মুখদিয়া কথা বলিতেছেন, সহস্র মাতাদিয়া সন্তান-নিচয়কে দুগ্ধ প্রদান ও খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন। দিব্য চক্ষুতে চাহিয়া দেখ, সকলই হরিময়।

তুমি হয়তো তোমার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে একটী মাত্র নরশিশুতে ঐশী শক্তির অবতরণ

বুঝিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু হিন্দুর ঐ তেজস্বিনী প্রতিভা প্রবুদ্ধকণ্ঠে ঈশ্বরের অসংখ্য অসংখ্য অবতারের প্রসঙ্গ করিতেছেন। "যেমন কুল্যা অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালী সকল স্থির হ্রদের জল বহন করিয়া দেয়, তেমনি ঈশ্বরের অসংখ্য অবতার জীবলোকে স্বর্গীয়তা বহিয়া দিতেছে।" (ভাগবত) অহো হিন্দুর কাছে কি সুমিষ্ট, কি সুন্দর জ্ঞানগর্ভ অবতার-সংবাদ। এই জন্যই বলি, হিন্দুর সঙ্গে কাহারও মিলিবে না, হিন্দুর নিকট কেহ আসিও না।

আবার হিন্দুর ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে অনুপদিষ্ট অনেকেই বলিয়া থাকেন, হিন্দু মাটীর পুতুল পূজেন কেন? এই কথার উত্তরে ঐ সকল ব্যক্তিকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে হয়, আপনারা বালককে বর্ণমালা শিক্ষা দিবার সময়ে এ, বী, সী ইত্যাদি অক্ষর ব্যবহার করেন কেন? তার্কিক বলিবেন, বর্ণমালা সাধন করিতে এইরূপ অক্ষরাবৃত্তি প্রয়োজনীয়। তদুত্তরে হিন্দু অবশ্যই বলিতে পারেন, অনন্ত ঈশ্বরের এক একটী ভাব মানবীয় ধারণায় আনিয়া দিবার জন্যেও এই সমস্ত মূর্ত্তি-যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। ঠিক অক্ষর-মালার ন্যায় ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ঐ সকল মূর্ত্তি মালাতে সাধন করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানিয়া রাখুন, ধর্ম্ম-ভূমিতে শিক্ষা-শাস্ত্রের ইহাও এক উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান। কিন্তু আবার কোনরূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় পরিণাম দর্শী হিন্দু স্পষ্টবাক্যে নোটিস দিয়া রাখিয়াছেন, "প্রতিমাতে কেহ শিলাবুদ্ধি করিতে পারিবেন না। তাহা করিলে নরক দর্শন করিতে হইবে।" অর্থাৎ ভাবতঃ অধঃপাতে যাইয়া পতিত হইবে। এই স্থলে তার্কিক পাঠক বলিতে পারেন, মূর্ত্তিকে মূর্ত্তি ভাবিবে না তো কি ভাবিবে। তদুত্তরে হিন্দুর নির্দ্দেশ এই, অনন্ত ঈশ্বরের আলাদা আলাদা এক একটি স্বরূপচিন্তা আনিয়া তদুপরি পুষ্পাঞ্জলি দিবে। আবার আপত্তি, তাহাতে লাভ কি? উত্তর, পরমাত্মার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ-বৃদ্ধি এবং সেই অনন্তের স্বরূপ-পরিজ্ঞানে অকুণ্ঠ উৎসাহ লইয়া তদভিমুখে ধাবন। চিন্তাশীল ধীমান পাঠক একবার মনে করিয়া দেখুন, সামান্য একটী বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা অথবা কোন একটা সামান্য ক্ষেত্রের জ্ঞান বিস্তার করিবার জন্য পণ্ডিত-মণ্ডলী বিবিধ চিত্র ও কত শত যন্ত্র শিক্ষা-স্থানে উপস্থিত করিতেছেন; কেননা তাহা হইলে সহজেই কত্তটী বুদ্ধিগম্য করাইয়া বালকের ধারণায় উপস্থিত করা যায়। অথচ অপার অগণ্য ও অনন্ত-মহিমান্বিত ঈশ্বরের জ্ঞান অবোধ জড়জগদ্-বাসী মানবকে শিখাইবার জন্য ঐ সমস্ত মূর্ত্তি-যন্ত্রের ব্যবহার অসঙ্গত, এই কথা কি শ্রবণযোগ্য? এক দিকে যেমন নিত্য কল্যাণদায়িনী ঈশ্বরেরই সাক্ষাদধিষ্ঠান লইয়া উপস্থিত বহিঃপ্রকৃতির জ্ঞান আনিয়া মূর্ত্তি যন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ স্বয়ং ঈশ্বরেরই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-মূর্ত্তিতে পরিগৃহীত। ব্রহ্মা বলিলে হিন্দু সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বুঝেন, হংসবাহন চতুর্ভুজ ও চতুরানন মূর্ত্তিটী ঐ আসল সৃষ্টিকর্ত্তারই যন্ত্রমাত্র। ইহার প্রকৃত ভাব এই, হিন্দু সৃষ্টিবিষয়ক মূল প্রকৃতি

গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, সৃষ্টির মূলবীজ জলেতেই প্রধানরূপে অভিব্যক্ত, তজ্জন্য জলের উপরেই ঘনতর হইয়া সৃষ্টিকর্তৃত্ব অবভাসমান, ইহাই পরিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত জলকেলিতৎপর হংসকে বাহন করিয়া ব্রহ্ম-মূর্ত্তি সুব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ পালন-কর্তৃত্ব ও সংহার কর্তৃত্ব যে ভাবে জগৎদর্পণে প্রতিফলিত, ঠিক তাহাই তাহাদের মূর্ত্তি-যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত। অনেক সময়ে মূঢ় লোকেরা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের কার্য্যে ভয়ানক রূপে দোষারোপ করে, যেমন ব্রহ্মা নিজকন্যা সন্ধ্যার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। ইহা মানুষের ভাবে দেখিলে অবশ্যই অত্যন্ত কুৎসিত। কিন্তু সন্ধ্যা পদার্থটী কি, ইহা অগ্রে জানা উচিত। সন্ধ্যা ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত অতি মনোজ্ঞ দৈনিক ক্রিয়া। ইহা অবশ্যই রজোগুণ হইতে উদ্ভূতা, কিন্তু সন্ধ্যা-ক্রিয়াটী এমনই সুন্দরী যে, তাহাতে অভিরমণ করিবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মাই ধাবিত হইলেন। এইখানে সন্ধ্যা বাস্তবিক কি একটী কন্যা, না ব্রহ্মাই একটী পুরুষ। এই পৌরাণিক বর্ণনাতে শুধু সন্ধ্যা-ক্রিয়ার সৌন্দর্য্যের ও মনোহারিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর, বিষ্ণু একবার জলন্ধর-দৈত্যপত্নী সতী বৃন্দার সতীত্ব নাশ করিয়া ঐ দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানে অতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা নানা কথা বলিয়া স্বীয় মূর্খতার পরিচয় দেয়। কি বিপাক! বিষ্ণু পদার্থটী কি, আগে তাহা জান, পরে দোষারোপ করিও। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ্ণু ঈশ্বরেরই বিশ্বপালনী শক্তি। এই শক্তিটী নিখিল বিশ্বব্যাপিয়া আছে বলিয়াই বিষ্ণু নাম হইয়াছে। (বিষ্ণাতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি বিষ্ণুঃ) সৃষ্টির প্রারম্ভে জলন্ধরও একটী জলের সঙ্গে মিশীন সৃষ্টি কার্য্যের বিরোধী ক্ষার পদার্থ মাত্র। আর বৃন্দা ঐ পদার্থের প্রাচুর্য্য। ঐ প্রচুরতা নষ্ট না করিলে দৈত্যবধ হয় না। অথচ ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ দৈত্যের উৎপাতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তখন বিষ্ণুর চক্রে বৃষ্ট্যাদি দৈব ঘটনায় ঐ প্রাচুর্য্য নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ সত্ত্ব-গুণ স্পর্শে তাহা হইতে উত্তমৌষধি তুলসীর জন্ম হয়। তুলসী বিশ্ব-রক্ষায় অত্যন্ত অনুকূলা বলিয়া বিষ্ণু শক্তি-রূপে পৌরাণিক বর্ণনায় পরিগৃহীতা হইয়াছেন। এইখানে সকলেরই জানা উচিত, যে যে স্থানে এক একটা দৈত্যবধের জন্য ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অত্যন্ত ব্যাকুলতা, সেই সেই স্থলেই মূলতঃ সৃষ্টি-বিরোধী এক একটী প্রাকৃতিক পদার্থ লক্ষ্য করিতে হইবে। আর কেবল তুলসী কেন, জলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইতে যে তাবৎ উদ্ভিদের জন্ম, এই কথা আধুনিক উদ্ভিদ্-বেত্তৃগণও স্বীকার করেন। তবেই বিষ্ণুর মূলতত্ত্ব সকলে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, বিষ্ণু তোমার আমার মত এক ভ্রষ্টাচারী কদর্য্য পুরুষ নহেন। বিষ্ণু বিশুদ্ধ সত্ত্ব ও অত্যন্ত মঙ্গলকারিণী বিশ্বের পালনী শক্তি। তিনিই বিশ্বের নিখিল পালনোপকরণ অর্থাৎ সর্ব্বসম্পদ্ লক্ষ্মীকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। তার্কিক পাঠক! এই মূল তত্ত্বটীতে তুমি এখন চারিবেদ ও বৌদ্ধ শাস্ত্র মিশাইয়া একটু চিন্তা কর।

এইরূপে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অত্যন্ত কল্যাণ বক্ষে করিয়া জগতের উপর যে অবতারণা তাহাই তাঁহাদের মূর্ত্তি-যন্ত্রে ঘনীভূত করিয়া সন্নিবেশিত। ইন্দ্রের বাহন মেঘ, বজ্র, তাঁহার অস্ত্র, গুহাগত কুঝটিকা বা অন্ধকার তাঁহার চিরশত্রু বৃত্রাসুর, সমুদ্রোদ্ভূত জলহস্তী তাঁহার দ্বার রক্ষক, উচ্চ নিনাদ তাঁহার উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, পুলমজা দৈত্য কন্যা অর্থাৎ অত্যন্ত অকল্যাণের ভিতরদিয়া কল্যাণময়ী ক্রিয়া তাঁহার প্রিয়পত্নী শচী। ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণনাতেই বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝিয়া লওয়া উচিত, দেবরাজ পদার্থটী কি। বলাবাহুল্য, সেই অত্যন্ত কল্যাণকারী বায়ু বরুণ প্রভৃতি সর্ব্বদেবের নেতা দীপ্যমান দেবতা তড়িৎ। ইহাতে অত্যন্ত হাসিবার একটী কথা এই, পশ্চিম দেশের আচ্ছা খ্যাতনামা পণ্ডিতসকলও কৃপাকটাক্ষে সদ্‌ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়া রাখিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্যেরা সরল বিশ্বাসে প্রকৃতির পূজা দিয়াছেন। হায়, ইহাকি সরল বিশ্বাসের কথা বা নিরর্থ বোকামী? এই যে দেবরাজের (দৈব তাড়িতের) আশীর্ব্বাদ না হইলে তুমি জড়পিণ্ড হইয়া মাটীতে লুণ্ঠিত থাকিতে। এই যে প্রাণের স্ফুরণ না হইলে তোমাকে চির মৃত থাকিতে হইত, এই যে ধমনীতে রঞ্জিত বারুণী-রসের সঞ্চালন না থাকিলে, তুমি শুষ্ক কাষ্ঠ হইয়া হীন সৃষ্টিতে পরিগণিত হইতে, আর এই যে জঠর-কুণ্ডে অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে, ইঁহা না হইলে তোমার কিদশা হইত তাহা সহজেই বুঝিতে পার; তথাপি কি বলিবে, ইহা সরল বিশ্বাস? যাহা হউক বাহ্যাভ্যন্তরদর্শী বুদ্ধিমান পাঠক দিগকে ঐ দেবলীলা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার আর প্রয়োজন করে না। তাঁহারা আপনিই পৌরাণিক-কবিত্বময়ী বিস্তার-বর্ণনা এক একটি মূর্ত্তিতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

কিন্তু ইহার ও উপরের দুই চারিটী কথা এস্থলে বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সকলেই জানেন, প্রাগুক্ত সমস্ত দেবাবতরণ ও তাহাদের তাবৎ কল্যাণ-প্রবর্ত্তনা ঈশ-সৃষ্টি-লীলার উপরেই অভিব্যক্ত। অতএব এইক্ষণে সৃষ্টির পূর্ব্বকথা ভারতীয় ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে কিরূপ পরিব্যক্ত, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। সেই তত্ত্ব প্রায় সকল দেশীয় লোকের নিকটই দুর্জ্ঞেয় ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন। প্রতীচ্য পণ্ডিত-মণ্ডলী তথায় চক্ষু ধরিতে না পারিয়াই বলিয়া রাখিয়াছেন, "কিছু নাই হইতে সমস্ত হইয়াছে।" "কিন্তু প্রজ্ঞা-চক্ষু ধ্যানপরায়ণ হিন্দু ঐ কিছুনাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ভাল বাসেন না। সেই কিছু-নাইর মধ্যেও তাঁহারা বিজ্ঞান-নেত্র ধরিয়া দেখিয়াছেন, এই যে কিছু নাই নিতান্ত অপদার্থ ধূলি-বালি, ইহা হইতেও অতি সুন্দর সুগন্ধি ফুল, সুমিষ্ট ফল, পরমাসুন্দরী ধর্ম্ম-পরায়ণা নারী ও তত্ত্বজ্ঞ সুধার্ম্মিক পুরুষ বাহির হইতেছেন। আবার তাঁহারাই যাহা করিবার কিছু করিয়া বিলয়-মুখে ঐ বর্ণহীন, রূপহীন, স্বাদুতা-বিহীন, জ্ঞান-ধর্ম্ম হইতে একেবারেই মুক্ত ও পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ধূলিতে পরিণত হইতেছেন।" এর উপরেও আবার হিন্দু কৃত্রিম প্রক্রিয়া করিয়া দেখিয়াছেন, অতি সুকঠিন লৌহাদি

ধাতুকে পর্য্যন্ত তাপাধিক্যে অথবা রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রথমতঃ দ্রব ও তৎপর আরও প্রক্রিয়া করিয়া সূক্ষ্ম বায়ুবৎ অদৃশ্য করিয়া দেওয়া যায়। আবার তাহাই যন্ত্রাদিতে বিধৃত থাকিলে স্থূলাভিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এতদৃষ্টেই তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইলেন, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে যাতায়াতই জাগতিকক্রিয়া এবং ধূলিরূপেই হউক, অথবা আকাশাকার সুসূক্ষ্ম পরমাণুরূপেই হউক, সমস্ত সৃষ্টির মূলেই কিছু আছে। সেই কিছুর অসদ্ভাব আজ পর্য্যন্ত কোন নাস্তিকও দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা "কিছু নাই বস্তুর বিদ্যমানতা নাই এবং কিছু আছে বস্তুর অবিদ্যমানতা নাই" এই সিদ্ধান্ত আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এরপর তাঁহারা ইহাও উপলব্ধি করিলেন, ধূলি-বালি হইতে তরু লতা ও জীবজন্তু-নিষ্কাশনে যেমন সূর্য্যাদিদেব-প্রবর্ত্তনা না হইলেই হয় না, তেমনি সেই পরমাণুমাত্রাবশিষ্ট কিছু নাইর মূলেও জ্ঞানসহ কোন এক শক্তির প্রবর্ত্তনা না থাকিলেই চলে না। কিন্তু যেখানে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি প্রাকৃতিক দেব-সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সশক্তিক ব্রহ্মাদি ত্রিগুণ মহিমা নীরব ও নিস্পন্দ, তাদৃশাবস্থায় অন্য আর থাকিবে কি? তথাপি এইখানে সকলেরই বুঝিয়া লইতে হইবে, যেখানে কিছু নাই, পরমাণু মাত্র অবশিষ্ট, অথচ এই সমস্ত অন্ধ পরমাণুতেই একটি অতি সুশৃঙ্খল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জগৎ রচনা করিতে হইবে, তথায় ভবিষ্যৎ যাবৎ শুভাশুভ জ্ঞানসহ অত্যন্ত কার্য্য-কুশলা একটী শক্তি-প্রবর্ত্তনা না থাকিয়াই পারে না। কিন্তু আবার ইহাও বুঝিয়া লইবার কথা, সেই জ্ঞান বা চিন্মাত্র পদার্থ, সমস্ত উন্মেষণের প্রবর্ত্তক হইলেও সেই নিস্তব্ধ অক্রিয়াবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ। অতএব জ্ঞান সেইখানে শবরূপে পতিত এবং কিছু না থাকায় সম্পূর্ণ আত্মক্রীড় ও আত্মরত। অথচ ঐ সুশুভ্র পদার্থটীই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু, সুতরাং তিনি সদাশিব। আর ঐ যে লীলাময়ী বিশ্বকর্ত্রী বিশ্বমাতা মহাশক্তি সমস্ত সুরাসুর ও নরসৃষ্টি খণ্ডবিখণ্ড ও সকবলে নিষ্পেষণ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর মুখে অট্টহাসির সহিত রণবেশে ঐ কিছু নাইর ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সাড়া-শব্দবিহীন অগম্যতাই মায়ের বাহ্যদৃশ্য কালরূপ। আর ঐ কালের উপর বিন্যস্ত ঐ যে স্খলিত-বন্ধন পরমাণু নিচয়ের উচ্ছৃঙ্খলাবস্থান, ইহাই মায়ের আলুলায়িত কেশ, এই জ্ঞানেই সেই আদ্যাশক্তি মুক্তকেশী। আর আদ্যন্তরহিত অপরিমেয় পদার্থের আবরণ অসম্ভব, অতএবই তিনি দিগ্‌বসনা। আর ঐ যে মহাপ্রলয়ের মূল কথা—সুরাসুর মিশ্রিত নষ্ট-সৃষ্টি কদর্য্য ও অপ্রিয় আসুরিকতা দূর করিয়া প্রিয় সুর-নর-সৃষ্টির নির্ব্বিঘ্নতা ও কল্যাণ সাধন, তাহারই অভিব্যক্তির জন্য মার মূর্ত্তি-যন্ত্রের দক্ষিণে বরাভীতি হস্ত ও উপ্রধান, বামে ছিন্ন অসুর-মুণ্ড ও নিষ্কোষ খড়্গ-প্রদর্শন।

এই সুবিস্তৃত জ্ঞান-গর্ভ তত্ত্বটী আদ্যাশক্তি কালীমাতার মূর্ত্তি-যন্ত্রে প্রদর্শিত। ইহা একটী নিরর্থ কল্পনার কথা নয়।

"সত্যং শিবং সুন্দরং আনন্দরূপমমৃতং" নির্গুণ ব্রহ্মের লীলাময়ী শক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূজা ভক্তি ও প্রণিপাত জানাইবার জন্যই এই মূর্ত্তির অবতারণা।

পাঠক মহাশয় এখন জানিয়া রাখুন, হিন্দু সত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য কোথায় অবতরণ করিয়াছিলেন। আর যে রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা কেমন সুকৌশলে মূর্ত্তি-যন্ত্রে রক্ষিত, এবং সাধন সময়ে ঐ অগম্য তত্ত্বজ্ঞান কেমন সুস্পষ্ট-রূপে ধ্যেয় পদার্থটি আনিয়া দেয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠিক বর্ণমালা সাধনের ন্যায় হিন্দুর মূর্ত্তি সাধন। বর্ণমালা-শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত অক্ষরগুলি যেমন নিশ্চয়ই উচ্চার্য্যমান ধ্বনি নহে, অথচ ঐ ধ্বনি সকল যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া সাধিত হয়, তাবৎ ঐ বাঁকাবুকা আঁকগুলিকেই সাদরে সেবা করা আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং পরে অভ্যস্ত হইলেও তাহা যোজনা করিয়াই তন্মধ্য দিয়া সমস্ত জ্ঞানের পরিচালনা করা হয়, ঠিক সেইরূপ সুন্দর হউক আর নাই হউক, ধর্ম্ম বিজ্ঞান-প্রবর্ত্তক হিন্দুর ঐ হাত-পা-ওয়ালা ঠাকুর-মূর্ত্তিগুলিও ধর্ম্ম-চর্চ্চা ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-পরিচালনার যন্ত্র। একমাত্র ঈশ্বরেরই অনন্ত তত্ত্ব বা স্বরূপ-জ্ঞান এই কোটি কোটি যন্ত্রে অধীত ও আয়ত্তীকৃত হইতেছে। আবার ইহাতেও বিশেষ এই, বর্ণমালার আঁকগুলি মোটামুটি এক একটি ধ্বনির দ্যোতনা করে, আর দেব-মূর্ত্তির হাত, পা, বর্ণ, বসন, ভূষণ ও বাহন প্রভৃতি সকলই এক এক বিভিন্ন অর্থ ও নিগূঢ় ভাব স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই সমস্ত অতি গভীর যুক্তি তর্কসহ জ্ঞানান্বেষণ ও সত্য লাভ সত্ত্বেও কি পাঠক বলিবেন, হিন্দু নিতান্ত সরল বিশ্বাসে দেবদেবীর অর্চ্চনা করেন? অবশ্য কেহ ইচ্ছা করিলে মানুষ কেন একটী গাছকেও স্বীয় পরিত্রাণ-কর্ত্তা বলিয়া জগতের নিকট ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব সজ্ঞানে বুঝিয়াও সর্ব্বত্র যে যে ভাবে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় পরিচালিত হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ঠিক প্রকৃতির অনুযায়ীরূপে ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতে হইলে, হিন্দুর পথেই উপস্থিত হওয়া আবশ্যক হইবে।

হিন্দুর বাহির ভিতর সকলই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র, সকলই তীর্থময়। হিন্দু বাহিরে যেমন অতি সুশৃঙ্খল দেব-প্রবর্ত্তনাসহ ঈশ্বরের একটী বিচিত্র সৃষ্টি-লীলা নিরীক্ষণ করেন, আবার স্বগত আত্ম-নিষ্ঠভাবে ও সেইরূপ দেবময়, তীর্থময় ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করেন, এবং তজ্জন্যই হিন্দুর বাহিরে ভিতরে সমভাবে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত। হিন্দুর বাহিরে ও অগ্নি, ভিতরে অগ্নি, উভয়এই সমভাবে আহুতি দিয়া দেবতার প্রসন্নতা বিধান করা হিন্দুর নিত্য-কার্য্য। হিন্দুর বাহিরে যেমন দেব-পুরোহিত অগ্নির হস্তে আহুতি দিয়া অন্যান্য দেবগণের নিকট সাদরে যজ্ঞভাগ প্রেরণ করেন, ঠিক সেই ভাবে ভিতরেও জঠরানলে তেমনি মন্ত্রপূর্ব্বক হবির্যুক্ত বিশুদ্ধ যজ্ঞীয়ান্ন আহুতি দিয়া ঐ দেব-পুরোহিত অগ্নিরই সাহায্যে দেহাধিষ্ঠিত দেবগণে যজ্ঞভাগ উপস্থিত করিয়া থাকেন। অন্যেরা হয়তো চৌদ্দ দেশের

খাদ্য একত্র করিয়াও ভোগ-বিলাসের উপরে আর কিছুই দেখেন না, কিন্তু আত্ম-পাকী সংযতাহারী হিন্দু তাঁহার আয়ুষ্কর ও সাত্ত্বিক বল-বুদ্ধির প্রবর্ত্তক হবির্যুক্ত যজ্ঞীয় অন্ন সম্মুখে করিয়া "অন্নং ব্রহ্ম রসোবিষ্ণুঃ ভোক্তাদেবমহেশ্বরঃ" এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে অগ্রে ব্রহ্মের ত্রিগুণ মহিমা দর্শন করেন, এবং তৎপরে অগ্নিতে আহুতি দেন। অন্ন ব্রহ্ম, কেননা মাতৃ-পিতৃ-ভুক্ত অন্নের সারই শুক্র-শোণিতে পরিণত হইয়া এই অন্নময় দেহ-কোষ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, এবং দিনে দিনে অন্নই রক্ত মাংস-মজ্জা পরিপুষ্ট করিয়া মানবীয় পূর্ণ সৃষ্টিতে নিয়া পঁহুছায়। কেবল তাহাও নয়, ঐ বিধাতা অন্ন রক্ত-মাংস-মজ্জার উপরেও আবার সদ্বুদ্ধি রচনা করিয়া ব্রহ্মতৎপরতা ঘটাইয়া দিতেছে। আর "রসোবিষ্ণুঃ" ইহাও কেমন এক জ্ঞান-গর্ভ-বাক্য; এই অন্নের রস অর্থাৎ অন্ন-সার বিশ্বপোষণ করিতেছে। সমস্ত জীব-জন্তু, এমন কি তরু-লতা পর্য্যন্ত অন্ন-রস দ্বারা পরিরক্ষিত। সুতরাং ইহাতে ঈশ্বরেরই পালন-কর্তৃত্ব বিদ্যমান। আর তৃতীয় যিনি সমস্ত ভোজ্য চিবাইয়া চিবাইয়া সংহার করিতেছেন, সেই ভোক্তাই সংহার-মূর্ত্তি দেব মহেশ্বর রুদ্র।

এইরূপ কেবল ভোজনে নয়, ভজনে বসিয়াও হিন্দু যোগধারণায় উদ্গীথ ব্রহ্ম-মন্ত্র-প্রণব-যোগে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তাকে বার বার স্মরণ করিয়া প্রাণে ধারণ করেন। এই সমস্ত ভাবে মূর্ত্তি কোথায়? আসল চিন্ময় পদার্থই যে অন্তরের লক্ষ্য ও প্রাণে পরিগৃহীত। এর উপরেও কি তার্কিক পাঠক বলিবেন, পৌত্তলিক হিন্দু পুতুল পূজা করিতে করিতে দুর্গত? আচ্ছা নিরপেক্ষ ধীমান্ পাঠক! আপনিই অবধারণ করুন দেখি, এই রূপে জীবনে মরণেও সর্ব্বাবস্থ ব্রহ্ম-যোগ ভাল, না এক জন কবর দেওয়া মরা মানুষের মিথ্যা সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকা ভাল? যাঁহার প্রশস্ত দৃষ্টি নাই, ব্যাপক ভাবে শক্তি ধারণ করিতে যিনি শেখেন নাই, তিনি হয় ত এক মৃত পুরুষেই ব্রহ্মের পূর্ণ আবির্ভাব কল্পনা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের বিশ্ববিচারণার অধিকার জন্মিয়াছে ও ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপর দৃষ্টি গিয়াছে, এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন শক্তি যন্ত্রস্থ করিয়া অধ্যয়ন ও ধারণাযোগ্য করিয়া লইতে যাঁহারা পারিতেছেন, তাঁহারা ঐ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত পরম পদার্থ ছাড়িয়া একটী ক্ষুদ্র মনুষ্যে যাইয়া কেনই আত্মসমর্পণ করিবেন? তুমি বল, এই ক্ষুদ্র মনুষ্যটী ব্রহ্ম, আর হিন্দু বলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," এই পরিদৃশ্যমান সকলই ব্রহ্ম। অর্থাৎ সকলেতেই ব্রহ্মের পূর্ণ আবির্ভাব, এবং এই নিখিল পদার্থের পরিত্রাণের সহায়। এই মূল সূত্র ধরিয়াই হিন্দু জড় পরমের একতা প্রদর্শন ও অজড় পরম পদার্থের কোটিতে কোটি ভাব স্ফুরণ এবং কোটি কোটি যন্ত্র-মূর্ত্তিতে তাহার ব্যক্তিকরণ করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্যই আজ হিন্দু অনন্ত বা সার্দ্ধ ত্রিকোটিরূপে ঈশ্বরের পূজা ও নমস্কার দিয়া ধন্য। আর কি চাও? হিন্দু বুকে হাত দিয়া সেই একদেবেরই অসংখ্য বীজমন্ত্র জপেন, চক্ষু মুদিয়া সেই একেরই অনন্তরূপ দর্শন করেন,

এবং বাহিরে ফুল চন্দন দিয়া প্রত্যেক রূপেই আদর করেন। বিস্তার-দর্শন সংক্ষেপে মনন করিয়া ধারণায় স্থিরতর রাখিবার জন্য বীজ-মন্ত্র যেমন উৎকৃষ্ট উপায়, অনন্তের জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সংক্ষেপে বুদ্ধি-গম্য করাইয়া দিবার জন্য মূর্ত্তি-যন্ত্রের ব্যবহার যেমন অত্যন্ত ফলোপদায়ক, আর নিরাকার অজড় পদার্থকে জড়-রাজ্যের আদর দিবার জন্য ধূপদীপ ও গন্ধ পুষ্পের ব্যবহার যেমন অত্যুৎকৃষ্ট প্রেম নিদর্শন, এমন আর কি আছে? তুমি ওসব বুঝ আর নাই বুঝ, প্রেমিক হিন্দু ভিতর হইতে প্রেম-ভক্তি ও বাহির হইতে ফুল-চন্দন দিয়াই আপ্যায়িত। সকলে পরিজ্ঞাত হউন, ইহাই হিন্দুর প্রতিমা পূজার ব্যাখ্যা বা সংক্ষিপ্তনোট। (১)

শ্রীভারত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১) খ্রীষ্টধর্ম্মের মায়াবিনী দূতীগুলি আমাদের নগরে নগরে ঘুরে, এবং যখন তখন হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেব দেবীর নিন্দা শুনাইয়া মহিলাদিগকে বিরক্ত করে। লেখক এই মস্তিষ্ক-বিহীন অন্নদাসীদিগকে বুঝাইবার জন্য এই সুন্দর প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপযুক্ত পথেই চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ মহৌষধে ইহাদিগের উৎপাত ঘুচিবে না; এজন্য উপায়ান্তর নাই—মূর্খের জন্য স্বতন্ত্র ঔষধ চাই। শিঃ পঃ সঃ।

শিক্ষা-সম্বাদ।

"প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইল, বঙ্গদেশে উচ্চ শিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উচ্চ শিক্ষার মহাযজ্ঞে বঙ্গবাসী ধন প্রাণ স্বাস্থ্য উৎসর্গ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিবার জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কঠোর ব্রতে, এই কঠোর সাধনায় বঙ্গবাসী অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বঙ্গের অধিবাসীর তুলনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা নগণ্য হইলেও সামান্য নহে। বর্ষে বর্ষে শত শত যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন; প্রতিযোগীতায় বঙ্গদেশে অধ্যবসায় এবং অন্যান্য স্থানে বঙ্গীয় যুবক অসামান্য এবং প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, ইহা বঙ্গবাসীর স্পর্দ্ধা এবং গৌরবের বিষয় হইলেও শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য, জীবনসংগ্রামে তাঁহাদের উপযোগিতা এবং দেশের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদিগে যেমন প্রজার জীবন এবং সম্পদ নিরাপদ হইয়া দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে; চিন্তাশক্তির বিকাশ হইতেছে, ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইতেছে, পক্ষান্তরে ইংরেজ জাতির

অর্থোপার্জনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাহাদের অর্থ ও কার্য্যকরী শিক্ষার সম্মিলিত শক্তির নিকটে বঙ্গবাসীর জীবন রক্ষার্থ অপরিস্ফুট ক্ষীণশক্তি পরাজিত হইতেছে। সমশক্তি ব্যতীত প্রতিযোগিতা সম্ভবে না এবং সমান শক্তি ব্যতীত সমতা রক্ষা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং চিন্তাক্ষেত্রে একই আগুনের নিয়ম; দুর্ব্বল সবলের নিকট পরাজিত। প্রকৃতি আপনা হইতেই দুর্ব্বলের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দেয়।” চারুমিহির।

“পুনায় ছাত্রমণ্ডলীর অভিনন্দনের উত্তরে সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ধর্ম্ম ও নীতির অপরিবর্ত্তনীয় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির আলোচনা ছাত্রদিগের পক্ষে কখনও অহিতকর হইতে পারে না। ধর্ম্ম ও নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাজনীতির আলোচনা করা ছাত্রদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সুরেন্দ্রবাবু ছাত্রমণ্ডলীকে যে কথা বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকদিগের প্রতি প্রযুজ্য। আজকাল শিক্ষিতদিগের মধ্যে অধিকাংশস্থলে নীতির অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হইতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনেকেই অনুরাগশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ অবস্থায় কেবল রাজনীতি চর্চ্চা দ্বারা দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে, এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। বহু শিক্ষিত যুবক সুরেন্দ্র বাবুকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং সুরেন্দ্রবাবুর এই কথা তাহাদের নিকট উপেক্ষায় বিষয় হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। ধর্ম্ম ও নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দেশে রাজনীতিরও সম্যক আলোচনা হইতেছে না।” চারুমিহির।

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছেন যে, যে পরীক্ষার্থী ফি দাখিল করার পর ফাষ্ট আর্টস-কি বি, এ, এম, এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইবেন, পুনরায় ফাষ্ট আর্ট, কি বি, এ, কি এম, এ পরীক্ষা দিবার কালে অর্দ্ধ ফি দাখিল করিলেই চলিবে।” এই নিয়ম করাতে দরিদ্র ছাত্রদিগের নিকট বিশ্ব-বিদ্যালয় আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

এক টাকা সম যেই কাণা কড়া দেখে,
সমাজের সেবা তার কুষ্টিতে না লেখে।

বচনে হইত যদি দেশের উদ্ধার,
বাঙ্গালা স্বাধীন হ'ত আগে সবাকার।

গণ্ডগোলে সিদ্ধি-লাভ হয় না কখন;—
নির্জ্জনে মঙ্গল-চিন্তা, নীরবে সাধন।

দরিদ্রের নাহি ধন, আছে ত জীবন,—
দেশ-হিত-যজ্ঞাহুতি কি আছে এমন?

শিক্ষা-পরিচর।

৬ষ্ঠ ভাগ | ফাল্গুণ, ১৩০২ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

শিরোনামাঙ্কিত মহাত্মার বিষয় আরও কিছু লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি, তজ্জন্য অদ্য আবার লেখনী ধারণ করিলাম।

যেবার শ্যামনগর ষ্টেসনে রেলগাড়ীদ্বয়ের সংঘর্ষণে বহু লোক হতাহত হয়; সেই বার ৺ভূদেববাবু যশোহর নর্ম্মালস্কুল পরিদর্শনে আসিয়াছেন। যশোহর জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে একদিন অপরাহ্নে জলযোগের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; বেলা চারিটার সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বাসায় উক্ত মহাত্মার পদার্পণ হইয়াছে। ঠিক এই সময়ে খ্যাতনামা ৺ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য ইঞ্জিনিয়র মহাশয়, এবং ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে অতিথি রূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অতএব সেই অপরাহ্ন সময়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে বঙ্গের চারিটী তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির সংমিলন হইয়াছে; এই চারিজনের মধ্যে প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং একজন। আমরা চারি পাঁচ জন শিক্ষক ও তিন চারি জন উকিল, দুই একজন দেশীয় হাকিম ও স্থানীয় স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় প্রভৃতি দশ বারজন লোকও তথায় দর্শক ও শ্রোতারূপে সমবেত হইয়াছি। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্যে সকলের সারবান্ জলযোগ শেষ হইল; বেলা ৫টার সময় নানাবিধ গল্প আরম্ভ হইল।

৺ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "বাঙ্গালা কাগজের মধ্যে এডুকেশন গেজেট খানিকে বড় ভালবাসিতাম, পড়িতাম, এবং উহাতে মধ্যে মধ্যে লিখিতাম। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের জনৈক আবদারে ছেলের অত্যাচারে সে সুখে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইতেছে।"

ক্ষেত্রবাবুর "আবদারে ছেলে" স্বয়ং ভূদেব বাবু। এস্থলে বলা আবশ্যক, ভূদেববাবু ক্ষেত্রবাবুর শিক্ষক ও তাঁহার প্রতি ক্ষেত্রবাবুর অচলাভক্তি। এত ভক্তি আজিকালিকার পুত্রেরা পিতার প্রতি

প্রদর্শন করেন কিনা সন্দেহ। ভূদেববাবুও ক্ষেত্রকে যত স্নেহ করিতেন, স্বীয় ঔরস জাত সুকৃতীসন্তান গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেবকে বোধ হয় তত করিতেন না। উভয়েই যারপর নাই স্বাধীনচেতা, সুতরাং উভয়ের পরস্পর এত প্রণয় ছিল। ভূদেববাবুর স্বাধীন চিন্তার সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তির কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, ক্ষেত্রবাবু জিনিসটী ছিলেন কি, তাহা বুঝাইবার জন্য তদীয় স্বাধীন চিন্তার একটীমাত্র পরিচয় দিতেছি। ক্ষেত্রবাবু ৪০০৲ শত টাকা বেতনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন নামজাদা কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার অপেক্ষা অধস্তন ও অকর্ম্মঠ দুইটী শ্বেতকায়কে ইঁহার উচ্চতর পদে উন্নীত করাতে ইনি স্বীয় পদ পরিত্যাগ করেন এবং তন্নিবন্ধন অত্যন্ত সাংসারিক কষ্টে নিপতিত হয়েন। কিন্তু তাহাতেও তেজের হ্রাসতা হয় নাই। একদা একটী বন্ধু তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে, ডাল, মাছের ঝোল, চর্চ্চড়ি ও টক দিয়া তাঁহাকে ভাত দিয়াছেন; এবং স্বয়ংও আহার করিতেছেন। বন্ধু কহিলেন, "ক্ষেত্র, এখন কি মাংস না হলে খেতে পার?" একে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অগ্নিশর্ম্মা তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্ষেত্রনাথ; তিনি ঐ শ্লেষ বাক্যে রুষ্ট হইয়া বন্ধুকে তীব্রস্বরে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "মাংস খাইবার জন্য কি অপমান সহ্য করিয়া পরের গোলামি করিতে হইবে?" ঐ বন্ধুটী একজন অপমানিত উচ্চ রাজকর্ম্মচারী; সুতরাং ক্ষেত্রবাবুর ভৎর্সনাটী তাঁহার হাড়ে হাড়ে যে লাগিয়াছিল, তাহা তিনি প্রবন্ধ লেখককে স্বয়ং বলিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত উচ্চদরের লোক ছিলেন না সত্য, কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর এই উক্তিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের একটী সদৃশ ঘটনা পাঠকগণের স্মৃতি-পথারূঢ় হইবে। ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গলা ভাষার একজন অতি উচ্চদরের লেখক ও পাঠক ছিলেন; এবং তাঁহার সাহিত্যিক সমালোচনা-শক্তি এত উচ্চদরের ছিল যে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বা ৺ বঙ্কিমচন্দ্রকে এ বিষয়ে অত উচ্চ আসন প্রদান করা যায় কিনা সন্দেহ। ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রান্তি-বিলাসের সমালোচনা যাঁহারা একবারও পাঠ করিয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারা আমার কথায় সায় দিবেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া বর্ত্তমান লেখক ঢের আলোচনা করিয়াছে, এবং অমিত্রাক্ষর কবিতা পাঠ করিতেও তাহার কতকটা ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করে; আর বহুলোকের মুখে, এমন কি স্বয়ং মাইকেল মধুসূদনের মুখেও অমিত্রাক্ষর পদ্যের আবৃত্তি শুনিয়াছে। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মুখে একদিন মেঘনাদ বধের একটী সর্গের যেরূপ আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম, তেমনটী জীবনে আর শুনি নাই, শুনিব না। সে আবৃত্তি "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" পশিয়া, বাস্তবিক "প্রাণ আকুল" করিয়াছিল। অনেকেই শুনিয়াছেন পরভৃতের কুহুস্বরে, বীণার ঝঙ্কার, হারমনিয়মের গদ, শিশুর আধ আধ কথা, কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মুখে যিনি মেঘনাদের আবৃত্তি শুনেন নাই, তিনি অমিত্রাক্ষর পদ্য যে কত মধুর, তাহা উপ-

লব্ধি করিতে অক্ষম। অপ্রাসঙ্গিক কথা ঢের বলিয়া ফেলিলাম, পাঠক ক্ষমা করিবেন। প্রকৃত প্রস্তাব পুনঃ আরম্ভ করিতেছি।

ক্ষেত্রবাবুর বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, "যা, যা, আর পাগলামো করিস্‌নে; আমার যে প্রতিজ্ঞা, সেই কার্য্য। হয় কাগজের সত্বাধিকারিত্ব ও সম্পাদকতা উভয়ই পাইব, না হয় কিছুই গ্রহণ করিব না। আর প্যারীবাবু যখন সম্পাদকতা ছাড়িয়াছেন; তখন আমি ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা করিতে পারে, এমন লোকও দেখি না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে আমার জেদ বাহাল রাখিতেই হইবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "আপনি ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা করিবার উপযুক্ত লোক বাঙ্গালায় নাই, এ কথাটী ভাল বলিলেন? ইহাতে কি অন্যায় আত্ম-গরিমা প্রকাশ পাইল না?"

ভূদেববাবু। আত্মগরিমা প্রকাশ পাইল বটে. কিন্তু তাহা "অন্যায়" নহে। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতায় বিদ্যাবুদ্ধি যে বড় লাগে, তাহা আমি মনে করি না। তবে একটু অধিক মাত্রায় সহিষ্ণুতা ও ধীরতা আবশ্যক; আর আবশ্যক একটু নূতন ধরণের নীতি। এস্থলে এ সম্বন্ধে অধিক বলা যাইতে পারে না, যদি শুনিতে চাও, এক সময়ে নির্জ্জনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। গবর্ণমেণ্ট এডুকেশন গেজেট ছাড়িয়া দিতে পারেনা, সুতরাং অতি সত্বরই দেখিতে পাইবে, আমি উহার সত্বাধিকারিত্ব ও সম্পাদকতা উভয়ই লাভ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই আলাপের দুই তিন মাস পরই ভূদেববাবু সত্য সত্যই উভয় স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর নানাগল্প চলিতে লাগিল। কিন্তু ভূদেববাবু সে গল্পে যোগ না দিয়া এক মিনিটের জন্য উর্দ্ধমুখে, নীরবে বসিয়া থাকিয়া, আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন "না এসেই পারে না।"

৺ দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলেন, তাহা কি শুনিতে পারি?"

ভূদেববাবু। "এই জিলায় স্কুল-সমূহের পরিদর্শনের কথা ভাবিতে ছিলাম। দেখ কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠ-শালা বসে, তার পরিদর্শন করি আমি; কিন্তু সেই বাড়ীর কাছারী ঘরে একটা মধ্যবাঙ্গলা বা মধ্যইংরেজী স্কুল বসে, তার পরিদর্শন করেন মার্টিন সাহেব। যে কাজ একজন ইনেস্পেক্টর দ্বারা হইতে পারে, তার জন্য গবর্ণমেণ্ট দুই জনের বেতন ও পাথেয় কেন দিবে? এ বিষয়ে এতদিন যে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়ে নাই, তাহাই আশ্চর্য্য! যাহা হউক, আর অধিক দিন এ অন্যায় অর্থব্যয় হইবে না। সুতরাং সর্ব্ববিধ বিদ্যালয় গুলি আমারই পরিদর্শনা-ধীন হইবে।"

দীনবন্ধুবাবু। "আমারত বোধ হয়, মার্টিন সাহেব যখন বিলাতী সাহেব, তখন তাঁর হাতেই সব স্কুল যাবে।"

ভূদেববাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন। বুঝাটা ভুল হইল। আমার বেতন ৫০০ শত টাকা। আর মার্টিন সাহেবের বেতন ১৫০০

শত। গবর্ণমেণ্ট এমন বোকা নয় যে, যে কাজ ২০০ শত টাকায় হইতে পারে, তজ্জন্ত তিনগুণ অর্থব্যয় করিবেন। কাজেই, আমায় হাতে সব স্কুল না আসিলাই পারে না।”

এই আলাপের নয় দশ মাসপর, উত্তর-মধ্যবিভাগ নামে একটা নূতন পরিদর্শন কেন্দ্র হইল, এবং ভূদেববাবু হইলেন তাহার কর্ত্তা। ভূদেববাবুর ভবিষ্য-দর্শন ক্ষমতা কত প্রবল ছিল, পাঠক এই দুইটী বৃত্তান্ত হইতেই বুঝিয়া লইবেন। অথবা একথা বলাই বাহুল্য যে, ভূদেববাবুর মত মনীষা-সম্পন্ন, দূরদর্শী ও রাজ-নীতি বিশারদ ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে আর জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

ভরসা করি, পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই ভূদেববাবুর প্রণীত “হাল্‌কাবন্দী-স্কুলের রিপোর্ট” পাঠ করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার কথা শুনিয়াছেন। সেই সকল স্কুল সম্বন্ধে কথা উঠিল, এবং সেই উপলক্ষে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের সম্বন্ধে কথা উঠিল। তাহাতে ভূদেব বাবু কহিলেন, “আমাদিগের বাঙ্গালদেশের লোকদিগের নির্জীবভাব, উৎসাহ ও সাহস-হীনতা, ভীরুতা প্রভৃতি দর্শনে আমি বহুদিন চিন্তার পর স্থির করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত পাঞ্জাবীর তেজ ও সাহস যোগ করিলে কালে বাঙ্গালীর ভীরুতা-কলঙ্ক দূর হইতে পারে, কালে বাঙ্গালী মানুষ হইতে পারে এবং তজ্জন্ত ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, একজন পাঞ্জাবী সুব্রাহ্মণের কন্যা শ্রীমান্ গোবিন্দদেবের সহিত বিবাহ দিয়া আমি স্বয়ংই এই সংস্কারের পথপ্রদর্শক হইব। কিন্তু হাল্‌কাবন্দীস্কুল পরিদর্শনোপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাবের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া আমি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।”

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ভূদেব বাবু পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তদঞ্চলের লোকদিগের চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক অভিনব কথা বর্ণন করিয়া কহিলেন, “তবে একটা গল্প শুন, তাহা হইলে আমার ন্যায় তোমরাও উক্ত অঞ্চলের লোকদিগকে পশু বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। গল্পটী এই ;—একদিন পাঞ্জাবের এক প্রধান নগরে একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য-গৃহে আমার নিমন্ত্রণ হয়। বলা বাহুল্য, গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ জমিদার (রেইস্) ও সুব্রাহ্মণ। আমার নিমন্ত্রণোপলক্ষে তদ্দেশবাসী পঁচিশ ত্রিশটী সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমরা পরিতোষের সহিত সকলেই আহার করিয়া অপরাহ্নে একটা বিস্তৃত সুসজ্জিত গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলাম গৃহটী অতি বিস্তৃত, রাজবর্ত্ম হইতে বহুদূরে অবস্থিত, এবং প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাচীর পরিবেষ্টিত। অপরাহ্ন ৫ টার পর রাজ-পথে যেই মাত্র শকটের ঘর্ঘর ঘোর নাদ উত্থিত হইল, অমনি রেইস্‌গণ সকলে কলের পুতুলের মত এক কালে দণ্ডায়মান হইয়া বারংবার উভয় হস্ত ললাট সংলগ্ন করিয়া সেলাম করিতে লাগিলেন। বিশ পঁচিশবার সকলে এক

রূপে উপর্য্যুপরি কপালে করাঘাত করিয়া (আমরা 'কপালে করাঘাত' শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়াছিলাম।) উপবেশন করিলেন। তোমরা হাসিতেছ কেন, তাহাদের সেই ভাব দেখিয়া এবং তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া, আমার বাস্তবিকই স্বীয় কপালে করাঘাত করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। ঐরূপ সেলাম করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গৃহস্বামী কহিলেন, 'সেকি বাবু সাহেব! গাড়ীতে যে, সরকার বাহাদুরের কোন সাহেব প্রতিনিধি যাইতে ছিলেন। তাঁহাকে সেলাম না করিলে আমাদিগের রাজ-ভক্তি কোথা থাকে?" আমি কহিলাম, আমরা বাঙ্গালী ও আপনাদিগের ন্যায় রাজভক্ত বটি, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত রাজ-ভক্তি প্রকাশ করিতে জানি না। গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু সাহেব, অদ্ভুত রাজ-ভক্তি বলিতেছেন কেন?" আমি বলিলাম, "আমাদের বাঙ্গলাদেশের রাস্তায় ভ্রমণ করিবার সময়, জজ, মাজিষ্ট্রেট্, কমিসনর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া অভিবাদন করি। কিন্তু আপনারা গাড়ীর শব্দ শুনিয়া, তাহাতে সাহেব আছেন কল্পনা করিয়া শব্দভেদী সেলাম করিলেন, তাই অদ্ভুত বলিতেছি।" যাহা হউক, ছয়টার সময়, সেস্থান হইতে আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং পথে মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, 'হা অহিফেন, তুমি দেশের কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছ। বন্দ ও গুরুগোবিন্দ সিংহের মন্ত্র-শিষ্যগণ, রণজিতসিংহের —বংশধর ও স্বদেশবাসিগণের কি শোচনীয় অবস্থাই না তোমা কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে! এবং ইহাও ভাবিলাম, যখন এই বীর-কেশরী জাতির এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তখন আর এই পতিত দেশের উদ্ধারের আশা অল্প।"

প্রাগুক্ত গল্পের উপসংহার-সূচক কথাগুলি বলিবার সময়, ভূদেব বাবুর যে কণ্ঠস্বর হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার সেই সুন্দর গম্ভীর বীরোচিত আননের ভাব দেখিয়া, আমাদের প্রায় সকলের চক্ষেই জল আসিয়াছিল।

যে ৺ ভূদেব বাবু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যাপক-বর্গের সাহায্যের জন্য রাজাধিরাজোচিত দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের প্রতি মর্ম্মান্তিক ঘৃণা ছিল, একথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন? কিন্তু তাঁহার স্বমুখে যে গল্পটী শুনিয়াছি, তাহা এস্থলে প্রকটন করিতেছি, এই গল্পটী পাঠ করিলে এ বিষয়ে কাহারও অবিশ্বাসের কারণ থাকিবে না। ৺ভূদেব বাবুর পিতা একজন অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন; এবং ভূদেব বাবুর মতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যেরূপ ক্রোধন-স্বভাব হয়েন, তিনি তাহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক রোষ-পরবশ ছিলেন। ভূদেববাবু কহিতে লাগিলেন, "আমি পিতার নিকট কলাপ ব্যাকরণ এবং (বোধ হয় বলিয়াছিলেন,) নৈষধ পাঠ করিতাম। কিন্তু শৈশব হইতেই আমার ইংরাজীশিক্ষায় ইচ্ছা অতীব বলবতী থাকাতে

সংস্কৃতের প্রতি আমার আদৌ মনোযোগ ছিল না। কেবল পিতার ভয়েই সংস্কৃত পড়িতাম,—পড়িতাম মাত্র শিক্ষা করিতাম না; সুতরাং যে দিন যাহা পড়িতাম, পর দিন তাহা ভুলিতাম। এইরূপে যতদিন পিতার অধ্যাপনার অধীন ছিলাম, ততদিন একটা নিরেট মূর্খরূপে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে ছিলাম। দুই তিন বৎসরের পর আমার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের অধ্যাপক মহাশয় আমাদের গৃহে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, এবং তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইবা মাত্র তাঁহার চরণ দুটী ধরিয়া কহিলাম, 'মহাশয় আমি পিতৃদেবের নিকট এতদিন যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছি, তৎসমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব পিতৃদেব আপনাকে আমার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিলে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে অদ্যকার পাঠ্যাংশে পরীক্ষা করিবেন। পুরাতন পাঠের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেও আমি বলিতে পারিব না।' অপরাহ্ণে পিতৃদেবের অনুরোধ ক্রমে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে বসিলেন। আমার অনুরোধ তিনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাসে আমিও সাহস করিয়া পরীক্ষা দিতে বসিলাম। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় অধ্যাপক মহাশয় আমার প্রতি বাছিয়া বাছিয়া "চোক চোক বাণ" মারিতে লাগিলেন, আমি ক্ষত বিক্ষত হইয়া পালাইবার পথ দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ব্বাসারূপী পিতৃদেব নিকটে পদচালনা করিতেছিলেন, আমার পালাইবার সাধ্য কি? অনন্যোপায় হইয়া আমি অপমানে ও ক্রোধে রোদন করিতে লাগিলাম। তখন স্বর্গীয় পিতৃদেব পদ হইতে কাষ্ঠপাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক আমার পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক প্রহার করিলেন। আমি ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে অন্ধ হইলেও পিতৃ-ভক্তি বিস্মৃত হই নাই। অধ্যাপক মহাশয় পিতাকে নিরস্ত করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার মর্ম্মান্তিক রাগ হইয়া রহিল। কেবল তাঁহার প্রতি কেন, সংস্কৃত ভাষা ও তদ্ভাষা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি আমার বিজাতীয় ঘৃণা হইল। ভাবিলাম, মানুষ কি এত অভদ্র, এত অশিষ্ট হইতে পারে? পরক্ষণেই ভাবিলাম, এ দোষ সংস্কৃত শিক্ষার, সুতরাং আর প্রাণান্তেও সংস্কৃত শিক্ষা করিব না। কলিকাতায় প্রস্থান করিব, এবং যেরূপে পারি ইংরাজী শিখিব। ক্রোধে ক্ষোভে রাত্রিতে আহার করিতে গেলাম না। তখন দয়াময় জনক আমার হস্ত ধরিয়া আহার করিতে বসাইলেন। বামহস্তে অশ্রুমোচন করিতে করিতে পিতাকে কহিলাম; 'আমি আর সংস্কৃত পড়িব না, এবং আমার বিদ্যা শিক্ষার চিন্তা আপনাকে আর করিতে হইবে না।' জনক জননী আমার প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম তখন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যা হৌক পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি কলিকাতায় গেলাম, এবং সেই দিনই ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম।

সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য।

"কোন সময়ে উজ্জয়িনীপতি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার স্বকীয় গুণ-গ্রামের মনোভঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গুণেরা অহঙ্কার করিয়া বলিল, "রাজন্! তুমি আমাদের বলেই বলীয়ান্।" রাজা তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলেন। অন্যান্য গুণের কথা কি, শান্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সকলই গেল; অবশেষে রাজ-লক্ষ্মীও রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সহিষ্ণুতা-দেবী রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন; রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন না, বলিলেন, "মাতঃ! আমি তোমাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।" সহিষ্ণুতা রহিলেন, অবশেষে যাবতীয় গুণগ্রাম আসিয়া জুটিল। কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী পুরুষদিগকে উপদেশ স্থলে এই গল্পটী বলিয়াছিলেন। আমরা পুষ্পাঞ্জলী হইতে ইহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বস্তুতঃ সহিষ্ণুতা অন্যান্য সৎপ্রবৃত্তির উৎস স্বরূপ। ইহা আত্ম-সংযম, আত্মত্যাগ, ক্ষমা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ-নিচয়ের আশ্রয় স্থল। যে স্থলে সহিষ্ণুতার অভাব, সেই স্থলে আত্ম-সংযম প্রভৃতি গুণাবলিরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। সহনশীলতার সহিত এই সকল গুণের অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাই এক্ষণে জানা যাউক।

আত্ম-সংযম। মানুষের মন প্রায় সর্ব্বদাই কোন না কোন চিন্তায় অভিভূত থাকে। কাহারও কাহারও মন অতি উপাদেয় ভাবে পূর্ণ থাকে, আবার কাহারও কাহারও মন কেবল অসার ভাবে পূর্ণ থাকে। কেহ কেহ এত সন্দিগ্ধচেতাঃ যে, অকারণ অন্যকে সন্দেহ করিয়া কেবল তৎসম্বন্ধীয় চিন্তাতেই স্বীয় মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে; আবার কেহ কেহ এত জিগীষা পরতন্ত্র যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জিগীষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে অক্ষম হইলে তাহারা পরোক্ষে বা আপন মনে গালিগালাজ করিয়া স্বীয় প্রতিশোধ-পিপাসার শান্তি-বিধান করে। অনেক সময়ে যখন ইহাদের মনের উদ্বেগ খুব প্রখর হইয়া উঠে, তখন মনের ভাবগুলি অজ্ঞাতসারে কথায় প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহারা নিজ মনে গালি দেয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহা উচ্চ কথায় পরিণত হয়। একটু অনুসন্ধান করিলেই এইরূপ ঘটনা অনবরত প্রত্যক্ষীভূত হয়। অনেককেই অধিকাংশ সময় অনন্যমনস্ক ও বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া অভিনব ভাবে মস্তক নাড়িতে ও ক্রোধে দুর্ব্বাসা সাজিয়া হস্ত

পদাদি সঞ্চালন করিতে দেখা যায়। এই রূপে পথে ঘাটে নাট্যাভিনয় সম্পাদন করিয়া তাহারা কেবল উপহাসাস্পদ হয়। যদি তাহাদের আত্মাকে সংযত রাখিবার সামান্য মাত্রও ক্ষমতা থাকে, তবে আর তাহাদিগকে এইরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয় না। আত্ম-সংযমের অভাবই তাহাদের এই দুর্গতির কারণ। এইরূপে সর্ব্বদা কুচিন্তার প্রশ্রয় দিয়া তাহারা স্ব স্ব মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলে, পরে আর কোন মহৎ বিষয়ে তাহাদের মনোনিবেশ হয় না।

যদি সহিষ্ণুতা না থাকে তবে আত্ম সংযম করা সুদূর-পরাহত ব্যাপার হইয়া পড়ে। অন্যে কোন কটূক্তি করিলে তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা যদি না কর, যদি তাহার কটূক্তি তোমার সহ্য না হয়, তবে ইহার প্রতিশোধ নিতেই তুমি সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিলে, এবং প্রত্যক্ষে প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থ-সম্পাদন করিতে অপারগ হইলে অনেক সময় আপন মনেই মনের আগুন নির্ব্বাপিত করিয়া নিজকে দুর্গতির নিম্নতম কূপে নিমজ্জিত করিবে। সুতরাং এই সকল কুভাব মন হইতে দূর করিতে হইলে সংযতাত্মা হইতে হইবে। আত্ম-সংস্কারের ইহা একটী মহৎ অঙ্গ।

আত্ম-ত্যাগ। আত্ম-ত্যাগের সহিত সহিষ্ণুতার কিছু দূরসম্পর্ক, পরার্থে নিজের স্বার্থ উৎসর্গ করার নাম আত্ম-ত্যাগ; আত্ম-ত্যাগ ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়। ভালবাসার ক্ষেত্র যখন অতিশয় প্রশস্ত হইয়া পড়ে, যখন আমরা অন্যকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতে শিক্ষা করি, তখনই আমরা অন্যের জন্য আত্ম-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হই। কিন্তু অন্যকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসিতে হইলে সময়ে সময়ে তাহার দোষ ক্ষমা করিতে হয়। সুতরাং ভালবাসার ক্ষেত্র খুব প্রশস্ত করিতে গেলে ক্ষমাগুণে থাকা আবশ্যক। এই ক্ষমা গুণের সহিত সহিষ্ণুতার নিকট সম্বন্ধ; সুতরাং আত্ম-ত্যাগের সহিতও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। ভালবাসা প্রথমতঃ পরিবারস্থ লোকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, প্রথমতঃ আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতিকেই ভালবাসিতে আরম্ভ করি। পরিবারই আমাদের ভালবাসার প্রথম শিক্ষাস্থল, পরে আমরা যত অধিক পরিমাণে ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই, ইহা ততই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা পরিবারের বাহিরে বিস্তার লাভ করে এবং ক্রমে ভৃত্য ও প্রভুর প্রতি, তৎপরে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি, তাহার পরে গ্রামস্থ ও নগরস্থ, এমন কি মনুষ্য মাত্রের উপর, এবং সর্ব্বশেষে প্রাণী মাত্রেরই উপর ইহা নিবিষ্ট হয়। রাজা উশিনর শ্যেনকে কপোতের বিনিময়ে নিজ দেহ অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভালবাসার ক্ষেত্র অতিশয় প্রশস্ত ছিল, প্রাণিমাত্রের উপরই ইহা নিবিষ্ট ছিল। ভালবাসার ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হইবে, আত্ম-ত্যাগের ক্ষেত্রও ততই প্রশস্ত হইবে। যতদিন ভাল বাসা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততদিন আত্ম-ত্যাগের ক্ষেত্রও পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে; কিন্তু যখন ইহার পরিসর ভিন্ন পরিবার পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, তখন

ভিন্ন পরিবারস্থ লোকের জন্য আমরা আত্ম-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হই। এইরূপে যখন স্বদেশের তাবৎ লোকের উপর ভালবাসার পরিসর বিস্তৃত হয়, তখন স্বদেশের জন্য আমরা আত্ম-ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ আত্ম-ত্যাগই স্বদেশ-প্রেম-প্রণোদিত। তখন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বা পরিবারস্থ লোকের প্রতি যে ভালবাসা তাহা আর থাকে না; স্বদেশ-প্রেমের নিকট ইহা অতি তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হয়, তখন স্বদেশের জন্য আমরা এই সমস্তই ত্যাগ করিতে উপস্থিত হই, এই জন্যই মিবারাধিপতি রাণা ভীম সিংহ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রগণকে ও নিজকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে বলিদান করিয়াছিলেন। রাণা ভীম সিংহ যবন-শিবির হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এক দিবস শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নিজ প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া মিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ "মৈঁ ভুখ হুঁ" এই শব্দটী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। যে দিক্ দিয়া শব্দ আসিল, রাণা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেখিতে পাইলেন। ভগবতীকে দেখিবা মাত্র ভীম সিংহ বলিলেন "আট সহস্র বীর পুরুষ খাইয়াও কি তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না মা!" দেবী কহিলেন "আমি রাজ-বলি চাহি; রাজ-মুকুটধারী দ্বাদশ রাজকুমারকে বলি প্রাপ্ত না হইলে মিবাররাজ্য শিশোদীয় কুলের হস্ত-চ্যুত হইবে।" এই বলিয়াই দেবী অন্তর্হিত হইলেন। পর দিবস রাণা ভীম সিংহ পারিষদ্বর্গকে এই কথা জানাইয়া দ্বাদশ বলির আয়োজন করিলেন। ভীমসিংহের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একাদশ জনই আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যবন-সমরে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। অজয়সিংহ রাণার অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন, তিনি অজয় সিংহকে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে না দিয়া আত্ম হৃদয়ের শোণিতদানে দেবীর পিপাসার শান্তি বিধান করিলেন।

আত্ম-ত্যাগের প্রসাদাৎ জগতে অনেক সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই আত্ম-ত্যাগের প্রসাদে ১৫৭২ অব্দের "তিজ" মহোৎসবের দিন একশত চল্লিশ জন রাজপুত-মহিলার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছিল। রাঠোর কুল তিলক যোধরাওয়ের তনয় সুরজমল নিজ হৃদয়ের শোণিত-বিনিময়ে এই রাজপুত-মহিলাদিগকে যবনদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

দৃঢ়তা। শতবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করার নাম দৃঢ়তা বা স্থির-প্রতিজ্ঞতা। সহিষ্ণুতার সহিত এই গুণের অতি নিকট সম্বন্ধ। যদি সহ্য করিবার শক্তি না থাকে, তবে ইহাও থাকিতে পারে না। সহিষ্ণুতা দৃঢ়তার ব্যাপক; সহিষ্ণুতার অভাবে দৃঢ়তারও অভাব হয়। সুতরাং এই গুণে অলঙ্কৃত হইতে হইলেই সহনশীল হওয়া আবশ্যক। সঙ্কল্প-কবচে হৃদয়কে আচ্ছাদন করিতে হইলে, সহিষ্ণু হইতে হইবে, সাহসের দৃঢ় পরিখায় হৃদয় মনকে বেষ্টন করিতে হইবে। যাহারা সহিষ্ণু, সামান্য প্রতিঘাতে যাহাদের হৃদয় বিচলিত হয় না, সঙ্কল্প-সিদ্ধি তাহাদের পক্ষে

বড় কঠিন ব্যাপার নহে। এই সকল শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ দৃঢ়তা সহকারে নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব মনোরথ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সহিষ্ণুতা ছিল বলিয়াই প্রতাপ, সমর প্রভৃতি জগৎপূজ্য মহাত্মাগণ সুমেরুর ন্যায় অচল ও অটল ভাবে সঙ্কল্প-সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। বস্তুতঃ স্থির-প্রতিজ্ঞা না হইলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। অস্থিরপ্রকৃতি লোকের মন ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল বাত্যার মত চতুর্দ্দিকেই সঞ্চালিত হয়। অতি সহজেই ইহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং সামান্য আঘাতেই ইহা চূর্ণ বিচূর্ণিত হয়।

ক্ষমা। সহিষ্ণুতা না থাকিলে ক্ষমা গুণও থাকিতে পারে না; সহিষ্ণুতা ক্ষমার চির-সহচরী, যেইখানে ক্ষমা, সেইখানে সহিষ্ণুতা; ক্ষমার চতুর্দ্দিকে সহিষ্ণুতার বাঁধ, যে দিন সেই বাঁধ ভাঙ্গিবে, সেই দিন ক্ষমা অনন্ত সাগরে বিলীন হইবে। যদি সহন-শক্তি না থাকে, তবে অন্যকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, তাহার দ্বারা কোন অনিষ্ট সাধিত হইলে, তখনই তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ক্ষমাগুণের একটী মোহিনী শক্তি আছে; সে শক্তি, অপার অনন্ত ও ঐশ্বরিক। যদি কেহ আমাদের অপকার করে, এবং আমরা কোনরূপ শাস্তি না দিয়া যদি তাহাকে ক্ষমা করি, তবে সে নিজের নীচাশয়তা ও ক্ষমীর উদারতা দেখিয়া আত্মাকে শত ধিক্কার দিবে, এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, নিজকে সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। দুষ্টকে সংশোধন করিবার এই একটী প্রকৃষ্ট উপায়। দৃষ্টান্তস্থলে নিত্যানন্দ ও জগাই মাধাইর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দ প্রেমিক, প্রেমই তাঁহার ব্যবসা, জগতে প্রেম-শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। একদা পাষণ্ড মদ্যপায়ী জগাই মাধাই নিত্যানন্দকে পথিমধ্যে পাইয়া গুরুতর রূপে আঘাত করে। দয়াল নিত্যানন্দ সেই আঘাতের আশ্চর্য্য প্রতিদান করিলেন। তিনি আহত হইয়া বলিলেন, "ভাই জগাই, মাধাই! আমাকে আহত করিয়াছ, তাহাতে কি হইয়াছে? এখন উভয়ে হরিবোলে নাচ।" নিত্যানন্দের সেই আশ্চর্য্য উদারতা দেখিয়া, পাষণ্ড-দ্বয়ের হৃদয় গলিয়া গেল। তাহারা নিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং সেই অবধি হরিভক্ত বৈষ্ণব সাজিয়া হরি-গুণগান করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিল। কঠোরতম শাস্তি দ্বারাও যাহা সাধিত হইত না; সামান্য ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া তাহা অনায়াসে সুসিদ্ধ হইল।

ক্ষমাগুণ মনুষ্যকে দেবতুল্য করে। ক্ষমীর গুণে জগৎ আকৃষ্ট হয়, তাঁহার যশোঃগৌরবে জগৎ আমোদিত হয়। যিনি এই গুণের বশীভূত, জগও তাহার বশীভূত। ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিবে যে, যে সমুদয় ধর্ম্মবীর এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই ক্ষমাগুণ অতিশয় অলঙ্ক্য ভাবে বিদ্যমান

ছিল। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভৃগুমুনি ক্রোধ পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করেন, তিতিক্ষু কৃষ্ণ মুনিকে বলিলেন "মহাত্মন্, আমার বক্ষে আহত হওয়াতে আপনার শ্রীচরণই ব্যথিত হইয়াছে, অতএব অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" পুরোহিতগণ হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভক্তপ্রবর স্থিরমতি প্রহ্লাদের বিনাশ-সাধনের জন্য অভিচার-ক্রিয়া আরম্ভ করেন, কিন্তু অভিচার তৎ-পরিবর্ত্তে পুরোহিতগণেরই বিনাশ-সাধন করে। প্রহ্লাদ তখন শত্রুনাশ হইয়াছে ভাবিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট না হইয়া, সেই সকল পুরোহিতের জীবনের জন্য জগৎগুরু বিষ্ণুকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণগণকে দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য জনার্দ্দনের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। কেমন মহৎ ও সুন্দর চরিত্র! কেমন উদার ভাব! যাহারা তাঁহার জীবন-বিনাশে সমুদ্যত ছিল, তিনি তাহাদেরই জীবনের জন্য দয়া-সিন্ধু ভগবান্‌কে কায়-মনোবাক্যে ডাকিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-কালে হিন্দুরাজগণ অনেকানেক বন্দীকে কারামুক্ত করিয়া এই ক্ষমাগুণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। রাণা কুম্ভ যখন মালবের খিলিজিরাজ মহম্মদকে বন্দী করতঃ চিতোরে আনয়ন করেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলেই বন্দীকে হত্যা করিয়া ক্রোধের উপশম করিতে পারিতেন। কিন্তু কুম্ভ সদাশয়; মনুষ্য-পদ-বাচ্য হইয়া তিনি কি প্রকারে এইরূপ পৈশাচিক কাণ্ড করিবেন? তিনি বন্দীকে, প্রচুর উপঢৌকন দিয়া স্বনগরে বিদায় দিলেন।

ক্ষমা-গুণের অন্য একটী মহতী-শক্তি আছে। ক্ষমীর নিকট ক্রোধ দাঁড়াইতে পারে না। সমুদ্রবেগ যেরূপ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইবামাত্র প্রতিহত হয়, ক্রোধও সেইরূপ ক্ষমাতে সংলগ্ন হইবা মাত্রেই বিলীন হইয়া যায়। অতএব সকলেরই দুই এক-বার অপরাধীকে ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু ক্ষমা প্রকাশ করিলে যে ক্ষুদ্রাশয় ও লঘুচেতাঃ অনুতপ্ত হয় না, তাহাকে অন্য-বার ক্ষমা না করাই কর্ত্তব্য; কারণ, সে ইহাতে ক্ষমাশীলকে অসমর্থ মনে করিয়া, তাঁহার উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎ-পীড়ন আরম্ভ করে, এবং সুবিধা পাইলেই তাঁহার ঘাড়ে উঠিবার চেষ্টা করে।

ক্রমানুশীলন দ্বারা যখন সহিষ্ণুতা পূর্ণ-বিকসিত হয়, তখনই হৃদয়ে ধৈর্য্য-গুণের আবির্ভাব হয়। যে গুণ থাকিলে বিকারের যথেষ্ঠ কারণ থাকা সত্ত্বেও মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না, তাহাকেই ধৈর্য্য-গুণ বলে। মনে কর আজ তুমি ঘোর সঙ্কটে পতিত, তুমি আজ সহায়সম্পদহীন, আত্মীয় কুটুম্ব তোমাকে একা ফেলিয়া এই ভবরঙ্গ-ভূমি হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া-ছেন, তুমি যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই ঘোর অন্ধকার; চতুর্দ্দিকেই বিভীষ বিকার করাল মূর্ত্তি। এইরূপ অবস্থায় তোমার বিকারের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে; তুমি হয়তঃ সহজেই অস্থির হইয়া উঠিবে; তোমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে; অনা-হারে অনিদ্রায় ও বিষময়ী চিন্তার কঠোরতম দংশনে হয়ত নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন

করিয়া তুলিবে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াও মনে কোন বিকার উপস্থিত না হওয়া ধৈর্য্য-গুণের কার্য্য। কোন কারণ বশতঃ মনে বিকার উপস্থিত হইলে সেই বিকারে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য না করা সগুণ-শক্তির পরিচায়ক; কিন্তু বিকারের কারণ থাকিলেও মনে কোনরূপ বিকার না হওয়া ধৈর্য্য-গুণের পরিচায়ক। সহিষ্ণুতা থাকিলে বিকারের ভাব চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু ধৈর্য্য-গুণ থাকিলে মনে আদৌ কোন বিকার উপস্থিত হয় না। মনে ক্রোধোদয় হইলে সেই ক্রোধ দমন করিয়া রাখা সহিষ্ণুতার কার্য্য; কিন্তু মনে আদৌ কোন ক্রোধোদয় না হওয়াই ধৈর্য্য-গুণের কার্য্য। সর্ব্বদা বিকারের ভাব দমন করিয়া রাখিলে ক্রমে এই ভাব মন হইতে অন্তর্হিত হয়, এবং ইহার লুপ্তাবস্থায়ই ধৈর্য্য-গুণের আবির্ভাব হয়।

মানুষের ও পশুর প্রকৃতিতে যে বিভিন্নতা আছে, ইহা এই ধৈর্য্য-গুণ দ্বারাই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের ধৈর্য্য-গুণ আছে, পশুর ধৈর্য্য-গুণ নাই; পশুজাতির যখন ক্রোধের উদ্রেক হয়, তখন তাহারা জিঘাংসা-পরবশ হইয়া উঠে, ক্রোধের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিহিংসা হইতে বিরত হয় না। মনুষ্য-সমাজে অনেককেই পশুর ন্যায় ক্রোধ-পরবশ হইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়। ইহারা পশু হইতে আরও ভয়ঙ্কর; কারণ, মানুষ কূট নীতির কুটিল-প্রয়োগে তাহার জিগীষা-প্রবৃত্তিকে এরূপ ভাবে অন্যের প্রতি নিয়োজিত করিতে সক্ষম হয় যে, তাহাতে আক্রান্ত ব্যক্তির অতি সহজেই সর্ব্বনাশ সাধিত হয়; রোষ-বহ্নির প্রখর উত্তাপে তাহাকে দগ্ধীভূত হইতে হয়।

ধৈর্য্য-চতুর্ব্বর্গের নিদান; কারণ, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলে ধর্ম্ম,অর্থ প্রভৃতি সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ধৈর্য্য আমাদের কল্পতরু, কারণ ধৈর্য্য আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ। যে আশা মানুষের প্রধান নিয়ন্ত্রী, যে আশায় মুগ্ধ হইয়া মানুষ এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুর্ব্বহ জীবনের ভার অম্লান-বদনে সহ্য করে, সেই আশা ফলবতী হইবার প্রধান উপায় ধৈর্য্য। যখন রোমের পদদ্বয় দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তখন যদি রোমের অধিবাসিগণ সুধীর ও শান্ত ভাবে কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে রোম আবার স্বাধীন হইবে বলিয়া তাহাদের যে আশা ছিল সেই আশা আর ফলবতী হইত না। তাহারা সুধীর ভাবে স্বল্পমাত্রও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল, এবং সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র অনন্ত উদ্যোগিতার প্রভাবে জননী জন্ম-ভূমির দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিয়া দিল। ধৈর্য্য ও চেষ্টার বলে রোম আবার মস্তক উত্তোলন করিল।

কেহ কেহ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে ভীরু বলিয়া তিরস্কার করেন। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া যখন স্বীয় কর্ত্তব্যাবধারণে চিন্তাকুল ছিলেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে ভীরু বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তিনি কি প্রকৃতই ভীরু ছিলেন? যখন তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপস্থিত

হইলেন, কে বলিবে যে তখন তিনি ভীরুতার কার্য্য করিয়াছিলেন? সঙ্কটের সময়ও যে মনের প্রবৃত্তি-নিচয়ের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল, নিন্দুকগণ তাহা বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই তাঁহাকে ভীরু বলিয়া অযথা নিন্দা করিয়াছে। তিনি ধীরভাবে কর্ত্তব্যাবধারণে সচেষ্ট ছিলেন। ইহাতে তাঁহার হীন সাহসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই; বরং ইহাতে তাঁহার বীরোচিত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও ভাবিদর্শিতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যদি তিনি তখনই স্বীয় অরির সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে আর ভারত-সিংহাসনে উপবেশন করিতে হইত না।

ধৈর্য্যের প্রতিপক্ষ কয়েকটী মানসিক বৃত্তি আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত; ইহারাই মানুষকে ধৈর্য্যচ্যুত করে; সুতরাং সর্ব্বথা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা আমাদের একটী মুখ্য কর্ত্তব্য। ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিলে ক্রোধ ইত্যাদি অসৎ প্রবৃত্তির অপকর্ষতা সাধিত হয়; একের উন্নতিতে অপরের অবনতি। সৎ-প্রবৃত্তি ও অসৎ-প্রবৃত্তি আমাদের মনো-রাজ্যকে সম দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে; উভয়ের পরিসরই এক্ষণে সমভাবে থাকে; ক্রমে ব্যক্তি বিশেষে একটী অন্যটীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অসৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন অধিক পরিমাণে করিলে সৎ-প্রবৃত্তি স্বল্প-প্রসর হয়, পক্ষান্তরে সৎপ্রবৃত্তির অধিক পরিমাণে অনুশীলন হইলে অসৎ প্রবৃত্তি স্বল্প-প্রসর হয়। সুতরাং অসৎ-প্রবৃত্তি গুলিকে মন হইতে দূর করিতে হইলে ক্ষমা ইত্যাদি সৎপ্রবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যক।

ক্রোধ দুই প্রকার; এক প্রকার ক্রোধ তাৎকালিক, অন্য প্রকার উত্তরকালিক। পূর্ব্বটী অবিচারিত পরবর্ত্তীটি বিচারিত। বিচারিত ক্রোধ সময় ও সহায়ের অপেক্ষা করে, অবিচারিত ক্রোধ এই একটীরও অপেক্ষা করে না। অবিচারিত ক্রোধে অন্ধ হইয়াই অনেক নর-পিশাচ নমস্য পিতাকে, করুণা-স্বরূপিনী মাতাকে এবং স্নেহময়ী বণিতাকে নিগ্রহ করে, অতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগ-দ্বারা মাননীয় ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির অবমাননা করে, নানাবিধ পাপের অনুষ্ঠান ও গুরু-জনের প্রাণ বিনাশ করে, এবং কার্য্যাকার্য্য-বিচার-শূন্য হইয়া রাগান্ধ বৃষভের ন্যায় স্বীয় জীবন-তরুর মূলে কুঠারাঘাত করে। অবিচারিত ক্রোধ অতীব দোষণীয়, ইহাই মানুষকে পশুপ্রকৃতিক করিয়া তুলে। বিচারিত ক্রোধ ততটা দোষণীয় বলিয়া অনুমিত হয় না; আত্ম-রক্ষার্থ ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহা কোন রকমেই দোষ-ণীয় হইতে পারে না। কেহ চুরি করিলে বা আমাদের সহিত প্রবঞ্চনা করিলে আমরা যে ক্রোধ প্রকাশ করি, তাহাও দোষণীয় নহে; বরং সময়ে সময়ে ইহা অশিষ্টদিগকে দমন ও শিষ্টদিগকে রক্ষা করে। কিন্তু এইরূপ ক্রোধেও আমাদের শারীরিক ও মানসিক অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়, সুতরাং ক্রোধ মাত্রকেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অত্যধিক ক্রোধের উত্তেজনায় ক্রমে শরীর

ও মন দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ক্রোধ জন্মিলে মস্তিষ্ক অত্যন্ত আলোড়িত হয়, সর্ব্বশরীরে এক প্রকার আগুণ ছুটিতে থাকে এবং মানসিক অন্যান্য সমস্ত বৃত্তির কার্য্য, একরূপ স্থগিত হইয়া পড়ে। শরীরে যে 'স্পষ্ট আগুণ ছুটিতে থাকে, এই আগুনই তাড়িৎ প্রবাহ।' ক্রোধের সময় এই তাড়িৎ প্রবাহ অধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং এই ক্ষয় আর কিছুতেই পূরিত হয় না। সহসা শরীরে সেই পরিমাণ তাড়িৎ প্রবাহ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া ব্যতীত আর কিছুতেই এই ক্ষয় পূরণ হইবার নহে। সুতরাং এই ক্ষয় হেতু শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, মন নিস্তেজ ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ক্রোধ দ্বারা কখনই ক্রোধের শান্তি হয় না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে সেই ক্রোধ কি কখনও শান্ত হয়। ইহা ঘৃত-সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং অবশেষে উভয় পক্ষই ক্রোধানলে পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন করে। বেণু ও নল যেরূপ আত্মনাশের জন্য ফল প্রসব করে এবং কর্কটী যেমন আপনার বিনাশার্থ গর্ভ ধারণ করে, সেইরূপ ক্রোধীও আত্ম-বিনাশার্থই ক্রোধ ধারণ করে।

ক্রোধের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা। সহানুভূতি একটী উচ্চ অঙ্গের দয়া। অগ্নি যেমন তৃণ-হীন স্থানে পতিত হইলে আপনিই নির্ব্বাপিত হয়, ক্রোধও সেইরূপ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল ব্যক্তির উপর নিক্ষিপ্ত হইলে আপনিই লয়-প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাতে ক্ষমা ও দয়া দ্বারা ক্রোধ প্রতিহত হইতে পারে, সেইরূপ যত্নশীল হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ক্ষমাগুণ ও দয়াগুণের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হইলে ক্রোধ মনকে অধিকার করিতে পারে না। এইরূপে ক্ষমা ও দয়া দ্বারা ক্রোধকে প্রতিহত করা অবশ্য অতিশয় আয়াসলব্ধ ব্যাপার; কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, মনকে উন্নত করিতে হইলেই অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। মানুষের মন সাধারণতঃ অসৎ বিষয়েই প্রধাবিত হয়; মনের এই গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলেই পরিশ্রম ও চেষ্টার আবশ্যক।

লোভ স্বার্থ হইতে উৎপন্ন হয়; লোভ হইতে মোহ উৎপন্ন হয় এবং মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই মনুষ্য দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থ মঙ্গলদায়ক ও অনিষ্টদায়ক উভয়ই; স্থল-বিশেষে ইহা মঙ্গল সাধন করে, আবার স্থল-বিশেষে ইহা ঘোর অনিষ্ট উৎপাদন করে। স্বার্থ হইতে অনুরাগ উপস্থিত হয়, এবং এই অনুরাগ হইতে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদয় হয়। স্বার্থে প্রণোদিত হইয়াই আমরা স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হই; ক্রমে স্বার্থ তিরোহিত হইয়া আমাদের মনে কেবল মাত্র অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী স্বামীর মধ্যে এই অনুরাগ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই তাহারা একে অন্যের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অনুরাগ স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে যে অনুরাগ তাহাকে প্রেম বলে, পুত্র ও ভ্রাতাদের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে স্নেহ বলে, এবং পিতা

মাতা, অন্যান্য গুরুজন ও ঈশ্বরের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি বলে।

অন্যের কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া, নিজ স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কিছুমাত্র দোষনীয় নহে। মানুষ যদি নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনে রত না থাকিত, তবে পৃথিবীর ও এত উন্নতি সাধিত হইত না। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, যখন আমরা স্বার্থান্ধ হই, তখন আমাদের হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়; আমরা অন্যের সুখ-দুঃখের প্রতি কটাক্ষও করি না। আমরা স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অতৃপ্তিকর লোভের বশবর্ত্তী হই, এবং অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আপন আপন স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাই। এই প্রকারের স্বার্থই আমাদিগকে নিরয়গামী করে। যে স্বার্থ অন্যের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করে না, সেই স্বার্থ ঘোর অনিষ্ট-দায়ক এবং এবম্বিধ স্বার্থসাধন নিতান্ত দূষনীয়। এইরূপ স্বার্থ হইতেই লোভ ও মোহের উৎপত্তি হয়, এবং যখন এই তিন-টীর একত্র সমাবেশ হয়, তখনই আমরা কেবল আত্ম-তুষ্টি ও আত্মোদর পূরণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করি, এবং সময় সময় মোহান্ধ হইয়া অন্যের জীবন নাশেও সমুদ্যত হই। এইরূপ স্বার্থপরতা নাদির সাহের অভিযান-সময়ে ভারতের সকল জাতির শরণী হইয়া উঠিয়াছিল; সেই জন্যই ভারতবাসী সেই দিন হইতে সুখ ও স্বাধীনতা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া আছে। এইরূপ স্বার্থে অন্ধ হইয়াই দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রাগণ রত্নগর্ভা মিবারে আপতিত হয়, এবং ইহার শোণিত শোষণ করিয়া সর্ব্বসংহারক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করে। এইরূপ স্বার্থের দাস হইয়াই আততায়ী অভয়সিংহ স্বীয় জন্মদাতার হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া রাঠোর-কুলের সর্ব্বনাশ সাধন করে, এবং দুরাচার উদো স্বীয় পিতা কুম্ভকে হত্যা করে। এইরূপ স্বার্থের জন্যই সরলা বালিকা কৃষ্ণকুমারীর জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হয়।

মোহ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কারীর 'অহং' ব্যতীত অন্য আর কোন জ্ঞান থাকে না। সে নিজকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী মনে করিয়া ক্রমে অন্যকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। অহ-ঙ্কারীর অহঙ্কার অনেক সময়েই তদীয় বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। এই অহ-ঙ্কার ও ঔদ্ধত্যই রাঠোরবীর রাওসিংহের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘৃণা দূষনীয় হইলেও ঘৃণার্হকে ঘৃণা করা অনুচিত নহে। ঘৃণা যখন অসৎকার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তখন ইহা সুরলোক গামিনী। যে চুরি করে, মিথ্যা বলে, পরদারাভিগমন করে, এবং এবম্বিধ অন্যান্য অসৎকার্য্যে রত থাকে, তাহাকে ঘৃণা করিলে তাহার উপ-কারই হইবার সম্ভাবনা; অনুতপ্ত হইয়া সে এই সমুদয় দোষনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যখন ধনী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নির্ধনীকে ঘৃণা করে, কিম্বা বিদ্বান সগর্ব্বে মূর্খকে ঘৃণা করে, কিম্বা যখন জাত্যাভিমানে একজাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করে, তখন ঘৃণা নিরয়গামিনী। এইরূপ ঘৃণা মানুষকে সহানুভূতি হইতে বিচ্যুত করে।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এই দুইটীর বলে রাজপুত বীরগণ কিঞ্চিদূণ দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া আপনাদের স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গারদ, ভীল, তুর্কি ও তাতার প্রভৃতি অসভ্য জাতি দ্বারা বারবার উপক্রত ও বিড়ম্বিত হইয়াও তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হন নাই। প্রচণ্ড প্রচণ্ড বিপ্লব-ঝটিকা রাজপুত জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা ধৈর্য্য-খুটা ধরিয়া সেই সমস্ত শাখা প্রশাখাকে পুনর্ব্বার মুকুলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যদি অন্যান্য জাতির ন্যায় তাঁহারাও অস্থির হইয়া ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতেন, তাহা হইলে রাজপুত বংশ-তরুর অনেক শাখা-প্রশাখা চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইত, এবং হয়ত তাঁহাদের গৌরবও এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। ফলতঃ চঞ্চল প্রকৃতির লোকদ্বারা কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না; তাহারা কোন কার্য্য করিয়া যদি অচিরে সুফল দেখিতে না পায়, তবে হতাশ হয়ে পড়ে; তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একবার বিফল-মনোরথ হইয়াই তাহারা "হা হতোস্মি" বলিয়া উপায়ান্তর-উদ্ভাবনে নিশ্চেষ্ট থাকে। কেহ কেহ আবার প্রক্রমেই বিফলের সন্দিহান হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, এবং ক্রমে পরাধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থির প্রকৃতির লোক যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হন, তাহার ফল না দেখিয়া কখনই সেই কার্য্য হইতে বিরত হন না, বার বার বিফল মনোরথ হইয়াও প্রত্যাদিষ্ট হন না। তাঁহাদের কর্ম্মে শত সহস্র অন্তরায় উপস্থিত হইলেও তাঁহারা নিরাবৃত্ত হন না বরং আরও অধিক উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই বিঘ্ন-সমূহকে দূর করিতে যত্ন করেন।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা-বলে প্রহ্লাদ হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে পাইয়া হৃদয়ের শান্তি বিধান করিয়াছিলেন; মায়াদেবীসুত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ধ্রুব সিদ্ধ কাম হইয়াছিলেন। এই ধৈর্য্য বলে হুমায়ুন সিংহাসন-চ্যুত হইয়াও আবার ভারত-সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হুমায়ুন সের সাহ কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ বৈরীর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, নিষ্ঠুর সেরসাহ সেই খানেই তাঁহাকে আক্রমণ করে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি অমর কোটাভিমুখে পলায়ন করেন। পথে তিনি যেরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হন, তাহাতে যদি মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও অধীর হইতেন তাহা হইলে তিনি সপরিবারে পথেই বিনষ্ট হইতেন। কিন্তু হুমায়ুন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা-বলে সেই ভয়াবহ বিপৎ সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব।

শিক্ষা।

আরম্ভ যাহার সুতিকা-গৃহে, শেষ যাহার শ্মশান-ভূমিতে, আশ্রয় যাহার মানব-জাতি, এবং লক্ষ্য যাহার চরম উন্নতি, এরূপ বিস্তীর্ণ বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বে যতই কেন অধিক না হইয়া থাকুক, ইহার পুনরালোচনা, সামান্য হইলেও, সর্ব্বদা ও সর্ব্বথাই সুফলপ্রসবিনী। বিশেষ এ বিষয়ে একটা স্থির আত্ম-মত সংগঠন করা সকলের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক, এবং তাহার প্রকটন ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভাবী উন্নতির পক্ষে কিছু না কিছু সহায়ক, এই সকল কারণেই অতি ক্ষীণ শক্তি লইয়াও আমরা এরূপ গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি।

প্রথমে দেখা যাউক, শিক্ষা কাহাকে বলে। "শিক্ষা বিদ্যোপদানে", সংস্কৃত ধাতুমূলক শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ এক্ষণে বহুব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এক্ষণে শিক্ষাশব্দের বাচ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। তবেই দেখিতে হইতেছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? দেহ ও মন লইয়া জীবন। দেহের শক্তির ন্যায় মনেরও শক্তি বা বৃত্তি আছে। মনোবৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত; নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি। নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি ঠিক যেন এক বৃন্তে দুইটী ফুল। স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসা প্রভৃতি নৈতিক বৃত্তির অনুবর্ত্তগণ; এবং যুক্তি ও পার্থক্যবোধ প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির দলবর্গ। ফুলের কলির ন্যায় মানবীয় বৃত্তি-নিচয়ও ক্রমে ক্রমে বিকসিত হয়, ফুলের পূর্ণ বিকাশের জন্যই যেরূপ ফুলের সৃষ্টি বলিয়া অনুমান হয় মানবীয় বৃত্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যই সেইরূপ মানবীয় বৃত্তির সৃষ্টি বলিয়া অনুমান হয়। কোন বিষয়ের প্রকৃতি দেখিয়াই তাহার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায়; মানবীয় বৃত্তিনিচয় পিপাসাময়; পূর্ণ-বিকাশের জন্য সদাই তাহারা চেষ্টিত; ইহাতেই নির্ণয় করা যায় যে, জীবনের উদ্দেশ্য নিজের শারীরিক, নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী এই ত্রিবিধ বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ-সাধন। উপযুক্ত আলোক ব্যতীত যেরূপ ফুলের পূর্ণ-বিকাশ-সাধন হয় না; শিক্ষা ব্যতীত সেইরূপ মানবীয় বৃত্তি নিচয়েরও পূর্ণবিকাশ বা উন্নতি-সাধন হয় না। এই জন্যই বলিতেছি শিক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। এখানে আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা, শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি নিকট—এতদূর নিকট যে, কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মনকে শিরার সঞ্চালন মাত্র মনে করেন। বাস্তবিকও ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে, অত্যধিক শারীরিক উন্নতি মানসিক উন্নতির যেরূপ ঘোর অন্তরায়, অত্যধিক মানসিক উন্নতিও শারীরিক উন্নতির সেইরূপ ঘোর

অন্তরায়। দেহের সুস্থতার উপর মনের সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং মনের সুস্থতার উপর দেহের সুস্থতাও সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই জন্যই দেহ ও মন উভয়েরই এরূপ ভাবে স্ফূর্ত্তি হওয়া আবশ্যক যে কেহ কেন কাহারও উন্নতির বিরোধী না হয়। মনোবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য দৈহিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ আবশ্যক, পক্ষান্তরে দৈহিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে মানসিক বৃত্তির বিকাশ-সাধন আবশ্যক। অতএব এই দুই বৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই জন্যই পণ্ডিত লক্ বলেন "সুস্থ-শরীরে সুস্থ মন", ইহাই শিক্ষার পূর্ণতা। শারীরিক, নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী এই তিনটী বৃত্তির যে কোন একটীর বিকাশ-সাধনে অবহেলা করিলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই জন্যই প্রকৃত শিক্ষার্থীর জন্য প্রকৃতি ও অবস্থা-ভেদে প্রত্যেকেরই তিনটী বৃত্তির ন্যূনাতিরিক্ত কর্ষণ বা অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা, এক জনের পূর্ণ উন্নতির জন্য দশ জনের সাহায্য আবশ্যক। জ্ঞানিগণ অনেককাল চিন্তা করিয়া যে সমস্ত জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া, নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাহায্য না পাইলে যখন আমরা জ্ঞানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হই না, এমন কি জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী অনেক বিষয়ও যখন আমরা অন্যের সাহায্য ব্যতীত লাভ করিতে পারি না; এক কথায় অন্যের সাহায্য ব্যতীত যখন আমাদের উন্নতি অসম্ভব, তখন অন্যকেও আমরা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কোন না কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে বাধ্য। বিশেষ আমাদের নৈতিক বৃত্তির মধ্যে দয়া, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির পরোন্নতি করিবার পিপাসা অতি বলবতী। এই জন্যই আত্মোন্নতির ন্যায় পরোন্নতির জন্য চেষ্টা করাও আমাদের জীবনের সুতরাং শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য।

কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাউক। যে সমস্ত ভারতীয় ঋষি সংসারের সমবেত চেষ্টায় বাল্যে ও যৌবনে দেহের ও মনের শক্তি সঞ্চয় করিয়া বার্দ্ধক্যে গহন বনের নিভৃত এক কোণে বসিয়া চরম আত্মোন্নতি-সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, এবং মরুভূমি-জাত সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় আপনার মনে আপনি শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছেন; সংসারের উন্নতির দিকে দৃক্‌পাত মাত্রও করেন নাই; পরের জন্য জ্ঞানরত্ন কিছুই সংসারে প্রকাশ করেন নাই, তাহাদের জীবনের বা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সফল হইয়াছিল? তাঁহাদের সেউদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা কি ঘোর স্বার্থপর ও নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন? (১) মহাত্মা নিউটন সাহেব যদি তাঁহার উদ্ভাবিত জ্ঞানতত্ত্ব সংসারে অপ্রকাশিত রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি কেহ প্রকৃত শিক্ষিত বলিতেন? কখনই না। এই জন্যই

(১) মহর্ষিগণ এরূপ কঠোর বিশেষণের যোগ্য পাত্র কি না, তাহা বিবেচ্য। শিঃ পঃ সঃ।

বলিতেছি, আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরোন্নতির চেষ্টাও করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে শিক্ষিত, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে পরের উপকার করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। আমরা যেন জীবনে কখনও

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে",

কবির এই মর্ম্মস্পর্শিনী কথাটী না ভুলি। এক্ষণে আমরা বলিতে পারি, নিজের শারীরিক, নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী এই ত্রিবিধ বৃত্তির পূর্ণ ও সমঞ্জসীভূত বিকাশ-সাধন এবং পরের বৃত্তিনিচয়ের তদ্রূপ বিকাশ-সাধন জন্য সাধ্যমত চেষ্টাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শিক্ষা ত্রিবিধ, শারীরিক, নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী। যে শিক্ষায় শরীর সুস্থ, বলিষ্ঠ ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হয়, তাহার নাম শারীরিক শিক্ষা; যে শিক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানের আলোকে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে এবং হৃদয়ের বল বাড়ে, তাহার নাম নৈতিক শিক্ষা; আর যে শিক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তির তেজ ও তীক্ষ্ণতার বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম জ্ঞানার্জ্জনী শিক্ষা।

এক্ষণে দেখা যাউক, শিক্ষার আবশ্যকতা কি? জীবনের উদ্দেশ্য-সাধন যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহার উপায়-স্বরূপ শিক্ষাও যে একান্ত আবশ্যক উহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। শিক্ষা আত্মার অন্নস্বরূপ। শিক্ষা ব্যতীত মানবের বৃত্তিনিচয় নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে; কর্ষণ, বীজ বপন ও জল-সিঞ্চন না হইলে ভূমিতে যেমন আপনা আপনি আগাছা জন্মিয়া থাকে, শিক্ষা না হইলে মানবমন সেইরূপ আপনা আপনি অবনতির দিকে ধাবিত হয়। শিক্ষাপ্রভাবে মানবের দেহ ও মন এক অপূর্ব্ব সজীবতা লাভ করে, এবং এক অপূর্ব্ব নব-বলে বলীয়ান হয়। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফুলের বিকাশের জন্য যেরূপ আলোকের আবশ্যক, বৃত্তির বিকাশের জন্যও সেইরূপ শিক্ষার আবশ্যক।

এক্ষণে দেখা যাউক, শিক্ষার প্রণোদক কি। সাধারণতঃ মানবমন এরূপ ভাবে গঠিত যে, সুখের আশা ব্যতীত অন্য কিছুই ইহাকে স্থায়ীরূপে কোন কার্য্যে প্রণোদিত করিতে পারে না। জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেহ লালায়িত নহে, উন্নতির জন্যও কেহ উন্নতি চায় না, যদি তাহার সহিত সুখের কোনই সম্বন্ধ না থাকে। তবেই দেখিতে হইতেছে, শিক্ষার সহিত সুখের কিরূপ সম্বন্ধ। আমরা পূর্ব্বেই ফুলের সহিত বৃত্তির উপমা দিয়াছি। ফুলের পূর্ণ বিকাশের সহিত তাহার সৌরভের যে সম্বন্ধ, মানবীয় বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে মানবের সুখের সেই সম্বন্ধ। ফুলটী ফুটিলেই যেরূপ চারিদিকে সৌগন্ধ ছড়াইয়া পড়ে, মানবীয় বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি হইলে সেইরূপ নিজের ও সংসারের চরম সুখ হইয়া থাকে। ফুলটী যে পরিমাণে বিকসিত হয় সেই পরিমাণে একটু একটু সৌরভ ছড়াইতে থাকে; মানবের বৃত্তিও যে পরিমাণে বিকসিত হয় সেই পরিমাণে সুখের উপায়-স্বরূপ হয়। বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ না হইলে মানুষের পূর্ণ প্রকৃত সুখ উপভোগের ক্ষমতা জন্মে না—নিজে এক দিবস উপবাস করিয়া, মুখের অন্ন দিয়া একটী মুমূর্ষু দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা

করিলে মনে যে এক অননুভূত পূর্ব্ব সুখ হয়, সে সুখের পবিত্র স্মৃতি কত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহা যাহার দয়া বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন না হইয়াছে সে বুঝিতে সমর্থ নহে। যে পিপাসাতুর সৈন্যাধ্যক্ষ নিজে জলপান না করিয়া তাহার অঙ্কে একটী পিপাসাতুর সৈন্যের হস্তে জলের গ্লাশ দিয়া বলিয়াছিল "তোমার আবশ্যক অধিক, অতএব এ জল তুমিই পান কর," দয়াবৃত্তি পূর্ণানুশীলন হইয়াছিল জন্যই সে এরূপ বলিতে পারিয়াছিল, এবং নিজে পিপাসা-ক্লিষ্ট হইয়াও ইহাতে সুখ অনুভব করিয়াছিল। তুমি আমি তাহা পারি কই? তোমার আমার সেরূপ সুখ উপভোগের উপযুক্ত বৃত্তির বিকাশ হয় নাই। যে মহাত্মা আপন জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও পদ্মার খরতর স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পরের জীবন উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি যে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করেন, সে অতুল সুখ বুঝিবার তোমার শক্তি কই? শক্তি নাই সুধু দয়াবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের অভাবে। সুখের মধ্যেও উচ্চ অঙ্গের ও নীচ অঙ্গের সুখ আছে; বৃত্তির যতই পূর্ণ বিকাশ হইবে, মানব ততই উচ্চ অঙ্গের সুখের জন্য লালায়িত হইবে। এই জন্যই সুখকে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য বলিতে পারি না। ইহ জীবনে যে মানব-বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ-সাধন হইবে, এবং পূর্ণ প্রকৃত সুখ উপভোগ করিবার শক্তি জন্মিবে, ইহাও বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না, বরং মানবের বৃত্তি ও সংসারের বর্ত্তমান গতির বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, আমরা ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবন লাভ করিয়া উচ্চতর সুখের অধিকারী হইব,—সে সুখ ঈশ্বর প্রাপ্তিই হউক অথবা যাহাই হউক। এই জন্য ঐহিক সুখ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সুখ শিক্ষার সহগামী, এই জন্যই শিক্ষার প্রণোদক। এস্থানে ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, ফুলের পূর্ণ-বিকাশে যেরূপ সৌরভ বৃদ্ধি হয়, মানবীয় বৃত্তির পূর্ণ বিকাশেও যে সেইরূপ সুখ-বৃদ্ধি হইবে, তাহার প্রমাণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, মানবের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিকাশে যে এই অক্ষর, ধূম্র-কল, মুদ্রা যন্ত্র, বৈদ্যুতিক-তার, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, তাপযন্ত্র, বায়ুযন্ত্র ও অন্যান্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, এই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি ও আবাস-পরিচ্ছদের ক্রমিক উন্নতি লাভ হইতেছে, ইহাতে মানবের সুখ বাড়িতেছে না কমিতেছে? নৈতিক বৃত্তির বিকাশে এই যে সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকারের বহু বিবাহ প্রথা, ও বাল্য-বিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, এই যে এক দেশের নিঃস্ব, দুর্ব্বল ও পতিতের উদ্ধার জন্য অন্য দেশের লোক জীবন মন সমর্পণ করিতেছে, এবং এই যে জগদ্ব্যাপী ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন ও পূর্ণ স্বাধীনতা-বিস্তারের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে মানবের সুখ বাড়িতেছে না কমিতেছে? শারীরিক বৃত্তির বিকাশে এই যে বেগবতী নদীর খরতর প্রবাহ হইতে কত অর্দ্ধনিমগ্ন ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইতেছে, এই যে জলন্ত হুতাশনের মধ্য

হইতে কত অৰ্দ্ধদগ্ধ প্রাণী মুক্ত হইতেছে, ইহাতে মানবের সুখ বাড়িতেছে না কমিতেছে? ইহাতে যাহারা উন্নতি করিতেছে এবং যাহাদের জন্য উন্নতি করিতেছে, সকলেরই কি সুখ ক্রমে বাড়িতেছে না? যে ব্যক্তি বৃত্তি-নিচয়ের বিকাশ-সাধন দ্বারা নিজের এবং সংসারের উন্নতি করিতেছে, তাহার মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয়, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? এই জন্যই বলিতেছি, সুখ উন্নতির সহগামী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি ও নৈতিক বৃত্তি এক বৃন্তে দুইটী ফুল। নৈতিক বৃত্তিরূপ ফুলটীর সৌরভ অধিক। এমন কি একটীর অভাবে অন্যটী একবারে মাটীতে নোয়াইয়া পড়ে, দলগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যায় ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে স্বধু জ্ঞানার্জ্জনী-বৃত্তির অনুশীলন হইতেছে; নৈতিক বৃত্তির অনুশীলন অবহেলিত হইতেছে, ফলও ফলিতেছে সেইরূপ। আমরা শিক্ষিত হইয়া স্বজন ও দরিদ্র বর্গকে সাহায্য করিতে ও এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, কিন্তু নেসায় ও বিলাসিতায় অকাতরে ব্যয় করিতেছি। আমরা যুক্তি ও বিজ্ঞান শিখিতেছি, কিন্তু তাহাতে সুফল হওয়া দূরে থাকুক, বাড়িতেছে কেবল কুতর্ক ও জড়তত্ত্বোদ্ভূত আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা জ্ঞানবান্ হইতেছি, কিন্তু নীতিমান হইতেছি না। এ সম্বন্ধে ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা মহাত্মা ম্যাট্‌সিনী ইউরোপীয় শ্রমজীবীদিগকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে প্রযোজ্য। "বর্ত্তমান শিক্ষা-পরিচালকগণ কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় যাহাতে তোমাদের সন্তানবর্গ উত্তমরূপে লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে পারে, তাহার বিধান করিয়া দিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন, এবং মনে করেন যে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এরূপ জ্ঞান দানকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না; জীবনের সঙ্গে তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেরূপ ভেদ শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানেরও ঠিক সেইরূপ ভেদ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের জীবন নহে, তাহারা জীবনের কার্য্যসাধক অস্ত্র স্বরূপ। তাহারা জীবনকে চালিত বা শাসিত করে না। কলঙ্কিত ও অকলঙ্কিত উভয়বিধ জীবনেই তাহারা সমভাবে বিরাজ করে। জ্ঞান-সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ; যাহা শিক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, কিরূপে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, জ্ঞান তাহারই উপায় করিয়া দেয়। জ্ঞান কখনই শিক্ষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। শিক্ষা মানবের নৈতিক জীবন বিশেষ ভাবে গঠন করে, জ্ঞান তাহার বুদ্ধি বিকাশের সহায়তা মাত্র করে। প্রথমটী মানুষেতে তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, দ্বিতীয়টী কিরূপে সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে তাহার উপায় করিয়া দেয়। জ্ঞান ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা একরূপ অকর্ম্মণ্য, কিন্তু নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান কোন কাজেরই নহে। তুমি পড়িতে জান, কিন্তু সে জ্ঞান তোমার কোন্ উপকারে আসিবে, যদি তুমি কোন্ পুস্তকে সত্য ও কোন্ পুস্তকে ভ্রম আছে তাহা বিচার করিতে অক্ষম হও? তুমি তোমার

মনোমত জ্ঞান প্রকাশ করিতে শিখিয়াছ, কিন্তু সে জ্ঞান তোমার কোন্ উপকারে আসিবে, যদি তোমার মন কেবল আত্ম অহঙ্কারে পূর্ণ থাকে? অর্থের ন্যায় জ্ঞানও ব্যবহারানুসারে শুভ বা অশুভ ফলপ্রসূ হইয়া উঠে। সমাজের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত হইলে ইহা সভ্যতা ও স্বাধীনতার উপায় স্বরূপ, কেবল স্বার্থকল্পে নিয়োজিত হইলে ইহা ভয়ানক উৎপীড়নের অস্ত্রস্বরূপ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে জ্ঞানের সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা না হওয়ায় শিক্ষা এক মহা দোষের আকর হইয়াছে।"

একণে দেখা যাউক, শিক্ষার আশ্রয় কে? শিক্ষার আশ্রয় সমগ্র মানব জাতি, কারণ লক্ষ্য স্থির করিয়া জাতি ভাবে কেবল মাত্র মানব জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম। দেশ, কাল, শক্তি ও অন্যান্য অবস্থা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, সমস্ত মানব জাতির শিক্ষা এক ছাঁচে ঢালা সম্ভবও নয়, কর্ত্তব্যও নয়, যে জাতি নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত তাহার যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, যে জাতি চিরকাল শান্তিতে থাকে, সে জাতির সেরূপ শিক্ষার আবশ্যক কি? যে জাতি স্বাধীন, তাহার যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, যে জাতি অধীন, তাহার সেরূপ শিক্ষা উপকারী নাও হইতে পারে। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সকল জাতির মধ্যেই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। এই সমস্ত সাধারণ নিয়ম উন্নত জাতির অনুকরণে অনুন্নত জাতি শিক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু দেশ কাল ও শক্তি বিবেচনা না করিয়া এক জাতির শিক্ষা-প্রণালী অন্য জাতির মধ্যে যথাযথ রূপে প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা বোধ হয় কোন কালেই সুফল প্রসবিণী হয় নাই, হইবেও না। এখানে এ কথাটা বলিবার আবশ্যক এই যে, একণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষ স্থানীয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজদের রীতি নীতি, ইংরেজী ধরণের শিক্ষা-প্রণালী, এমন কি ইংরেজী ভাষা পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মধ্যে যথাযথ রূপে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবী সন্তান সন্ততি গণকে পূর্ণমাত্রায় ইংরেজী ভাবাপন্ন করিবার আশায় সন্তান-সম্ভাবিতা স্ত্রীকে বিলাতে পাঠাইতেছেন, অথবা দেশেই ইংরেজী আয়া রাখিয়া সন্তান-সন্ততিগণকে ইংরেজী বুলি শিখাইতেছেন; পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে তাঁহারা ঠিক ইংরেজ সাজিতেছেন, এবং বিলাতকে "হোম" বলিয়া পরিচয় দিয়া ইংরেজ জাতির সহিত মিশিয়া ইংরেজের সহিত নিজের জাতীয়ত্ব মিশাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইংরেজী রোগের চিকিৎসা ইংরেজ ডাক্তার দ্বারা হওয়াই কর্ত্তব্য; এই জন্য এখানে জার্ম্মান পণ্ডিত গেটীর এতৎ সম্বন্ধীয় কথা গুলি উদ্ধৃত করিলাম। "কোন জাতীর স্বীয় অভাব ও অবস্থা হইতে উৎপন্ন না হইয়া ভিন্ন এক জাতির অবিকল অনুকরণে যে সমস্ত আচার-ব্যবহার উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত জাতির পক্ষে বিশেষ হিতকর নহে। কারণ যাহা এক সময়ে এক জাতির পক্ষে বিশেষ হিতকর, তাহা অবস্থা ভেদে অন্য জাতির পক্ষে বিষবৎ। এই জন্যই জাতীয় আভ্যন্তরিক অভাব-মোচনের

জন্য যে সমস্ত বিজাতীয় পদ্ধতির কিছু মাত্র আবশ্যক নাই, কেবল মাত্র অনুচিকীর্ষা পরবশ হইয়া সে গুলি আপন সমাজে নূতন ভাবে প্রবর্ত্তন-চেষ্টা মূর্খতা মাত্র।" এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১৮৮২ শালের উপাধি-দান-বক্তৃতাতে মহামতি লর্ড রিপণ সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ যোগ্য। "আমরা এক্ষণে যে প্রাচীন জাতির মধ্যে আছি, তাহাদের নিজের জাতীয়-শিল্প, সাহিত্য ও সভ্যতা সকলি আছে; যাহাতে তাহারা তাহাদের অতীত অবস্থা, জাতীয় স্বভাব ও পূর্ব্বোক্ত সংস্কার বিলুপ্ত করিয়া সকল বিষয়ে ইংরেজদের অভিপ্রেত অনুকরণ করে, সে বিষয়ে চেষ্টা করা আমাদের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সমুদয় জ্ঞানরত্ন অকুণ্ঠিত ভাবে প্রদান করি, তাহারা সেই রত্নরাজি তাহাদের প্রাচ্য জ্ঞান-রত্নের সহিত সুমিলিত ভাবে মিশাইয়া এক করিয়া লউক।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি, শক্তি ও অবস্থা-ভেদে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ নরনারীর প্রকৃতি, শক্তি ও অবস্থা ভেদেও নরনারীর মধ্যে শিক্ষার তারতম্য হওয়া আবশ্যক। আদৌ স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত কোন ভেদ আছে, ইহাই অনেকে স্বীকার করেন না। মিলের মত চিন্তাশীল লেখকও স্ত্রী-পুরুষের মানসিক শক্তির প্রকৃতিগত ভেদ অস্বীকার করেন, এবং মানসিক শিক্ষার ভিন্নরূপ ব্যবস্থা অনাবশ্যক মনে করেন। মিলের মত বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমরা বড়ই সঙ্কুচিত হইতাম, যদি বেন্ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহার বিরুদ্ধ মত পোষণ না করিতেন। বেন্ সাহেব বলেন, স্ত্রী-পুরুষের মানসিক সমতা-বিষয়ে মিল সাহেবের আলোচনা ঠিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি, এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি নিজেই নিজের মত অখণ্ডিত রাখিতে পারেন নাই। তিনি এরূপ সমতার কথা বলিয়াছেন, যাহা কেহই এ সংসারে দেখিতে পায় না। স্ত্রীজাতির শারীরিক শক্তির ন্যূনতা তিনি স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহাতে মানসিক শক্তির কোন তারতম্য হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করেন না। তিনি এ কথাটী ভাবিয়া দেখেন নাই যে, প্রসব-ক্রিয়ায় স্ত্রীজাতির যে প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়, গড়ে পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতি অধিক বলবতী, এ কথা স্বীকার করিয়া না লইলে সেই ব্যয়িত শক্তির জন্য স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা চিরকালই হীন থাকিবে। স্ত্রীজাতির শারীরিক শক্তি যে পুরুষজাতির শক্তি অপেক্ষা কম, এ কথা মিল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। স্পেন্‌সার সাহেব ও তাঁহার শিক্ষা গ্রন্থে নরনারীর এই প্রকৃতিগত ভেদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই ভেদ কিছুতেই যাইবার নহে। নারী-জাতি বিষয়ক প্রস্তাবে শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন ঘোষ একথা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সুফল-প্রসবিনী স্ত্রী-শিক্ষার উপর ভারতের কল্যাণ বহুল পরিমাণে নির্ভর

ফুটিয়াছে। বহুবিধের স্বদেশ সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা প্রগতিশীল এই ভাব ভারতবাসীর মন হইতে একেবারে দূরীভূত হয় নাই; এ সময়ে স্ত্রী শিক্ষার একটু কুফল ফলিলে, অথবা শিক্ষা-প্রণালীতে সামান্য মাত্র দোষ ঘটিলে আমাদের উন্নতি বহু শতাব্দী পিছাইয়া পড়িবে। এইজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া, স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতিগত ভেদ বুঝিয়া, সমাজের অতীত অবস্থার সহিত মিল রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। পুরুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি স্ত্রীজাতির শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি অপেক্ষা তেজস্বিনী, কিন্তু তাহাদের নৈতিক বৃত্তি পুরুষের নৈতিক বৃত্তি অপেক্ষা অতুল-শক্তিশালিনী। স্নেহ, মমতা, দয়া, ভক্তি, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ধর্ম্ম ও প্রীতি এই সকল বৃত্তি রমণী-হৃদয়ে যেরূপে সুন্দর ভাবে বিকশিত হয়, পুরুষ-হৃদয়ে কখনই সেরূপ হয় না। পক্ষান্তরে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ন্যায়ের কঠোরতা, বিপদে সাহসিকতা পুরুষ-হৃদয়ে যেরূপ প্রভাবশালিনী হয়, নারী-হৃদয়ে সেরূপ হয় না। প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার বিধান হইলে, অল্প শক্তিব্যয়ে অধিক শিক্ষালাভ হয়, এইজন্য স্ত্রীজাতি যেরূপ অল্প শক্তি ব্যয়ে পূর্ণ নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, পুরুষজাতি তাহা পারিবে না। পক্ষান্তরে পুরুষজাতি যেরূপ অল্প শক্তি ব্যয়ে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে, স্ত্রীজাতি তাহা পারিবে না। বিশেষতঃ সংসারের পূর্ণ হিত-সাধন করিতে হইলে, পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির নৈতিক শিক্ষার আবশ্যক অনেক বেশী। একটী পিতার নৈতিকহীনতার জন্য পুত্র-কন্যার যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, একটী মাতার নৈতিকহীনতার জন্য পুত্র কন্যার তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে। বাল্যকালে যে নীতি শিক্ষা হয়, তাহার প্রভাব চির-জীবন ব্যাপিয়া লক্ষিত হয়। বাল্যজীবন-গঠন-সম্বন্ধে মাতার ক্ষমতা অতুলনীয়া। লর্ড হারবার্ট বলিয়াছেন, একটী মাতা শত শিক্ষকের সমান। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নীতি সম্পূর্ণরূপে মাতার হস্তে ন্যস্ত। এই জন্যই ফরাসী জাতির অধঃ-পতনের সময় সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "ফ্রান্সের" উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট মাতার আবশ্যক। মাতার শিক্ষা-প্রভাবেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। আর একটী কথা, স্ত্রীপুরুষ লইয়াই পূর্ণ সংসার। সংসার কোমলে ও কঠোরে প্রস্তুত। নীতির মধ্যেও কোমল ও কঠোর নীতি আছে। একা পুরুষ জাতি বা স্ত্রীজাতি সংসারের সকল কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, এই জন্য প্রকৃতি বুঝিয়া দুই জাতির মধ্যে কার্য্যগত সুতরাং শিক্ষাগত, পার্থক্য রাখা সংসারের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সরল-হৃদয় স্ত্রীকুলের পক্ষে কোমল শিক্ষাই অনায়াস-সাধ্য ও বিশেষ উপকারী। সামাজিক সম্মিলনীতে ভাণ্ডারকার সাহেব সভাপতিরূপে বলিয়াছেন যে, কলেজ ক্লাশে স্ত্রীদিগকে স্ত্রীসুলভ কোমল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। মূর্ত্তিমতী দয়াস্বরূপা মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের কথা মনে হইলে আমাদের হৃদয়ে যে অতুল ভক্তি ও আনন্দ হয় ফ্রান্সের

মহাবিদ্যাবতী মেডাম ডিষ্টেলের নাম স্মরণেও আমাদের সেরূপ আনন্দ হয় না। এই জন্যই বলি, স্ত্রীকুলের নৈতিক শিক্ষা সংসারের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কেবল সংসারের উন্নতির জন্য নহে, আত্মহিতসাধন জন্যও পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির নৈতিক শিক্ষার আবশ্যকতা বেশী। কারণ সমানরূপ শিক্ষা দিলে পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির নৈতিক উন্নতি যেরূপ অধিকতর হইয়া থাকে, সমানরূপে অবহেলা করিলে তাহাদের নৈতিক অবনতিও সেইরূপ অধিকতর হইয়া থাকে। দয়ার পূর্ণ অনুশীলনে পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির হৃদয় যেরূপ অধিকতর স্বর্গতুল্য হয়, অনুশীলনের সমান অভাবে সেইরূপ অধিকতর নরকতুল্যও হয়। নীতি ও ধর্ম্ম পুরুষদিগের যেরূপ আদরের বস্তু, স্ত্রীলোকদের তদপেক্ষা অনেক অধিক আদরের বস্তু; কোন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি এই অমূল্য রত্নের কণামাত্র ক্ষতিপূরণ করিতে সক্ষম নহে। এই জনাই কোমল নৈতিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীজাতির এবং কঠোর নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির পূর্ণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুরুষ জাতির শিক্ষার বিধান করা আমাদের মতে কর্ত্তব্য।

আমরা স্ত্রীজাতির জ্ঞানার্জ্জনী শিক্ষার বিরোধী নহি। বরং তাহার সম্পূর্ণ অনুকূলে। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির উচ্চ শিক্ষা প্রভাবে নৈতিক শিক্ষা যেরূপ বলবতী ও ফলবতী হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু অধুনা স্ত্রীজাতির নৈতিক শিক্ষা অবহেলিত হইয়া যেরূপ কেবলমাত্র জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির শিক্ষা-বিধান হইতেছে, তাহার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। যাঁহারা বর্ত্তমান প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, নেসন সম্পাদকের সহিত আমরাও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, নীতি-শিক্ষা-দানে বিরত থাকিয়া নারীর কোমল হৃদয়ে শুষ্ক ন্যায়-শাস্ত্রের জটিল যুক্তি ও জড়তত্ত্বোদ্ভূত সঙ্কীর্ণ আকাঙ্ক্ষা অনুপ্রবেশ করাইয়া তাহাদের সলজ্জ সৌন্দর্য্য নষ্ট করা কি উচিত? আমাদের মূল কথা এই যে, কিয়ৎ পরিমাণে নৈতিক ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির শিক্ষা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরপক্ষেই সমান এবং একান্ত আবশ্যক; কিন্তু সেই পরিমাণের পর স্ত্রীজাতির পক্ষে নৈতিক শিক্ষাকে চরম লক্ষ্য রাখিয়া, তাহার পূর্ণতা-সাধনে বিশেষ যত্ন করিয়া যতদূর সম্ভব জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিকাশ সাধনে চেষ্টা করাই সমাজের পক্ষে বিশেষ হিতকর; পক্ষান্তরে সেই পরিমাণের পর পুরুষদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব নৈতিক বৃত্তির উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা করা সমাজের পক্ষে হিতকর।

এখানে আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক—ভারতীয় নারী কুলের শিক্ষা কোন্ ভাষায় ও কোন্ আদর্শে হওয়া উচিত। সামাজিক অধিবেশনে সামাজিক সম্মিলনীর মুখপাত্র স্বরূপে ভাণ্ডারকার সাহেব বলিয়াছেন, ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষা ইংরেজী ভাষায় ও ইংরেজী আদর্শে হওয়া আবশ্যক। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকের

ইহাই মত; কার্য্যেও তাহাই হইতেছে। আমরা স্বীকার করি, ইংরেজী ভাষা মহা ওজস্বিনী এবং ভাব-সমাবেশে একরূপ অতুলনীয়া; একমাত্র ইংরেজী ভাষা শিখিলে জগতের সমস্ত ভালভাল দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি আয়ত্ত করিবার সুবিধা হয়। কিন্তু দেশীয় ভাষায় (বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ধরিয়াই আমরা বলিতে পারি) যে সকল পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের দেশীয় নারী-কুলের যে পূর্ণ শিক্ষা হয় না একথা আমরা স্বীকার করি না। দেশীয় ভাষা দ্বারা ইংরেজী বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া আমরা অসম্ভব মনে করি না। পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয় এই ভাবে গঠিত, তথায় প্রাচ্য ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সার সংগ্রহ করিয়া, ছাত্রবর্গকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মহামতি লর্ড রিপণ সাহেব এ প্রথার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের দেশীয় পুরুষগণ যেরূপ ইংরাজী ভাষাতে সুশিক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজী বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি নিজ নিজ ভাষাতে অনুবাদ করিয়া নারীকুলকে শিক্ষা দিলে তাহাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। দেশীয় নারী-কুলের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে দক্ষ হইতে পারেন। মক্ষমুলার সাহেব কন্‌টেম্‌পোরারী রিভিউ নামক পত্রিকাতে যে একটী প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। সিভিল সারভিস্ পরীক্ষার্থিগণকে উপলক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তোমাদের নিকট সাহিত্যের এরূপ এক উচ্চ স্তর খুলিয়া দিবে, যাহা এখন পর্য্যন্তও তোমাদের অজ্ঞাত ও অননুসংহিত। এবং এরূপ গভীর চিন্তা স্তরে তোমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি পতিত করিবে, যাহা তোমাদের নিকটে পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, এবং যাহা এত উচ্চ উপদেশে পূর্ণ যে মানুষের হৃদয়ের গভীরতম সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ।" এই জন্যই আমরা ভারতীয় ললনা কুলকে দেশীয় ভাষায় জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। আমরা বিকাশের প্রয়াসী, বিপ্লবের প্রয়াসী নহি; আমরা ক্রমোন্নতি চাই, প্রলয় চাহি না। এই জন্য সমাজের অতীত অবস্থার সহিত মিল রাখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার বিধান হওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। পুরুষেরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান রত্ন আহরণ করুক, স্ত্রীজাতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রাচ্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করুক, এই দুইটীর সমাবেশ হইয়া আমাদের জাতীয় ভাষা উন্নত হউক। ইংরেজী ভাষায় নারীকুলের শিক্ষা হইলে তাহারা জাতীয় ভাব একেবারে হারাইবে। এক জন ফরাসী পণ্ডিত বলেন, ইংরেজী ভাষার এরূপ এক অনিবার্য্য আকর্ষণী শক্তি আছে যে, যাহারা এই ভাষায় শিক্ষিত হয়, তাহারা সকলেই জাতীয়ত্ব হারাইয়া অজ্ঞাতে ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। আমাদের ইংরেজী শিক্ষা হওয়াতে একথার সত্যতা আমরা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতেছি। পুরুষ যে

তাহার প্রভাবে জাতীয়ত্ব হারাইতেছে, কোমল-প্রকৃতি অবলা-কুল কি সে শিক্ষার প্রভাবে জাতীয়ত্ব রাখিতে পারিবে? নিজ জাতীয়ত্ব নষ্ট করিয়া ইংরেজ জাতির সহিত মিশিতে গেলে আমরা কালে যে একেবারে বিলুপ্ত না হইব, তাহা কে বলিতে পারে? হার্বার্ট স্পেনসারের সমাজ-তত্ত্ব পাঠে বরং ইহাই জানা যায় যে, এরূপ মিশ্রণ-চেষ্টায় অনেক জাতির বিলোপ হইয়াছে। এই সকল কারণে স্ত্রীগণকে বিজাতীয় শিক্ষা দিয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করি না। যখন দেশীয় শিক্ষায় জগতের নারীকুলশিরোমণি সাবিত্রী ও ও দময়ন্তী, লীলাবতী ও দুর্গাবতী, খনা ও গার্গী প্রভৃতি হিন্দু ললনার পূর্ণ ও হিতকর মানসিক বিকাশ-সাধন হইয়াছে, যখন হিন্দু শিক্ষার অস্তমিত অবস্থাতেও পুণ্যময়ী অহল্যাবাই, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী ও পুণ্যশ্লোকা মহারাণী শরৎসুন্দরীর ন্যায় ললনাগণের নৈতিকবৃত্তির উৎকৃষ্ট বিকাশ সম্ভব হইয়াছে; তখন অতীত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিদেশীয় আদর্শ গ্রহণ করা এবং বিদেশীয় সভ্যতার স্রোতে হিন্দুরমণীর ব্রত-নিয়ম, ঈশ্বর-ভক্তি, পরিজন-পরিচর্য্যা, আত্ম-ত্যাগ, পরার্থপরতা ও পতির উদ্দেশে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি জাতীয় পবিত্র শিক্ষা ভাসাইয়া দেওয়া কিছুতেই মঙ্গলপ্রদ নহে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেবের আমলে ভারতীয় শিক্ষা-বিষয়ক প্রশ্ন প্রথম মীমাংসার সময় অনেক বিজ্ঞ ইংরেজের মত ছিল যে, দেশীয় ভাষাতে দেশীয় লোককে শিক্ষা দেওয়াই দেশের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে শীর্ষ স্থানীয়, এরূপ অনেক লোক ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দেশীয় লোকের শিক্ষা দেশীয় ভাষায় দেওয়াই উচিত মনে করিতেছেন। এমত অবস্থায় অন্ততঃ স্ত্রীকুলের শিক্ষা দেশীয় ভাষায় হওয়া উচিত; এ কথা বলিলে অবশ্যই আমরা তীব্র সমালোচনাধীন হইব না।

একণে দেখা যাউক, নারীকুলের কি কি বিষয়ে শিক্ষা হওয়া একান্ত আবশ্যক। নারীকুলের শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বিজ্ঞান এই কয়টি প্রধান স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। কারণ সন্তান-পালন তাহাদের প্রধান একটী কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে উপর্য্যুক্ত কয়টী বিষয় না জানিলে চলে না। স্বাস্থ্যতত্ত্বে জ্ঞান না থাকিলে শিশুকে সুস্থ রাখা যায় না, ধর্ম্মতত্ত্বে জ্ঞান না থাকিলে শিশুর কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের ও নীতির বিমল জ্যোতিঃ প্রবেশ করান যায় না, এবং বিজ্ঞানে জ্ঞান না থাকিলে সন্তানের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির ক্রম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ে অন্ততঃ সামান্য রূপ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। চিত্র-বিদ্যাও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ উপযোগী। স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ ভাবপ্রবণতা খুব বেশী, এই জন্য এ বিষয়ে তাহারা সত্বরেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। চিত্রবিদ্যা নৈতিক উন্নতিরও সহায়। স্ত্রীজাতি সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ভার তাহাদের লওয়াই কর্ত্তব্য, এ জন্য সূচী প্রভৃতি শিক্ষা

কার্য্য তাহাদের শিক্ষা করা উচিত। সঙ্গীত বিদ্যাও আমরা স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগী মনে করি, স্ত্রী-কুলের এ বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা হইলে মানব জাতির নীতি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইতে পারে; সমাজের অতীত বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদের সমাজে সঙ্গীত-বিদ্যা স্ত্রীকুলের মধ্যে আশু প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, তাহা বিশেষ বিবেচনাধীন। আহার প্রস্তুত বিষয়ে ও অন্যান্য গৃহকর্ম্মে স্ত্রীজাতির বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এ সব বিষয়ে ভারতীয় ললনাদের বিশেষ শিক্ষা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-স্রোতে সে শিক্ষা ভাসিয়া যাইতেছে—ইংরেজজাতিও যে শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রচলন জন্য চেষ্টা করিতেছে, আমরা সে শিক্ষা নষ্ট করিতেছি। এ সম্বন্ধে স্মাইলস্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, "যে ক্ষেত্রে এক-মন শস্য হইত, সে ক্ষেত্রে যে দুই মন শস্য উৎপন্ন করিতে পারে, সে যদি দেশের উপকারী বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই শস্য যে উত্তম ও পরিমিতরূপে ব্যয় করে, সে কেন সংসারের উপকারী বলিয়া স্বীকৃত না হইবে"? এ সম্বন্ধে সে দিন বর্ত্তমান ছোটলাট শ্রীযুত মেকেঞ্জী সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"রন্ধন ও অন্যান্য গৃহ কার্য্য স্ত্রীলোকের শিক্ষা করা উচিত। স্ত্রী যদি গৃহকর্ম্মে দক্ষ হন, তবে তিনি স্বামীর উপর খুব আধিপত্য করিতে পারেন। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে যে, আহার করাইলে ইংরেজকে যেমন সন্তুষ্ট করা যায়, আর কিছুতেই তেমন করা যায় না। পুরুষেরা আমার এই কথা অবশ্যই অনুসন্ধান করিবেন যে, পত্নীরা যদি আমাদিগকে ভাল খাবার দ্রব্য তৈয়ার করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর আমাদের অসন্তোষভাজন হন না।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাট শ্রীযুত মেকডোনাল সাহেব বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণ-উপলক্ষে বলিয়াছেন, "আমরা আজ যে সকল বালিকা দেখিতেছি, ইহা-দিগকে আমরা সুশিক্ষিত সৌখীন মেয়ে করিতে চাহি না। আমরা ইচ্ছা করি যে, তাহারা কার্য্যোপযোগিনী হয় এবং তাহাদের স্বামীর গৃহ সুখ-স্বচ্ছন্দতাময় করিয়া তুলে।" আর দুইটী কথা বলিয়া আমরা স্ত্রী-শিক্ষার আলোচনা শেষ করিব। প্রথম কথা, শিক্ষা স্বাধীনতার আকাঙ্খী। স্ত্রীকুলকে ন্যায্য শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলে ন্যায্য স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতা হইতে ভিন্ন। কিরূপ ও কতদূর স্বাধীনতা স্ত্রীকুলের আবশ্যক, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। এই কথা বলিলেই এখানে যথেষ্ট যে, এক্ষণে স্ত্রীকুলের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, ভবিষ্যতে স্ত্রীশিক্ষা হইলে এতদপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক হইবে। দ্বিতীয় কথা, আমাদের যেরূপ সামাজিক অবস্থা, তাহাতে তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন না হইলে, অনেক সময়ে স্ত্রীকুলকে বাধ্য হইয়া অল্প শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। এই জন্য অল্পশিক্ষা ভয়ঙ্করী এ প্রবাদের দোহাই দিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন, হয় পূর্ণ শিক্ষা দাও, নচেৎ উহা হইতে একেবারে বিরত থাক। মহামুক্তি লর্ড রিপনের সহিত

তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দি যে, অল্প শিক্ষা কদাচ ভয়ঙ্করী নহে, যে অল্প শিক্ষিত হয়, সে যদি বুঝিতে পারে ও বিশ্বাস করে যে তাহার শিক্ষা অতি অল্প।

স্ত্রী-জাতির শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা পুরুষ-জাতির শিক্ষা বিষয়ক মতামত একরূপ প্রকাশ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের এক্ষণে যেরূপ জাতীয় অবস্থা তাহাতে পুরুষদিগের (নিজের জাতীয়ত্ব না হারাইয়া) ইংরাজী ভাষাতে ও ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। আইন আদালতে ইংরেজী আবশ্যক, রাজ নৈতিক আন্দোলনে ইংরেজী আবশ্যক। আমরা এক্ষণে অধীন; প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই ইংরেজদের মুখাপেক্ষী—আমাদের যে কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, ক্ষমতাশালী উচ্চমনা ইংরেজদের নিকট আমাদের দুঃখ-কাহিনী জানাইয়া তাহাদের দয়া আকর্ষণ করিতে হইবে; তাহাদিগকে আরও বুঝাইতে হইবে যে, আমরা শিক্ষায় ও বুদ্ধিতে তাহাদের অপেক্ষা হীন নহি। এ কার্য্য কেবল ইংরেজী ভাষা দ্বারাই সাধিত হইতে পারে; বিশেষ বিজ্ঞান ও দর্শনের নূতন নূতন অনেক তথ্য ইংরেজদের নিকট হইতেই আমাদের শিখিতে হইবে, এই সকল কারণে পুরুষদের ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা হওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে, জাতীয় ভাব, জাতীয় ভাষা, জাতীয় গৌরব, জাতীয় আদর্শ, এ সমস্ত যেন আমরা ইংরেজী শিক্ষা-স্রোতে ভাসাইয়া না দি; আমরা যেন ইংরাজী শিক্ষা স্রোতে জাতীয় ধর্ম্ম ভাসাইয়া দিয়া

"না হিন্দু না মুসলমান
ধর্ম্ম ধনের ধার ধারে না,
নয় মগ, ফিরিঙ্গী, বিষম খিঙ্গী
ভিতর বাহির যায় না জানা"

এরূপ গোছের অমানুষ না হই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে আমরা প্রধানতঃ দুইটী দোষ দেখিতে পাই। প্রথমটী প্রতিভা-স্ফূর্ত্তির অবরোধ; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথানুসারে সাহিত্যে যদি এক জনের রুচি কম থাকে, তাহা হইলে দর্শন বিজ্ঞান ও অন্যবিধ জ্ঞানের দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ। বিশ্ব-বিদ্যালয় সকলকে এক ভাবে শিক্ষিত করিতে চায়, এ জন্য এক্ষণে আমাদের মস্তিষ্ক হইতে মৌলিক চিন্তা ক্রমে দূর হইতেছে। সংসারের উন্নতির জন্য মৌলিকতা যে কতদূর আবশ্যক, তাহা মিল সাহেব তদীয় প্রবন্ধ গ্রন্থে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, একটী কোট্ বা এক জোড়া জুতা ঠিক ফিট করিতে হইলে হয় দোকানে ফরমাইস দিতে হয়, নচেৎ সমস্ত দোকান খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; এক-জনের জীবন তাহার উপযোগী করিয়া গঠন করা কি কোট্ ফিট্ করা অপেক্ষা সহজ কাজ, অথবা মানুষের পায়ের বিভিন্নতা অপেক্ষা মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের বিভিন্নতা কি কম?" এইজন্য সকলের পক্ষে এক প্রণালীর শিক্ষা বিধান উপকারী নহে। দ্বিতীয় দোষটী জ্ঞানের প্রগাঢ়তার অভাব। মানসিক বৃত্তির

বিকাশের পক্ষে, দুই একটী বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান, কতকগুলি বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান অপেক্ষা অধিক উপকারী। আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে সব বিষয়েই ভাসা ভাসা জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই প্রগাঢ়তা জন্মিতেছে না। একটী উপায়ে এই দুই দোষের নিরাকরণ হইতে পারে। ইংলণ্ডে যেরূপ এক এক বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা লক্ষ্য করিয়া এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, যেরূপ অঙ্কের জন্য কেমব্রিজ, প্রাচীন ভাষার জন্য অক্সফোর্ড বিজ্ঞানের জন্য ভিক্টোরিয়া; ভারতেও যদি সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের উন্নতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইতেছে না, সেটা আমাদের জ্ঞানার্জনী শিক্ষার প্রণালীগত বিশেষ দোষের জন্য নহে। আমাদের নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষার অভাবে। কিয়ৎ পরিমাণে নৈতিক শিক্ষা লাভ না হইলে জ্ঞানার্জনী শিক্ষায় আমাদের কি উপকার হইবে ? যদি আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া খাবৃত্তি ও অর্থোপার্জ্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করি, তাহা হইলে উচ্চ জ্ঞানার্জনী শিক্ষাও আমাদের জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পুরুষের নৈতিক শিক্ষার উপর স্ত্রী-জাতির কি অসীম ক্ষমতা। আমাদের স্ত্রীজাতির পূর্ণ নৈতিক শিক্ষা না হইলে, আমাদের পূর্ণ নৈতিক শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই আমাদের প্রকৃত শিক্ষিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। উতলা হইলে চলিবে না—দীর্ঘকালের ব্যাধি দীর্ঘকালেই আরাম হয়। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আমরা পর শাসনে আছি, আমাদের চরিত্র-বল অন্তর্হিত হইয়াছে, স্বাধীন তেজ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। চরিত্র-বল ও স্বাধীন তেজ ব্যতীত কোন কালেই কোন জাতির উন্নতি হয় না। যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়, "সৎ যাহার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর তাহার সহায়" এই মহা বাক্যে আস্থা রাখিয়া মানুষের গ্লানি, তিরস্কার ও সর্ব্ববিধ বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া সত্যপালন করিতে চেষ্টা না করিলে পতিত জাতির উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। বিশ্বাসে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য না হইলে, সমাজের অস্থিমজ্জাগত কুসংস্কার দূরীভূত হইবে না। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগরের মত চরিত্রবলে বলীয়ান শত শত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ভারতে না জন্মিলে ভারতের ভবিষ্যৎ আশা ফলবতী হইবে না। চরিত্র-বল ও সত্যনিষ্ঠা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শারীরিক-শিক্ষা-সম্বন্ধে বেশী বলিবার আবশ্যক নাই; যাহা সকলেই বুঝে, তাহা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" এ একটী ধ্রুব সত্য। স্পেনসার সাহেব বলিয়াছেন, "স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করা মহাপাপ।" শরীর ও মনের সম্বন্ধ কতদূর নিকট, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। শরীরের উন্নতি না হইলে মনের উন্নতি হয় না।

আগে স্থিতি, পরে উন্নতি ; আগে আত্মরক্ষা, পরে অন্যবিধ শিক্ষা। শরীর রক্ষার উপায় তিনটী ; প্রথমে ব্যায়াম, দ্বিতীয় আহার, তৃতীয় সংযম। অশ্বারোহণ, সন্তরণ, জিম্‌ন্যাষ্টিক, এগুলি সকলেরই অভ্যাস করা আবশ্যক। আহার সম্বন্ধে আমাদের গীতার বচনটী মনে রাখিয়া আহার্য্য বিচার করা আবশ্যক ;—

"আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়।

যে আহার আয়ুবৃদ্ধিকর উৎসাহ বৃদ্ধিকর, বলবৃদ্ধিকর, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকর, সুখ বা চিত্তপ্রসাদবৃদ্ধিকর এবং রুচিবৃদ্ধিকর, যাহা রসযুক্ত স্নিগ্ধ যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় এবং যাহা হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মায়, তাহাই সাত্বিকের প্রিয়। এ সম্বন্ধে স্পেনসারের কথাটীও মনে রাখা আবশ্যক,—"আমরা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাই ; খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকি না"। আহার্য্যবিচারে আগে দেখিতে হইবে, তাহা পুষ্টিকর কি না। ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত শরীরে পুষ্টি হয় না, ব্যায়াম করিতে ইচ্ছা হয় না, শরীর জীর্ণ হইয়া যায়। যে সকল বৃত্তি দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের সংযমই বিকাশের কার্য্য করিয়া থাকে। সংযমের উপকারিতা আমি বহুদিবস পূর্ব্বে "আত্ম-সংযম শিক্ষা" প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিলে রীতিমত মানসিক পরিশ্রম করা যায় না। কথাটা নিতান্ত অমূলক। এ সম্বন্ধে ডাক্তার পার্কাস বলেন, অধিক শারীরিক শ্রম করিলেও যে অত্যন্ত মানসিক শ্রম করা যাইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই ; বরং সুস্বরূপ মানসিক শ্রমের জন্য উপযুক্ত শারীরিক শ্রম একান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে ভারতবাসীর উন্নতির একমাত্র লক্ষ্যতারা শিক্ষা। যে দিন, শিক্ষা-প্রভাবে ভারতবাসী জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হইবে, যে দিন ভারতবাসী বুঝিতে পারিবে যে, আত্মা, স্বদেশ ও স্বজাতির সমুন্নতি চেষ্টাই জীবনের উদ্দেশ্য, যে দিন ভারতবাসী মাতৃ স্তন্য পান করিতে করিতে চরিত্রবল, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীন তেজ শিক্ষা করিবে, যে দিন ভারতবাসী নিজ নিজ মাতার নিকট শিক্ষা করিবে, "বীরত্ব কি মহারত্ন, একতা কি বল" যে দিন ভারতবাসী বুঝিবে কৃষি ও বাণিজ্য ব্যতীত দেশের শ্রী-বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, সে দিন ভারতবাসী কখন অলস ও উৎসাহশূন্য হইয়া থাকিতে পারিবে না, সে দিন জাতীয় মহত্ব; জাতীয় গৌরব ও আত্মাদর ভুলিয়া জাতীয়ত্ব নষ্ট করিতে ভারতবাসী চেষ্টা করিবে না, সে দিন ভারতবাসী স্বাস্থ্যনাশক, মর্ম্মচ্ছেদী, কুসংস্কারে জর্জ্জরিত হইবে না ; সে দিন ভারতবাসী স্বার্থ হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ নীচতা ভুলিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে, সে দিন মহাপাপ পরসেবারূপ মহাস্রোত মন্দীভূত হইবে, সে দিন ভারতের সর্ব্বসংহারিণী দরিদ্রতা লোপ পাইবে, সে দিন ভারতে এক নবীন শক্তি-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইবে ; সে দিন ভারতের মলিন মুখ চন্দ্রিমা প্রসন্ন হইবে,—সে দিন

"ভারত আঁধার, ঘুচায়ে আবার
জ্বলিবে তরুণ ভাতি,
নরনারী তায় সুধর্ম্ম প্রভায়
পোহাবে বিঘোর রাতি।"

শ্রীভবানী গোবিন্দ চৌধুরী।

———

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

স্পেশেল ট্রেনে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর কে, সি, এস্, আই মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত কাশীগমন বৃত্তান্ত। বৈদ্যবাটী নিবাসী মহারাজ সমাশ্রিত শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত কর্তৃক বিরচিত। ডিমাই এক ফর্ম্মা ১২ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থের প্রথমেই ত্রিশূলধারী শিবের প্রতিমূর্ত্তি, তাহার পরে শিবের ধ্যান, ধ্যানান্তে "বম্ বম্ হর শিবশম্ভো প্রসীদ," তাহার পরে "লঘুপয়ার" বলিয়া গ্রন্থারম্ভ। "লঘুপয়ারের" সর্ব্বত্রই চতুর্দ্দশ অক্ষর বটে, তবে মধ্যে মধ্যে ত্রয়োদশ বা পঞ্চদশ অক্ষরের আর্ষ প্রয়োগ আছে মাত্র। অধিক উদ্ধৃত করিলে গ্রন্থকার পাছে আবার দাবীতে ফেলেন, এই ভয়ে পাঠকের জন্য উপহার স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"মহারাজ মহারাণী সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলেন কাশীধামে আনন্দে ভাসিয়া॥
বিয়ানার অধিপতি সহর্ষ হইয়া।
মহারাজ জন্য যুড়ী দেন পাঠাইয়া॥
সোয়ার ঘোড়ার গাড়ী সবে ইষ্টেসনে।
অপেক্ষা করিয়া থাকে আহ্লাদিত মনে॥
তাহা দেখি মহারাজ সদয় হইয়া।
আপনার যুড়ী গাড়ী সকল ত্যজিয়া।
প্রেরিত সুরম্য গাড়ী করি আরোহণ।
মহারাজ কাশীধামে করিল গমন॥"

সঙ্গে চিকিৎসকও ছিলেন;—
"ডাক্তার কানাইলাল বৈদ্য নানামত।
(একাই এক সহস্র—)
দৈহিক রোগের তত্ব লয় অবিরত॥"

লেখকের ন্যায় আরও অনেক লোক মহারাজের সঙ্গে ছিল;—
"ইহারা সকলে সদা সভায় বসিয়া।
মনোমত কথা কয় মেজাজ বুঝিয়া॥"

সকলেই বুদ্ধিমান, রাজানুগ্রহ কেমন করিয়া পাইতে হয়, তাহা সকলেই জানে।

গ্রন্থকার দেশ ভ্রমণে গিয়াছেন, কাশীর ঘটবাটি দেখিয়া সুখী হইয়াছেন, আর দেখিয়াছেন; "দেশ হতে অহিফেন তথা সস্তা বটে।"

মহারাজ বিন্ধ্যবাসিনী দেখিতে গেলেন। মির্জাপুর ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইলে

"গুড়ুম্ গুড়ুম্ রবে বন্দুক ছুড়িল।"

সে সময়ে মহারাজাকে দেখিবার জন্য নাগরিকদিগের ব্যাকুলতার বর্ণনা দেখুন;—
"কোন নারী নাপ্তিনীর নিকটে বসিয়া।
আহ্লাদে পরিছে আলতা এয়োৎ রাখিয়া॥
বন্দুকের ধ্বনি শুনি অমনি উঠিল।
এক পদে আলতা পরা দেখিতে চলিল॥
কাহার কটির বস্ত্র পড়িছে খসিয়া।
পরিতে না সহে ব্যাজ ছুটিছে ধরিয়া"॥ ইত্যাদি

কালীদাসের উপযুক্ত বটে। গ্রন্থখানি মহারাজের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা সে কথার উল্লেখ নাই।

শিক্ষা-পরিচর।

৫ম ভাগ। | চৈত্র, ১৩০২ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

বৈশাখের সমুদিত প্রথম প্রভাতে,
খুলিয়াছি জীবনের নূতন অধ্যায় ;
কলঙ্ক-কালিমা-ক্লিষ্ট পুরাতন পাতে,
যত দুঃখ যত তাপ লিখিলাম হায় !
আয় নব বর্ষ আয় ! ধরি তোর হাত,
ভুলে যাই সে সকল বিগত কাহিনী !
মুছি অশ্রু, বাঁধি বুক করি দেহ পাত,
সংসার কর্ত্তব্য পথে দিবস যামিনী,
হই পুন অগ্রসর, নূতন জীবনে।
জীবনের অধিপতি ! অগতির গতি !
চাহ কাঙ্গালের প্রতি করুণ নয়নে,
ক্ষীণ দেহে ঢালি দেও অসীম শকতি ;
সেবাব্রতে দৃঢ়পদে কর অগ্রসর,
নব বর্ষে নব বল কর বিতরণ,
নবভাবে জাগরিত করহ অন্তর,
নব রাগে পদ-চিহ্ন করিতে স্মরণ।

আজ আমার জন্ম তিথি, শিক্ষা-পরিচরকে স্মরণ করিলাম ! শিক্ষা-পরিচরে যাহাতে আবার অঞ্জলি বাহির হয় ইহা তাঁহারই সকরুণ আবেদন। ইতি ১৯ শে ফাল্গুন ১৩০২।

বাল্যশিক্ষায় পিতামাতা।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা যেরূপ ছিলাম, এখন ঠিক তেমন নাই, এবং এখনও যেরূপ আছি আর কিছুদিন পরে ঠিক সেরূপ থাকিব না, ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইব। শুধু আমি-তুমি বলিয়া কেন, জগতে যাহা কিছু আছে এবং জগতের বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনই জড়-জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। আজ যাহাকে বীজ স্বরূপ দেখিতেছি, চির দিন কি তাহা এই ভাবে থাকিবে? কখনই নহে; আজ হউক, কাল হউক, অথবা দুই দিবস বাদেই হউক, যদ্যপি তাহা সুক্ষেত্রে ও সুকৃষকের হস্তে পতিত হয়, তবে তাহা হইতে অঙ্কুরের উৎগম হইবেই হইবে; এবং ক্রমে সেই অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পল্লব, পুষ্প ও ফলে সুশোভিত ও সুন্দর বৃক্ষরূপ ধারণ করিবে। কল্য যাহাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ-স্বরূপ দেখিয়া এই অনন্ত জগতের এক অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য পরমাণু বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি, অদ্য তাহা সুক্ষেত্রে ও সুকৃষকের হস্তে পতিত হওয়ায় বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য জীবের আশ্রয়-স্থল, আহারদাতা, শান্তিদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা হইয়া বিশ্বকর্ত্তার কি অদ্ভুত কৌশল ও অপার মহিমাই প্রকাশ করিতেছে।

"শিশুগণ শিশু নহে, কিন্তু তাহারা ভাবী বংশের জনক," সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই কথাটার মধ্যে যে অতীব গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। আজ যাহারা মাতৃকোলে শায়িত থাকিয়া মাতৃদত্ত স্তন্য-পানে জীবন ধারণ করিতেছে ও সময়ে সময়ে আধ আধস্বরে হাত দু'খানি তুলিয়া আই আই করিয়া চাঁদকে ডাকিতেছে,—আজ যাহারা ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে পুতুল লইয়া ক্রীড়াসক্ত, এক ভাঙ্গিতেছে, আর এক গড়িতেছে, আবার মনঃপূত হইল না, দেখিয়া নিতান্ত মনঃক্ষোভে দৌড়িয়া গিয়া মাতার ক্রোড়ে উঠিতেছে, এবং স্তন্য-পান করিতে করিতে মাতার মুখপানে চাহিয়া সমস্ত জগৎ ভুলিয়া যাইতেছে, কাল যে তাহারাই জগতের নেতা হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? হয়ত যে আননে একদিন আধ আধ কথাও অতি কষ্টে বহির্গত হইয়াছিল, সেই আননের জলদগম্ভীর নির্ঘোষে সসাগরা পৃথিবী কম্পিতা হইবে। যে মস্তিষ্ক একদিন পুতুল মনঃপূত হইয়াছিল না বলিয়া মর্ম্মাহত হইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিয়াছিল, হয়ত সেই মস্তিষ্ক হইতে কোন না কোন দিন জগতের গূঢ় হইতে গূঢ়তম রাজনৈতিক সমস্যা সকলও অতি সহজে সুন্দররূপে মীমাংসিত হইবে, এবং সেই মস্তিষ্কের উপর দিয়া কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, সকল প্রকারের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইলেও ইহা প্রশান্ত মহাসাগর অপেক্ষাও

প্রশান্ততর ভাব অবলম্বন করিয়া, অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে। যে ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় দ্বারা নির্ব্বোধ শিশু এক দিন আই আই করিয়া চাঁদকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু চাঁদ তাহার কথা শুনে নাই, হয়ত সেই বাহুদ্বয়ের প্রতাপে সমস্ত জগৎ তাহার পদাবনত হইবে। তাই কবি গাহিয়াছেন,—"শিশুগণ শিশু নহে, কিন্তু তাহারা ভাবীবংশের জনক।"

কথাটি ঠিক, আজ যাহাদিগকে আমরা বালক বালিকা দেখিতেছি, কাল তাহারাই পিতা মাতা হইয়া দাঁড়াইবে। আজ যাহারা বর্ণ-শিক্ষা-প্রণালী হস্তে বিদ্যালয়ের কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট, কাল হয়ত তাহারাই পার্লিয়ামেণ্টের উচ্চতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ-নৈতিক কূটতর্ক সকলের মীমাংসায় নিযুক্ত থাকিবেন; আজ যাহারা সমাজে নগণ্য, কাল হয়ত তাহারাই সমাজের অগ্রগণ্য হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বালক-বালিকাদিগের উপরই তাহাদের স্ব স্ব পরিবারের, সমাজের, জাতির এবং সমগ্র দেশের সর্ব্ব-বিষয়িণী উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তাহাদের উন্নতিতেই দেশ উন্নতির উচ্চতম সোপানে উন্নীত হইবে, এবং তাহাদের অবনতিতেই দেশ অবনতির অধস্তন সোপানে আনীত হইবে। এইজন্য তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য।

যাহাদিগের উপর তাহাদের নিজ নিজ পরিবারের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের, স্বজাতির, স্বদেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল কোথায় অদৃশ্যভাবে লুকাইত রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে অবধারণ করা কর্ত্তব্য। রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে ঔষধ প্রয়োগ বৃথা। আগে রোগ নির্ণয় কর, অচিরাৎ ঔষধে ফলপ্রাপ্ত হইবে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিশ্বাস ছিল, সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল অধিকাংশ স্থলেই তাহার মাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং বস্তুতও তাহাই এক দিবস সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধেই গল্প করিতে করিতে তিনি মাদাম-কাম্পেকে বলিয়াছিলেন, "আমার নিকট বোধ হয় যে, প্রাচীন ধরণের শিক্ষা-প্রণালী (এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী বুঝাইতেছে), অতীব জঘন্য এবং কোন কার্য্যকরী নহে; সাধারণের সুশিক্ষা সম্বন্ধে কিসের অভাব, বলিতে পারেন কি?" মাদাম কাম্পে তৎক্ষণাৎ এক কথায় উত্তর দিয়াছিলেন—"মাতার।" এই কথাটী সম্রাটের হৃদয়ে বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি অতীব প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মাদাম তুমি অতি সংক্ষেপে বড়ই সুন্দর উত্তর দিয়াছ, যথার্থ সুশিক্ষিতা মাতাই সন্তান-শিক্ষার মূলীভূত কারণ।" নেপোলিয়ন নিজেই তাঁহার চরিত্র সংগঠন-সম্বন্ধে মাতার উপর গুণারোপ করিয়া থাকেন। তাঁহার মাতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দৃঢ়-প্রতিভা ও প্রবল বিচার-শক্তি-সম্পন্না রমণী ছিলেন। কিরূপে সন্তানের সুশিক্ষা সম্পাদন এবং চরিত্র সংগঠন করিতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কখন সন্তানকে আদর করিতে

হয়, এবং কখন তাঁহাকে শাসন করিতে হয়, তাহা তিনি সুন্দররূপে জানিতেন। অযথা আদর দেখাইয়াও কখন তাহাকে প্রশ্রয় দেন নাই, অথবা অযথা শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াও তাহার নৈসর্গিক শক্তি সকলকে নিস্তেজ করেন নাই। স্নেহ, মমতা, শাসন, এবং অপক্ষপাতিত্ব, এই সমস্ত গুণের সংমিশ্রণ দ্বারা তিনি শিশু নেপোলিয়নের চরিত্র এরূপ ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ন মাতার প্রতি যথারীতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন না করিয়াই থাকিতে পারেন নাই। শুধু নেপোলিয়ান কেন, ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে, যাহারা সমাজের উচ্চপদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, মাতাই তাঁহাদের অধিকাংশের উন্নতির একমাত্র কারণ। স্যর ওয়াল্‌টর স্কটের পিতা অতি সামান্য লোক ছিলেন, কিন্তু মাতার গুণেই তাঁহার নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। সেইরূপ লর্ড বাইরণ, গ্রে, কাউপার, চিপ্‌-আর্টিস্‌ ম্যান্‌স্‌ ফিল্ড ইত্যাদি সকলেই মাতার নিকট হইতে নিজ নিজ চরিত্রের ও বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

এস্থলে হয়ত প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক মাতার সন্তান হইলে সকলেই কি সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইবে।—সকলেই কি অমিত-তেজা ও অমিত-প্রতিভাশক্তি-সম্পন্ন হইবে? অথবা সকলের হৃদয়েই কি তাহার বিপরীত গুণ-সকল সমানভাবে পরিলক্ষিত হইবে? যাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার, জিজ্ঞাস্য এই যে, কৃষক এক হইলে তৎকর্ত্তৃক কর্ষিত সমস্ত ক্ষেত্রেতেই কি সমান পরিমাণের শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে? ক্ষেত্রের তারতম্যানুসারে অবশ্যই শস্যের তারতম্য হইয়া থাকে। কৃষকের তারতম্যানুসারে ক্ষেত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের অনেক হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ক্ষেত্রের নৈসর্গিক শক্তির উপর কোন কৃষকেরই সর্ব্বতোভাবে হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা নাই। কৃষক ভাল হইলে ক্ষেত্র অনেকাংশে উৎকর্ষলাভ করে, এবং কৃষক মন্দ হইলে অনেক উৎকৃষ্ট জমিও অপকর্ষের চরম সীমায় আনীত হয়। এস্থলেও ঠিক সেইরূপ; মাতা উত্তম হইলে অধিকাংশ স্থলেই সন্তানকে ভাল হইতে দেখা যায়। ইহার বিপরীত যে আদবেই দৃষ্ট হইবে না, এ কথাও আমি স্বীকার করি না, চরিত্রের মহত্ত্ব ব্যক্তিগত, কিন্তু বংশগত নহে। উচ্চবংশে জন্মিলেই উচ্চ হইতে হইবে, এবং নীচবংশে জন্মিলেই নীচ হইতে হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নহে। যদি তাহাই হইত, তবে নেপোলিয়নের সমস্ত ভ্রাতাকেই নেপোলিয়নের মত হইতে হইত; পিথাগোরাস্‌কে রৌপ্যকারের কার্য্যে, ইউরিপিডিস্‌কে মালির কার্য্যে, এবং ভার্জিনকে কুম্ভকারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। তাই বলিতেছি, মহত্ত্ব ব্যক্তিগত, কিন্তু বংশগত নহে। মহত্ত্ব যদি ব্যক্তিগতই হয়, তবে যে ভাল হইবার সে স্বতঃই ভাল হইবে, আর যে মন্দ হইবার তাহাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না; সুতরাং অযথা পিতা মাতার উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলা-

মঙ্গলের কারণ নির্দ্দেশ করা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে,—এ কথাও অনেকে বলিতে পারেন। কিন্তু এটি তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সুক্ষেত্র ও সুকৃষক উভয়েরই দরকার। ইহার একটির অভাব হইলে অন্যটিও অকর্ম্মণ্য হইবে। বিশেষতঃ সু-কৃষকের সর্ব্বত্রই দরকার, কেন না ক্ষেত্র মন্দ হইলে কৃষকের গুণে তাহাও যে কোন প্রকারেই হউক, সম্পূর্ণ শস্য উৎপাদন করিতে না পারিলেও কিছু না কিছু অবশ্যই উৎপাদন করিবেই করিবে। সন্তান যেমনই হউক, পিতা মাতার ভাল হওয়া সর্ব্বাগ্রে দরকার। পিতামাতা ভাল না হইলে সন্তান কোন রূপেই ভাল হইবে না; যদি হয়, সে দৃষ্টান্ত অতি বিরল। মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃই অনুকরণ-প্রিয়, অনুকরণ ব্যতীত সে কখনই থাকিতে পারে না। কি বাল্যাবস্থা, কি যৌবনাবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, সকল অবস্থাতেই সে অনুকরণ করিতেছে,—বিশেষতঃ শৈশবাবস্থাতে। এই অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই এক অভিনব জগতে প্রবেশ করে। এখানে সকলই তাহার নিকট নূতন এবং অপরিচিত। সে যেদিকে চায় সেই দিকেই নূতন নূতন দ্রব্য ও নূতন নূতন প্রাণী দেখিতে পায় সে জানেনা ইহা কি, অথবা উহা কি, অথচ তাহার সকলই জানিবার বাসনা হয়। যেমন কোন একটি অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইলে যতক্ষণ না তত্রত্য সকলের সহিত অথবা অন্ততঃ কিয়দংশ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, ততক্ষণ মনে সুখ বা শান্তির লেশমাত্রও থাকে না, জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত থাকিয়াও অনালাপ-নিবন্ধন নির্জ্জন-বাসের যন্ত্রণা উপভোগ করা অপেক্ষা লোকে শীঘ্র শীঘ্র সকলের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া সুখানুভবের বাসনা করে; সেইরূপ জীবও তাহার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া যখন এই অভিনব জগতে প্রবেশ করে, তখন সকলই তাহার নিকট নূতন ও অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব সকলের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের সাহচর্য্যে সুখ-ভোগ-বাসনা তাহার হৃদয়ে প্রবল রূপে জাগিয়া থাকে। মানবের জ্ঞান-লালসা যে অতীব প্রখরা, ইহা আমরা সদা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। দেখিতেছি বটে—কিন্তু স্থূল-চক্ষে। একটুকু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই ইহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যাইবে। বালকগণ কতদূর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, ইহা সকলেই জানেন, এবং অবশ্যই দেখিয়াছেন। কথা প্রস্ফুটিত হইবার পর হইতেই তাহারা যাহা দেখে সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়া থাকে; শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া এক কালীন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। সময়ে সময়ে যে তাহারা এমন কঠিন প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, তাহা মানবের মস্তিষ্ক হইতে সহসা মীমাংসিত হয় না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একদা একটি ভদ্র লোক সন্তান ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই সময়ে আমিও তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। একটি মাহুত হস্তীতে আরোহণ

করিয়া ঠিক সেই সময়ে আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল।
সন্তান জিজ্ঞাসা করিল—
বাবা ওটা কি?
উত্তর। হাতী।
প্রঃ। হাতী কি?
উঃ। হাতী আবার কি, হাতী হাতী?
প্রঃ। হাতী দিয়া কি করে?
উঃ। চড়ে।
প্রঃ। হাতী কি খায়?
উঃ। ঘাস খায়।
প্রঃ। কি দিয়া ঘাস খায়?
উঃ। মুখ দিয়া।
প্রঃ। মুখ কৈ?
উঃ। শুঁড়ের নীচে।
প্রঃ। হাতীর শুঁড় কৈ?
উঃ। ঐ যে লম্বা ঝুলিতেছে, ঐ শুঁড়।

তখন শিশু নিজ মুখে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আমাদের শুঁড় নাই কেন?" এতক্ষণ পিতা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সৎ অসৎ যাহা হউক এক একটা উত্তর দিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ধৈর্য্য আর রহিল না। বিরক্তির সহিত তিনি সন্তানকে লম্বা চওড়া এক ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর্, বিরক্ত করিস্ না, তোর শুঁড় হবে এখন।" সন্তানের শেষ প্রশ্ন শুনিয়া আমার বড়ই হাসি পাইল। একটুকু হাসিয়া ঐ ভদ্র লোকটিকে বলিলাম, বিরক্ত হইবেন না, এসময় এরূপ প্রশ্ন হইয়াই থাকে; এবং আপনাদেরও উহাতে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া যতদূর সম্ভব সদুত্তর প্রদান করা উচিত।"

যে মুহূর্ত্তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অজ্ঞাতসারে তাহার শিক্ষার আরম্ভ হইয়া থাকে, এবং সেই সময় হইতেই সে যাহা দেখে, তাহাই অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে। এই সময়ে বালকের হৃদয়-দর্পণ এরূপ স্বচ্ছ ও কোমল থাকে যে, তাহার উপর যাহা পতিত হয় তাহাই সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত ও ক্ষোদিত হইয়া থাকে। এই সময়ে যাহা তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়া এককালীন বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা আর কখনই অপসারিত হইবার নহে। এই সময়েই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ বীজ তাহার হৃদয়ে রোপিত হইয়া ক্রমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়, এবং পরিণামে তাহার ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। জীবনের প্রত্যূষ সময়ে,—যে সময়ে শিক্ষা অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া থাকে, সেই সময়ে সন্তান সম্পূর্ণ রূপ মাতৃহস্তে ন্যস্ত থাকে, সুতরাং মাতা ব্যতীত সে আর কাহাকে অনুকরণ করিবে? এই অবস্থায় সর্ব্ব বিষয়ে মাতাই তাহার একমাত্র অনুকরণীয় এবং মাতাই তাহার চরিত্র-শিক্ষার আদর্শ-স্থল। অতএব এই আদর্শ মাতার কিরূপ হওয়া উচিত, পাঠকবর্গ একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আজ কাল ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, পরিবার কিঞ্চিন্মাত্র সমৃদ্ধিশালী হইলেই মাতা কেবল প্রসব করিয়াই খালাস। যেমন প্রসব-কার্য্য শেষ হইল, অমনি সন্তানটি সর্ব্বতোভাবে দাস দাসীর হস্তে ন্যস্ত হইল, এবং তাহারাই সন্তানের লালন

পালন ইত্যাদি যাহা করিতে হয় সমস্তই করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা একটি জঘণ্য প্রথা। কারণ, পিতা মাতা নিজ নিজ সন্তানের জন্য যাহা করিতে অক্ষম বা কুণ্ঠিত, তাহা যে অপরের হস্তে সুন্দর রূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহার প্রমাণ কি? বিশেষতঃ সচরাচর যে সমস্ত লোকের হস্তে সন্তানের লালন-পালনের ভার অর্পিত হইয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই ইতর শ্রেণীর লোক। তাহাদের কথা-বার্ত্তা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা-প্রণালী সমস্তই ইতর জনোচিত। অতএব ইহাদিগের হস্তে লালিত পালিত সন্তান যে সর্ব্বতোভাবে ইহাদিগকেই অনুকরণ করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। অতএব সন্তানের চরিত্র গঠিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পিতা-মাতার চরিত্র গঠন করাই কর্ত্তব্য। পিতা মাতা যেরূপ হইবে, সন্তানও ঠিক তদ্রূপ হইবে, এদৃষ্টান্ত বিরল নহে। কথা বার্ত্তা, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতেই অনায়াসে বুঝিতে পারাযায় যে, এটি ভদ্র ঘরের অথবা অপর লোকের সন্তান। ভদ্রবংশীয় সন্তানের মুখে কথনই কুৎসিৎ বা ইতর ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ভদ্রসন্তানের মুখে ইতর ভাষা শুনা যায়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল দাস-দাসী অথবা অন্য প্রকার কুসঙ্গই তাহার একমাত্র কারণ। অপর লোকের সন্তানের মুখে কুৎসিত ভাষা বিরল নহে। তাহার কারণ এই যে, সন্তান যাহা দিগকে অনুকরণ করে, তাহাদিগের চরিত্রানুসারেই সন্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। ভদ্র লোকের ঘরে অনুকরণীয় বিষয় ভাল, কাজেই সন্তানও ভাল হইয়া থাকে। অপর লোকের ঘরে অনুকরণীয় বিষয় অতীব কদর্য্য, সুতরাং সন্তান জঘণ্য প্রকৃতির না হইয়াই থাকিতে পারে না।

পিতামাতার মানসিক ও দৈহিক শক্তির তারতম্যানুসারে সন্তানের মানসিক ও দৈহিক শক্তির অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্টবিউভ্ নামক জনৈক নব্য ফরাসী পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, মহৎ লোকেরা মাতার নিকট হইতেই স্বস্ব স্বভাব ও প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুইডেননিবাসী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-গ্রন্থরচয়িতা সুইডেনবর্গের মত তাহা নহে। তিনি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাত্রেই পিতা হইতে আত্মা ও মাতা হইতে শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতার মানসিক শক্তি অনুসারে সন্তানের মানসিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি এবং মাতার শারীরিক অবস্থানুসারে সন্তানের শারীরিক অবস্থার ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুইডেনবর্গ-সম্বন্ধে এ দৃষ্টান্তটি যথাযথ প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু ইহার বিপরীতও অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাই হউক, সন্তান, পিতা হইতে মানসিক শক্তি ও মাতা হইতে শারীরিক, অথবা মাতা হইতেই মানসিক শক্তি ও পিতা হইতে শারীরিক শক্তি প্রাপ্ত হয় কিনা, সে বিষয় লইয়া আমি সময় নষ্ট করিতে চাই না এবং এক্ষণে তাহা আমার আলোচ্য বিষয়ও নহে। তবে এই বলিতে চাই যে, মাতৃগর্ভে সন্তানের স্থিতি হইবার সময় হইতেই কি শারীরিক কি মানসিক

পিতা মাতা উভয়েরই সর্ব্ববিধ শক্তি সন্তানের উপর বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাতৃ-সমীপে থাকে; এবং সেই সময়ই যখন তাহার চরিত্র-গঠনের প্রকৃত সময়, তখন পিতা অপেক্ষা মাতার আচার ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতিই সর্ব্বথা দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। পিতা যেমনই হউন না কেন, মাতা ভাল হইলে তিনি তাঁহার স্বীয় চরিত্রের দৃষ্টান্ত এবং স্নেহ মমতা, নম্রতা ও সদুপদেশের আকর্ষণীশক্তি দ্বারা সন্তানকে ধর্ম্ম-পথে রাখিয়া তাহার চরিত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু যেস্থলে মাতার চরিত্র দূষিত, পিতা সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও সন্তানের মঙ্গলের আশা অতি কমই করিতে পারা যায়। প্রচুর ঐশ্বর্য্যই থাকুক, সুখ-স্বচ্ছন্দতাই থাকুক, অথবা ভূরি ভূরি সুদক্ষ শিক্ষকই নিযুক্ত থাকুক, সুমাতার অভাব-পূরণ কিছুতেই হইবে না। দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা ও সহৃদয়তা ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ সমাজের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা গৃহেতেই মাতা দ্বারা সন্তানের সুকোমল হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হয়, এবং তাহাই ক্রমে পরিপক্ক হইয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল প্রসব করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের জন্য পিতা মাতাই সর্ব্বতোভাবে দায়ী, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগেরই সুশিক্ষিত হইবার আবশ্যক, এবং পূর্ব্বাপর সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চলা উচিত। অন্যথা সন্তানের মঙ্গলের আশা অতি কম।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

শিক্ষা সম্বাদ।

আসাম শিক্ষা-সমিতি। গত বর্ষাকালে আসামে একটি শিক্ষা-সমিতি বসিয়াছিল, তত্রত্য ডাইরেক্টর সংপ্রতি সেই সমিতির প্রস্তাববলী মঞ্জুরীর জন্য চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের নিকট দাখিল করিয়াছেন। সমিতির একটী প্রস্তাব আছে, আসাম্‌ বিভাগে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করা। প্রস্তাব উত্তম, কিন্তু এ বিষয়ে ডাইরেক্টর সাহেবের ব্যবসায়বুদ্ধি দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, বিজ্ঞাপন দিয়া প্রথমে লেখকদিগকে আহ্বান করিবেন, এবং লেখকেরা আপন পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিলে যাঁহার পাণ্ডুলিপি মনোনীত হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৫০ টাকা দিয়া পুস্তকের স্বত্বটি ক্রয় করিয়া লইবেন। এ প্রস্তাবে কোন মস্তিষ্কবিশিষ্ট লেখক সম্মত হইবেন বলিয়া

বোধ হয় না। প্রস্তাবটা ঠিক দোকানদারের মত হইয়াছে। মনোনীত গ্রন্থের স্বত্বটা গ্রন্থকারেরই থাকিবে, অধিকন্তু প্রথম সংস্করণটা গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে সম্পাদন করিয়া দিবেন, এরূপ প্রস্তাব করিলে কথাটা ঠিক রাজার মত হইত। একদিকে যেমন পুরস্কারের প্রলোভন আছে, অন্যদিকে যে সেইরূপ পণ্ডশ্রমের ভয় আছে, এ কথাটাও ভাবিয়া দেখিতে হয়।

আদর্শ পুলিশ কর্ম্মচারি।

জেলা হুগলির অন্তর্গত মণ্ডলাই নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু বসু মহাশয় দীর্ঘকাল সম্মানের সহিত পুলিসে কর্ম্ম করিয়া কয়েক বৎসর হইল পেন্‌সন লইয়াছেন, এবং শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সস্ত্রীক কলিকাতায় বাস করিতেছেন। বাহিরের লোকে তাঁহাকে জানে না, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে জানে, তাহারা সকলেই তাঁহার পবিত্র চরিত্রে বিমুগ্ধ। তিনি যখন যে প্রদেশে শান্তি-রক্ষার ভার লইতেন, তখন নিষ্পাপ থাকিলে রাজ-দণ্ডের ভয় নাই মনে করিয়া সে প্রদেশের লোক নিশ্চিন্ত থাকিত। ইলিয়টী আমলের প্রারম্ভেই তিনি পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন, সুতরাং 'যত শাস্তি তত পুরস্কার' এই ভয়ঙ্কর নিদেশ তাঁহাকে পালন করিতে হয় নাই। সুদীর্ঘ চাকুরীর সময়ে কখন্ কোন্ নিরপরাধ ব্যক্তিকে বহু যত্ন করিয়াও রাজদণ্ড হইতে বাঁচাইতে পারেন নাই, সে কথা স্মরণ করিয়া আজিও তিনি আক্ষেপ এবং অশ্রুপাত করেন। রাজসাহী অঞ্চলে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন, সেখানে অনেকের নিকটেই তিনি সুপরিচিত। যখন প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎ সুন্দরী দেবীর নির্ম্মল পবিত্র জীবনের ধর্ম্ম-জ্যোতিতে দিগন্ত পরিপূত হইতেছিল, সেই সময়ে পুঁঠিয়ার শান্তি-রক্ষার ভার জগদ্বন্ধু বাবুর হস্তে ন্যস্ত ছিল, সুতরাং অনেক বিষয়ে মহারাণীর চরিত্রের দেবত্ব প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। নিজ চরিত্রে পবিত্রতা না থাকিলে অন্য চরিত্রের দেবত্ব কেহ বুঝিতে পারে না; একথা নিশ্চয়। মহারাণীর প্রসঙ্গ উঠিলে জগদ্বন্ধু বাবুর মুখে তাঁহার প্রশংসা যেন শতধারে ফুটিয়া উঠে; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে জগদ্বন্ধু বাবু পবিত্রতার কেমন পক্ষপাতী, এবং সেই অলোক-সামান্য দেব-চরিত্র কেমন গভীর ভাবে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

পুলিসে চাকুরী করিয়া কত লোকে বাড়ী ঘর সৌধ-মণ্ডিত করিয়া ফেলে, জমিদারী কিনিয়া বড় হইয়া যায়; কিন্তু জগদ্বন্ধু বাবু তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি সারা জীবন পুলিসে চাকুরী করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অতি সামান্য। বাস্তবিক তিনি যে ভাবে চলিতেন, তাহাতে অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন অসম্ভব, নিজের খরচ পত্র চালাইয়া বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই সঞ্চয় করিয়াছেন মাত্র। ফলতঃ যিনি মফস্বলে কর্ত্তব্যোপলক্ষে যাইতে হইলে প্রজার অন্ন খাইবার ভয়ে বাসা হইতে দাইল চাউল, এমন কি লবণ টুকু পর্য্যন্ত বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তিনি যে অধিক অর্থ-উপার্জ্জন করিতে পারিবেন না, ইহাত

অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারি এই সামান্য অর্থ গবর্ণমেণ্টের হাতে গচ্ছিত রাখাতে এখন তিনি কিঞ্চিদধিক দুই শত টাকা মাত্র বার্ষিক সুদ পাইতেছেন। সংসারে তাঁহার প্রতিপাল্য একমাত্র সহধর্ম্মিণী ব্যতীত আর কেহ নাই। সংপ্রতি তিনি একখানি উইল করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তিতে তদীয় সহধর্ম্মিণী তাঁহার যে সামান্য স্থাবর সম্পত্তি আছে তাহার নিব্যূঢ় স্বত্বাধিকারিণী হইবেন, আর গচ্ছিত টাকার সুদ দ্বারা গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। যদি কখনও এই বিদ্যালয় উঠিয়া যায়, তবে দুঃখী দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য গ্রামস্থ চিকিৎসালয়ে উক্ত টাকা প্রদত্ত হইবে। এ ব্যবস্থায় বালকদিগের জননীগণও উপেক্ষিত হন নাই। যে সুশীল সচ্চরিত্র বালক পড়া শুনায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বৃত্তি পাইবে, তাহার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া প্রতিপালিকা নগদ টাকার একটি পুরস্কার পাইবেন। উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রসব এবং পালনের ঋণ কেহ কখন পরিশোধ করিতে পারে না সত্য; কিন্তু এই অসাধারণ আত্ম-ত্যাগের জন্য মাতার প্রতি যে কিঞ্চিৎ সম্মান-প্রদর্শন, সমাজে তাহাও হয় না। মাতৃপূজার এই অভিনব সুন্দর প্রণালীটি প্রবর্ত্তিত করিয়া পরোক্ষ ভাবে জগদ্বন্ধু বাবু দেশের একটা প্রকৃত উপকার করিলেন। ইহাতে প্রতি বৎসর একজন মাত্র জননী পুরস্কৃত হইবেন বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রত্যেক জননীই আপনার দায়িত্ব এবং মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাবলা গাছে যেমন আম জন্মে না, সেইরূপ জননীর মহত্ব না থাকিলে মহৎ পুত্রও হইতে পারে না। আমরা জননীর মহত্ব কবে বুঝিব, জননীর আদর কবে শিখিব, জননীর হাতে সন্তানের শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রদানের ভার দিয়া দেশের সুখ-সৌভাগ্যের জন্য কবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব!

সৌভাগ্যক্রমে তিনি উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীও পাইয়াছেন, লক্ষ্মীরূপিনী সেই পতিব্রতা রমণী এ ব্যবস্থায় কিছু মাত্র দুঃখিত না হইয়া সাহ্লাদে পরামর্শাদি দিয়া স্বামীর সৎকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

জগদ্বন্ধু বাবু রাজা বা রায় বাহাদুর হইবেন, এই আশায় যে আমরা সংবাদটি প্রকাশ করিলাম, তাহা নহে। একজন পুলিস কর্ম্মচারী কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অর্থ কেমন করিয়া স্বদেশের মঙ্গলের জন্য, স্বজাতির শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করিতে পারেন, পাঠককে তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই সংবাদটি প্রকাশ করিলাম। জগদ্বন্ধু বাবু নাম চাহেন না, গোপনে সৎকার্য্য করিয়া সুখী হন, এবং কেহ তাঁহার কার্য্যের উল্লেখে তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু পাছে এই কথাটি সাধারণকে বলিবার সুযোগ আমাদের অদৃষ্টে আর না ঘটে; পাছে স্বদেশবাসিগণ এমন সুন্দর নিভৃত পরোপকারময় জীবনের সংবাদটি একেবারেই না পান, এই আশঙ্কায় আমরা

সামান্য ভাবে উল্লেখ করিয়া রাখিলাম মাত্র। জানিতেছি, হয়ত এ কার্য্য দ্বারা তাঁহার অপ্রীতি-ভাজন এবং তিরস্কার-যোগ্য হইলাম; কিন্তু সে ভয়ে শিক্ষা-পরিচর আপন কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারে না। তিনি যদি এ অপরাধের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করেন, আমরা তাহা আশীর্ব্বাদ মর্ম্মে করিয়া গ্রহণ করিব।

মুমূর্ষু শিক্ষক।

দুঃখদাস শর্ম্মা শিবনগরের পাঠশালার শিক্ষক। শিবনগরে ধনী মানী এবং বড় বড় উপাধিধারী শিক্ষিত লোক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই একদিন না একদিন গ্রামের পাঠশালায় দুঃখ দাসের নিকট পড়িয়াছেন। দুঃখ দাসের বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালার সংস্থাপন হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি ইহার শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। তিনি কখনও এই পাঠশালার শিক্ষকতা ছাড়া আর কোন কর্ম্ম করেন নাই, অন্য কোন শিক্ষকও কখন শিবনগরের পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতে আইসে নাই।

বৃদ্ধ দুঃখদাস আজ মুমূর্ষু, তাই শিবনগরের পাঠশালা আজ বন্দ গ্রামের সমস্ত বালক যুবক এবং প্রৌঢ় তাঁহার নিকট উপস্থিত।

বৃদ্ধেরা প্রায়ই মৃত্যুর সময় বুঝিতে পারেন, আর অনেকেরই মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানও থাকে। দুঃখদাসের জ্ঞান এবং বাক্‌শক্তি অক্ষুন্ন আছে; কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন অদ্যই তাঁহার শেষ দিন সুতরাং ছাত্রবর্গকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য শয্যা পার্শ্বে আহ্বান করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যখন জানিলেন সকলেই উপস্থিত তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ;—

"আজ তোমাদের নিকট আমার শেষ বিদায়। আমার কথা কহিবার শক্তি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, এই সময়ে তোমাদের নিকটে বিদায় হইয়া থাকি, এবং জন্মেরমত কয়েকটা কথা বলিয়া রাখি। আমি শিবনগরের পাঠশালায় শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া এখানেই জীবনের শেষ করিলাম। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাঅপেক্ষা বেশী বিদ্বান্ হইয়াছ তথাপি আমি তোমাদিগকে ছাত্র বলিয়াই ভাবি, এবং ছাত্রের ন্যায়ই ব্যবহার করি। তোমাদিগকে ভাল কথা বলিতে কখনও আলস্য করি নাই। আজও সেই ইচ্ছা, কিন্তু শক্তির শেষ হইয়া আসিতেছে, শেষ মুহূর্ত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই। বিদেশ যাইবার কালে অথবা মরিবার সময়ে আত্মীয় বন্ধু দিগকে যে কথা

গুলি বলা যায়, তাহা তাহাদের মনে থাকে। এই জন্যই এত কষ্টের মাঝেও তোমাদিগকে দুই একটি কথা বলিতে আমার এত যত্ন। কিন্তু সকল কথার আগেই বলিয়া রাখি, ভ্রান্তি বশতঃ কখনও যদি কাহারও মনে কষ্ট দিয়া থাকি, কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি, আমাকে সে জন্য ক্ষমা কর।" এই বলিয়া দুঃখদাস কিছুকাল নীরব রহিলেন, উপস্থিত অনেকেই অশ্রু মুছিতে লাগিল। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

"মানুষের অভাব অনেক, সেই সকল অভাব ঘুচাইবার জন্য কার্য্যও অনেক। নিজের এবং পরিবারের জীবন ধারণের পরিপন্থি যে সকল অভাব সর্ব্বাগ্রে তাহা দূরকরা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু মনে রাখিও মানুষের বাস্তবিক অভাব অতি সহজেই ঘুচে। কিন্তু কাল্পনিক অভাব কখনও ঘুচে না।

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক অভাবের ন্যায় সামাজিক এবং জাতিগত অভাবও অনেক আছে। এই সকল অভাব দূর করা বড় কঠিন অথচ এই সকল অভাব দূর করিবার চেষ্টাতেই মানুষের মহত্ব। নিজের অভাব পশু পক্ষীও দূরকরে ; স্বজাতির কথা ভাবিবার, স্বজাতির জন্য খাটিবার, স্বজাতির দুঃখ দূরকরিবার মহত্ব কেবল মানুষেরই আছে। জাতীয় অভাবের শেষ নাই। সকল অভাব একজনে দূর করিতে পারে না, সকল অভাব দূর করিবার জন্য সকল দিকে কেহ খাটিতেও পারে না। প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি সামর্থ, এবং রুচি বুঝিয়া এক একটি জাতীয় কার্য্যে হাত দিবে এবং আমরা প্রাণপনে তাহার জন্যই খাটিবে। শক্তি, সামর্থ, রুচি এবং উদ্দেশ্যে তোমার সঙ্গে যাহাদের মিল আছে তাহাদের সঙ্গে এক যোগে কাযকরিলে উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইবে। তেমন লোক না পাও নিজের কায একাকী করিবে। বাঁধিয়া ধরিয়া হরিভক্তি হয় না, অনুনয়-বিনয়ে বা খোসামোদ-তোসামোদে জীবন-ব্যাপী ব্রতের সঙ্গী পাওয়া যায় না। কর্ত্তব্য মনে করিয়াই খাটিবে, পুরস্কারের জন্য নহে ; পুরস্কার বা মজুরীর জন্য মজুরেরাই খাটে মহতের জীবনে তাহা শোভা পায় না। যাহা কর্ত্তব্য তাহার জন্য প্রাণপনে খাটিয়াই সুখী হইবে, সফলতায় গর্ব্বিত বা বিফলতায় বিমর্ষ হইবে না। তোমার কায তুমি কর ফল ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া দেও।

সুখ, সম্মান, প্রশংসা, মহত্ব, যশঃ এবং ধর্ম্ম এসমস্তই পরার্থক পরিশ্রমে। এহেন পবিত্র ব্রতে কেবল যে সকল সময়ে সঙ্গী পাওয়া যায় না, এমন নহে ; অনেক সময়ে এজন্য লোকের নিকটে ঘৃণা, নিন্দা, তিরস্কার এবং লাঞ্ছনাও ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত কর্ত্তব্য-বোধে প্রণোদিত হইয়া তুমি কার্য্য করিতেছ কি না, ইহা তাহারই পরীক্ষা। যদি কর্ত্তব্য বুদ্ধি তেমন দৃঢ় না হয়, এ সকল ঘৃণা নিন্দা সহিয়া কখনই কায করিতে পারিবে না।

সমস্ত মানবকে ভাল করিবার চেষ্টা বৃথা। বুদ্ধ খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ, সকলেই সে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। নিজে ভাল হইবার চেষ্টা সহজে সিদ্ধ হয়, অতএব সকলে সেই চেষ্টাই

আগে করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি ভাল হইলেই সমগ্র মানবজাতি ভাল হইবে। সকল বিষয়েরই সহজ দিকে আরম্ভ করিবে। কেমন করিয়া ভাল হইতে হয়, তাহা আগে নিজের জীবনে দেখাও।

ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে উদাসীন থাকিয়া যাহারা জাতীয় উন্নতির আশা এবং চেষ্টা করে, তাহাদের পরামর্শে প্রতারিত হইও না। তাহারা কাঁচা ইটের গাঁথনি দ্বারা পাকা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে চাহে।

যতদিন শিক্ষাকে ব্যবসায় এবং শিক্ষককে ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য করিবে, ততদিন জাতীয় উন্নতিতে শিক্ষা এবং শিক্ষকের ভাগ কতটা তাহা বুঝিতে পারিবে না—তত দিন জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। যে দিন মা এবং শিক্ষকের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন আরম্ভ হইবে। সে দিন জানিবে লোকে শিক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়াছে, দেশে সৌভাগ্যের দিন ফিরিয়াছে।

ঈশ্বর আছেন, আত্মার অমরত্বও আছে। না থাকিলে এ বিশ্বাস এত বিশ্বব্যাপী হইত না, আর তাহাতে এত শান্তিও মিলিত না। যুক্তি তর্কে ইহার প্রমান পাইবে না, কিন্তু নির্জ্জন আত্ম চিন্তায় এবং সদ্‌গুরূপদিষ্ট সাধনে ইহার মধুর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ অনুভব করিবে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ রক্ষাই মানবের ধর্ম্ম সাধন। ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে সমস্ত জীবনই চলিতে পারে কিন্তু মৃত্যুর দিনে চলে না আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন দশমাস ব্যাপিয়া প্রসব মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হয়, সেইরূপ জ্ঞানিগণ সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। মৃত্যু সকলেরই ঘটে কিন্তু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় অতি অল্প লোকে।” এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন ঘন ঘন তাঁহার নিশ্বাস বহিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া ক্ষীনতর স্বরে আবার তিনি বলিতে লাগিলেন;—

“তোমাদিগকে অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর কথা সরিতেছে না। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক দুইটি কথা না বলিলেই চলিতেছে না, কথা দুইটি না বলিয়া মরিলে আমি পরলোকে সুখী হইতে পারিব না। আমার মাথার দিব্য তোমরা সকলেই কথা দুইটি মনে রাখ, মনে না থাকে,লিখিয়া রাখ। ১ম, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন মনে এবং প্রত্যেক শিশুর হৃদয়ে সৎসঙ্কল্প অর্থাৎ মানব জাতির কল্যাণকর সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিবে। ২য়, যাহা ভাল বুঝিয়া মনে মনে একবার সঙ্কল্প করিবে, অথবা অন্যের নিকট একবার যাহার জন্য প্রতিশ্রুত হইবে, তাহা প্রাণপণে পালন করিবে। সঙ্কল্প করিবার অথবা প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে একবার না হয় দশবার ভাব, একদিন না হয় দশ দিন অপেক্ষা কর, যদি প্রস্তাবিত কার্য্যের উপকারিতায় সন্দেহ থাকে, যদি তাহার সাধনে কাঠিন্য বা বিঘ্ন দেখ, অথবা যদি তাহাতে নিজের রুচি বা শক্তির অভাব বুঝিতে পার, বরং সঙ্কল্প করিও না, প্রতিশ্রুত হইও না; কিন্তু কোন বিষয়ে একবার সঙ্কল্প করিলে বা প্রতিশ্রুত হইয়া গেলে

তাহার শেষ ফল না দেখিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইও না। জাতীয় চরিত্রের অস্থি-মজ্জা, জাতীয় শক্তির মর্ম্ম গ্রন্থি, জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র এই দুইটি কথা। যে নরাধম দিগের হৃদয়ে স্বার্থপরতা ছাড়া কোন মহৎ সঙ্কল্প স্থান পায় না, যে সকল নর-পশু পরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার পর মুহূর্ত্তেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে, তাহারা ধনী হইতে পারে, বিদ্বান্ হইতে পারে, উচ্চপদস্থ হইতে পারে; কিন্তু তাহারা দৃঢ়তাবিহীন, চরিত্র বিহীন, মনুষ্যত্ব বিহীন,—তাহাদিগকে ভর করিয়া নিদ্রিত জাতি জাগিতে পারে না, পতিত জাতি উঠিতে পারে না। যে কথায় কথায় অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু কাজের বেলায় সুবচনীর ব্রতটিও করে না, তাহার কথায় এবং চরিত্রে কখনও নির্ভর করিও না; আর যে গরুচুরি করিবার জন্য একবার প্রতিজ্ঞা করিলে গরুচুরি না করিয়া ক্ষান্ত হয় না; বরং তাহার কথায় বিশ্বাস করিও,তাহার উপরে নির্ভর করিও। কেন না তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, তাহার সঙ্কল্প-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে, তাহার নিকট সমাজের আশা আছে।

আমার অনেক আশা ছিল, সকল গুলি পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু শিব নগরের বালক দিগের শিক্ষার জন্য আমরা খাটিব বলিয়া যে যৌবনের প্রারম্ভেই প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলাম, আজ সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল, সে ব্রতের উদ্‌যাপন হইল। সঙ্কল্পিত কার্য্য ভালরূপে করিয়া উঠিতে পারি নাই, তাহা ঈশ্বর জানেন, তোমরাও জান।”

কথা শেষ করিয়া বৃদ্ধ শিক্ষক নয়ন নিমীলিত করিলেন, এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহ-মুক্ত হইলেন। তাহার মৃত্যুতে শিব নগরের অধিবাসী সকলই কাঁদিয়াছিল।

নারী-শিল্প।

ভদ্র-সমাজের দরিদ্র এবং অভিভাবক-হীন মহিলাদিগের দিন গুজরান যে ভাবে চলে, তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন না। উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, মুখে কথাটিও নাই! মৃত্যু আসিলেই সকল যন্ত্রনার শেষ হইবে, কেবল এই আশাতেই সহিষ্ণুতার এই সকল প্রতিমা নীরবে (অম্লানবদনে নহে) সমস্ত যন্ত্রনা সহিতেছেন।

এই সকল মহিলার জীবনোপায়ের কোন প্রকার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করা যাইতে পারে না কি? সন্তান-শিক্ষা এবং সন্তান-পালন-কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিতে পারিলে দেশে-রও প্রভূত মঙ্গল হইত, তাঁহাদেরও অন্না-

ভাব ঘুচিতে পারিত—তাঁহারা অনন্ত কার্য্য হইয়া মাতৃকারূপে শিশু-পালন-রূপ মহাব্রত গ্রহণ করিতে পারিতেন, এ কথা শিক্ষা-পরিচরে ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার বলা হইয়াছে। যাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি প্রেম, উৎসাহ এবং কার্য্য-কুশলতার উপর আশা করিয়া এ সকল কথা বলা হয়, ভারতের আশা স্থল সেই সকল শিক্ষিত যুবকেরা তাহা ভাবিয়া দেখেন কি না, তাহা আমরা জানি না, অন্ততঃ তাহার বিশেষ কোন নিদর্শন এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শিশু-শিক্ষায় রীতিমত সকলে মনোযোগ দিলে, উপলক্ষ বিহীন মহিলাগণ স্বজাতীয় শিশুদিগের শিক্ষাকে জীবন-ব্যাপী ব্রতরূপে গ্রহণ করিলে এক পুরুষেই ভারতের অবস্থায় যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে, এ কথা সকলে যখন হৃদয়ঙ্গম করিবেন, তখন আপনা হইতেই তাঁহারা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন,শিক্ষা-পরিচরের অনুরোধের অপেক্ষা করিবেন না।

কিন্তু সকল নিরুপায় মহিলারই যে শিশুদিগের শিক্ষয়িত্রী হইবার যোগ্যতা, বা অবসর হইবে, এমন আশা করা যায় না। অতএব বিশেষ কোন মুলধনের সাহায্য ব্যতীত কি কি উপায়ে তাঁহারা আপন আপন ঘরে বসিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারেন, অদ্য আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

১। খাদ্য দ্রব্য। যাহা প্রস্তুত করিতে অনেক সময় এবং পরিশ্রম লাগে, অথচ যাহা একবার প্রস্তুত করিলে দীর্ঘকাল থাকে, এ প্রকার খাদ্য বস্তু অনেকেই প্রস্তুত করেন, কিন্তু তদ্দারা যে জীবিকার কোন উপায় হইতে পারে, তাহা কেহই ভাবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন লিখিত দ্রব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে;—আম, জাম, বেল, কুল, আমলকী, হরীতকী লেবু, পেয়ারা প্রভৃতি নানাবিধ ফলের আচার ও মোরব্বা। শতমূলী, মূলা, শশা, কুষ্মাণ্ড, পেঁপে প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্যের উৎকৃষ্ট মোরব্বা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নারিকেল হইতে জিরা, চিঁড়া, মুড়কি ও নানাবিধ ফুল প্রস্তুত করিলে তাহা বোতলে করিয়া সুদীর্ঘ কাল রাখিতে পারা যায়।

২। তামাক। গুড়ুক, চুরুট, নস্য প্রভৃতি কোন না কোন আকারে তামাক আজকাল অনেকেই ব্যবহার করেন, এজন্য বোর্ণিও, সুমাত্রা, চীন, ব্রহ্ম, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ব্যবসায়ীগণ এদেশে তামাকের চুরুট প্রভৃতি পাঠাইয়া প্রতি বৎসর ভারত হইতে রাশি রাশি অর্থ লইয়া যায়। তামাক দ্রব্যটা অবশ্যই ভাল নহে; কিন্তু যত দিন শিক্ষারও উপদেশের বলে ইহা উঠিয়া না যাইতেছে, তত দিন এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যুগপৎ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা এবং নিজের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা মন্দ নহে।

৩। বোঁটা। শাড়ী, চাদর, রুমাল, পরদা প্রভৃতি বিবিধ বস্ত্রে রেশম বা রঙ্গীন সূতা দ্বারা লতা, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি বিবিধ সুন্দর প্রাকৃতিক দ্রব্যের অনুকরণে বোঁটা তুলা। শান্তিপুর এবং বোম্বের

অনেক রমনী এই উপায়ে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

৪। চিত্রকার্য্য। যে চিত্র-কার্য্যে ধীরতা, সহিষ্ণুতা এবং সৌন্দর্য্য-বোধ, এ তিনেরই বিশেষ প্রয়োজন, তাহা মহিলা-দিগেরই উপযোগী, কেন না ঐ সকল গুণ বিশেষ রূপেই তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে বর্ত্তমান আছে। অবশ্য দেবতা, মনুষ্য বা জীব জন্তুর অঙ্কনে বিশেষ শিক্ষা এবং ক্ষমতা চাই; কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আঁকা যাইতে পারে।

৫। কাগজ। দেশীয় কাগজ যেমন পবিত্র তেমনই দীর্ঘকাল স্থায়ী, কিন্তু বিলাতী চাকচিক্যময় অচিরস্থায়ী কাগজের প্রতিযোগীতায় এখন তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এদিকে কিন্তু আবার যেন সেই দেশী তুলট কাগজের কথা লোকের মনে পড়িতেছে, স্থায়িত্বের জন্য যাহা লেখা যায়, তাহা তুলট কাগজে লিখিলেই যেন ভাল হইত, এরূপ লোকে ভাবিতেছে। মহিলা-গণ ঘরে বসিয়া দেশী কাগজ প্রস্তুত ও তাহা তুলট করিতে পারেন। কাগজের খাম এবং বিবিধ আকারের বাক্সেরও খুব কাটতি।

৬। কালি। উপযুক্ত সময় অতি-বাহিত না হইলে কোন জিনিসেরই পরীক্ষা হয় না। অদ্যাপি ঘরে ঘরে বিলাতী কালির পসার রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইতি মধ্যেই লোকে বুঝিতে পারিয়াছে দেশীয় কালির তুলনায় বিলাতী কালি কি অপদার্থ জিনিস। শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত দেশীয় কালির লেখা মুক্তা-পংক্তির ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে; কিন্তু দুই চারি বৎসর গেলেই বিলাতী কালির দিন ফুরাইল, আর পড়িতে পারা যায় না। আমাদের মহিলাগণ যদি ভার-তীয় প্রণালীতে কালি প্রস্তুত করিতে থাকেন, তাহা হইলে বিলাতী কালির হাত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি। এস্থলে বলা আবশ্যক, আমাদের প্রসিদ্ধ কৎকালিই প্রশস্ত; সচারচর ব্যবহৃত তেল কালি নিতান্ত জঘন্য।

৭। বাঁশের কায। চিক, ঝাঁপী, চুপড়ি প্রভৃতি বাঁশের নানাবিধ সূক্ষ্ম কায তাঁহারা করিতে পারেন।

৮। খেলনা। শিশুদিগের খেলার জন্য কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ পুতুল ও অন্যান্য খেলনা প্রস্তুত হইতে পারে। তেমন সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার ভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে বিদেশেও এই সকল জিনিসের আদর হয়।

৯। আয়না এবং কটোর ফ্রেম্ বা কাষ্ঠ-বন্ধনী। কদম্ব প্রভৃতি সূক্ষ্ম কার্য্যো-পযোগী কাষ্ঠ দ্বারা এই সকল বন্ধনী প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে নরুণ দিয়া লতাপাতা কুদিতে পারিলে ইহাও দেশে বিশেষ আদর পাইতে পারে।

১০। সঞ্চ বা সাঁচ। কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ গৃহজাত সন্দেশ এবং পুতুল প্রভৃতির সাঁচ প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহারও আদর হয়।

১১। শাদা কাগজের খাতা এবং পুস্তক বাঁধিতে পারিলে ইহাতেও বিলক্ষণ লাভ আছে। চামড়ার সাহায্য না লইলেও

পুস্তক বাঁধা যাইতে পারে। তবে ইহাতে রীতিমত শিক্ষা এবং যন্ত্রাদির জন্য কিঞ্চিৎ মূলধন চাই।

১২। দ্রব্যানুকরণ। ইহাতে কিছুমাত্র মূলধন লাগে না, মাটি দিয়া আম, জাম, কলা, পেয়ারা, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বর্ণের সাহায্যে অবিকল প্রস্তুত করিতে পারিলে ইহাতেও জীবিকার সাহায্য হইতে পারে।

যাহা আমাদের মনে পড়িল তাহাই লিখিলাম, কিন্তু ইহাতেই যে নারী-শিল্পের শেষ হইল, কেহ এমন মনে করিবেন না।

হিন্দু মহিলাগণ ঘরে ঘরে এ সকল জিনিস প্রস্তুত করিতে পারেন এবং অনেকে অনেক জিনিস প্রস্তুত করিয়াও থাকেন। কিন্তু বিক্রয়ের বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে তাহাদ্বারা জীবিকার সাহায্য হইতে পারে না। এখন কথা হইতেছে, ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার উপায় কি? ভদ্র মহিলা-দিগের পক্ষে প্রকাশ্যভাবে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করা দূরে থাকুক, তাঁহারা নিজের নাম দিতেও সঙ্কুচিত হইবেন।

ফলতঃ আমাদের বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য ব্যতীত এ প্রস্তাব সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সমাজের শ্রেণী-বিশেষের উপকার করিয়া থাকেন; আমরা বিনা পয়সায় কেবল একটু চেষ্টা করিলেই যদি এই সকল নিরুপায় মহিলার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয়, তাহা করা কি কর্ত্তব্য নহে?

আমাদের বোধ হয়, সহরে সহরে নারী-শিল্প-ভাণ্ডারের সংস্থাপন, আর এই ভাণ্ডারে যাহা পাওয়া যাইবে, অন্যত্র তাহা কিনিব না, এইরূপ সংকল্প, এই দুই উপায় অবলম্বন করিলেই বিক্রয়ের সুবিধা হইতে পারে। মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে নাম না দিয়া যে কোন উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্য ভাণ্ডারে পাঠাই-বেন, এবং ভাণ্ডারাধ্যক্ষের নিকট হইতে ঐ দ্রব্যের জন্য নম্বরযুক্ত একখানি রসিদ পাইবেন। প্রত্যেক দ্রব্যের সঙ্গে একখানি বর্ণনা-পত্র থাকিবে, তাহাতে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কি বাবতে কত খরচ পড়িয়াছে এবং কত দিন বা কত ঘণ্টা সময় লাগি-য়াছে, তাহার উল্লেখ রহিবে। প্রত্যেক ভাণ্ডারের সঙ্গে একটি মূল্য-নির্দ্ধারিণী সমিতি থাকিবে, তাঁহারা বর্ণনা-পত্র সহ প্রত্যেক দ্রব্য দেখিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, এবং ক্রেতাগণ দর দস্তুর কিছু না করিয়া সমিতির নির্দ্ধারিত মূল্যেই দ্রব্য ক্রয় করিবেন। বর্ণনা-পত্রের একপার্শ্বে সমিতি-পতির স্বাক্ষরযুক্ত নির্দ্ধারিত মূল্যের উল্লেখ থাকিলে আর কোন উৎপাতই থাকে না। ক্রেতাকে সেইখানি দেখাইলেই হইল। মূল্য নির্দ্ধারণের সময়ে সমিতি স্মরণ রাখি-বেন, নারী-শিল্প-ভাণ্ডারের দ্রব্য যতদূর সম্ভব অন্যত্র হইতে যেন মহার্ঘ্য না হয়। অবশ্য ভাণ্ডারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে এই সকল দ্রব্যের মূল্য হইতেই কিছু কিছু কর্ত্তন করিতে হইবে।

বিলাতের ব্যবসায়ীর হাতে আমাদের নিস্তার নাই। আমরা কি খাই, কি পরি, কিরূপে চলি বসি, বিলাতের ঘরে ঘরে তাহার সংবাদ চলে, আমাদের যখন যাহার প্রয়োজন, বিলাত তখনই তাহা পাঠাইয়া দেয়, অনেক সময়ে আগে জিনিস পাঠাইয়া

পরে আমাদের মধ্যে প্রয়োজনের সৃষ্টি করে, সৌভাগ্য ক্রমে শাক ভাত শিল্পজাত নহে, তাই নিস্তার। নারী-শিল্প-ভাণ্ডারের সংবাদও বিলাতে অবশ্যই যাইবে, তখন প্রবল বিলাত যে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবেন না, তাহা কে বলিল? কিন্তু সে কিছু দূরের কথা। বিশেষ সে প্রতিযোগিতা হইতে মহিলাদিগকে বাঁচাইবার দুইটি স্বাভাবিক উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১ম, আমরা নারী-শিল্প-ভাণ্ডারে যাহা পাইব, অন্যত্র এক পয়সা সস্তা হইলেও তাহা কিনিব না। কেন না, এই ভাণ্ডার হইতে যখনই যাহা কিনিব, তখনই ভাবিব, আমি ইহাদ্বারা একটী স্বজাতীয় মহিলার গ্রাসাচ্ছাদনের সাহায্য করিতেছি। ২য়, এখন আমাদের মহিলাগণ অলস ভাবে বসিয়া থাকিয়া নীরবে অসহ্য দারিদ্র্য সহিতেছেন, ইহার উপরে তাঁহারা যাহা পাইবেন তাহাতেই পরম উপকার মনে করিবেন, কেননা, ইহা তাঁহাদিগের জীবিকার সহায়তা করিবে।

নব-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সমিতির উপরে আমাদের অনেক আশা ভরসা আছে। ব্যক্তিগত গুণ, শিক্ষা এবং শক্তি কাজে লাগাইবার প্রথম উদ্যম এদেশে তাঁহারাই দেখাইতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবটি কার্য্যে কতদূর পরিণত হইতে পারে, তাহারা একটিবার ভাবিয়া দেখেন। আমাদের বিশ্বাস, এ অনুষ্ঠান করিলে ইহাতে কৃতকার্য্যতার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন।

বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, এবং জ্ঞানলাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুখলাভ বা জীবনকে সুখী করা। যে কোন বিষয় শিক্ষা করনা কেন, তাহাতেই কিছুনা কিছু জ্ঞানলাভ হইবে; অর্থাৎ তুমি যাহা পূর্ব্বে জানিতে না, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিবে। প্রাগুক্ত দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটী বাদ দিলে, পৃথিবীতে এমন কোন্ বিষয় নাই, যাহা আমাদিগের শিক্ষাকরা কর্ত্তব্য নহে। যে জ্ঞান লাভ করিব, তাহা ভাল কি মন্দ, নির্দ্দোষ কি সদোষ, সংক্ষেপতঃ তাহা সুখ না অসুখ, সে বিচার করিতে হইবে না। আমার কেবল লক্ষ্য থাকিবে সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞতা-পরিহার, বা জ্ঞানলাভ। এই হিসাবে চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি বিদ্যাও আমার অর্জ্জন করিতে হইবে; কেননা উহাতে আমার জ্ঞানের অভাব আছে, এবং সে অভাব দূর করা আমার কর্ত্তব্য। চৌর্য্য দস্যুতায় বিপদ আছে, রাজ-দণ্ড আছে, পাপ আছে, এসকল আপত্তি আমার মনে স্থান পাওয়া উচিত নহে। কেননা, আমি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটী বাদ দিয়াছি। কিন্তু

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটী প্রথম প্রতিজ্ঞার সহিত একত্র করিয়া যদি জীবনযাপনের মূলসূত্র করিয়া লই, তবে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি বিদ্যা আমার অশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ, চৌর্য্য দস্যুতাদির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি, অর্থাৎ বিপদাশঙ্কা, রাজদণ্ড ভয়, পাপ, সামাজিক নিগ্রহ প্রভৃতি সুখের অন্তরায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুখ বলিতে কেবল ঐহিক সুখ বুঝিতে হইবে না; জীবনের সুখ বলিতে অনন্ত-জীবনের সুখ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাকে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ পবিত্র ও প্রকৃত সুখ বলে, সেই সুখ বুঝিতে হইবে। "চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি সেরে খেতে পারে।" ইহজীবনের সুখসমৃদ্ধি ধরিলে, দস্যুতা চৌর্য্য প্রভৃতি বড় বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যাই বটে, যদি উহা গোপনে ও সতর্কভাবে সাধন করা যায়। কেননা, বড় পাকাবাড়ী, ঘোড়াগাড়ী, মান মর্য্যাদা জমিদারি প্রভৃতিই ঐহিক সুখের উপাদান ও লক্ষণ; চৌর্য্য দস্যুতায় যে এসবই মিলে, তাহার প্রমাণ অন্যত্র কেন এই বাঙ্গলার প্রত্যেক অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। কিন্তু পাপ, ঐহিক ও পারত্রিকের কণ্টক, সুতরাং প্রকৃত সুখের— অনন্ত সুখের প্রবল অন্তরায়; এবং চৌর্য্য দস্যুতা পাপাবহ, সুতরাং উহা জ্ঞান নহে, অজ্ঞান বা অপজ্ঞান; বিদ্যা নহে, অবিদ্যা; সুতরাং উহার শিক্ষাও কুশিক্ষা বা অপশিক্ষা বলিয়া আমার পরিত্যাজ্য। আজিকালি স্কুল কলেজে যে শিক্ষানীতি অবলম্বিত হইয়াছে বা হয়, তাহাকে অনেকে কুশিক্ষা বা অপশিক্ষা-প্রবণ বলেন বটে, কিন্তু আমি তাহা বলি না। আর যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাত "কু" বা "অপ" যে নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিরূপ শিক্ষা দ্বারা জীবনকে প্রকৃতরূপে সুখী করা যাইতে পারে; এবং বর্ত্তমান শিক্ষানীতির কি দোষগুণ; এই দুইটী বিষয়ের বিচার করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান শিক্ষানীতি যে "খামখেয়াল" পূর্ণ ও "সাময়িক হুজুক" মাত্র, আমি এই প্রবন্ধে তাহাই আংশিক রূপে প্রতিপন্ন করিব।

জ্ঞানলাভকে যদি মাত্র ইহজীবনের সুখলাভের উপায়-স্বরূপও ধরিয়া লই; তাহা হইলেও কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে চলিবে না। কারণ, উহাতে কেবল, সময় নাশ, অর্থ নাশ ও পরিশ্রম নাশ হয় মাত্র। "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" এই প্রবাদ সর্ব্বদা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, উহা যে ক্ষতিজনক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যাহা ক্ষতিজনক, তাহা যে সুখের নিদান হইতে পারে না, অথবা তাহা যে শিক্ষণীয় নহে, একথা অল্পবুদ্ধি লোকেও বুঝে। কিন্তু যাহারা আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থলে স্থাপিত, তাঁহারা বুঝেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারথীদিগের মনে যখন যে খেয়াল হয়; কিছু দিনের গণ্ডগোল অর্থাৎ বাগ্‌বিতণ্ডার পর সেই খেয়াল কার্য্যে পরিণত হয়; আর সাময়িক হুজুগের দায়ে পড়িয়া শিক্ষক ও পরীক্ষার্থী বেচারিদের প্রাণান্ত। সাধারণ কথায় বলে "একযুগ, বারবৎসর।" এই হিসাবে দুই যুগের উপর শিক্ষাবিভাগে থাকিয়া কত খেয়ালই দেখিলাম। কত হুযুগই মাতিলাম, এবং

কত তালেই নাচিলাম, তাহা আর বলিয়া লাভ কি ?

কতিপয় বৎসর গত হইল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিজ্ঞান পাঠের হুজুক উঠিল। সেই অবধি বালকেরা হক্সলি সাহেব কৃত বিজ্ঞান-সূত্র অধ্যয়ন করিতেছে। সেই বিজ্ঞান-সূত্র যখন হাইস্কুলে অধীত না হইত, তখন এল্ এ পরীক্ষার বিজ্ঞান-শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত কষ্ট হইত; এবং বিজ্ঞান-সূত্র অধীত হইবার পর অবধি সে কষ্টের লাঘব বা নিরাকরণ হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ করিতে না পারিলে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে ছাত্রদিগের কি উপকার করিয়াছেন, তাহা অন্ততঃ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। তবে গ্রন্থকর্ত্তা বা প্রকাশকের কিঞ্চিৎ লাভের উপায় করিয়া দেওয়া যদি এ বিজ্ঞান-প্রবর্ত্তনার উদ্দেশ্য হয়, তাহা সম্যক্রূপেই সাধিত হইতেছে। ছাত্রবর্গের লাভের মধ্যে দেখি পূর্ব্বে ভূগোলের প্রশ্নের কাগজের ৬০ নম্বর মধ্যে, ১৫ নম্বর এক সাধারণ ভূগোল পড়িয়াই পাইত, এখন সেই স্থলে ভট্টগিকির প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভট্ট হক্সিলির বিজ্ঞান-সূত্র পড়িতে হয়। কেবল একখানি পুস্তকের স্থলে তিনখানি পুস্তক পড়িতে হয় এমন নহে, তিনখানি পুস্তকের মূল্য প্রদান করিতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে মধ্য-বাঙ্গলা ও মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য মধ্যে বিজ্ঞান ছিল বলিয়া সংবাদ পত্রাদিতে তদ্বিরুদ্ধে তুমুল আলোচনা হয়; সেই আলোচনার ফলে উক্ত প্রবেশিকা নিম্নে উচ্চপ্রাথমিক উভয়-বিধ পরীক্ষায়ই বিজ্ঞান হইয়াছে। সুতরাং এখন আর বিজ্ঞান-প্রবর্ত্তনার বিরুদ্ধে কথা বলে, কাহার সাধ্য ? কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তার করিতে এতই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন যে, লোকের এখন বিজ্ঞানের প্রতি "বিজ্ঞান" ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। তা লোকের রোষ-তোষে যায় আসে কি, কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমে ক্রমে দুগ্ধপোষ্য বালককেও বিজ্ঞান না শিখাইয়া ছাড়িবেন না। কোন কোন পরিদর্শন বিভাগে এবারই সে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। মার্চ্চ সাহেবের বিজ্ঞান-পাঠই সেই বিজ্ঞান-গোঁজের সূক্ষ্মাগ্র। ছোট ছোট বালকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ ও মুখস্থ করিতে ভালবাসে, কিন্তু কবিতাপাঠ গাঁজাখুরি, এবং উহাতে বৃথা সময় নষ্ট, সুতরাং মার্চ্চ সাহেব স্বগ্রন্থে নির্জ্জল-বিজ্ঞান দিয়াছেন, বালকেরা ভাল না বাসুক ক্ষতি নাই, তাহারা না বুঝুক ক্ষতি নাই, তাহাদের অভিভাবকগণ পছন্দ না করেন, ক্ষতি নাই। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেই হইবে। পাঠকগণ ব্যস্ত হইবেন না আগামী বর্ষের নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষার তালিকায় অবশ্যই বিজ্ঞানসূত্র দেখিতে পাইবেন।

সর্ব্ববিধ বিদ্যালয়ে ও সকল প্রকার পরীক্ষায় বিজ্ঞান-প্রচলনের চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমের হইলেও বিজ্ঞান-প্রবর্ত্তনার সপক্ষেও দুই একটা কথা বলিবার আছে। অর্থাৎ ১০।১১ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ২১।২২ বৎসর পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের অল্পবিস্তর আলোচনা করাতে বিজ্ঞানে অবশ্যই কতকটা ব্যুৎপত্তি জন্মে। যদিও সে ব্যুৎপত্তির ফল অত্যল্প বাঙ্গালীতেই হাতে কলমে দেখা যায়। কিন্তু সংপ্রতি যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ড্রয়িংএর প্রবর্ত্তনার আদেশ হইয়াছে, তাহাতে যে ছাত্রদিগের কি উপকার হইবে

তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা মহাশয় আদেশ করিয়াছেন যে, আগামী ১৮৯৭ সনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পর জুনিয়র. বৃত্তি বিলি করিবার সময় ড্রয়িংএর নম্বর অন্য নম্বরের সহিত যোগ করা হইবে, এবং যাহারা ড্রয়িং-এ ভাল নম্বর রাখিবে, বৃত্তির উপর তাহাদিগের দাবি অধিকতর থাকিবে। সুতরাং সমস্ত বাঙ্গলার হাইস্কুলে ড্রয়িং শিক্ষার আয়োজন হইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুল মাত্রেই নর্ম্মালস্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ১২ কি ১৫ টাকা বেতনে ড্রয়িং শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইতেছেন। এই নূতন খেয়ালে, প্রতি স্কুলে বৎসর গড়ে ২০০৲ শত টাকা করিয়া ব্যয় পড়িবে। আপাততঃ সরঞ্জাম প্রস্তুতীকরণ ও ক্রয়করণ জন্য প্রায় ২৫০ কি তিন শত টাকা লাগিবে। ছাত্রগণ যেন বাদিয়ার হাতে মর্কট, গ্রীবা রজ্জুবদ্ধ করিয়া যে ভাবে নাচাও, সেই ভাবেই নাচিতে বাধ্য ও নাচিবে। কিন্তু বৎসর বৎসর যে রাশীকৃত টাকার শ্রাদ্ধ হইবে, তাহাকি এদেশের অসচ্ছল রাজ-কোষ হইতে আসিবে না? আর রাজ-কোষের টাকার অর্থ কি প্রজার দেহের শোণিত নহে? ডাইরেক্টর সাহেবের অধীনে তিন শ্রেণীর জিলাস্কুল ৩৮টী, সুতরাং প্রতিস্কুলে গড়ে বার্ষিক ব্যয় ২০০ টাকা ধরিলে, ৭৬০০ টাকা হয়। মনে কর এই খেয়াল ১০ বৎসর বজায় রহিল, সুতরাং দশবৎসরে ৭৬০০০ টাকার শ্রাদ্ধ হইল; ইহার সহিত, সরঞ্জামি ব্যয় ৯৫০০ যোগ করিলে, দশবৎসরে মোট ব্যয় হইল ৮৫৫০০, কিন্তু এই ৩৮টী স্কুলের মধ্যে বড় বড় স্কুল আছে, যে সকল স্কুলে ৪০।৫০ টাকা মাসিক, বেতনের ড্রয়িংমাষ্টার পূর্ব্বাবধি নিযুক্ত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই নূতন খেয়ালের পাছে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইবে। কিন্তু কয়েক জন এদেশীয় লোকের তিলকাঞ্চন গোছের গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন আর কোন লাভ কি হইবে? চিত্রবিদ্যা একটী অতি শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা, তাহার আর সন্দেহ নাই; ইহা যেমনই নয়ন-মনের প্রীতিকর, তেমনি প্রভূত অর্থকরী। এমন কি রেফেল, বা ভেণ্ডাইকের চিত্রিত এক একটী প্রতিমূর্ত্তির মূল্য নাকি লক্ষ টাকাও হয় শুনিয়াছি। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় মডেল ড্রয়িংএর দ্বারা চিত্রবিদ্যার কি সাহায্য হইবে? কেট্‌লি, পেয়ালা, চা দানি ইত্যাদির সামান্য চিত্র শিখিয়া মূর্ত্তিচিত্র করিতে কেহই সক্ষম হইবে না। হয়, এল্‌, এ, পরীক্ষায় ড্রয়িংএর প্রবর্ত্তনা হউক, না হয় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান খেয়াল পরিত্যাগ করুন। ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বরং জরিপ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হউক, তাহাতে বহুলোকের জীবনোপায়ের পন্থা পরিষ্কার হইবে; অথবা এদেশ কৃষিপ্রধান স্থান, এবং এদেশীয় সকল লোকেরই ভূমির সহিত কোন না কোন প্রকারের সম্বন্ধ আছে, অতএব বিদ্যালয় সমূহে কিছু কিছু কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদিলেও ক্ষতি নাই।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

যাইতেছ যার কাছে যশের আশায়,
জান না যশের তরে সে যে ক্ষিপ্ত প্রায়!

—

এক মানবের আশা ধরায় না ধরে;
অনন্ত মানব-আশা কোথা তবে পুরে?

—

আশা যে অসার, তাহা সকলেই জানে;
তথাপি ছাড়িতে আশা পারে কত জনে?

—

আশা-হিংসা-দ্বেষ-পূর্ণ অসংখ্য হৃদয়,
একাই নির্দ্দয় কাল করিতেছে ক্ষয়!

—

কত রাজা কত বীর করিল বড়াই,
ধরায় তাদের এবে চিহ্ন মাত্র নাই!

—

এ জীবনে কিছুতেই নিশ্চয় ত নাই,
কেবল মৃত্যু যে হবে, সুনিশ্চিত তাই।

—

হাসি, খেলি, শুই, বসি, যাহা ইচ্ছা করি,
মাথায় মৃত্যুর বোঝা, ছাড়াইতে নারি!

—

না দেখে নয়নে বৃদ্ধ, না শুনে শ্রবণে,
দীর্ঘ জীবনের আশা জাগে তারো প্রাণে!

—

আগে পাছে নিরখিলে অনন্তের পানে,
জীবনের অসারতা জাগি উঠে প্রাণে।

—

সাগর সমান আশা, অনন্ত কল্পনা,
শরীর হইলে ভস্ম কিছুই থাকে না।

—

কেন এত বল-দর্প, কেন অভিমান?
সম্মুখে চাহিয়া দেখ নিকটে শ্মশান!

—

না জানিলে ব্যবহার ছিল যবে ধন,
সর্ব্বস্ব হারায়ে বিজ্ঞ হয়েছ এখন!

—

ধনের দাসত্বে যার গেল চিরদিন,
শ্মশানে সে ধনী আজ কপর্দ্দকহীন!

—

বাহু-বলে আছিল যে দুর্ব্বলের যম,
আজি সে মুখের মাছি তাড়া'তে অক্ষম!

—

দেখেছি শুনেছি বটে অন্যের মরণ,
আমি যে মরিব, তাহা ভাবি নি কখন।

—

পুত্র মুখে অন্ন দিতে সহিত না যার,
পাঁচ ভুতে লুঠে আজি ঐশ্বর্য্য তাহার!

—

বধিয়াছ কত জীব অবলীলা ক্রমে,
আজি কেন শিহরিছ শৃগালের নামে?

—

কৃপণ! শ্মশানে কেন সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া?
যাহা পার লও কিছু অঞ্চলে বাঁধিয়া।

—

সদ্ভাবে সদ্ব্যয়ে অর্থ—নাহি লাগে যার,
চৌর্য্য আর রাজ দণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত তার।

—

করিলাম গঙ্গা-যাত্রা মরিব নিশ্চয়;
কিন্তু বাগানের কলা চোরে যদি লয়?

—

দেখে তব মৃত্যু-দশা, দুঃখে ফাটে প্রাণ!
আমায় করুণা ভাই শাল যোড়া দান?

—

গড়িলাম অট্টালিকা করি কত সাধ,
জানি না এখনি যম সাধিবে যে বাদ।

—

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ফুলজানি। উপন্যাস। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।০ রয়েল ১২ পেজী, ১৬৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

মহেশ্বর ঘোষের পুত্রবধূ, পুরন্দর ঘোষের সহধর্ম্মিণী, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ফুল কুমারী কামুক নবাব সিরাজ উদ্দৌলার জন্য অপহৃত, এবং অন্যান্য অপহৃতা অনাথার ন্যায় কারারুদ্ধ। সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক, সাহসী এবং তেজস্বী পুরন্দর হাতে বিষের মোড়ক লইয়া পরিচারিকার সাহায্যে গোপনে ফুলের সঙ্গে দেখা করিলেন, ফুল মোড়কটি চাহিয়া লইলেন, কিন্তু পুরন্দর ধরা পড়িলেন। ঘটনার সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে পুরন্দরের বিচারের জন্য অবিলম্বে নবাবের সভা বসিল, অন্যান্য সুন্দরীগণের সঙ্গে ফুল, পুরন্দর, এবং একজন ঘাতকও উপস্থিত থাকিল। প্রথমেই ফুলের রূপে নবাব মুগ্ধ হইল, এবং তাহার পরিচয় পাইয়া তাহার ফুলজানি বেগম নাম রাখিল। তাহার পরে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরন্দরকে তস্কর বলিয়া সম্বোধন করাতে সেই তেজস্বী যুবক স্থির অকম্পিত কণ্ঠে নবাবেরই তস্করতার প্রতিপাদন করিলেন; কিন্তু নরাধম নবাবের নরক-সদৃশ হৃদয় পুরন্দরের তেজস্বিতায় মুগ্ধ না হইয়া ক্রুদ্ধ হইল, তখনই তাহার আদেশে ঘাতকের কৃপাণাঘাতে পুরন্দরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ফুলকুমারী মোড়কের বিষ ভক্ষণ করিলেন, এবং বিদ্যুদ্বেগে দৌড়িয়া গিয়া স্বামীর চরণ জড়াইয়া ধরিয়া পড়িলেন—নবাবের পাপকর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই পতিব্রতার পুণ্যাত্মা স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহণ করিল।

ইহাই গ্রন্থের মূল গল্প; কিন্তু ইহার সঙ্গে আবান্তরিক অনেক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, অনেক বিষয়ে তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে। সুশিক্ষিত ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রের নীরব আচরণে ঘোর বিষয়াশক্ত ক্রুরস্বভাব পিতার চরিত্রও কিরূপে ধীরে ধীরে সংশোধিত হইতে পারে, পুরন্দর এবং তাঁহার পিতার চরিত্রে শ্রীশ বাবু তাহা সুকৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ বাবুর সরস লেখনীর গুণে গল্পটি অতি সুন্দর হইয়াছে।

জন্মভূমি। ৬ষ্ঠ ভাগ—১ম সংখ্যা। আকার রয়েল ৮ পেজী ৩২ পৃষ্ঠা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

আষাঢ় মাসের শিক্ষা-পরিচয়ে বাবু হারাণ চন্দ্র রক্ষিতের জন্মভূমিতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক পুরস্কৃত প্রবন্ধের সমালোচনে সহযোগী আমাদের উপর বেজার হইয়া কয়েক মাস আমাদিগকে দেখা দেন নাই, এখন এত দিন পরে হঠাৎ এই নূতন বেশে আবার দেখা পাইয়া সুখী হইলাম। সহযোগীর আকৃতি বদলিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি যেমন ছিল তেমনই আছে বলিয়া বোধ হইল।

কুমারী পত্রিকা। সাপ্তাহিক সংবাদ-

পত্র। আকার ডিমাই একফর্ম্মা। বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

কাগজখানির লেখা ভাল, কিন্তু আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র। "আমি হিঁদু এডিটার" শীর্ষক ব্যঙ্গ-কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে।

বাণিজ্য-দর্পণ। সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। আকার ডিমাই ৪ ফর্ম্মা। মূল্য কলিকাতায় মাসিক ॥০ এবং বার্ষিক ৫৲ টাকা, মফস্বলে মাশুল সহ ৬৲ টাকা।

দেশে বাণিজ্য-বিষয়ক একখানি সংবাদ পত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা বাণিজ্য-দর্পণের প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ভগবান্ ইহাকে স্থায়ী করুন।

"ভারত সমিতি লিমিটেড্" অনুষ্ঠান পত্র।

ভারতসমিতির উদ্দেশ্য।

১। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক দিগের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও ঘনিষ্টতা সম্পাদনের চেষ্টা।

২। শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিষয়ে ও অপরাপর হিতকর কার্য্যে পরস্পর সহানুভূতি এবং সাহায্য প্রদান।

৩। সমবেত ধনদ্বারা কোম্পানি স্থাপন করতঃ শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন।

৪। বৃত্তি প্রদানে দেশীয় লোককে বিবিধ কার্য্যোপযোগী শিক্ষা দান।

৫। আদর্শবিদ্যালয় স্থাপন করতঃ কার্য্যকরী শিক্ষা দান।

৬। বিবিধ কার্য্যক্ষেত্র সংস্থাপন দ্বারা শিক্ষিত লোকদিগকে শক্তি ও গুণানুসারে কার্য্যে নিয়োগ।

৭। সমবেত ধনদ্বারা স্থাপিত যে সকল কোম্পানি এই সমিতির সহিত যোগদান করিবে, তাহাদের কার্য্য-ক্ষেত্র পরিদর্শন, বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ এবং প্রকাশ এবং আবশ্যকীয় অভাব পূরণের চেষ্টা।

৮। যেখানে যে হিতকর সদনুষ্ঠান সমবেত কি ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা, ধন ও পরিশ্রম দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কি হইবার চেষ্টা হইতেছে, কিম্বা হইবার সঙ্কল্প আছে, তাহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া সাধারণ সমীপে তাহা প্রকাশ করতঃ সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ দ্বারা তাহার কার্য্য ক্ষেত্রের বিস্তার।

৯। আপন স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা কি যে সকল কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন, তজ্জন্য আবেদন অর্পণ বা উপায়ান্তর অবলম্বন।

১০। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধন উপলক্ষে "ভারত হিতসাধিনী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার।

উদ্দেশ্য পাঠ করিয়াই পাঠক বুঝিতেছেন, ব্যাপারটা কতদূর উচ্চ। পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধনে সমিতি গঠিত এবং রেজিষ্টরি হইয়া গিয়াছে। বিশহাজার অংশে মূলধন বিভক্ত; প্রত্যেক অংশের মূল্য পঁচিশ টাকা এবং পাঁচ বৎসরে দেয়। ইতি মধ্যেই ছয় হাজার অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ইহাতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমবেত ধনের কারবারে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং কৃতকার্য্য, সুতরাং বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের সফলতায় আমাদের

সন্দেহ হইতেছে না। এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান যুগপৎ নিজের হিতকর এবং দেশের কল্যাণকর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত, বর্ণারপুর বাগিচা, কাছাড়, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন।

রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর জীবনী বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, ভক্তি-বৈরাগ্যের এরূপ দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যেও দুর্লভ। এরূপ গ্রন্থ দ্বারা যে কেবল প্রেম-ভক্তি প্রচারের সাহায্য হয়, তাহা নহে; ইহাতে আরও অনেক তত্ত্ব-কথা জানা যায়, এবং অনেক ভ্রম-প্রমাদ দূরীভূত হইবার পক্ষে সুবিধা হয়।

রূপ এবং সনাতন গৌরাঙ্গকে বলিলেন,—

"পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥"

তদুত্তরে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন,—

"ধন্য তুমি দুই বড় পরম বৈষ্ণব।
কিন্তু আমা প্রতি না করিহ হেন স্তব॥
আমি জীব তোমরা আশীষ কর মোরে।
বৃন্দাবন দেখি যেন কৃষ্ণভক্তি স্ফুরে॥"

আর এক স্থলে, রূপ-গোস্বামী স্বপ্রণীত নাটকে ইষ্টদেবতার বর্ণনোপলক্ষে গৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে শ্লোক দুইটি লুকাইয়া রাখেন, লজ্জায় বা গৌরাঙ্গের ভয়ে তাহা পাঠ করেন নাই। কিন্তু অবশেষে গৌরাঙ্গ যখন একেবারে নাছোড় হইলেন, তখন অগত্যা পাঠ করিলেন। শ্লোকের নিজের অবতার-বাদ শুনিয়া গৌরাঙ্গ বলিতেছেন,—

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেন মিথ্যা স্তুতি ক্ষার বিন্দু॥"

বড় কঠিন সমস্যার কথা, রূপের বর্ণিত অবতার-বাদকে গৌরাঙ্গ "মিথ্যাস্তুতি" বলিতেছেন, ইহাতে রূপের শ্লোক লুকাইবার কারণও কতকটা বুঝা যাইতেছে। এখন কথা হইতেছে, মিথ্যাবাদী কে? রূপ, না গৌরাঙ্গ? রামকৃষ্ণাদি ভগবানের অবতারকে অবতার বলিয়া স্তুতি করিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বা অস্বীকার করিয়াছেন, এমন স্মরণ হয় না। পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর বলিলে তিনি লজ্জিত হইবেন বা তোষামদ মনে করিয়া চটিয়া যাইবেন, ইহা স্বাভাবিকও নহে। যাহা হউক, লেখক এই কণ্টকময় প্রশ্নের সমালোচনে প্রবৃত্ত না হইয়া ভালই করিয়াছেন।

ভক্ত-জীবনী একেই অমৃতের খনি, তাহাতে লেখকের সহৃদয়তা এবং ভাব-গ্রাহিতা মিলিত হওয়াতে গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সবিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

ভাল জিনিসে ক্ষুদ্র ত্রুটি দেখিলেও মনে কষ্ট হয়। "তাহাতে বিশুদ্ধ সেবাময়ী প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন," "অন্যত্রে গমন করেন না," "—অরবিন্দলাভপদারবিন্দ—," "উৎসবে প্রফুল্লিত," "প্রফুল্লিত, বৃক্ষলতা," "অন্যত্রে তাহা অতি দুর্লভ," ইত্যাদি ভুল লেখারই হউক আর ছাপারই হউক, পরিহার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীহট্ট-সুহৃৎ-সমিতির একাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ। ১৩০১—১৩০২ সাল।

কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও শ্রীহট্টের অনেক যুবক অধ্যয়নোপলক্ষে থাকেন; কলিকাতাস্থ শ্রীহট্টের যুবকেরা যেমন শ্রীহট্ট-সম্মিলনী স্থাপন করিয়া স্বদেশের হিত-সাধনে অভ্যস্ত হইতেছেন, ঢাকাস্থ শ্রীহট্টবাসী যুবকেরাও সেইরূপ শ্রীহট্ট-সুহৃৎসমিতি স্থাপন করিয়া দেশ হিতৈষণা-বৃত্তির পরিচালনা করিতেছেন। মাদক-সেবন-নিবারণ, চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন, চরিত্রবান্ দরিদ্র ছাত্রের সাহায্য, জন-সাধারণে শিক্ষা-বিস্তার, ইত্যাদি কয়েকটি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ইঁহারা খাটিতেছেন।

শুধু লেখা পড়া শিখিয়া কেহ কখন আপনাকে বা স্বদেশকে উন্নত করিতে

পারেন নাই ; যাহারা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ভাবিতে এবং খাটিতে শিখো, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ এবং তাঁহাদের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। পৃথিবী কর্ম্ম-ক্ষেত্র, মানবজন্ম কর্ম্মেরই জন্য; এখানে কর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া কেহ নিরাপদ হইতে পারেন না—এখানে কর্ম্মের মধ্যদিয়াই নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি লাভ করিতে হয়। এ হেন কর্ম্মে—স্বদেশার্থক কর্ম্মে যাহার প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট এবং অভ্যাস পরিমার্জ্জিত না হইল, তাহাকে প্রকৃত ভাবে শিক্ষিত বলিব কেমন করিয়া? সুহৃৎ-সমিতির কার্য্য-বিবরণ-পাঠে আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশা করি, যুবকগণ ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদের পবিত্র ব্রতে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কলিকালে সৎকর্ম্মের ফল বিলম্বে ফলে, কচিৎ নাও ফলে, সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ফল না দেখিলে হৃদয় ভগ্ন হইয়া যাইতে পারে, এই জন্যই ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে নিষেধ করিলাম। আমরা মনুষ্য হইয়া সৎকর্ম্মে অধিকার পাইয়াছি, এবং ঈশ্বরের কৃপায় সেই অধিকার পরিচালন করিতে পারিতেছি, ইহাই কি যথেষ্ট ফল, যথেষ্ট পুরস্কার, এবং যথেষ্ট আনন্দের কারণ নহে? কর্ম্মই কর্ম্মের যথেষ্ট পুরস্কার, ইহার নিকট অন্য পুরস্কার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

গয়ামাহাত্ম্যম্। মূল ও বঙ্গানুবাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত। গয়া "সুলভ যাত্রি-নিবাসের" অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আকার রয়েল ৮ পেজী ৪৯ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল এক আনা।

অনুবাদের সাহায্যে মূল বুঝিবার পক্ষে অনেকেরই সুবিধা হইবে। অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

উপহার। রুদ্রকুলোদ্ভব নাথ বংশীয় বঙ্গদেশস্থ যোগী জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। (বালীগ্রাম নিবাসী শ্রীভূতনাথ নাথজী দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত) তন্ত্রাদিতে বিন্দুনাথ, আইনাথ, সিদ্ধনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি প্রভৃত নামান্তনামা অনেক যোগীর উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গদেশীয় যুগিগণ বলিতেছেন, ইহারাই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ, এবং তাঁহারা যুগী নহেন, যোগী। বাস্তবিকও দেখা যায় যুগী বা যোগী জাতি "নাথ" উপাধি দ্বারা পরিচিত, আর তাঁহাদের অশৌচধারণ প্রভৃতি অনেক কার্য্য ব্রাহ্মণ-জাতির নিয়মেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন তাঁহারা রুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ, সুতরাং উপবীত-ধারণে অধিকারী। এতদর্থে সংস্কৃত শাস্ত্রে যেখানে নাথ বা যোগী শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে ; এমন কি,

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
('ততোধিক' নহে)
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥"

ভগবদ্‌গীতার এই শ্লোকটি পর্য্যন্ত প্রমাণ-স্থলে গৃহীত হইয়াছে !

বর্ত্তমান যুগে এতদ্দেশে সংস্কারের দ্বিবিধ গতি দেখা যাইতেছে,—এক উপবীত ছিঁড়িয়া ব্রাহ্মণত্ব ধ্বংস করা, অপর উপবীত গ্রহণদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা বোধ হয় শেষোক্ত প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী। উপবীত লইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় না, এ কথা সকলেই জানে ; তবে, অধিকার প্রয়াসে ব্রাহ্মণত্ব গুণ লাভে যদি কেহ যত্ন করে, তাহাতে ক্ষতি কি ? যাহা হউক, যুগী বা যোগীদিগের প্রতি যদি প্রকৃতই সামাজিক কোন অবিচার হইয়া থাকে, তাহার প্রতিকার দর্শনে আমাদের সুখ বই দুঃখ হইবে না।

ভক্ত চরিতামৃত। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি গুরু শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব-গোস্বামীর জীবন-চরিত। প্রেম ভক্তিতত্ত্বের সমালোচনা সম্বলিত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীঅধরচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার ডিমাই ১২ পেজী ১৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

স্বভাব-নীতি শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র রায় প্রণীত। বলিহার রাজবাটী।

সুন্দর অক্ষরে এবং সুন্দর কাগজে মুদ্রিত এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতীব প্রীত লাভ করিলাম।

লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর সম্মিলন ধনের সঙ্গে জ্ঞান এবং সাহিত্যানুরাগের সমাবেশ বহু পুণ্যের ফল; অজ্ঞান কাণ্ডাকাণ্ডবোধশূন্য গণ্ডমূর্খ অথচ ষোলআনা অহঙ্কারে এবং অভিমানে স্ফীতহৃদয় ধনী আমরা সচরাচরই দেখিতে পাই; আবার অন্নাভাবে ক্ষীণকায় মলিন চীরধারী জ্ঞানবান্ সাহিত্যানুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প, সাহিত্যসেবীর সংখ্যা আরও অল্প। সংখ্যা অল্প বলিয়াই ইহাদিগের এত গৌরব এত সম্মান, এত প্রশংসা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম আজিও লোকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে কেন? কৃষ্ণনগরের রাজ বংশে কেবল কৃষ্ণচন্দ্রই রাজা ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বে এবং পরে অনেকেই রাজত্ব করিয়াছেন, এখনও অনেকে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও নাম মনে থাকে না, কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের নামই মনে থাকে কেন? হতভাগ্য সিরাজের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া যে তিনি খুব সাধুতা বীরতা বুদ্ধিমত্তা বা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নামটি স্মরণ রাখিতে হইবে এমনও নহে। সিরাজ লম্পট এবং অত্যাচারী ছিল সত্য; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র কিম্বা তাঁর বংশধর বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিতে পাইলে কি করিতেন, একবার না দেখিলে তাহা বলা যায় না। কৃষ্ণচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে তাঁহার আর কোন গুণে নহে, কেবল বিদ্যার প্রতি তাঁহার আদরে এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় বলিহারের শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুরও সৌভাগ্যশালী, কেন না ইহাতেও ধনবত্তার সঙ্গে সাহিত্যানুরাগের সমাবেশ হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সাহিত্যসেবী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি সাহিত্যসেবীর অত্যন্ত আদর করিতেন, সামান্য একটা কবিতা লিখিয়া কেহ তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাকে পুরস্কার দিতেন বলিহারের রাজা বাহাদুরের সে গুণ আছে কি না জানি না, কিন্তু তিনি নিজে একজন সাহিত্যসেবী, শুনিয়াছি তাঁহার প্রণীত আরও কয়েক খানি পুস্তক না কি আছে। স্বভাব-নীতি তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের ফল, সুতরাং ইহাতে ভাষা এবং ভাব উভয়েরই গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান আছে। গ্রন্থকার পশু পক্ষি বৃক্ষাদিকে উপলক্ষ করিয়া মানব সন্তানকে অতি হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে পয়ার ছন্দে একটি করিয়া শ্লোক থাকাতে উপদেশ গুলি আরও মধুর হইয়াছে।

আসামের শিক্ষাবিবরণ, ১৮৯৪—৯৫ নিয়ে প্রদত্ত দুই বৎসরের তালিকা হইতে আসামে শিক্ষার অবস্থা বুঝা যাইবে।

		১৮৯৩—৯৪ বিদ্যালয়-সংখ্যা	১৮৯৩—৯৪ ছাত্র-সংখ্যা	১৮৯৪—৯৫ বিদ্যালয়-সংখ্যা	১৮৯৪—৯৫ ছাত্র-সংখ্যা
	(সাধারণ বা সরকারী সংশ্রবযুক্ত বিদ্যালয়)				
উচ্চশিক্ষা	কলেজ	১	২৫	১	১,
মধ্যবর্ত্তী শিক্ষা বালকের	উচ্চইং	১৯	৩,৪৬২	২২	৩,৭৬[illegible]
	মধ্যইং	৫০	৩,৯৮৪	৫৫	৪,০৮
	মধ্য বাং	৪৪	২,৯৪৭	৪৭	২,৯৪
ঐ বালিকার	মধ্য বাং	২	৫৭	২	৫২
প্রাথমিক শিক্ষা	বালকের	২,৪২০	৭০,৭২৫	২,৫৭৫	৭৪,৬৩৯
	বালিকার	১,৮৮	৩,১০৩	২১৬	৩,৭৬১
বিশেষ শিক্ষা	শিক্ষক-বিদ্যালয় ও শ্রেণী	১৭	৩১৪	১৭	৩৩
	শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় ও শ্রেণী	১	৩৩	১	২৪
	শ্রমশিল্প	১	৮	১	৮
	ইউরোপীয় এবং ইউরেসীয়	১	১৮	১	২
	আইন শ্রেণী	৩	৪৩	৩	৪
	অন্যান্য	৪	১৬২	৪	১৩২
সমগ্র		২,৭৫১	৮৪,৮৮১	২৯৩৯	৮৯,৮৪৩
	(অপসাধারণ বা সরকারী সংশ্রব-শূন্য বিদ্যালয়)				
আরব্য ও পারস্য		২১	৭১৫	১৬	৫৯৪
সংস্কৃত		৯৮	১,৮৭০	৮৬	১,৭৯
বালকদিগের প্রাথমিক		২০	৪৭৭	৬	১০৭
কোরাণ বিদ্যালয়	বালকের	২০৩	৩,৯৪৭	১৯৭	৩,৮৮২
	বালিকার	৪	৭০	৫	৯২
অনিয়মিত বিদ্যালয় বালকের		১৫	৫৬৫	১১	৪০২
সমষ্টি		৩৬১	৭,৬৪৫	৩২১	৬,৯০
সর্ব্বসমষ্টি		৩,১১২	৯২,৫২৫	৩,২৬০	৯৬,৭

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, মোটের উপরে আসামে বৎসর বৎসর অধিকতর শিক্ষা-বিস্তার হইতেছে; কিন্তু শিক্ষা-পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা তাহার বিস্তীর্ণ আলোচনা অসম্ভব।